বঙ্কিমলোক

বসন্তকুমার
চট্টোপাধ্যায়

[illegible]

প্রথম পরিচ্ছেদ

"কৈ ? মাসীমা গেলেন কোথা ? টেঁপী, ওরে ও টেঁপী—"

"যাই বাবা"—স্বাভাবিক কর্কশকণ্ঠ যথাসম্ভব কোমল করিয়া দেবী শয়নকক্ষ হইতে উত্তর দিয়া, তাড়াতাড়ি বাহিরে ;, একখানা পিঁড়ি আগাইয়া দিয়া, শ্রীমান্ ভূষণকে কহিলেন— া ঘুঁটুকে—বস্ ।"

ান্ ঘুঁটুকেই ভুষণ গাঙ্গুলী, বর্ত্তমানে কলিকাতাবাসী এবং জনৈক সুপ্রসিদ্ধ সিনেমা-আক্টর, সাপ্তাহিক কাগজওয়ালারা "নটহস্তী" উপাধি দিয়াছে। সম্প্রতি পূজার সময় বাবুদের 'কংসবধ' চিত্রে 'কালুয়া', 'ইন্দ্রসভা' চিত্রে জনৈক মূকদেবতা রণ্যকশিপুবধ' ছবিতে মৃত সৈনিকের বিশিষ্ট চরিত্রাভিনয়ে, দেশে া পঞ্চক্রোশী হইয়া পড়িয়াছে।

া বসিল।

নিস্তারিণী কহিলেন—"আমাদের তো বড় বিপদ, বাবা ঘুঁটকে—"

ভূষণ বাধা দিয়া, গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া কহিল—"বিপদ! বিপদ কি মাসীমা ?"

ভূষণের পিতা স্থানীয় জমিদারগৃহে পূজারী ও তাহার জননী পাচিকা ছিলেন। নিস্তারিণী দেবীকে ভূষণ বাল্যাবধি গ্রামসম্বাদে মাসী বলিত

ভূষণের ভাষায় সহানুভূতি এবং দরদের ছাপ থাকিলেও, তাহ চক্ষু যেন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। হৈমন্তী সন্ধ্যার ধূমাচ্ছন্ন প্রায়ান্ধকারে নিস্তারিণী তাহা লক্ষ্য করিলেন না।

জনান্তিকে চিৎকার করিয়া—"অলা ও, ক্ষেন্তি, ও বুঁচি—তোরা যো ওর কাছে থাকিস, পালাস না। আমি ঘুঁটকের সঙ্গে একটু কথা কয়ে যেচি। একে এই সংসারের খাটা-খাটুনী, তার ওপরে ব্যায়রাম-স্যায়রাম হলে আর, বাবা, শরীলে শরীল থাকে না! আর কি সে-গতর আছে ?" বলিয়া, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণা স্থূলদেহা, মাথায় লম্বা চাদি হাত, বয়স চল্লিশের কিছু বেশী, কোনও প্রকারে লজ্জারক্ষা-করা আট হাতী একখানা কাপড়পরা, নিস্তারিণী দেবী ভূষণের নিকট বসিলেন।

ভূষণ জিজ্ঞাসা করিল—"বিপদ কি মাসীমা ?"

—"বিপদ, বাবা ঘুঁটকে, বড় বিপদ! আজ সাত-আট দিন থেকে তোমার মেসোর খুব জর যে—"

ভূষণ কহিল—"তা তো জানি—"

—"হাঁ, তা তো তুমি জানই। প্রথমটা আমরা ভেবেছিলাম ও মালোয়ারী জ্বর, খেতে নাইতেই সেরে যাবে। কাল আবাং কষে তেল মেখে নদীতে চান্ করে এল—কলাইয়ের ডাল, নতুন মূলো

চচ্চড়ি, কুম্‌ড়ো বড়ির অম্বল দিয়ে, বলতে নেই—বেশ যেমন খায়, তেমনি ভাতও খেল, ইস্কুলেও গেল—ওমা, ইস্কুলে পা দিতে না দিতেই, হন্ হন্ করে জ্বর! বাবুদের বাড়ী কে এক ডাক্তোর এয়েছিল, সে নাকি দেখে বলেচে—ও জ্বর নয়, নীলমণি হয়েচে!"

ভূষণ ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"মাসীমাও যে ইংরিজী শিখে ফেলেছেন?"

টেঁপী কোন্ সময়ে আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, নিস্তারিণী লক্ষ্য করেন নাই। টেঁপী কহিল—"কেন মাকে কি ইংরিজী শিখ্‌তে নাই ঘুঁটকে দাদা?"

—"থাকবে না কেন? কলকাতায় সব মেয়েরাই তো আজকাল ইংরিজী বলে! তবে তারা শুদ্ধু ইংরিজী বলে, ভুল বলে না।"

টেঁপী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কলকাতায় সব মেয়েরাই ইংরিজী বলে? বল কি ঘুঁটকে দাদা?"

ভূষণ গম্ভীরভাবে কহিল—"আমি আর বল্‌ব কি? কলকাতা গেলেই দেখতে পাবি—পথে, ঘাটে, ইষ্টাশিনে, টেরামে, বাশে কেবল মেয়ে আর মেয়ে! আর তারা কি সব যে-সে মেয়ে? জজ, হাকিম, উকীল, মোক্তারদের মেয়ে, সব বি-এ, এম-এ পাশ!"

টেঁপীর বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। মুগ্ধের মত জিজ্ঞাসা করিল—"তারাও আমাদেরি মতন তো?"

ভূষণ হাসিয়া কহিল—"মেয়েরা তোদের মত নয় তো কি আমার মত? তবে হাঁ. তাদের শাড়ী, শেমিজ, ব্লাউজ, বডি, জুতো দেখলে, তাদের চশমা-চোখে মুখপানে তাকালে, আমাদের মত মুখ্যুশুখ্যু

পাড়াগেঁয়ে লোকের প্রথম প্রথম ভিরমি লাগার জো হয়! এখন দেখে দেখে ও-সব অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে।"

মা ও মেয়ে উভয়েই একমনে শুনিতেছিল।

ভূষণ কহিল—"নীলমণি নয় মাসীমা, নীলমণিয়া। নীলমণিয়া হল ঠিক শুরুদ্দ ইংরিজী। বুঝলি টেঁপী? শুধু বাংলা পরীক্ষায় জলপানি পেলেই হয় না! এই যেমন হারমনিয়ার বাজনা, আলুমনিয়ার বাসন! হারমনিয়া জানিস তো, যা গানের সঙ্গে বাজায়?"

টেঁপী কহিল—"হাঁ দেখিচি, অভয় দাদাদের বাড়ীতে আছে।"

—"হাঁ, তবে ঐ যাক্, তারপর মাসীমা?"

নিস্তারিণী কহিল—"তারপর আর কি বাবা? তাই শেকটেক্ করছিলাম—ছোটবাবু এয়েছিল বৈকালে; তিনি বলে গেলেন, খুব সাবধান—একটু অযত্ন হলেই প্রাণ বাঁচান দায় হবে। এখন এই বিপদে কি করি বল্ তো, বাবা?"

ভূষণ ভরসা দিয়া কহিল—"ওর জন্যে কোন ভয় নেই, মাসীমা—আমার সতেরবার নীলমণিয়া হয়েছে। ও কিচ্ছু নয়!"

নিস্তারিণী যেন অকূলে কূল পাইলেন, কহিলেন—"আহা তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক বাবা, তাই যেন হয়।"

টেঁপী সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে দাদাবাবু যে বলে গেলেন?"

—"আরে ও-সব বড়লোকদের বড় বড় কথা! তাদের পা কামড়ালে বলে বাত, একটু ঠাণ্ডা লাগলেই বলে নীলমনিয়া, মাথা ধরলে বলে শিরঃপীড়া, কাস্‌লে বলে টিবি, মোটা হলে বলে রক্তের ব্যায়রাম—ওদের

কথা ছেড়ে দে টেঁপী, ওদের কথা ধরিস না। আমি বলচি, মেসোমশায়ের কিচ্ছু হয় নাই, কোন ভয় নাই!"

নিস্তারিণী কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। কহিলেন—"তোর কথা শুনে বাঁচলাম বাবা ঘুঁটকে—আমার তো বড্ড ভয় হয়েছিল, পেটের ভেতর হাত পা সেঁদিয়ে গিয়েছিল! তুই কলকাতায় থাকিস্, কত দেখিস্ শুনিস্, তোর কথা আমার মনে নাগচে। কোথাকার কে এক পাড়াগেঁয়ে ভূতো ডাক্তোর, ও কি জানে? যা টেঁপী, ভাঁড়ার থেকে দুটো রসকরা এনে, ঘুঁট্‌কেকে একটু জল খেতে দে। তারপর আকায় আগুন দেগা, দুটো যা হয় শীগগীর শীগগীর ফুটিয়ে নামা গা! সন্দে বাঁউরেচে কোনকাল। আমি ঘুঁট্‌কের সঙ্গে ততক্ষণ একটু কথা বলি। দিনভোর এই ঝঞ্ঝাটে খাওয়াই হয় নাই। মলাম খেটে খেটে, গা-গতর যেন ভেঙে পড়্‌চে। আর বস্‌তে লার্‌চি। সকাল সকাল খেয়ে একটু গড়াতে পেলে বাঁচি।"

টেঁপী উনানে আগুন দিতে গেল।

ভূবণ কহিল—"পূজোর সময় মেসোমশায়কে আমি পই পই করে বারণ করলাম, কিন্তু তিনি তা শুনলেন না। এই বয়সে এত খাটুনী কি সহ্য হয়? তার উপর খালি গায়ে ঘোরা-ফেরা, একি সোজা কথা, মাসীমা? কলকাতায় আমরা খালি গায়ে বেড়িয়েচি কি, অম্‌নি, টিবি!"

নিস্তারিণী কহিল—"তা বাবা, তোরা এখন কল্‌কাতার নোক, তাদের সঙ্গে কি আমাদের কথা? বাবা ধম্মরাজের দয়ায় তোর যে একটা গত্তি নেগেচে, এতে আমরা ভারী সুখী হইচি। আহা,

বেঁচে থাক্,' নফর গাঙ্গুলীর নাম থাক্। তোর মা, তোকে নিয়ে কি কষ্টই না করেচে। তোর মাকে তোর মনে আছে, ঘুঁটকে।"

ভূষণ কহিল—"খুব সামান্য।"

—"তাতো হবেই, তুই পেটে তোর বাবা মারা যায়। তারপর তোর যখন ৫।৬ বছর বয়েস, তখন তোর মা মরে—তা' আর মনে থাক্‌বে কি? বেঁচে থাক্, সুখে থাক্—আমরা দেখে মরি! তবু গাঁয়ের একটা ছেলেও তো মানুষের মত মানুষ হল! আমার ঐ পৌনে এক গণ্ডা দস্যির তো কেউই মানুষ হল না।"

টেঁপী ভাত চড়াইয়া, বারান্দায় একটা রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া, তুইটি রসকরা ও এক গ্লাস জল দিয়া চলিয়া গেল। ভূষণ খাইতে বসিল।

নিস্তারিণী কহিলেন—"তোর বাবা বাবুদের ঠাকুরসেবা করে, বছরে ছ' টাকা মাইনে আর তু' বেলা ভোগ পেত'। তোর মা বাবুদের রাঁধতো আর লোকের বড়ি দিয়ে, কাঁথা সেলাই করে', ধান ভেনে দিয়ে যা' পেত', তাতেই কষ্টে স্বষ্টে কোন রকমে সংসার চালাত। আহা, আমাকে দিদি বল্‌তে সে অজ্ঞান হত! বড় ভাল লোক ছিল তোর মা!"

টেঁপী আসিয়া বসিল। কহিল—"ঘুঁটকে দাদা, কল্‌কাতার গল্প কর'—"

ভূষণ সহাস্যে কহিল—"আরে সে কি গল্প করে বোঝাবার জিনিস ক্ষেপি, না সে বলে' কখনও শেষ করা যায়?"

নিস্তারিণী বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা ঘুঁটকে, তোদের ঐ বাইশকোপে তোকে মাইনে টাইনে দেয় তো? কত দেয়?"

ভূষণ অতি-বিনয়ে মুখটি নত করিয়া কহিল—"বাইশ্‌কোপ্‌ বল' না, মাসীমা, কল্‌কাতায় আমরা বলি, ছিনেমা। এখন আমার মাইনে—দেড়শো টাকা।"

টেঁপী চমকিয়া উঠিল—"দেড়শো টাকা—"

নিস্তারিণীর মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। তাহার মুখ দিয়া হঠাৎ কোনও কথাই বাহির হইল না।

—"বলিস্‌ কিরে ঘুঁটুকে, তোর মাইনে দেড়শো টাকা? সত্যি বল্‌চিস তো?"

ভূষণ সবিনয়ে নিবেদন করিল—"গুরুজনের কাছে কি মিছে কথা বলা যায় মাসীমা? আর তা বলেই বা লাভ কি?"

নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছোটবাবু বুঝি বলে' কয়ে করে দিয়েছে?"

ভূষণ কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া কহিল—"ছোটবাবু! হেঃ—ভারী তোমার ছোটবাবু! তোমাদের এই বনগাঁয়েরই ও শেয়াল্‌ রাজা! ছোটবাবু তোমাদেরই জমিদার! আমাদের কল্‌কাতায় এ সবকে পোঁছে কে? দেশ থেকে আমায় নিয়ে গেলেন খান্‌শামা করে', আর সেখানে গিয়ে হাতে তুলে দিলেন দু'বেলা হাড়িকুঁড়ি আর হাতা বেড়ি! দু' বেলা রান্না, দু' বেলা জলখাবার আর সারাদিন চা করতে করতে আমার টিবি হবার উপক্রম মাসীমা! কি কষ্ট যে, তা আর কি বল্‌ব! খুব তোমাদের ছোটবাবু! যাও—"

টেঁপী জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি তো ঘুঁটুকে দাদা লেখাপড়া কিছুই শেখ' নাই, তবে তোমার এত বড় চাকরী কি করে' হল? কে করে' দিলে?"

ভূষণ কহিল—"কল্‌কাতার লোকের খুব দয়া, বুঝ্‌লি টেঁপী! তারা মানুষ চেনে, গুণের আদর তারাই করতে জানে! তারা দেখ্‌লে যে আমি একজন ভাল আক্টোর, আর অমনি আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে কাজ দিয়ে দিল। ইষ্টুডিওতে পা দিতে না দিতেই মাইনে হল ৫০৲ টাকা! তারপর যেমন যেমন কাজ করি, তেমনি তেমনি মাইনে বাড়ে। ছিনেমার কাজ অত সস্তা নয় মাসীমা। কত রাজা মহারাজা, বি, এ পাশ, এম্, এ পাশ মেয়ে পুরুষ দিনরাত প্রোপ্রাইটারের খোশামুদী করে' আর হাঁটাহাঁটি করে, ফেল্ হয়ে যেচে! হেঁঃ—"

নিস্তারিণী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—"তাহ'লে পচাকে ভোলাকে আর বটাকে একটা করে চাকরী করে দে'না বাবা? তোর তো ভাই ওরা! ধেড়ে ধেড়ে ছেলে, ক অক্ষর গোমাংস, দিন রাত্তির নেশা-ভাং করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বৈ তো নয়! তবু ৫০ টাকা করেও যদি মাইনে হয়, মন্দ কি? কি বলিস্ টেঁপী?"

টেঁপী কহিল—"নিশ্চয়! তাই দাও ঘুঁটুকে দাদা। বড়দাদা, মেজদাদা আর ছোটদাদা তিনজনাই তো একেবারে তোমারি মত পণ্ডিত! তুমিই পারবে। ঐ ছিনেমাতেই ঢুকিয়ে দাও।"

ভূষণ বিপদে পড়িল! অগ্রহায়ণ মাসের ঠাণ্ডাতেও সে ঘামিতে আরম্ভ করিল! তবু মুখে সে হঠিল না, কহিল—"স্বচ্ছন্দে! এ আর শক্ত কি? আমার সঙ্গে চলুক তা'হলে কল্‌কাতায়!"

টেঁপী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কল্‌কাতা গেলেই চাকরী হয়ে যাবে? বেশ হবে তাহলে, আমরাও দাদার বাসায় গিয়ে কল্‌কাতা দেখে আসব—" বলিতে বলিতে কলিকাতার স্বপ্নপুরী দর্শনের

কল্পনায় কিশোরী টেঁপী আত্মহারা হইয়া রান্নাঘরে ঢুকিল ভাত নামাইতে।

শ্রীমান্ পচা কিঞ্চিৎ গঞ্জিকা সেবন করিয়া ঢুলু-ঢুলু নেত্রে ফিরিলেন। উঠানে দাঁড়াইয়া ভূষণকে দেখিয়াই আপ্যায়িত করিল—"কি ভূষণ ম্যাষ্টোর যে! খবর কি? ভাত হল টেঁপী? শীগ্‌গীর দে, বড্ড ক্ষিদে নেগেচে। এখনো হয় নেই? আ মর্ মুখ্‌পুড়ী, কুঁড়ের বাদ্‌শা।"

টেঁপীও উত্তর দিল—"কি আমার চাক্‌রী করে বাড়ী এলেন? এসেই তম্বি! ছাই খাও—আকার ছাই দিচি—"

ক্রমশ ভোলা ও বটাও প্রবেশ করিল। ভোলা একটু তাড়িপানে শরীরটা কিঞ্চিৎ গরম করিয়া, মাথায় কাপড় দিয়া মুখ ঢাকিয়া, সোজা রান্নাঘরে ঢুকিয়া বসিল, পাছে কেহ গন্ধ পায়। বটা গ্রামের যাত্রার দলে লক্ষণ সাজিবে, মহলা দিবার জন্য এখনি তাহাকে যাইতে হইবে, তাহারও তাড়াতাড়ি। মাতাকে কহিল—"মা, ভাত না হয়ে থাকে তো একবাটী মুড়ি দে, আমাকে এখুনি যেতে হবে কানাই ময়রার বাড়ী!"

নিস্তারিণী ছোট কাপড়ে বিপুল দেহখানিকে কোনও রকমে ঢাকিতে বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে উঠিতেই, ক্ষেন্তি ও বুঁচি ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে জননীকে কহিল—"ওমা, শীগ্‌গীর এস, দেখ্‌বে, বাবা কেমন কর্‌চে—"

ভূষণ ও নিস্তারিণী তাড়াতাড়ি রোগীর কক্ষে ছুটিয়া গেল। টেঁপীও রান্নাঘর হইতে এঁটো হাতেই ছুটিল।

কেশবের তখন নাভিশ্বাস উঠিয়াছে!

নিস্তারিণী ও কন্যাত্রয় একসঙ্গে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ভূষণ মুমূর্ষুর পুত্রত্রয়কে খোঁজ করিতে বাহিরে আসিয়া দেখিল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দভেদী বাণ খাইয়া অনাহারেই অন্তর্ধান করিয়াছে, কেবল জ্যেষ্ঠ শ্রীমান্ পচা তখনও দাওয়ায় বসিয়া ঢুলিতেছিল।

ভূষণের নিকট পিতার মৃত্যুসংবাদে পচা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চক্ষু বুঁজিয়াই কহিল—"কি মুস্কিল দেখ্‌দেখি ঘুঁটকে? এই শীত, এই অন্ধকার রাত—এখন কিনা—এ কি বিপদ হল, বল্ দেখি ভাই—"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার রাত্রিতে সারারাত্রি নদীর ধারে খালি গায়ে ছেলেদের শ্মশান-জাগার প্রধান আপত্তি সত্ত্বেও, কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মরিলেন। পত্নীর বহুবিধ সাংসারিক অসচ্ছলতা-অনটনের স্বরেলা ফিরিস্তিতে এবং সরোদন চিৎকারে, নানা দুঃখকষ্টের সত্য ও মিথ্যা বিবিধ কাহিনীতেও, কেশবচন্দ্র এতটুকু কর্ণপাত করিলেন না। অনভিজ্ঞা অবলা পত্নীর দুর্ব্বল স্কন্ধে, তিনটি অবিবাহিতা কন্যা এবং তিনটি অকর্ম্মণ্য পুত্রের গুরু ভার ন্যস্ত করিয়া, কেশবের এই মহাযাত্রার অনৌচিত্য প্রদর্শনপূর্ব্বক, নিস্তারিণী দেবী বহু অভিযোগ করিলেন, কিন্তু মৃত্যুদেবতার তাহাতে দয়া হইল না বা কেশবচন্দ্রও পুনর্জীবন লাভ করিলেন না। তিনি মরিলেন, সত্য সত্যই মরিলেন।

গ্রামের লোকেরা বলিল, কেশব মরিয়া বাঁচিল, কেন না বহু পূর্ব্বেই তাহার নাকি মরা উচিত ছিল, অন্তত নিস্তারিণীর মত প্রবলা পত্নীর কবল এবং শ্রীমান্ পচা ভোলা ও বটার ন্যায় ত্রিরত্নের পিতৃত্ব হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য। কথিত আছে, কেশবচন্দ্রকে উক্ত কারণে দেশে আপামর লোক করুণা করিত, অবশ্য নিস্তারিণীর কানে সে সব পৌঁছিত না। জনসাধারণের নিকট কেশবচন্দ্র এইজন্য সহ্য গুণের আদর্শ ছিলেন।

হাজার টাকাই হউক আর দশ টাকাই হউক, উপায় করে একজনই, তার দশজন আত্মীয়তা এবং অধিকারসূত্রে বিনায়াসে সেই উপার্জ্জনের

উপসত্ব ভোগ করে—এবং যেমন করিয়াই হউক একরকমে সংসারও চলে। কাজেই, উপায়ক্ষম সেই একটি ব্যক্তির অবর্ত্তমানে, সকলেই একসঙ্গে যুগপৎ নিরুপায় হইয়া পড়ে—অন্তত বাঙালী পরিবারের ইহাই বিশেষত্ব। মাসিক ছয় টাকা বেতনে কেশবচন্দ্র গ্রামের নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া, সেই ছয় টাকার মতই সংসার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। আজ তাঁহার অভাবে তাঁহার সংসারও তাই অকূল সমুদ্রে ডুবিল।

শ্মশানখরচ করিবার টাকাও ঘরে ছিল না, ভূষণ চালাইয়া দিল। তারপর ?, তারপর সবই অন্ধকার।

লোক মৌখিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাইয়া, কেহ বা দুই ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া বিদায় হইল। যাহার কিছুই ইচ্ছা ছিল না, সেও নিস্তারিণীর গঞ্জনা এবং অকারণ কলহের ভয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আসিল। নিস্তারিণীর মনের দুঃখ তদ্বারা যদিও কিছুই ঘুচিল না।

জীবৎকালে কেশবের আধিদৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁহার স্ত্রীপুত্র কায়মনোবাক্যে কিছুই করে নাই, কাজেই তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ার জন্যও আজ তাহারা তেমন আগ্রহশীল হইল না।

ভূষণ এই সুযোগে এ-পরিবারে হঠাৎ একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িল। গিন্নী এবং ছেলে-মেয়েদের পর্য্যন্ত সকলেরই ভূষণের সঙ্গে সব বিষয়ের সারা দিনই গভীর পরামর্শ চলিতে লাগিল।

ভূষণ নিস্তারিণীকে শ্রাদ্ধাদিতে অনর্থক অর্থব্যয় না করিতে পরামর্শ দিয়া কহিল, রাজা রামচন্দ্র বালির পিণ্ড দিয়া যদি পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে পারেন, পচা, ভোলা, বটা তাহা হইলে তাহা পারিবে না কেন?

কথাটি নিস্তারিণীর খুবই মনে ধরিল। শাস্ত্রের কথা ধরিবে না-ই বা কেন? নিস্তারিণী মনে মনে ঘুঁটুকের বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। ঘুঁটুকে মূর্খ হইলে কি হয়, কলিকাতায় থাকিয়া, বড় বড় লোকের সঙ্গে দিবারাত্র মিশিয়া, ছিনেমা কোম্পানিতে দেড়-শো টাকা মাইনের চাকরী করিয়া, তাহার মাথা কি পরিস্কার খুলিয়া গিয়াছে! স্বামীর নিকট নিস্তারিণীর শোনা ছিল, মনে পড়িল, শ্মশানে আর আদালতে যাহারা উপস্থিত থাকে, তাহারাই প্রকৃত বন্ধু। ঘুঁটুকে পয়সা খরচ করিয়া যখন বন্ধুত্ব করিয়াছে, তখন তাহার বন্ধুত্বে সন্দেহ করা যায় না। বিশেষতঃ, তাহাদের যখন এই দুর্দ্দিন, তখন এমনি একজন অযাচিত হিতৈষীর অর্থ-সাহায্য ও হিতোপদেশ ছাড়া কি নিতান্ত মূর্খতা নয়?

নিস্তারিণীর পরামর্শদাতা অবশ্য কেহই ছিল না, আর এ গ্রামে এ দুঃসাহসিক কার্য্যে মাথা দিবার সাহসও লোকের তেমন ছিল না। কাজেই তিনি নিজে যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করিতে লাগিলেন।

পুত্রতিনটীর তো সারাদিন বিশেষ কোনও খোঁজই পাওয়া যাইত না। সন্ধ্যায় মাঝে মাঝে দয়া করিয়া কেহ একআধ বার দেখা দিত, তাহাও অতি অল্প সময়ের জন্য। কেবল ঘুঁটুকেই মাসীমাকে বহু সদুপদেশ এবং সান্ত্বনা দিয়া, প্রত্যুষ হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত এ-বাড়ীতে কাটাইত। মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায় বাবুদের ঠাকুরবাড়ীতে দুইবার বিনা-ব্যয়ে উদরপূর্ত্তির নিমিত্ত সে দুইবার কেবল অনুপস্থিত হইত।

বাবুদের ঠাকুরবাড়ীতে দুইবেলা প্রসাদ পাইয়া এবং তাঁহাদের ঠাকুর বাড়ীর নাটমণ্ডপে কিম্বা বৈঠকখানার এককোণে রাত্রিযাপন করিয়া,

অবশিষ্ট কাল সে নিস্তারিণীর সহিত তাঁহার সুখদুঃখ ও ভবিষ্যৎ আলোচনা করিয়া কাটাইতে লাগিল। নিস্তারিণীও ক্রমশঃ ভূষণের উপর সত্যই স্নেহশীলা হইয়া উঠিলেন।

অপরাহ্ন। ঝির্‌ঝিরে উত্তরবায়ুর অঞ্চলপ্রান্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে শীত অবতরণ করিতেছিল। দাওয়ার এক কোণে ক্ষেন্তি ও বুঁচি খেলা করিতেছিল, টেঁপী মাতার কাছে উপবিষ্টা। নিস্তারিণী কপালে করাঘাত করিয়া ক্রন্দনের সুরে কহিতেছিলেন—"তিন্ তিন্‌টে উপযুক্ত ছেলে থাক্‌তে আজ ভাতের ভাবনা? কিন্তু এমনি আমার পোড়া অদেষ্ট যে, ঐ তিন্‌টে দস্যিকেই, বিধবা মেয়ের মত ভাত কাপড় দিয়ে, আমাকেই পুষ্‌তে হচ্ছে! বল্ দিকিনি বাবা ঘুঁটেকে, একি কম দুঃখের কথা?"

ভূষণ আশ্বাস দিয়া কহিল—"আমি তো বলেছি, মাসীমা, ওদের কথা আপনি ভাববেন না, ওদের যা' হয় একটা বিহিত আমি করে দোবই।"

নিস্তারিণী আশ্বস্ত হইয়া উচ্ছ্বসিতভাবে কহিলেন—"বেঁচে থাক বাবা, গাঙ্গুলী মশায়ের নাম থাক্। তুমি আমার পেটের ছেলের বাড়া। প্রাতঃবাক্যে তোমার একশো বছর পেরমাই হোক, তোমার সোনার দোয়াত কলম হোক্। ওদের তো যা হয় করবে, তারপর এই যে এরা? এরা যে গলায় নেগেছে, নামাই কি করে, বাবা? টেঁপী তো এই তেরো পেরুলো, একে তো আর বিদেয় না করলে জাত থাকে না, বাবা। ও দু'টো না হয় এখনও কিছুদিন না মরে', অন্ন ধ্বংসাবে! আ মর্, মরণ নেই তোদের?"

ভূষণ বাধা দিয়া কহিল—"ওদের কেন মিছেমিছি গালাগাল দিচ্ছেন, মাসীমা, ওদের দোষ কি? আহা—"

নিস্তারিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"দোষ নেই? জন্মালি তো আবাগীরা মেয়ে হয়ে জন্মালি কেন? ছেলে হ'তে পার্‌লি না? তাহলে তো এখনই আমাকে এমন অথন্তরে পড়তে হ'ত না?"

টেঁপী উদ্গত অশ্রু চোখে চাপিয়া সে স্থান ত্যাগ করিতে যাইতেছিল, ভূষণ নিবৃত্ত করিল। কহিল—"মাসীমা, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, আমি কল্‌কাতা যাই একবার, তারপর সব ঠিক করে ফেল্‌চি! আপনার কোনও ভাবনা থাকবে না। আপনি শুধু পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাক্‌বেন্, আর হুকুম চালাবেন্। এদ্দিন তো চলেই যেতাম, কেবল এই বিপদে পড়েই তো যাওয়া হচে না। এর মধ্যে আমার চারখানা চিঠিও এসে গিয়েছে। আমি না যাওয়ায়, কোম্পানীর বহুৎ ক্ষেতি হচে।"

জমিদারবাড়ী হইতে জনৈক পাইক আসিয়া সংবাদ দিল, নিস্তারিণী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ছোটবাবু আসিয়াছেন।

ভূষণের উৎসাহ শুধু বাধাপ্রাপ্তই হইল না, মুখটি শুকাইয়া ছাইয়ের মত পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। নিস্তারিণী ছোট্ট পরিধেয়খানিকে যতদূর সম্ভব টানিয়া বড় করিয়া, বিপুল দেহের আধখানা কোন রকমে ঢাকিয়া, পাশ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। মেয়েগুলিও ত্রস্তভাবে মায়ের পাশে ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ভূষণ দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া, উঠানে পদার্পণ করিবামাত্র ছোটবাবুকে গলবস্ত্র হইয়া দণ্ডবৎ করিয়া, সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া, সঙ্কুচিত ভাবে একধারে সন্ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ছোটবাবু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে ঘুঁটকে, তুই এখানে কি কর্‌চিস্?"

ভূষণ সবিনয়ে নতনেত্রে উত্তর দিল—"মাসীমার এই বিপদ, হুজুর—"

ছোটবাবু কহিলেন—"ও, চক্কোত্তি খুড়ীমা তোর মাসীমা হন বুঝি? বেশ—বেশ—"

দাওয়ার নিকটবর্ত্তী হইতেই টেঁপী একখানা সতরঞ্চির ছেঁড়া আসন পাতিয়া দিয়া, মৃদু মধুর স্বরে কহিল—"বাবুদাদা, বসুন্—"

ছোটবাবু সেদিকে লক্ষ্য না করিয়াই কহিলেন—"থাক, থাক্, তোরা ব্যস্ত হস্নি। পচা-টচা সব গেল কোথায়?"

টেঁপী কহিল—"তারা বেড়িয়েচে।"

নিস্তারিণীর চাপা কান্নার ফঁ্যাচ্ ফঁ্যাচ্ শব্দে ছোটবাবু কহিলেন—"কেঁদে আর কি হবে, খুড়ীমা? যা হবার তা তো হয়েচে! এ তো আর ফিরবে না—এখন তাঁর সদ্গতি যাতে হয়, তার কি কর্‌চেন?—"

জমিদারবাবু বয়সে তরুণ, সত্যকার সুপুরুষ, বলিষ্ঠ পেশীবহুল, ঋজু দেহ। বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, নাম অসীমকুমার।

বাল্যকালে মাতৃহীন হইয়া, পিতার স্নেহে মানুষ হইয়াছেন। পিতা গৌরমোহন চক্রবর্ত্তী যখন মারা যান্, তখন অসীমের বয়স প্রায় ১২।১৩ বৎসর। অসীমের মা বা দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন তেমন কোনও আত্মীয়ও ছিল না, এবং এই পল্লীগ্রামে লেখাপড়া ঠিক হইবে না বলিয়া, কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল, অসীমের পিতৃবন্ধু শ্যামাকান্ত ভট্টাচার্য্য, অসীমকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া, নিজ বাসার সন্নিকটে একটি স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া দিয়া, অসীমকে বি. এ. পাশ করাইয়াছেন; এবং শুধু নিজের ওকালতী পরিত্যাগ করিয়াই নয়, নিজের সমূহ অনিষ্ট করিয়া, অভিভাবকহীন একমাত্র বন্ধুপুত্রের কল্যাণের নিমিত্ত, চৈতন-

পুরের এই বিপুল জমিদারী রক্ষার সমস্ত ভার পর্য্যন্ত নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বন্ধুপুত্রের মঙ্গলের জন্য শ্যামাকান্তর এই নিঃস্বার্থ পরোপকার যদি আর পাঁচ বৎসর কাল চলিত, তাহা হইলে অসীমকে হয়ত আর এদিকেই আসিতে হইত না বা চৈতনপুরের জমিদার বলিয়া পরিচয় দিবারও কিছুই থাকিত না। অসীম নিজে অবশ্য কিছুই সন্দেহ করে নাই, কিন্তু উপর্য্যুপরি যখন বহু নামী ও বেনামী চিঠির উপদ্রবে সে গোপনে একটু অনুসন্ধান করিল, তখন অবগত হইল যে, চৈতনপুরের বিশাল জমিদারীটির গজভুক্ত-কপিত্থত্ব প্রাপ্ত হইতে সতই আর বেশী বিলম্ব ছিল না।

বার তের বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ অসীমকে প্রথম শ্যামাকান্ত যখন কলিকাতায় আনেন, তখন তাঁহার অবস্থা ছিল, চোরের মায়ের পুত্রশোকের মতই। হাইকোর্টের উকীল, অথচ এক বেলা খাওয়ারও সংস্থান তাঁহার ছিল নাঃ প্রকাশ্যে লোককে একথা বলাও যায় না! এক জনের দোতলা বাড়ীর স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার একতলাটি, মাসিক চৌদ্দ টাকায় ভাড়া লইয়া, বাড়ী ভাড়া দিতেই তখন তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইতেন। আর সেই শ্যামাকান্ত ভট্টাচার্য্য আজ কলিকাতায় তিন চারি খানি বড় বড় বাড়ীর মালিক, স্ত্রী কন্যার অঙ্গভরা অলঙ্কার, একখানি মোটর পর্য্যন্ত। দুইটি কন্যাই লরেটোতে পড়ে। পুত্র ছিল না। গৃহিণীর চিবান' চিবান' কথা ফুটিয়াছে, বড়লোকী চাল হইয়াছে।

অথচ ওকালতী তিনি এই দীর্ঘ কালের মধ্যে একটি দিনও করিলেন না! কেহ জিজ্ঞাসা না করিলেও, তিনি প্রায়ই ইদানীং বলেন, তাঁহার দিদিমা তাঁহাকে বহু নগদ টাকা দিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

অসীম বি, এ, পাশ করিয়া দেশে আসিয়া, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, শ্যামাকান্তের নিকট হিসাব চাহিয়াছে।

ঘুঁটুকেকে অসীম খানসামা করিয়া প্রথম কলিকাতা লইয়া যায়। তিন চার বৎসর থাকিয়া, হঠাৎ ঘুঁটুকে একদিন অসীমকে ছাড়িয়া, কলিকাতার অসীমেই না-বলিয়া না-কহিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া পড়ে এবং পরে পত্র দ্বারা জানায় যে সে নিরাপদ এবং অন্যত্র ভাল চাকরীও পাইয়াছে। ইহার পর দুই একবার সে অসীমের সঙ্গে সাক্ষাৎও করিয়াছে।

বহুদিন পরে অসীম দেশে আসিয়া এইবার এই প্রথম দুর্গোৎসব করিল। পূজা উপলক্ষে জমিদারবাড়ীতে, ঘুঁটুকের নির্ব্বন্ধাতিশয্যেই, কিং ফিল্ম কর্পোরেশনের নিকট হইতে আনীত ঘুঁটুকের অভিনীত তিনখানি ছবি-প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঘুঁটুকেও এই সূত্রে অসীমের সহিত বহুদিন পরে দেশে আসিয়াছে।

চৈতনপুরে অবশ্য বাইশ্‌কোপ এই প্রথম। কাজেই দূরদূরান্তর হইতে বহু লোকের সমাগমও হইয়াছিল। ঘুঁটুকের দেশব্যাপী খ্যাতিতে, লোকে এখন প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকে। সাধারণের চক্ষে ঘুঁটুকে এখন আর জমিদারবাড়ীর পূজারী ব্রাহ্মণ নফর গাঙ্গুলীর পুত্র এবং পরে ছোটবাবুর খানসামা ঘুঁটুকে নয়, সে এখন কলিকাতার ভূষণ গাঙ্গুলী, ভূষণবাবু। সে কলিকাতায় থাকে এবং বাইশ্‌কোপে ছবি দেয়! মাসে ছয়-সাত কুড়ি টাকা উপায় করে! সে কি যে-সে লোক?

অবশ্য সে যে যে-সে লোক নয়, এ ধারণা তাহারও বড় কম নয়, কিন্তু কেন যে সে এই নগণ্য গ্রাম্য জমিদারটাকে দেখিয়া সম্ভ্রমে এতটুকু

হইয়া পড়ে, ইহা সে নিজেও যেমন বুঝিতে পারিতেছিল না, টেঁপীরাও এই ব্যাপারে তেমনি বেশ একটু বিস্মিত হইয়া উঠিল।

নিস্তারিণী অশ্রুসিক্তকণ্ঠে বিনাইয়া বিনাইয়া কহিলেন—"তা' বাবা, তার সদ্‌গতি যে ক'র্‌ব, সে পয়সা কোথায়? তোমাদের ওর নাম কি, আপনাদেরই চাক্‌রী ক'রতে ক'র্‌তেই তো সে ম'ল'—কিই-বা এমন সে পেত', আর কি-ই বা সে রেখে গেছে—"

অসীম বাধা দিয়া কহিল—"সে তো সব জানি, খুড়ীমা। যাই হোক্ একটা কিছু তো ক'র্‌তে হবে! আমরা থাকতে, একজন ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধ হবে না, তাতো হয় না! এতে যে গ্রামের অমঙ্গল হবে। আমরাই বা সমাজে মুখ দেখাব কেমন করে? আমি এই সব ভেবেই, এই পঞ্চাশটা টাকা এনেছি, এইটে রাখুন্, এই দিয়ে কোনও রকমে দায়মুক্ত তো হোন্ আগে—তারপর যা' হয়, পরে ভাবা যাবে।" বলিয়া অসীম নিস্তারিণীর নিকট পাঁচখানি নোট নামাইয়া রাখিয়া কহিল—"তা' হলে আমি এখন যাই—হ্যাঁ, আপনার লোকজন বাসনপত্র যখন যা' দরকার হবে, আমাদের ওখানে খবর দিলেই, সব হাজির হবে। কিচ্ছু ভাববেন না। ওরে ঘুঁটুকে, এঁদের কাজকর্ম্মে যা কর্‌তে হয়, সব কর্‌বি, এতটুকু গোলমাল যেন না হয়, বুঝ্‌লি?"

"বহুৎ আচ্ছা, হুজুর" বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া ঘুঁটুকে প্রতিশ্রুতি দিল।

নিস্তারিণীর মুখখানা খুসীতে ভরিয়া উঠিল। এত টাকা একবারে সে কখনও দেখেও নাই বা ঘরেও তুলে নাই! নোট পাঁচখানি আঁচলে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া, নিস্তারিণী অসীমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুয়ার পর্য্যন্ত আসিয়া কিঞ্চিৎ নিম্ন স্বরে মোলায়েমভাবে কহিল—"আপনাদেরই ভরসাতো এখন

ছোটবাবু! আমাদের আর কে আছে? ছেলেরা তো কেউই মানুষ হ'ল না!"

অসীম যাইতে যাইতে দাঁড়াইল। মুখ না ফিরাইয়াই কহিল—"হ্যাঁ, খুড়ীমা, এও ভাবনার কথা বৈকি! আচ্ছা, কাজটাজ চুকে যাক্ তো আগে, তারপর দেখা যাবে ভেবে, কি করা যায়"—বলিতে বলিতে অসীম পথে আসিয়া পড়িল। সকলেই অসীমকে অনুসরণ করিল।

নিস্তারিণী ভাবিলেন, এমন সুযোগ হেলায় হারাইবে? লোহা যখন তাতিয়া লাল হইয়া উঠে তখনি তো ঘা মারিতে হয়। কহিল—"ছোট বাবু, আমার আর একটা ভিক্ষে আছে।"

"কি বলুন্?" অসীম তুই পা গিয়া পুনরায় দাঁড়াইল।

নিস্তারিণী কহিলেন—"টেঁপীও তো বড় হয়েছে, এই তেরো পেরুলো, ওর একটা গতি তো এখুনি কর্‌তে হয় বাবা—"

অসীম এই প্রথম টেঁপীর পানে চাহিল। দেখিল, গরীবের ঘরের অন্নহীনা নিরাভরণা কুসজ্জিতা কিশোরী, কিন্তু তবু সে কত সুন্দরী! ধনী গৃহে না হউক, সাধারণ সচ্ছল ঘরেও যদি সে থাকিত, তাহা হইলে তাহার রূপের খ্যাতি আজ বহুদূর পর্য্যন্ত পৌছিত! কি অপূর্ব্ব গৌর দেহবর্ণ, কি অপরূপ গঠনসৌষ্ঠব!

সত্যই এমন সুন্দরী মেয়ে কি-কলিকাতায় কি-দেশে ইতিপূর্ব্বে আর সে কোথাও দেখে নাই। স্থানকাল ভুলিয়া গিয়া, অসীম নির্ব্বাক প্রশংসায় কিয়ৎকাল টেঁপীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া, অপ্রস্তুত ভাবে হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া লইয়া, থতমত খাইয়া কহিল—""আচ্ছা,—আচ্ছা, সে হবে—সে হবে, তার জন্যে ভাবনা নেই।"

অসীম দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

ঘুঁট্‌কে বাড়ীর উঠানে পদার্পণ করিতে করিতেই অত্যন্ত অপ্রসন্ন ভাবে কহিল—"মাসীমা, এসব জমিদার-ফমিদার থেকে সাবধান থেকো, নইলে বিপদে পড়্‌বে কোন্‌দিন। স্থির জেনো, গরীবের বন্ধু গরীবই হয়, বড়লোক নয়।"

নিস্তারিণী বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল্‌চিস্‌ ঘুঁট্‌কে? তোর কথা তো আমি বুঝ্‌তেই লার্‌চি।"

ঘুঁট্‌কে চক্ষু ও মুখের একটি বিচিত্র ভঙ্গী করিয়া কহিল—"মাত্র পঞ্চাশটা টাকাতেই আপনি এমন ভুলে গেলেন মাসীমা? বলি, ওরা কি সোজা লোক? যাবার সময় ওর ভাবটা একবার দেখ্‌লেন না?"

টেঁপী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। নিস্তারিণী একটু ভাবিয়া কহিলেন—"ও কিছু নয়।"

ঘুঁট্‌কে কিঞ্চিৎ গরম হইয়া কহিল—"বেশ! কিছু নয়তো, কিছু নয়। গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে—এ আমি এখন থেকে বলে রাখ্‌চি মাসীমা: ও চাউনি নয়, ও নেক্‌ড়ে বাঘের থাবা—"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মানুষ ভাবে এক, ঘটে আর এক। বহু বিচার বিবেচনা যুক্তি তর্ক এবং প্রমাণ সহযোগে কর্ত্তৃত্বাভিমানী মানুষ যাহা ঠিক করে এবং যে-ঘটনার দূরতম সম্ভাবনাও থাকে না, শেষ মুহূর্ত্তে অর্থাৎ কার্য্যকালে কিন্তু ঠিক সেইটিই ঘটে। ইহার ফল কাহারও হয় সু, কাহারও হয় কু। মানুষের শক্তি ও যুক্তি এবং বুদ্ধি ও ঋদ্ধির নাগালের বাহিরের এই সব ঘটনাকে শেষ পর্য্যন্ত ভাগ্য বলিয়া মানিয়া লইতে আমরা বাধ্য হই এবং মনকেও তাই বলিয়া প্রবোধ দিই, পাছে আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হয়।

স্বামীর শ্রাদ্ধ ব্যাপারে নিস্তারিণী প্রথমেই পড়িলেন অকূলপাথারে ঃ ঘরে নাই কপর্দ্দক, কি করিয়া কি হইবে ? পরে স্থির হইল, শ্রীরামচন্দ্রের মত তাঁহার পুত্রগণ বালির পিণ্ড দিয়াই পিতৃকৃত্য শেষ করিবে। তারপর হঠাৎ পঞ্চাশটি টাকা পাইয়া, লোকে কি বলিবে এবং ছোটবাবুই-বা কি ভাবিবেন, মনে করিয়া, এই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও টাকাগুলি বৃথা খরচ করিতে নিস্তারিণী অগত্যা রাজী হইলেন ঃ কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঘটিল সম্পূর্ণ এক অভাবিত ব্যাপার ঃ অর্থাৎ কেশব চক্রবর্ত্তীর শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াইল। প্রায় শতাধিক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের এমন ব্যবস্থা হইল যে, গ্রামের লোকে ধন্য ধন্য করিল।

গ্রামের মহামান্য জমিদার অসীম চক্রবর্ত্তী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এবং স্বীয় পরিচালনায় বিধিমত শ্রাদ্ধাদি ও রীতিমত ব্রাহ্মণভোজনও

বিদায়াদি শেষ করিতে, হঠাৎ মুক্তহস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রথমটা লোকে বিস্ময়ে হতভম্ব হইল, কহিল—হাঁ, রাজা বটে। সত্যই গরীবের মা বাপ। তারপর ভোজনের পঞ্চমাঙ্কের শেষ দৃশ্যে অর্থাৎ পায়স ও বোঁদে যখন মঞ্চাবতরণ করিল, তখন লোকজনের বুদ্ধি হঠাৎ যেন খুলিয়া গেল। সকলেই এই অভাবিত ব্যাপারে, একটু সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িল।

স্বর্গীয় গৌরমোহন চক্রবর্ত্তী ছিলেন এ তল্লাটে স্বনামধন্য ব্যক্তি। অর্থব্যয় ব্যাপারে লোকে তাঁহাকে আদর্শ স্বরূপ উল্লেখ করিত, অবশ্য ভোজনের পূর্ব্বে এ দুঃসাহসিক কার্য্য কেহ করিত না। লোকে বলে, প্রত্যহ সকালে বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত তিনি গ্রাম্য লোকের বাগান-ক্ষেত খামার এবং গৃহসংলগ্ন তরকারী-ক্ষেতগুলি স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া, পরিহিত আটহাতী ধূতির স্বল্প অপরিসর কোঁচায় বাঁধিয়া, যে-তোলা তিনি সংগ্রহ করিতেন, তাহাতেই নাকি তাঁহার সংসার চলিত। পয়সা দিয়া কোনও দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। সেই ফলনা চক্রবর্ত্তীর পুত্র আজ হঠাৎ যে এমন দাতা-কর্ণ হইয়া উঠিল, ইহাতে লোকে বিস্মিত না হইয়া পারে কি ?

চুপিকথা ও ইসারার শরজালে কর্ণ বধ হইবার উপক্রম ঘটিল। নিমন্ত্রিতেরা যত খাইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক পায়েস এবং বোঁদে, শুক্তুনী এবং মাছ, পাতা হইতে গ্লাসে ও ঘটিতে ভরিয়া, অপরাহ্নে এক একটি মূর্ত্তিমান্ লম্বোদররূপে গৃহে ফিরিল। পথেও এই সন্দেহজনক ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা যে না চলিল, তাহাও নয়।

নিস্তারিণীও এই আকস্মিক ব্যাপারে যে কিঞ্চিৎ বিস্ময় অনুভব করেন নাই, তাহা নহে, তবে তিনি মুখে কিছু প্রকাশ করিলেন না।

ভগবানের নিকট শুধু আন্তরিক প্রার্থনা জানাইলেন, ছোটবাবুর এই সুমতি যেন চিরস্থায়ী হয়। অত্যন্ত গরীবের কন্যা, তেমনি গরীবের ঘরে বিবাহও হইয়াছিল; জীবনে দুইবেলা পেট ভরিয়া আহার বা অঙ্গ ঢাকিবার একখানা প্রমাণ বস্ত্র পর্য্যন্ত যাহার ভাগ্যে কখনও জোটে নাই, তাহার পক্ষে হঠাৎ জমিদারের এরূপ অযাচিত করুণালাভ, একটা স্বপ্নকাহিনীর মত শুধু বিস্ময়াবহই নহে, অনাগত অতুল সৌভাগ্যের অগ্রদূত ভাবিয়া, নিস্তারিণী বেশ প্রফুল্ল এবং প্রসন্নভাবই ধারণ করিলেন।

মনে পড়িল, বহুদিন পূর্ব্বে সাগরঘাটায় গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া তথায় একজন জ্যোতিষীর নিকট নিস্তারিণী একবার করকোষ্ঠি গণনা করাইয়াছিলেন। জ্যোতিষী বলিয়াছিল, তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে এবং একদিন তিনি বহু অর্থেরও অধিকারিণী হইবেন। অন্নবস্ত্রের দুঃখকষ্ট তো থাকিবেই না, পরন্তু বহু লোকজন এবং যানবাহনের উপর পর্য্যন্ত তিনি কর্ত্তৃত্ব করিবেন। সেদিন তিনি তাহার উপর এমন কুপিত হইয়াছিলেন যে, জ্যোতিষীকে এক আনা দক্ষিণার পরিবর্ত্তে, প্রকাশ্যে কুৎসিত গালাগালি দিয়া তবে সেস্থান পরিত্যাগ করেন। আজ নিস্তারিণীর মনে হইল, তাহাকে পাইলে আর একবার হাতটা দেখান এবং সেদিনকার গালাগালির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া, তাহাকে তাহার বহুদিনের প্রাপ্য দক্ষিণা এক আনা দিয়া ঋণমুক্ত হন। কিন্তু সে আজ দশ বৎসরের ঘটনা। সে হতভাগ্য জ্যোতিষীর সন্ধানও অবশ্য কেহই করিল না।

স্বামীর শ্রাদ্ধের সুযোগে নিস্তারিণী বেশ কিঞ্চিৎ লাভও করিলেন। পঞ্চাশটি টাকার একটি পয়সাও খরচ হইল না; বরং জিনিষপত্র

ঘি, ময়দা, চাউল, ডাল, তৈল, মশলা প্রভৃতি প্রকাশ্যে এত উদ্‌বৃত্ত থাকিল এবং অপ্রকাশ্যে নিস্তারিণী ও টেঁপী পূর্ব্ব হইতেই যাহা সরাইয়াছিল, তাহাতে অনায়াসে মাসখানেক এই সংসারটি বেশ স্বচ্ছলভাবে চলে। অবশ্য চলিলও তাই।

কিন্তু বিপদ বাধাইল ঘুঁটুকে। জমিদারের অযাচিত এই কৃপালাভে নিস্তারিণী ঘুঁটুকেকে ইদানীং আর তেমন আমল দিতেছেন না। ঘুঁটুকে এটা কিন্তু একেবারেই পছন্দ করিল না। তাহার একান্ত ইচ্ছা, ইহাদের দারিদ্র্য নিবারণ যদি কখনও হয় তো, সেটা তাহার দ্বারাই হউক্, নচেৎ কখনই যেন না হয়। পচা, ভোলা ও বটাকে কলিকাতা লইয়া গিয়া চাক্‌রী করিয়া দিবে; তারপর মাসীমার পুত্রত্রয়ের সহিত মিলিত হইয়া চতুর্থপুত্ররূপে ঘুঁটুকে একটি বাড়ীভাড়া করিয়া মাসীমাকে ও তাঁহার কন্যা তিনটিকেও কলিকাতা লইয়া গিয়া, একটি সুখী পরিবার গঠন করিবে; সেখানে টেঁপী, ক্ষেন্তি ও বুঁচির আশাতীত রকমের এক একজন সৎপাত্রের সহিত বিবাহ দিবে প্রভৃতি মনোজ্ঞ কল্পনাতে, এই মাসখানেক কাল নিস্তারিণী একরকম মশগুলই ছিলেন এবং এ সবের একমাত্র কর্ত্তা হিসাবে শ্রীমান্ ঘুঁটুকে নিস্তারিণী দেবীর কিঞ্চিৎ স্নেহলাভও করিয়াছিল; কিন্তু অসীমের আকস্মিক আবির্ভাবে, সুদূরের সে সব অসম্ভব, অলস ও অনিশ্চিত কল্পনা নিস্তারিণীর এখন আর তেমন ভাল লাগিল না। দেশে-ঘরে থাকিয়া নিশ্চিত সুখ সৌভাগ্যের প্রতীক্ষাতেই তিনি তাই সমধিক মনোনিবেশ করিলেন। কাজেই, ঘুঁটুকেও তাহার মন হইতে ছিট্‌কাইয়া, হুড়মুড় করিয়া গিয়া পড়িল একেবারে আস্তাকুঁড়ে।

ঘুঁটুকের লাগিল ভীষণ আঘাত। অসীমের এই অনধিকারপ্রবেশে ঘুঁটুকে প্রথম হইতেই বিলক্ষণ অপ্রসন্ন ছিল; এখন তাহার এই উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসায়, সে রীতিমত কুপিত হইয়া, নিস্তারিণীর প্রতি বিলক্ষণ বিরূপ হইয়া উঠিল।

প্রয়োজন হইলে নিস্তারিণী নির্ব্বোধের অভিনয় করেন মাত্র, অথচ তাঁহাকে যাহারা ভাল করিয়া চেনে, তাহারা জানে, কূটবুদ্ধিতে নিস্তারিণীর সমকক্ষ কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল-ব্যারিষ্টারও নহে। নিস্তারিণী ঘুঁটুকের কথার ষোল আনাই অবশ্য বিশ্বাস করেন নাই; কিন্তু ঘুঁটকে মনে করিয়াছিল তাহাই এবং সেই ভুল ধারণাতেই সে-এতদিন আকাশে বাড়ী গাঁথিতেছিল।

এই নিরাশ্রয় অবস্থায় ও নিদারুণ দুঃসময়ে নিস্তারিণী বুদ্ধিমতীর মতই, তৃণের আশ্রয়ও ত্যাগ করেন নাই। কাজেই, ঘুঁটুকেকে একটু প্রশ্রয় দিয়াছিলেন সত্য। ঘুঁটুকের আশ্বাসে যদিও তিনি সম্পূর্ণ আস্থা-স্থাপন করিতে পারেন নাই, তবুও মজ্জমান ব্যক্তির ন্যায় তৃণকে তৃণ জানিয়াও, সেটির আশ্রয়ও ছাড়েন নাই। নিস্তারিণীর মাঝে মাঝে সন্দেহ হইত, কলিকাতার ফক্কড় ছেলে ঘুঁটুকে তাঁহাকে ভোগা দিতেছে না ত'? হাসিতেন, নিজের শক্তিমত্তায়ঃ তাঁহার চক্ষে ধূলি-নিক্ষেপ কার্য্য এতটা সহজ নয়। অমন ঢের ছোকরাকে তিনি সাতঘাটের জল খাওয়াইতে পারেন! আবার মনে হইত, সত্যই হয়ত ঘুঁটুকে তাঁহার কিঞ্চিৎ ন্যাওটা হইয়া পড়িয়াছে। আহা মা'ওরা ছেলে ত'? তারপর অসীম যখন, অযাচিত দেবতার করুণার মত, এমন অনায়াসে করায়ত্ব হইল, তখন তিনি যে এ নিশ্চিতকে ছাড়িয়া, অনিশ্চিত মায়ামৃগের

পশ্চাৎধাবন করিবেন না, ইহা খুবই স্বাভাবিক—অন্ততঃ তাঁহার মত চতুর নারীর পক্ষে। দেশঘর ছাড়িয়া কলিকাতায় যদি শেষ পর্য্যন্ত যাইতেই হয়, তাহা হইলে তাহার পুর্ব্বে দেশে কি-হয় না-হয়, তাহাও তো ভাল করিয়া জানা দরকার! নিস্তারিণী স্পষ্ট দেখিতেছেন, অসীম জালে পড়িয়াছে। ভাবনা কি? কোথায় জমিদারী আর কোথায় চাক্‌রী!

হেঁঃ!—ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ কুপিত হইয়া অতর্কিতে নিস্তারিণী বলিয়া ফেলিলেন—"ঘুঁটকে, অষ্টপ্রহর তুই মাসী মাসী করে', আমার সঙ্গে অধিকার ফলিয়ে, অমন আদিখ্যেতা দেখাস্ না বল্‌ছি। তুই আমার কিসের বোনপো? সেই নফ্‌রা পূজুরীর বেটা—ছোটবাবুর খান্‌সামা—ভারী আমার অন্তরঙ্গ—"

ঘুঁট্‌কেও অপ্রস্তুত ছিল না। বাধা দিয়া কহিল—"তাতো বল্‌বেই তুমি আজ! সেদিন মড়া পচে ঘর যখন গো-ভাগাড় হয়ে উঠ্‌বার যোগাড় হয়েছিল, কোথায় ছিল তখন তোমার এই পেয়ারের ছোটবাবুটি? তখন তো এই নফ্‌রা পূজুরীর বেটাই হয়েছিল বড্ড অন্তরঙ্গ! না?"

হঠাৎ রাগের মাথায় মনের গোপন কথাটি বলিয়া ফেলিয়া, নিস্তারিণী একটু অপ্রতিভ হইলেন। ভাবিলেন—কাজটা ভাল হইল না। এত শীঘ্র ইহাকে চটান' ভাল হইবে না। যদি এদিক ফস্‌কায়? কে জানে? বরং দুই জনেই হাতে থাক্, দুই দিকই বজায় থাকিবে। কি জানি, কখনও কাজে লাগিতেও তো পারে! কথায় বলে—যাকে রাখ, সেই রাখে।

নিস্তারিণী নরম স্বরে ন্যাকামী করিয়া কহিলেন,—"তুই তো, গোড়া থেকেই দেখচিস্ বাপু, এই দুখে শোকে আমার মতিচ্ছন্ন

হয়েচে। কখন কাকে যে কি বলি, ঠিক করতে নারি। যাকে যা মুখে আস্‌চে, তাকেই তাই বল্‌চি, আমার ভীমরতি হয়েচে—আমার কথা ধরিস না, বাবা, লক্ষিটি।"

শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি। ঘুঁট্‌কেও হঠিবার পাত্র নয়, সুর-ফেরতায় কহিল—"তা কি আমি বুঝ্‌চি না, মাসীমা। আপনি বলেই "ধৈর্য্যং কুরু রাধে" হয়ে এখনও বসে আছেন। আর কেউ হ'লে, সে সত্যি পাগল হয়ে যেত। তাই বল্‌ছিলাম কি—"

নিস্তারিণী বাধা দিয়া কহিলেন—"তা এতে তোর এত হিংসে কেন বল্ দেখি, বাপু? সে ভাল নোকের ছেলে, আমাদের মত অনাথা গরীবদের দিকে যদি একটু নেক্‌নজর করেই, তাতে তোর এত গায়ের জ্বালা কিসের, শুনি—"

কথার আগুন আর খড়ের আগুন দুইই সমান। দপ্ করিয়া যেমন জ্বলিয়া উঠে, খপ্ করিয়া তেমনি নিভিয়াও যায়। উভয়েই বুঝিল, উভয়েই উভয়কে একটু একটু চিনিল।

ঘুঁট্‌কে কলিকাতায় থাকে, ফিলিম কোম্পানীতে কাজ করে। কথাই তাহাদের মূলধন, সুতরাং কোন্ কথা কোথায় কার্য্যকরী হয়, অন্য কিছুতে না হউক, এ বিষয়ে এতদিনে তাহার সবিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে।

কলিকাতায় ঘুঁট্‌কের একমাত্র মুরুব্বী শ্রীমতী বিজলী দেবীর নিকট শব্দ-ব্রহ্মের অভাবনীয় শক্তি সে প্রত্যহ প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ করিতেছে। বিজলী দেবীর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা পদ্ধতিই তাহার জীবনের অন্ধকার পথ সর্ব্বদা আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। কাজেই কোন

লোকের সহিত কি ভাবে কথা কহিতে হয়, তাহা সে ভালই শিখিয়াছে। কথার উপরই সমস্ত বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর করে; কাজেই তাহারও বাণিজ্য-প্রচেষ্টার মূলে যে কথাবার্ত্তা হইতেছে, তাহাতে হারিয়া গেলে ক্ষতি তো তাহারই সমধিক—এ কি সে বুঝে না? ইহা ছাড়া, ঘুট্‌কে যে ফিলিম কোম্পানীতে কাজ করে, সেই রয়্যাল ফিল্ম কোম্পানির স্বত্বাধিকারী মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় মহাশয়ের কথাও তাহার মনে পড়িল: পাওনাদার তাঁহাকে সেদিন যখন বডি-ওয়ারেণ্ট ধরাইতে আসিল, সুবোধবাবু তখন তাঁহার জন্য নিজে মাংস রাঁধিতে ও লুচি ভাজিতে বসিয়া গেলেন। পাওনাদার মহাশয় বডি-ওয়ারেণ্ট ধরান দূরে থাকুক্, উল্টা গুরু ভোজন এবং প্রচুর পান করিয়া, ধার স্বরূপ আরও কিছু টাকার মোটা একখানি চেক্ দিয়া, তবে উঠিয়া গেলেন।

ঘুট্‌কে চটিয়া উঠিয়াছিল, সেজন্য সত্যই সে লজ্জিত হইল। সে শিখিয়াছে, উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে মান-অপমান নাই বা রাগ-অভিমানও চলে না। এ যাহারা করে, তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলে না। পরের দ্বারা কাজ হাঁসিল করাইতে হইলে, অমন দুই চারিটা ছুট-বেছুট কথা শুনিতে অভ্যস্ত হইতে হয়, বোকার মত চটিলে চলে কি? কথায় তো গায়ে ফোস্কা পড়ে না!

ঘুঁট্‌কে কহিল—"কি জান মাসীমা—তোমরা যেমন গরীব, আমিও তেমনি গরীব। গরীবের বন্ধু গরীবই হয়। তোমরা আমার আপনার লোক, পূজনীয় লোক। তোমাদের যাতে অনিষ্ট হয়, সেটা আমি কি করে দেখি বল দিকিন্?"

নিস্তারিণী কপাল কুঁচ্‌কাইয়া চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অনিষ্ট ? ছোটবাবু টাকা-পয়সা খরচ করে, আমাদিকে দায়-উদ্ধার করিয়ে, খেতে পর্‌তে দিয়ে, কি অনিষ্ট করচে বাছা ? কি যে বলিস্ ঘুঁট্‌কে ? তোর কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে:পারচি।"

ঘুঁট্‌কে বিচক্ষণতার ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কিছুই বুঝতে পারচ না, মাসীমা ? তুমি বড্ড ভাল মানুষ, খুব শাদা লোক কিনা ?"

নিস্তারিণী ঘাড় নাড়িয়া কৌতূহলীভাবে স্বীকার করিল।

ঘুঁট্‌কে মহা সমস্যায় পড়িল। ইঙ্গিতে ইসারায় সে যে-কথাটি এতদিন ধরিয়া নিস্তারিণীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, তাহার একটি বর্ণও যে নিস্তারিণীর মস্তকগম্য হয় নাই, তাহাতে সে সত্যই নিরাশ হইল; অথচ তাহার প্রকৃত মনোভাবটাও সে ব্যক্ত করিতে পারে না, কারণ তাহাতে বিপদ সমধিক। ঘুট্‌কের গুরুভক্তি ছিল একলব্যের মতই—কেবল অঙ্গুষ্ঠটিই দেয় নাই, কিন্তু দেখাইতে সে গুরুর উপযুক্ত শিষ্যই হইয়াছিল। বিজলী দেবী ও সুবোধবাবুকে স্মরণ করিয়া সে হাল ছাড়িল না। কহিল—"মাসীমা, আমাদের রবিবাবুর পাঁচালীর একটা পদ মনে পড়্‌ল, শোন'—

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ
কভু হাতে দড়ি, কখনো চাঁদ।

কিছু বুঝলে ?"

নিস্তারিণী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"তোর মাথা আর তোর মুণ্ডু। তোর কলকাতার ছড়া রাখ্। কি বল্‌তে চাস্, তাই বল্ খোলোশা করে।"

ঘুঁটকে প্রমাদ গণিল। কথাটা খোলাশা করিয়া বলা যে বিষম শক্ত, আর তাহাতে বিপদও কম নয়। সে ভাবিতে লাগিল।

নিস্তারিণী কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করিয়া, ঘুঁটকের পরিবর্ত্তমান চিন্তাশীল মুখভাব দেখিয়া, উত্তর চাহিলেন—"চুপ্ করলি যে, বল্—কি বল্‌তে চাস্—বল্। ছোটবাবুর দ্বারা আমাদের কি অনিষ্ট হচে, বল্—"

ঘুঁটকে মরিয়া হইয়া, সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল—"কি জান' মাসীমা—ছোটবাবু ছুঁচ হয়ে সেঁধিয়ে, দেখো একদিন ফাল হয়ে বেরুবে। ওর নজর তোমার ঐ টেঁপীর ওপর—"

নিস্তারিণী হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা ধাক্কায় যেন টাল সামলাইতে পারিলেন না, নিজের অজ্ঞাতেই চমকিতভাবে বলিয়া উঠিলেন—"য়ঁ্যা ?"

ঘুঁটকে নিজের কৃতকার্য্যতায় উৎফুল্ল হইয়া কহিল—"হ্যাঁ, মাসীমা, দেখলে না ? সেদিন টেঁপীর পানে কেমন করে সে তাকাছিল ? চোখ দিয়ে যেন গিলে খেতে যেছিল টেঁপীকে।"

নিস্তারিণী হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। মারাত্মক অস্ত্রোপচারে সফলকাম চিকিৎসকের মত উৎসাহিত হইয়া, ক্ষতস্থানে শীতল প্রলেপ দানের মত, ঘুঁটকে এক এক করিয়া বহু কাহিনীর অবতারণা করিল: কবে শ্যামবাজারে কোন গরীবকে সাহায্যদানের অছিলায়, কোন্ ধনী তাহার যুবতী স্ত্রীকে অপহরণ করিয়াছিল; বাগবাজারের জনৈক ধনী তাহার গরীব প্রতিবেশীর এক মূর্খ ছেলের চাক্‌রী করিয়া দিয়া, তাহার ভগিনীর সহিত কিরূপ অবৈধভাবে মিলিত হয়; কালীঘাটে জনৈক পথভ্রান্তা যুবতীকে বাড়ী পৌছাইয়া দিবার নামে, এক ধনী কেমন করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল; ভবানীপুরে সেদিন মুমূর্ষু স্বামীর

চিকিৎসার জন্য ভিক্ষায় বাহির হইয়া, এক ভদ্র তরুণীর এক বড়লোক সহায় জুটে, এবং পরে সে কি করিয়া সেই নারীকে সর্ব্বস্বান্ত করে— এমনি কত বিচিত্র কাহিনী, ল্যাণ্টার্ণ স্লাইড সহ বক্তৃতার মত, ঘুঁটুকে নিস্তারিণীকে অনর্গল, শোনাইয়া, ছোটবাবুর উদ্দেশ্যটি তাঁহার নিকট পরিস্কার করিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইল।

নিস্তারিণী নীরবে এবং অবিচলিতভাবে সব শুনিয়া, গভীর চিন্তান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই ঠিক বুজিচিস ঘুঁটুকে? ছোটবাবুর নজর ঠিক পড়েচে তো টেঁপীর উপর?"

ঘুঁটুকে সোৎসাহে এবং সহাস্যে বিশেষ উত্তেজিতভাবে কহিল— "নিশ্চয়। এ আমি বুঝব না? কি বলেন মাসীমা? এই সব লোক নিয়েই আমাদের দিনরাত কারবার। হেঁঃ—ছিনেমা লাইনে থাকৃতে হলে মানুষ চিনতে হয় আগে, তা' নৈলে কি একটা দিনও চলে? আমরা বেদে, মাসীমা, আমরা বেদে; সাপের হাঁচি বেদেই চেনে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গভীর থমথমে রাত্রি। মাঝে মাঝে প্রহর-গণা শৃগালের ডাকে এবং গ্রাম্য কুকুরের চিৎকারে ও তাহার প্রতিধ্বনিতে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কুকুরদের প্রত্যুত্তরে ক্লান্ত সুষুপ্ত রাত্রির শীতজর্জ্জর আচ্ছন্নদেহ রূঢ় আঘাতে মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠিতেছিল। মেঝে-জোড়া বিছানার একদিকে টেঁপী, ক্ষেন্তি ও বুঁচি শত তালিযুক্ত ছেঁড়া ময়লা ওয়াড়হীন কালো-কালো দাগে-ভরা তেলচিটে একখানা লেপ মুড়ি দিয়া, গভীর নিদ্রায় অভিভূত; অন্যদিকে উত্তপ্ত মস্তিষ্কে নিস্তারিণী জাগিয়া। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরও অতীতপ্রায়, তাঁহার ঘুম আসে না। পূর্ব্বদিনের কথাগুলি কেবলি তাঁহার মনের মধ্যে, প্রদীপের চতুর্দ্দিকে পতঙ্গের মত অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া, এক অচিন্তিতপূর্ব্ব আলো-আঁধারীর সৃষ্টি করিয়াছে। এ-প্রসঙ্গ তিনি এড়াইতেও পারিতেছেন না, অথচ তাহার সন্তোষপ্রদ মীমাংসাও কিছু হইয়া উঠিতেছে না।

এই পরিবারের সহিত ঘুঁটকের অযাচিতভাবে এত ঘনিষ্ঠতা করিবার এবং আত্মীয়তা দেখাইবার কারণ কি? ছোটবাবুর সহানুভূতির যে কারণ ঘুঁটকে নির্দ্ধারিত করিল, তাহার ঘনিষ্ঠতার মূলেও যে সেই একই হেতুই নাই, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? এখন, উভয়ের মধ্যে, কারণ যদি একই হয় তাহা হইলে, অসীম নিশ্চয়ই যোগ্যতর ব্যক্তি, ইহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে? অথচ সন্দেহ করিবার কারণও দেখা যাইতেছে যথেষ্ট।

অসীম জমিদার। একজন গরীব গ্রাম্য প্রজার কন্যাকে সে কি এত সহজে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে? তাহার কি সুন্দরী কন্যার অভাব? অসীমের সঙ্গে বিবাহ দিতে কত বড়লোক হাজার হাজার টাকার তোড়া আর পরমাসুন্দরী কন্যা লইয়া উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছে। কেন তবে সে এই হা-ঘরের ঘরে বিবাহ করিতে আসিবে? ঘুঁটকে মিছামিছি সন্দেহ করিয়া অসীমকে হিংসা করিতেছে।

কিন্তু কথাটা যখন উঠিয়াছে, তখন ইহার হেস্ত-নেস্ত একটা করিয়া দেখা তো উচিত! কি করিয়া তাহা হয়? নিস্তারিণী নিজেই একবার অসীমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ ব্যাপারটার মীমাংসা করিবেন, স্থির করিলেন। শুভকার্য্যে বিলম্ব করা ঠিক নয়। কালই তিনি না-হয় ছোটবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কথাটা পাড়িবেন। এখনও ব্যাপারটি হয়ত বেশী লোক-জানাজানি হয় নাই, কথাটা এখনি পাকা করা দরকার, নহিলে পরে লোকে ভাংচি দিতে পারে! এমনিই তো তাঁহাদের হিংসায় গ্রামসুদ্ধ লোকের বুক চড়চড় করিতেছে—এ কথা শুনিলে তো, তাহারা বুকে খিল লাগিয়া মরিয়াই যাইবে! পরের ভাল কেউ দেখিতে পারে না—গ্রামের লোকগুলি অত্যন্ত বদ্!

এদিকে পাকাপাকি কিছু না হওয়া পর্য্যন্ত, ঘুঁটুকেকেও হাতছাড়া করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। যদি নিতান্তই কিছু না হয়, অর্থাৎ অসীমকে তাঁহারা যদি ভুলই বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঘুঁটকেকেই অগত্যা ধরিতে হইবে। জালে যখন দুইটাই পড়িয়াছে, তখন একটা তো উঠিবেই।

ঘুঁটুকেও তো নিতান্ত খারাপ নয়। দেড়শো টাকা মাইনেতে

ছিনেমায় চাকরী করে, কলিকাতায় থাকে, ছেলে তিনটাকেও চাকরী করিয়া দিবে, তাঁহাকেও কলিকাতা লইয়া যাইবে, ক্ষেন্তি, বুঁচিরও ভাল ঘরে বিবাহ দিয়া দিবে—মন্দ কি? হইলই বা সে নফ্‌রা গাঙ্গুলীর ছেলে, তাহার কন্যাই বা কোন্ এমন জমিদারের মেয়ে? এ বরং ভালই হইবে। কুটুম্বিতা সমানে সমানেই ভাল। পৃথিবীতে সকলেই তো আর জমিদার হয় না? না-ই বা হইল ঘুঁটুকে জমিদার? ঘুঁটুকের উদ্দেশে নিস্তারিণীর স্নেহ হঠাৎ শতধারে উথলিয়া উঠিল।

রাত্রি যতই বাড়ে, নিস্তারিণীর বুদ্ধিও ততই উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। টেঁপীর বিবাহ একটা মস্ত ভাবনা ছিল। বাবা ধর্ম্মরাজের দয়ায় যে না-চাহিতে এমন দুই-দুইটি সুপাত্র সশরীরে তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইবে, এ তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর।

আচ্ছা ধরা যাউক, ছোটবাবুর সঙ্গেই টেঁপীর বিবাহ হইল। তাহাতে টেঁপী সুখে থাকিবে বটে, কিন্তু তাঁহার বা তাঁহার অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সুখ তাহাতে কি হইবে? টেঁপী খাইলেই তো তাঁহাদের পেট ভরিবে না! তাঁহাদিগকেও বাঁচিতে হইবে ত? টেঁপীর হাজার ইচ্ছা থাকিলেও, তাহার স্বামীর যদি মত না হয়, তাহা হইলে জমিদারবাড়ী হইতে কোন সাহায্যই পাওয়া যাইবে না। অথচ ঘুঁটুকের সঙ্গে বিবাহ হইলে, সে ভয় একটুও থাকিবে না—তিনিই হইবেন, সে বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। মোট কথা, টেঁপীর ভাল ঘর-বর চাই, সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও যদি কিছু সুবিধা না হয়, তাহা না হইলে তাহাকে আর ভাল ঘর-বর বলা চলে না। কেবলমাত্র টেঁপীর বিবাহই তো একমাত্র সমস্যা নয়ঃ মেয়ের বিবাহ দিয়া নিজেদের কাজও এই সুযোগে কিছু গোছাইয়া

লইতে হইবে। তাহা না হইলে, এমন মেয়ের বিবাহ তো সকল ঘরেই হয়, হইবেও চিরদিন।

আরও গভীরভাবে চিন্তা করিয়া নিস্তারিণী দেখিলেন, ছোটবাবু বা ঘুঁটুকে যে, এ-বাড়ীতে এমন আকৃষ্ট হইয়াছে, এ কেবল টেঁপীর জন্যই। এতদিন তিনি বৃথাই সোনা ফেলিয়া শূন্য আঁচলে গেরো বাঁধিয়াছেন। অবশ্য প্রদীপের নীচেই সর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকার। এতদিন তিনি টেঁপীকে অবহেলা করিয়া, বৃথাই ছেলেদের মুখ চাহিয়া ছিলেন। ছেলেদের সামর্থ্য তো অষ্টরম্ভা, বরং তাহারাই এ পরিবারের গলগ্রহ।

নিস্তারিণী গভীর অন্ধকারে আলোকের সন্ধান পাইলেন। টেঁপীর যে এ-প্রকার আকর্ষণী শক্তি আছে, এ-ধারণাই তাঁহার ছিল না। তিনি নিজেও ইহাতে বেশ বিস্মিত হইলেন। কানাকড়িতে তাঁহাকে এখন খেলিতে হইবে। কাণ্ডারীহীন তরণীতে তাঁহাকেই এখন কর্ণধার হইতে হইবে। না করিলে কে করিবে? কে আছে তাঁহাদের? সংসার চালাইতে হইবে তো! পেট শুনিবে না! আচ্ছাদন না জুটুক, অন্ন চাই-ই! কে দিবে? কে আনিবে? কোথা হইতে আসিবে?

নিস্তারিণী বুঝিলেন, টেঁপীই এখন এই নাতিক্ষুদ্র সংসারের একমাত্র ভরসা। টেঁপীই তাঁহাদের একমাত্র মূলধন। টেঁপীর জন্য এখনিই যখন এত, তখন ভবিষ্যতে আরও কত-কি হইতে পারে তো? মূলধন না ভাঙ্গিয়া, তাহার সুদে যাহাতে সুচারুরূপে কাজ চলে, তাহাই এখন শুধু লক্ষ্য হওয়া উচিত। অতএব তাড়াতাড়ি ইহার বিবাহ দিয়া হাতছাড়া না করিয়া, কিছুদিন ইহার সুদেই চলুক না, মন্দ কি? এমনি আরও দুই-চারি জন যদি জুটে তো ভালই হয়। ততদিনে ক্ষেন্তিও একটু বড়

হইবে তো! কাজেই, টেঁপী শ্বশুরবাড়ী গেলেও, একেবারে পথে দাঁড়াইতে হইবে না, ক্ষেন্তি হইবে ভরসা। নিস্তারিণী রাত্রের প্রার্তবাক্যে বারম্বার টেঁপীর ক্ষেন্তির ও বুঁচির দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া, গভীর রাত্রের অন্ধকারে অত্যন্ত ভক্তিভরে হাত দুইটী জোড় করিয়া, কপালে ঠেকাইয়া, তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে পুনঃপুনঃ প্রণাম জানাইয়া, শেষরাত্রে কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িলেন।

* * *

—"মা, ও মা, ওঠ'—অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে যে"—টেঁপী নিস্তারিণীকে ঠেলা মারিয়া জাগাইয়া দিল।

"য়ঁ্যা? য়ঁ্যা?" বলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে নিস্তারিণী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া, ভীতভাবে বিভ্রান্তের মত চারিদিকে করুণভাবে চাহিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া, কহিলেন—"এত বেলা হয়ে গিয়েচে? বেঁচে থাক্, মা, এই বাসিমুখে আশীর্ব্বাদ করচি, রাজরাণী হ'—আয়, আমার কাছে সরে আয়—আহা, খেটে খেটে মায়ের আমার অমন সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেল! দুখিনীর পেটে এয়েচিস্, বাছা, দুখই পেচিস্ ছেরকাল—"

এই দীর্ঘ ত্রয়োদশবর্ষ জীবনে 'হতভাগী' 'সর্ব্বনাশী' 'পোড়ারমুখী' 'খালভরী' প্রভৃতি সম্বোধন ছাড়া, মায়ের মুখে আর কোনও সোহাগের বাণী সে কখনও শোনে নাই। কাজেই সু-কু-নির্ব্বিশেষে গালি খাইতেই সে চিরাভ্যস্ত। হঠাৎ মাতার এই স্নেহাতিশয্যে এবং কোমল সোহাগ-সম্ভাষণে সে রীতিমত ভয় পাইয়াছিল। ভাবিল, তাহার মাকে বোধ হয় ভূতে পাইয়াছে: ভূতে পাইলে লোকে বেছুট

কথা বলে, সে জানে। টেঁপী ভয়ে পিছু হটিতেছিল, তাহার সর্ব্বশরীর হিম হইয়া যাইবার মত হইল। টেঁপী সত্যসত্যই কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। আড়ষ্ট হইয়া অর্দ্ধোচ্চারিত ভাবে কহিল—"বাইরের কাজকর্ম্ম সব সেরে ফেলেচি, মা। তুমি উঠে কাপড়-চোপড় ছেড়ে, ক্ষেন্তিকে বুঁচিকে আর দাদাদিকে ভাঁড়ার ঘর থেকে দুটো মুড়ি বের করে দিও। আমি চান করতে যেচি—" বলিয়া একছুটে বাহিরে আসিয়া টেঁপী হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।

নিস্তারিণী একটি সুখ-স্বপ্নে বিভোর হইয়াছিলেন। তিনি যেন প্রকাণ্ড এক বাড়ীর সর্ব্বময়ী গৃহকর্ত্রী। ছেলেগুলি বড় বড় চাকরী করিতেছে। টেঁপীর বিবাহ হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ সোনা, হীরা, মুক্তায় মোড়া। জামাতা বাবাজীবন যথাসর্ব্বস্ব টেঁপীর শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া নিঃস্ব হইয়াছে, তবুও টেঁপী প্রসন্ন নয়। নিস্তারিণী অলক্ষ্যে থাকিয়া এই সব দেখিয়া পুলকে মৃদু হাস্য করেন। বাড়ীভরা লোক জন দাস দাসী, যেন একটা মস্ত ভোজের বাড়ী। জামাতা শ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণীকে সমীহ করিয়া বড়-একটা কাছে আসেন না এবং তাঁহার সম্মুখে মাথা উঁচু করিয়া কখনও কথাও বলেন না বলিয়া, তাঁহার মুখখানা নিস্তারিণীর ভাল মনে পড়িতেছিল না। জমিদারী, মহাল, নায়েব, গোমস্তা, বরকন্দাজ প্রভৃতি বহু কর্ম্মচারী। সকলেই তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য প্রাণপণ করিয়া জোড়হস্তে অষ্টপ্রহর খাড়া। টেঁপী সকলকে শাসন করিতেছে বটে—কিন্তু মায়ের কাছে সে সেই টেঁপীই আছে। হঠাৎ বাড়ীতে মহা হুলুস্থূল! উপরতলা হইতে নামিতে নামিতে পা পিছলাইয়া টেঁপী পড়িয়া গিয়াছে। গড়াইতে গড়াইতে যে সে কোথায় গিয়া পড়িল,

তাহার কোনও সন্ধান কেহ পাইতেছে না বা টেঁপীকেও আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। বহু লোকজন বরকন্দাজ পাইক জড় হইয়াছে। নিস্তারিণীও জ্ঞানশূন্য হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। ছুটিতে ছুটিতে পথে ফণীমনসার ডালে হঠাৎ পা পড়িয়া, তাহার পদযুগল সেই বিচিত্র কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। মধ্যপথে বসিয়া পড়িয়া, অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি যেমন চিৎকার করিতে যাইবেন, অমনি টেঁপী তাঁহাকে উঠাইয়া দিল।

ভোরের স্বপ্ন কাহাকেও বলিতে নাই। নিস্তারিণীও বলিলেন না।

তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন। উঠানে পৌষের পীতাভ রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া, পিঁচুটিভরা চোখে এবং রাত্রের গলিত লালার শুক্‌নো দাগভরা মুখে, ছেঁড়া দোলাই গায়ে ক্ষেন্তি ও বুঁচি কাঁচা ছোলা পোড়াইয়া খাইতেছিল। পুত্র তিনজন তখনও নিজ নিজ শয্যায় গভীর নিদ্রাভিভূত।

—"ওরে ও ড্যাক্‌রা, ও খালভরারা, এখনও তোদের ঘুম ভাঙ্গল না?—বলি আর যেন ও-ঘুম না ভাঙে—আ মর্‌ হাড়হাবাতের দল,"—জননীর এই স্নেহের আহ্বানে পুত্রত্রয় তাড়াতাড়ি মুখ-চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে বাহিরে আসিয়া, দাঁড়াইল।

—"বলি, গিল্‌বে না? সারাদিন ভাঁড়ার খুলে আমি বসে থাক্‌ব নেকি? নিজের নিজের পিণ্ডি নিয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়ে মর্‌গা না! এই তোরাও আয়—" তিন পুত্র ও দুই কন্যা সভয়ে ভাঁড়ার ঘরের দুয়ারে আঁচল পাতিয়া দাঁড়াইল। নিস্তারিণী প্রত্যেককে কিছু মুড়ি ও খানিকটা করিয়া খেজুর গুড় দিয়া বিদায় করিয়া, নিজে উঠানে আসিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া দাঁড়াইলেন।

অসীমের প্রিয় খান্‌সামা কার্ত্তিক আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কার্ত্তিক যে, কি মনে করে?" অর্দ্ধেক উড়িয়া ও অর্দ্ধেক ভাঙা বাংলায় কার্ত্তিকচন্দ্র কহিল—"মা, বাবু, দাদাবাবুদিকে ডেকেছেন; বেলা এগারটার মধ্যে যেন একবার নিশ্চয় পাঠিয়ে দেবেন।"

নিস্তারিণী উঠান হইতে চিৎকার করিয়া কহিলেন—"শুনচিস, ওরে ও ঘাটেপড়ারা, ছোটবাবু ডেকেছেন যে। আচ্ছা বাবা, ওরা এখুনি মুড়ি খেয়েই যেচে।"

ভয়ে ছেলেগুলির মুখ শুকাইয়া গেল। গলায় শুক্‌নো মুড়ি লাগিয়া তাহারা ঘন ঘন বিষম খাইতে লাগিল। অথচ না গেলেও নয়, জমিদারের ডাক। ছেলেরা প্রমাদ গণিল।

কার্ত্তিক বাড়ীর বাহির হইতেই, ঘুঁটকে একটা বড় মানপাতার ঠোঙায় কিছু পাঁচমিশালী মাছ লইয়া বাড়ী ঢুকিয়াই, গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"ও উড়ে বেটাটা কি জন্যে এয়েছিল, মাসীমা?"

নিস্তারিণী উত্তর দিলেন—"ছোটবাবু ঐ ড্যাক্‌রাদিকে ডেকেচে একবার, তাই বল্‌তে—"

"ও—" বলিয়া অপ্রসন্নমুখে রান্নাঘরের দুয়ারে মাছগুলি নামাইয়া দিয়া, ঘুঁটকে ঝড়ের মত তখনিই আবার বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়!

অলক্ষ্যে থাকিয়া অসীম পরোপকার করিতেছে, নিঃস্বার্থভাবেই বলা চলে, কিন্তু গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা তাহার সদর্থ করিয়া বলিল—বলিহারি, জমিদারী চাল! পাটোয়ারী বুদ্ধিতে এ বাপের উপর টেক্কা মারিবে! জমি-তৈরীর পূর্ব্বে, জমাবন্দীটা বেশ কায়েমীই হইল বটে! বলিহারি যাই! বয়সে ছোকরা হইলে কি হয়, তিন-তিনটে পাশ দিয়া বি-এ পাশ করিয়া, তবে জমিদারী হাতে লইয়াছে! এ পাত্র বড় সহজ নয়।

স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর স্থানে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ পঞ্চানন ওরফে পচা, স্থানীয় বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হইল, মাসিক বেতন পাঁচ টাকা। গ্রামের রসিকচূড়ামণি মদনমোহন গোস্বামী প্রভু কহিলেন—সে এক ছিলেন পঞ্চানন, ভাটপাড়ার পঞ্চানন তর্করত্ন, আর এ হ'ল দু'নম্বর পঞ্চানন মর্করত্ন বিদ্যাভীষণ। মধ্যম ভোলানাথ সেরেস্তায় রহিল, বেতন মাসিক তিন টাকা এবং কনিষ্ঠ বটকৃষ্ণ হইল ঠাকুরবাড়ীর এসিষ্ট্যাণ্ট পূজারী, মাসিক বেতন এক টাকা ও ভোগের অংশ বা দৈনিক একটি করিয়া সিধা।

নিস্তারিণীর আনন্দ আর ধরে না। বলিলেন—যেমন-তেমন চাকরী ঘি-ভাত। চাকরীর এমন প্রশস্তি আর কোনও দেশে রচিত হইয়াছে কি? একসঙ্গে তিন-তিনটি বেকার ও অযোগ্য পুত্রের গাঁয়ে-ঘরে

এমন মনের মত চাকরীলাভ, ঘটা করিয়া স্বামীর এমন শ্রাদ্ধ, ইহাকে বৃষোৎসর্গও বলা চলে, কেন না, এই শ্রাদ্ধ-ব্যাপারে গ্রামের বহু বৃষই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, জমিদারের এমন অযাচিত করুণালাভ—এ সব যে জন্মজন্মার্জ্জিত তপস্যালব্ধ অতি-ভাগ্যের কথা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নিস্তারিণীর স্বপ্নদর্শন যে এমন হাতে হাতে সফল হইল, ইহাতে তিনি মনে মনে সিদ্ধেশ্বরী মাতার একদিন পূজারও মানসিক করিয়া ফেলিলেন। হঠাৎ মনে হইল, স্বামী মরিলে লোকের কত কষ্ট হয়, কিন্তু নিস্তারিণীর হইল তাহার বিপরীত, অর্থাৎ ষোল আনা সুখ। সেই হারিয়ে-যাওয়া জ্যোতিষীর কথাও যে এমন সত্য হইবে, তাহাই বা কে জানিত! দেখা যাইতেছে, স্বামীই ছিল নিস্তারিণী দেবীর সুখের একমাত্র প্রতিবন্ধক, যাহাকে বলে সৌভাগ্য-প্রাসাদের তোরণদ্বারে কণ্টকিত অর্গল, দুরোরোহ পর্ব্বত।

এক দিকে যেমন সুখ হইল প্রচুর, অন্যদিকে নিস্তারিণীর তেমনি ঘনাইল এক বিষম অশান্তি। গ্রামের লোক তাঁহার আশাতীত সুখ-সৌভাগ্যে হঠাৎ যে শুধু হিংসিত হইয়া উঠিল তাহাই নয়, তাহারা বেশ শনৈঃ শনৈঃ বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের কাদাও ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। প্রথমটা অবশ্য কেহই বাড়াবাড়ি করিতে সাহস করিল না, কারণ ছোটবাবুর -অনুগৃহীত পরিবারটিকে লইয়া কথা কহিলে, ছোটবাবুর রোষবহ্নিতে পড়িবার সম্ভাবনাই সমধিক। জলে বাস করিয়া কি কুমীরের সহিত কেউ বিবাদ করে?

লোকে এই চক্রবর্ত্তী-গোষ্ঠীকে আগে কৃপার চক্ষে দেখিত, কারণ তাহারা ছিল অনাথ, নিরাশ্রয়, নিরুপায়। যেমনি তাহাদের একটা

আশ্রয় মিলিল এবং একটু সুরাহা হইল, অমনি গ্রামবাসীদের বক্ষপঞ্জরে নিদারুণ একটা বেদনা চাগাড় দিয়া উঠিল ! একসঙ্গে বহু জিহ্বা, নিদাঘ তাপে বিবরছাড়া উদ্যতফণা নাগিণীর মত, আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতে লাগিল। ভয়ও আছে, অথচ স্বভাবও অপরিহার্য্য।

কুৎসা বাতাসের চেয়েও বেগবতী, মধু অপেক্ষাও মুখরোচক এবং রক্তবীজের মতই অমর। গ্রামের পুকুরঘাটে, নদীর ধারে, অশ্বত্থতলায়, বারোয়ারির মাঠে, মুদীর দোকানে, ভটচাজদের দাওয়ায়—হামাগুড়ি দিতে দিতে, কাহিনীগুলি ক্রমশঃ বেশ হাঁটিতে আরম্ভ করিল। নিস্তারিণীর কাণেও পৌছিল, টেঁপীও শুনিল, নিস্তারিণীর পুত্রগণেরও এ-সব তেমন আর অজ্ঞাত রহিল না।

নিস্তারিণী প্রথমটা চেঁচাইয়া, গালাগালি দিয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া, দুই পরিজনের সঙ্গে কলহ পর্য্যন্ত করিল ; কিন্তু কলহ করিয়া ঈদৃশ অরুচি-নাশক এবং অত্যন্ত মুখরোচক কাহিনীর গতিরোধ করা অসম্ভব ; তদ্দ্বারা বরং তাহাকে আরও গতিশীল করিয়াই তোলা হয়। নিস্তারিণী মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। মনকে প্রবোধ দিলেন—অবস্থা ভাল হইলে লোকে অমন হিংসা করে, শত্রু হয়। ইহারা বাড়ীর বাহির হওয়াই বন্ধ করিয়া দিল, কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করে না। তবুও সুফল ফলিল না। গ্রামের লোকেরা বলিল—মুখ আর দেখাবে কোন্ লজ্জায় ? কেহ কেহ বলিল—এরা এখন জমিদারের শ্বাশুড়ী গো ! এরা কি তোমার-আমার মত হ্যাং হ্যাং করে যখন-তখন আর পথে ঘাটে বেরুতে পারে কখনও ? এখন ওদের বেরুতে হলে, দোলা তাঞ্জাম না হোক্, অন্তত একটা পাল্কী ডুলিও চাই তো !

বাড়ীর বাহির হইলে টিট্‌কারি, না হইলেও ঠেশ-মারা বাক্যবাণ। লোকে বাড়ী আসিয়া বা বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়াও দশ কথা শোনাইয়া যায়। নিস্তারিণী একা কত লোকের মুখে হাত দেয়?

এ সময় ঘুঁট্‌কে থাকিলে নিস্তারিণীর পরামর্শের হয়ত কিঞ্চিৎ সুবিধা হইত। ঘুঁট্‌কেকে মনে পড়িল। ঘুঁট্‌কে মনের দুঃখে হতাশ হইয়া কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় সে নিস্তারিণীকে সাবধান করিয়া জানাইয়া দিয়া গিয়াছে যে, বড়লোকের আশ্রয়, শরতের মেঘ—ক্ষণিক! এই আছে—এই নাই।

ঘুঁট্‌কে সদাশয়তার চূড়ান্ত প্রমাণ স্বরূপ কহিয়া গিয়াছে যে, সে যখন একবার তাঁহাকে মাসীমা বলিয়াছে, তখন সে যাবজ্জীবন মাসীমার মতই তাঁহাকে দেখিবে। কাজেই যখনই তিনি তাহাকে কোনও আদেশ করিবেন, ঘুঁট্‌কে সাধ্যমত তাহা পালন করিবেই। যদি প্রয়োজন হয়, সে তাহার মাসতুতো ভাই তিনজনের বড় বড় চাকরী করিয়া দিয়া, সকলের ভার লইয়া, সপরিবারে মাসীমাকেও কলিকাতায় লইয়া গিয়া, দেবীর মত পূজা করিতে প্রস্তুত।

তাহার মাতাপিতা ভ্রাতা ভগিনী বলিতে এ পৃথিবীতে কেহই নাই—সে অনাথ। নিস্তারিণী এ কথায় গলিয়া জল না হইলেও, একেবারে উদাসীনও থাকিতে পারেন নাই, যেহেতু ইহাতে তাঁহারই স্বার্থ সম্পূর্ণ। আর এ কথা একেবারে উড়াইয়াও দেওয়া চলে না। এখানকার বৃহৎ রোহিত যদি জালে না-ই উঠে, তাহা হইলে কাজ চলিবার মত কাল-বাউসটি তো আট্‌কাইয়া রহিলই! ঘুঁট্‌কে তাহার কলিকাতার ঠিকানাও দিয়া গিয়াছে।

প্রায় তিন মাস হইতে চলিল, ছোটবাবু ইহাদের আর কোনও খোঁজ খবর লন নাই। একটা মুখের কথা পর্য্যন্ত কাহাকেও জিজ্ঞাসা করেন নাই। অথচ তিন-তিনটা ছেলে সেখানে সারাদিন কাজ করিতেছে। প্রত্যহ অপরাহ্নে তিনি অশ্বারোহণে ভ্রমণে বাহির হন্—একবার এই দিকটা হইয়া গেলেও তো পারেন!

আলোচনা করিতে করিতে নিস্তারিণী তন্ময় হইয়া পড়িলেন। তবে কি ঘুঁটুকের কথাই সত্য? তাহাই বা কি করিয়া হয়? অসীম যে টেঁপীর প্রতি আকৃষ্ট, তাহার তো কোন প্রমাণই পাওয়া যাইতেছে না! তবে কি এতদিনের সব কল্পনাই মিথ্যা?

এমনও তো হইতে পারে, ছোটবাবু ছেলেমানুষ, তাহাতে গ্রামের জমিদার, তাই প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও লোক-নিন্দার ভয়ে, বিনা কাজে তিনি এ-বাড়ীতে যাতায়াত করিতে পারিতেছেন না। অথচ নিন্দার কি আছে ইহাতে? গাঁয়ের রাজা প্রজার বাড়ী আসিবেন, তাহাতে কাহার ঘাড়ে দুইটি মাথা যে কেহ কিছু বলিবে? নিশ্চয় তিনি খুব লাজুক—লজ্জায় আসিতে পারেন না। ইহাই হয়ত ঠিক। তাঁহাকে তো এ বাড়ীতে কেহ আমন্ত্রণ করে নাই। বিনা আহ্বানে, কে কাহার বাড়ী যায়? বিশেষ তো জমিদার এবং হবু-জামাই!

পুত্রদের উপর তাঁহার রাগ হইল। উহারা তো ছোটবাবুকে আহ্বান করিতে পারিত। ছেলেগুলি যে মানুষ নয়।···তিনিই বা কোন্ মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছেন? ছোটবাবু যে এত করিলেন, তাহার বিনিময়ে তিনি নিজেই বা কোন্ একবার গিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আসিয়াছেন? বহুপূর্ব্বেই, তাঁহার নিজেরই একদিন যাওয়া উচিত

ছিল···ও-বাড়ীতে কোনও স্ত্রীলোক নাই···নাই বা থাকিল? তিনি গিন্নিমানুষ তাঁহার পেটের ছেলের বয়সী ছোটবাবু, আজ বাদ কাল যিনি জামাতা হইবেন, তাঁহার কাছে যাইতে দোষ কি?···ছোটবাবু নিশ্চয়ই ইঁহাদের উপর তাহা হইলে রাগ করিয়াই আসেন না।··· না, এ রাগ ভাঙাইতেই হইবে। আজ আর সময় নাই, শীতকালের ছোটবেলা—কাল নিশ্চয়ই তিনি ছোটবাবুর সহিত দেখা করিবেন।··· লোকে তাঁহাকে ছোটবাবুর নিকট যাইতে দেখিবে তো! দেখিলেই বা! বিনা কারণেই যখন নানান কথা রটিয়াছে, তখন যাতায়াত সুরু হইলে কি আর রক্ষা থাকিবে?

গ্রামের এই সব কানাঘুষা কথা কি ছোটবাবুর কাণে কিছুই পৌঁছে নাই? নিশ্চয় পৌঁছিয়াছে। সবাই জানে, আর গ্রামের জমিদার শোনে নাই? যাঁহাকে জড়াইয়া ভিত্তিহীন অমূলক এই কুৎসার বিছুটি-লতা এমন বাড়িতেছে, তিনি যে ইহার অস্তিত্বও অবগত নন্, ইহা কি বিশ্বাস্য? বোধ হয়, এই লজ্জাতেই তিনি আর এদিক্ মাড়ান না।······

বেশ তো, ইহাতে তাঁহার লজ্জা কিসের? পুরুষ মানুষের এমন বহু রটিয়া থাকে। মরিতে মরে অপর পক্ষই।···

পুরুষের চোর আর মেয়েদের নচ্ছার অপবাদই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। পুরুষের আর এ অপবাদ কি? অপবাদ তো স্ত্রীলোকেরই! বিশেষতঃ আইবুড়ো মেয়ের!! মুস্কিল তো এ পক্ষেরই সমূহ···

নিস্তারিণী হঠাৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখে চোখে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। গ্রীক দার্শনিকের মত 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলিয়া লাফাইয়া না উঠিলেও, তিনি এই অশুভ পরিস্থিতির

মধ্যে এক পরম শুভের নির্দ্দেশ পাইয়া উল্লষিত হইয়া উঠিলেন। হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে ডাকিলেন—"টেঁপু, ও টেঁপু মা—একবার শোন্' তো, মা নক্ষি—"

টেঁপী সাজিমাটিতে কাপড় সিদ্ধ করিয়া, রান্নাঘরের পার্শ্বস্থ পেয়ারা তলায় সেগুলি কাচিতেছিল। ভিজা কাপড়ে, অর্দ্ধসিক্ত দেহে জননীর কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি মা ?"

টেঁপী আজকাল জননীর ঈদৃশ স্নেহাধিক্যে আর ভীত হয় না। মাতার সহিত কথাবার্ত্তায় টেঁপী বুঝিয়াছে যে, সে এখন আর অবহেলিত অবজ্ঞেয় এবং অনাদৃত টেঁপী নয়, এ পরিবারে তাহার স্থান এখন বহু উর্দ্ধে, সে-ই এখন ইহাদের একমাত্র ভরসা, ইহাদের জীবন-মরণের জটিলতম সমস্যার সমাধান এখন তাহারই হাতে। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া এখন অনরবত নানাদিক হইতে এ পরিবারে নিত্য নব নব সুখসৌভাগ্য উঁকি মারিতেছে। সে এখন অনেকক্ষণ ধরিয়া দর্পণে নিজের মুখ চোখ কান্তি এবং সমাসন্ন যৌবনের অরুণাভায় সুরঞ্জিত স্বচ্ছন্দ ললিতসুকোমল তন্বী দেহখানি বারম্বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে, আর ভাবে—সে কত সুন্দরী। টেঁপী যেন হঠাৎ এক দুঃস্বপ্নভয়াল নিদ্রা হইতে জাগিয়া, আপনার প্রকৃত সত্তাটি ফিরিয়া পাইয়া আশ্বস্ত হইয়াছে।

জননী কহিলেন—"আজ তো আর বেলা নেই মা, তোর হাতেও তো অনেক কাজ রয়েচে, দেখ্‌চি—"

বাধা দিয়া টেঁপী কহিল—"কি করতে হবে, তাই বল' না ? কাজ তা থাকবেই, এ আর ছাড়া কবে ? ভিজে কাপড়ে শীত নাগ্‌চে—"

নিস্তারিণী কহিলেন—"আহা, তাই বটে। তা' যা' মা, তাড়াতাড়ি

কাপড় ক'খানা কেচে, গা ধুয়ে নে গা—আমি না হয়, হেঁসেলে যেচি—"

টেঁপী কহিল—"তুমি ক্যানে রেতে হাঁড়ি ঠেলতে যাবে? ও বেলাকার সবই আছে, শুধু দুটো চাল ফুটোনো তো? ওর জন্যে তোমার ভাবনা নেই। তুমি আমায় ডাক্‌লে ক্যানে, তাই বল।"

নিস্তারিণী কহিলেন—"ডাক্‌লাম—কাল একবার ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাব, মনে কর্‌চি। তুই যাবি আমার সঙ্গে?"

টেঁপী ভাবিতে লাগিল।

নিস্তারিণী কহিলেন—"আমার একার যাওয়ার চেয়ে, মায়ে-ঝিয়ে দু'জনে গেলে, কাজটা একটু শীগ্‌গীর শীগ্‌গীরই হাঁসিল হ'তে পারে—"

ভাল শিকারীরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে খাঁচায় একটি ছাগল পুরিয়া রাখিয়া, নিকটেই লুকাইয়া থাকে। তাহার ডাকে ও গন্ধে বাঘ যেমন নিকটে আসে, শিকারীরা অমনি মারে, অথচ ছাগলটিও জীবিত থাকে এমন শিকারী হয়ত আছে, যে একটি মাত্র ছাগলে সমস্ত সুন্দরবনটিই অনায়াসে নির্ব্যাঘ্র করিতে পারে, অথচ ছাগলও মরিবে না।

টেঁপী সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল—"কি কাজ তোমার সেখানে?"

নিস্তারিণী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"তোরই বিয়ের জন্য রে পাগলী—"

"মা যেন কি—যাও—" বলিয়া টেঁপী সলজ্জ কোমল হাস্যে দ্রুতপদে পূর্ব্ব কার্য্যে ফিরিয়া গেল।

নিস্তারিণী কন্যাকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিতে লাগিলেন "এতে আর

লজ্জা কি মা? গরীবের ঘরে লজ্জাসরম করতে গেলে কি কাজ চলে? আমাদের আছে কে? আমাদের কাজ আমরা না করলে, কে করে' দিয়ে যাবে মা?"

নিস্তারিণীর কথা মধ্যপথেই বন্ধ হইয়া গেল। বহু লোকের সম্মিলিত একটা কোলাহল ক্রমশ এই দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। নিস্তারিণী দ্রুতপদে এবং টেঁপী ও তাহার বালিকা ভগিনী দুইটিও এক রকম ছুটিয়া আসিয়া সদর দুয়ারে দাঁড়াইতেই, দেখিল, কেনারাম ভট্টাচার্য্যের একমাত্র পুত্র বেচারামকে কতকগুলি লোক ধরাধরি করিয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতেছে। বেচারামের মাথা ফাটিয়া দর দর ধারে রক্ত পড়িতেছিল, তাহার পরণের কাপড়খানি পর্য্যন্ত রক্তে লাল হইয়া গিয়াছে।

দুয়ারে আসিয়া সকলে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। জনতা দুয়ার অবরোধ করিয়া, নিস্তারিণী ও টেঁপীকে সরল সহজবোধ্য গ্রাম্য ভাষায় গায়ের ঝাল ঝাড়িয়া বহু গালি দিয়া শাসাইয়া গেল যে, তাহাদিগকে এ গ্রাম হইতে মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া শীঘ্রই তাড়াইয়া দিবে, কিম্বা ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া গোষ্ঠীসুদ্ধ সকলকেই অবিলম্বে পোড়াইয়া মারিবে। থানায় লোক গিয়াছে, দারোগা আসিতেছে। ভোলা বেচাকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কোনও প্রকারে ইহারা উদ্ধার করিয়াছে। ভোলাকে তাহার জমিদার-ভগিনীপতির দেউরীতে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, ফাঁশি হইবে।

নিস্তারিণী ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অজ্ঞান হইয়া সেইখানে পড়িয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পুষ্করিণীর নিস্তরঙ্গ জলের মত, চৈতনপুরের উত্তেজনাবিহীন অতি-সাধারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় চাঞ্চল্যের বিশেষ হেতু সাধারণত বড় ঘটে না! কাজেই, খড়ের আগুনের মত এই ব্যাপারে আশপাশের গ্রামে পর্য্যন্ত রটিয়া গেল, কেশব চক্রবর্ত্তীর মধ্যম পুত্র ভোলা, কেনারাম ভট্টাচার্য্যের একমাত্র পুত্র বেচারামকে বাজারের মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে, খুন করিয়াছে। গ্রামের ইতর ভদ্র আবালবৃদ্ধ-বনিতা ক্ষেত খামার গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, দুর্ণিবার কৌতূহলে বাবুদের দেউড়ীতে খুন ও খুনী দেখিতে ছুটিল। কয়েকজন বরকন্দাজ ভোলাকে সেখানে বসাইয়া রাখিয়াছে, থানায় খবর দেওয়া হইয়াছে। চৈতন্‌পুর হইতে তিন ক্রোশ দূরে কুসুমপুরে থানা।

দারোগাবাবু ঘোড়ায় আসেন। সামান্য কোথাও খুট্‌খাট্‌ একটু শব্দ হইলেই, উত্তেজিত প্রতীক্ষমান জনতা উচ্চকিত হইয়া চায়—ঐ বুঝি দারোগা আসিল। অনেকেই কখনও খুনী দেখে নাই; তাহারা অতিপরিচিত ভোলাকে নিরীক্ষণ করিয়া এবং তাহার চেহারায় বিশেষ অসাধারণ কিছুই দেখিতে না পাইয়া, খুনীর সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িল।

এই রক্তারক্তি ব্যাপারে ছোটবাবুর অনুগৃহীত এই পরিবারটির সর্ব্বনাশ হইবে মনে করিয়া, কেহ কেহ বিশেষ আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল। বুক হইতে একটা গুরুভার পাষাণ

অবনমিত হওয়ায়, কেহ কেহ একটা লঘুতা অনুভব করিয়া বিলক্ষণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। গ্রামে অন্যান্য বহু যোগ্যতর অনুগ্রহের পাত্র থাকিতে, ইহাদিগের প্রতি ছোটবাবুর ঈদৃশ পক্ষপাতে, পূর্ব্ব হইতেই ইহারা ছোটবাবুর উপর তেমন প্রসন্ন ছিল না। তবে তাঁহার প্রকাশ্য বিপক্ষাচরণ তো সম্ভব নয়, কাজেই অনুগৃহীতদের উপর দিয়াই প্রতিশোধ লইতে হইতেছে। প্রতিশোধ চাই-ই।

মহানুভব ধর্ম্মাত্মা গ্রামবৃদ্ধগণ পরস্পর গা-টেপাটেপি করিয়া কহিলেন—এখনও চন্দ্রসূর্য্য উঠিতেছে, সুতরাং এই পুণ্যতীর্থ পবিত্র গ্রামে এত বড় একটা ব্যাভিচারদুষ্ট মহাপাপ কখনও কি বৃথা যায়? ধর্ম্মের কল যে বাতাসে নড়ে, ধার্ম্মিকগণ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া পরম পরিতুষ্টি লাভ করিলেন। অসূয়াপরতন্ত্রগণ কহিল—হ'ল তো? হাতে হাতে ফল্‌ল! এখন ক'টার ফাঁসি হয়, দেখ'। এই ত' কলির সন্ধ্যে।

সমস্ত অস্ফুট গুঞ্জন হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। উত্তেজিত জনতা, নিশীথে নির্জ্জন প্রান্তরের মত সহসা, নিস্তব্ধ হইয়া উঠিল। দারোগাবাবু আসিয়া পড়িয়াছেন। একজন নগ্‌দী গিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিল। কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রে যমুনা যেমন নিজের বুক দ্বিধাবিভক্ত করিয়া, শিশুকৃষ্ণবক্ষে বসুদেবের গমনপথ সুগম করিয়া দিয়াছিল, জনতাও তেমনি দারোগাবাবুর জন্য আপনাআপনিই দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। তিনি রাজাধিরাজের মত উভয়পার্শ্বস্থ লোকের অভিবাদন গ্রহণ করিতে করিতে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সেরেস্তার কর্ম্মচারীরা দণ্ডায়মান হইয়া, আভূমিনত হইয়া প্রণাম করিয়া, ছোটবাবুর নির্দ্দেশমত দারোগাবাবুকে দ্বিতলে তাঁহার নিকট লইয়া গেল।

মাঘ মাস। শীতের সন্ধ্যা। জনতার কৌতূহল শীতকেও পরাস্ত করিল। দেউড়ীর বাহিরে খোলা মাঠে লোকে শীতে কাঁপিতেছে, বাহিরের বারান্দায় ব্রাহ্মণাদি গ্রামবৃদ্ধগণ ছেঁড়া মাদুরে জড়সড় হইয়া উপবিষ্ট, স্ত্রীলোকগণ অন্য এক ধারে দণ্ডায়মান। খুনের বিচার দেখা সচরাচর হয় না, সেই সুযোগ যখন মিলিলই, তখন এমন একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য ব্যাপার না দেখিয়া লোক থাকেই বা কি করিয়া? সংসারের কাজকর্ম্ম তো আছেই চিরকাল। খুন রোজ হয় না বা দারোগাও সারাদিন আসে না! কাজেই শীত বা গৃহকার্য্য কিছুতেই গ্রামবাসীরা দমিল না।

বেশ একটা থম্‌থমে ভাব হইয়া আসিয়াছিল, জনতার মধ্যে আবার একটা গুঞ্জন ধ্বনিয়া উঠিল। কেহ কেহ রুখিয়াও দাঁড়াইল। গ্রাম্য সভ্যতানুযায়ী বহু ব্যঙ্গবিদ্রূপও একসঙ্গে নানাদিক হইতে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সকলের লুব্ধ ও বিষদিগ্ধ দৃষ্টির শর-জাল ভেদ করিয়া, আপাদমস্তক একখানা শাদা থানে ঢাকা নিস্তারিণীর সঙ্গে, ময়লা একখানা র‍্যাপার গায়ে টেঁপী দ্রুতপদে সদর দেউড়ী দিয়া, অবলীলায় জমিদারবাবুদের বাড়ীতে প্রবেশ করিল এবং বিনাদ্বিধায় সোজা দ্বিতলে উঠিয়া গেল। খুনীর মাতা ও ভগিনীকে এই দিকে আসিতে দেখিয়া লোকগুলি প্রথমে যেমন উত্তেজনায় মুখর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদিগকে বিনাবাক্যব্যয়ে অবিচলিত চরণে ছোটবাবুর দোতলায় সরাসরি উঠিয়া যাইতে দেখিয়া, তাহারা বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িল।

ইহাদের অনুসরণ করিয়া, দুই-তিন জন পাইক "ও মা ঠাক্‌রুণ, ও

দিদি ঠাক্‌রুণ্‌—শুন্থন্‌, শুন্থন্‌—উদিকে যেয়েন্‌ না, উদিকে যাওয়া সরকারের মানা—শুন্‌চেন্‌, শুন্‌চেন্‌—" বলিতে বলিতে ধাওয়া করিল, কিন্তু নিস্তারিণী বা টেঁপী তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। একেবারে তাহারা অসীমের বৈঠকখানার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।

পাইকেরা মধ্যপথ হইতেই হতাশভাবে ফিরিয়া গেল—কারণ তাহাদের একটা জায়গা আছে, যাহার বেশী তাহাদের গমন-নিষেধ। তাহাদের ভয় হইল, মনিব যদি ক্রুদ্ধ হন্‌। অথচ তাহারা নিরুপায়—ইস্তিরী-লোকের গায়ে হাত তো দিতে পারে না!

বৈঠকখানাটি অতিআধুনিক সভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন স্বরূপ পরিপাটিভাবে সজ্জিত। বহুমূল্য টেবিল, চেয়ার, টীপয়, আয়না, আলমারি, সোফা, কৌচ, র‍্যাক্‌, ফুলদানি, মধ্যে মধ্যে ছোট-বড়-মাঝারি নগ্ন নারীর মর্ম্মরমূর্ত্তি; প্রাচীরে লম্বমান্‌ উলঙ্গ নারীর চিত্র; আলোর ঝাড়, ঘরের এক কোণে নীলাভ কাচের গোলক হইতে ডে-লাইটের স্বপ্নমধুর উজ্জ্বল আলো—কিছুরই অভাব ছিল না!

অসীম ও দারোগাবাবু একখানি টেবিলে কাঁটা চামচ ও ছুরি সহযোগে নানাবিধ আমিষ নিরামিষ ও উদ্ভিজ্জ আহারে প্রবৃত্ত। উভয়ের মধ্যে একটি প্লেটে বড় একটি মুরগী রোষ্ট। কার্ত্তিকের বিশেষ রান্নাঘরটি বারান্দারই এককোণে—সে ছুটিয়া ছুটিয়া পরিবেশনে ব্যস্ত এবং এঁটো প্লেট ও ছুরিকাঁটাগুলি বাহিরে একটা স্থানে জমা করিতেছিল।

ইহাদের এতদূর অনধিকারপ্রবেশে কার্ত্তিকচন্দ্র চটিয়া তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্য হুম্‌কি দিয়াই বুঝিতে পারিল, এ বড় কঠিন ঠাঁই!

"ছোটবাবু গো—" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া, নিস্তারিণী সেইখানে

বুক্ চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। টেঁপী মাতার পাশে দাঁড়াইয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অসীম চমকিয়া উঠিয়া এদিক-ওদিক চাহিতেই, কার্ত্তিক ইহাদের আগমন বার্ত্তা জানাইল। অসীম রোষ্ট চিবাইতে চিবাইতেই বাহিরে আসিয়া, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"একি? আপনারা এখানে যে?"

নিস্তারিণী ঘোম্‌টার মধ্য হইতে সরোদনে জানাইলেন—"দোহাই ছোটবাবু, আমার ভোলাকে ছেড়ে দাও—ও কোনো দোষ করে নাই। দোহাই দারোগাবাবু—"

দারোগাবাবুও আহার ফেলিয়া, ছোটবাবুর পিছু পিছু বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অসীম ইংরাজীতে দারোগাবাবুকে জানাইল—ইনি আসামীর মাতা ও এটি তাহার ভগিনী।

অসীম অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু নিস্তারিণীর একই কথা—"ভোলা কোন দোষের দূষী নয়! গাঁয়ের সব নির্ব্বংশেরা হিংসেয় বুক চড়্ চড়্ করে মরুচে। আমি যেন ওদের বুকে ভাতের তেউলো চাপিয়েচি—ওলাউটো, আঁটকূড়ো, খালভরা, বাঁশবুকোরা বেটার মাথা খাক্, ধড়ফড়্ করে মরুক্, রাত না পোয়াতে যেন ওদের সর্ব্বনাশ হয়, ভালবাসার মড়া মুখ দেখুক্, মহাব্যাধি হোক্—ঐ ওদের এ কার্‌সাজী—"

দারোগাবাবু ইংরাজীতে অসীমকে কহিলেন—"মিঃ চক্রবর্ত্তী, এঁর সঙ্গে তর্ক কর্‌বেন না। যুক্তি দিয়ে কোন মাকে ছেলের বিপদে ছেলের দোষ বোঝান যায় না! এ আমাদের কষ্টার্জ্জিত অভিজ্ঞতা।"

অসীম জিজ্ঞাসা করিল—"তাই নাকি? এ অশিক্ষিত গ্রাম্য স্ত্রীলোকদিকে বোঝান' অবিশ্যি শক্ত খুবই—"

দারোগাবাবু কহিলেন—"না না, এ রকম অবস্থায়—সহরের শিক্ষিত মায়েরাও এমনিই অবুঝ হন্!" একটু হাসিয়া কহিলেন—"কি জানেন, মিঃ চক্রবর্ত্তী? মা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র মা-ই! আর তা' ছাড়া, আমাদের দেশের মেয়েরা শিক্ষিতাই হোন্ আর অশিক্ষিতাই হোন্, বিপদে পড়্লে হয়ে দাঁড়ান্ ঐ একই, কোনই প্রভেদ থাকে না! তবে, ইউরোপীয়ান্ মেয়েদের বেলায় অবিশ্যি এ কথা সব সময় খাটে না।"

অসীম ঘাড় নাড়িয়া, দারোগাবাবুর বিচক্ষণতা স্বীকার করিয়া, ঘরের মধ্যে নিজের চেয়ারে ফিরিয়া আসিয়া, পুনরায় আহারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তাহলে আর আমাদের মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে লাভ?"

দারোগাবাবু কহিলেন—"বল্‌চি!" নিস্তারিণীকে কহিলেন—"দেখুন্ মা, আপনি অমন অধীর হবেন না, আপনার ছেলে যদি কিছু না করে থাকে, তাহলে তার কোনো ভয় নাই। তার গায়ে একটা আঁচড় পর্য্যন্ত লাগ্‌বে না। আপনি ভাববেন না। বাড়ী চলে যান, মিছেমিছি বুড়োমানুষ কেন ঠাণ্ডায় কষ্ট ভোগ কর্‌বেন?"

বলিয়া দারোগাবাবুও আহারে ফিরিয়া আসিলেন। নিস্তারিণী অপ্রকাশ্য রাগে গশ্‌ গশ্‌ করিতে করিতে অস্ফুটস্বরে কহিলেন—"আ মর্ —পোড়াকপালে বে-আক্কেলে মিন্‌সে—চোখের মাথা খেয়েছেন, কানা হয়েছেন—বুড়ো মানুষ—বুড়ো মানুষ!—তোর ছরাদ—তোর পিণ্ডি—"

টেঁপী মাকে টিপিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—"ও কি মা, শুনতে পাবে যে—"

উভয়েই দুয়ারের বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বিস্ফারিত নেত্রে গৃহের আস্‌বাব আহার্য্য ও আহারের রীতি

দেখিতে দেখিতে মা ও মেয়ে এমনি মুগ্ধ হইয়া গেল যে, ভোলার বিপদও কিয়ৎকালের জন্য তাহারা ভুলিয়া গেল।

ঈদৃশ গৃহসজ্জা ও আহারের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত রীতি ইতিপূর্ব্বে ইহারা দেখা দূরে থাক্, কখনো কল্পনাও করে নাই।

আহারে বসিয়া দারোগাবাবু কহিলেন—"হাঁ, কি বল্‌ছিলেন মিঃ চক্রবর্ত্তী? আমরা মেয়েদিকে লেখাপড়া শেখাই কেন, কেমন না? আমরা মেয়েদিকে লেখাপড়া শিখতে যে পাঠাই, সেটা ঠিক লেখাপড়া শিখ্‌তেই নয়। লেখাপড়া যত হোক্ আর নাই হোক্, এই স্কুলে পাঠানোটাই আজকালকার ফ্যাশান্! তথাকথিত সভ্যসমাজে, তা নইলে মেয়ের বিয়ে হয় না! অথচ আপনি দেখবেন, এই ইস্কুলে-কলেজে-পড়া মেয়েদের মধ্যে সত্যিকারের ভাল মেয়ে ক'টি! কথাটা অপ্রিয়, কিন্তু অত্যন্ত সত্যি।"

অসীম উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। জনৈক কর্ম্মচারী আসিয়া, সংবাদ দিল, বেচা ঠাকুরকে আনা হইয়াছে। আহার শেষ করিয়া উভয়েই তদন্ত করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিল।

নিস্তারিণী ও টেঁপীও ইহাদের পিছু পিছু আসিয়া, দুয়ারের পাশে দাঁড়াইল।

দারোগাবাবু ভোলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি একে মেরেচ?"

পরিষ্কারকণ্ঠে ভোলা কহিল—"মেরেচি, হুজুর।"

দরজার পাশ হইতে চিৎকার করিয়া নিস্তারিণী কহিলেন—"না, হুজুর, ও নির্-দূষী ও মারে নাই। আপনি বিচার করুন্, হুজুর, আইন্ দেখে বিচার করুন—"

দারোগা দারোগার মত পরুষকণ্ঠে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন—"ফের্ যদি এ রকম চেঁচান্ আপনি, তা'হলে আপনার ছেলের ক্ষতি হবে, আর, আপনাকেও এখান থেকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া হবে! এই বুঝে, চল্‌বেন।"

ভোলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, কি হল, কি দিয়ে মার্‌লে, কেন মার্‌লে, বেশ গুছিয়ে বলো দেখি আমায়। সত্যি কথা বল্‌বে—মিছে কথা বল্‌লে কিন্তু ভয়ানক বিপদে পড়্‌বে—"

ভোলা নির্ভীকভাবে কহিল—"মিথ্যে কেন বল্‌ব হুজুর! হাকিম আপনি। আমি বেষ্টা ময়রার দোকানে বসেছিলাম, ব্যাচা সেখান দিয়ে যেছিল। খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে, আমাকে দেখে ভেংচে বল্‌লে—পেন্নাম হই, মামাবাবু! আমি ঠাট্টাটা ঠিক ধর্‌তে না পেরে ভাব্‌চি। বেষ্টা ময়রা সুধোলো—মামাবাবু কিরে ব্যাচা? ব্যাচা হেঁসে কুটিকুটি হয়ে বল্‌লে—মামাবাবু কি রকম শুন্‌বে, বেষ্টাদাদা? তবে শোন। ভোলা যখন ছোটবাবুর শালা, আর ছোটবাবু যখন গাঁয়ের রাজা, রাজা বাপেরই সমান, তখন মামা নয় তো কি? বাবুর শালা, বাবু। ব্যস্, মামাবাবু। ব'লে, ব্যাচা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌ল, আর ওর সঙ্গে যারা ছিল, তারাও সবাই হেসে উঠ্‌ল।"

দারোগাবাবু অসীমের দিকে চাহিলেন। লজ্জায় অসীমের কাণ পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল! কহিলেন—"তারপর?"

ভোলা বলিতে লাগিল—"এই কথা শুনে লজ্জায় রাগে আমার মাথা পর্য্যন্ত ঘুরে উঠল, সামনে পেলাম একটা বাটখাড়া, তাই ছুঁড়ে ওকে মারলাম। রাগে তখন আমার জ্ঞান ছিল না। মাথা কেটে ও সেখানে

পড়ে যায়। তারপর সবাই মিলে আমাকে ধরে এনে, এখানে বসিয়ে রেখেচে।"

দারোগাবাবু বেচারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে, এই কথা তো ?"

বেচারাম ঢোক গিলিতে গিলিতে এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল। দারোগাবাবু ধমক দিয়া, তাঁহার প্রশ্নের উত্তর চাহিলেন।

বেচারাম স্বীকার করিল—"আজ্ঞে হাঁ হুজুর।"

দারোগাবাবু আদেশ দিলেন "এখনকার মত যে যার বাড়ী চলে যাও, তার পর দরকার হলে ডেকে পাঠাব।"

মদন গোঁসাই, জেলায় কিছুদিন এক উকীলের মুহুরী ছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"এটা ৩০৭ না ৩২২ ধারায় ফেল্‌চেন্ হুজুর ?"

দারোগাবাবু তাচ্ছিল্যভরে অসীমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ রাসবিহারী ঘোষটি কে, মিঃ চক্রবর্ত্তী ? কোনও ধারাতেই নয়, হুজুর !"

মদন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কি বেকসুর ছেড়ে দিলেন ? এটা কি ঠিক বিচার হল, হুজুর ?"

দারোগাবাবু কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া কহিলেন—"এ বেয়াদপটা কে, মিঃ চক্রবর্ত্তী ? থানা থেকে সেপাই কে এসেচে ?"

"হম্ আইনি হুজুর" বলিয়া রাম সিং কনেষ্টবল সেলাম করিয়া, দারোগাজীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"এর কান ধরে থানায় নিয়ে চল', আইনের ধারাগুলো শিখিয়ে দোব' ওকে কিছু দিন।"

রাম সিং গোঁসাইজীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইতেই, তিলকছাপাসম্বলিত এবং "প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ" মুদ্রিত দেহখানি ধূলায় লুটাইয়া দিয়া, "হুজুর মা-বাপ, হুজুর ক্ষমা করুন্" প্রভৃতি বাক্যাবলীতে তৃণাদপি সুনীচ হইয়া বৈষ্ণব-বিনয় প্রদর্শনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল।

দারোগাবাবু ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমায় যদি ঐ কথা কেউ বল্‌তো—তুমি কি তাকে রসগোল্লা খাওয়াতে বাপু?"

জনতার মধ্যে চাপা হাসি ও হতাশার একটা মৃদু তরঙ্গ ও অস্ফুট দুই চারিটা বাক্যের ক্ষীণ শব্দ শ্রুত হইল।

জনতা হইতে হরিশ দত্ত কহিল—"এ কথা গাঁয়ে সবাই জানে হুজুর, সবাই কানাঘুঁষো করে। ও ছেলেমানুষ, সমবয়সীর সঙ্গে ঠাট্টাই করতে গিয়েছিল—"

দারোগা কহিলেন—"তা বেশ তো, শিমুল গাছে পিঠ ঘসে' যেমন ইয়ারকি কর্‌তে গিয়েছিল, জবাবও তেমনি পেয়েচে। দুঃখ কিসের তাহ'লে? আচ্ছা, তোমাদের এ ব্যাপারে এত মাথা ব্যথা কেন বল দেখি? এত বড় আইন্‌বাজ যখন তোমাদের গাঁয়ে, তখন ওকে নিয়ে জেলায় গিয়ে, দরখাস্ত দাও গে। রামসিং, হঠাও এসব।"

রাম সিংকে কিছুই করিতে হইল না।

রবারের ফানুসের জনতা এই একটি ফুৎকারেই একেবারে ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল।

অসীম কার্ত্তিককে আদেশ দিল—"দক্ষিণের বারান্দায় পেগ্ টেবিলটা রাখ্‌গে—"

"আচ্ছা, হুজুর" বলিয়া কার্ত্তিক ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খুন্ করিলে ফাঁসি হয়, সবাই জানে। কিন্তু হইল তাহার ব্যতিক্রম। এ-কি ? এমন বে-কসুর খালাস পাওয়া তো কেহ কখনও শোনে নাই ! ভোলানাথের নিষ্কৃতিতে গ্রামে আবার এক নূতন রকমের চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। আসামীর গায়ে একটি আঁচড়ও লাগিল না! অথচ গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ সুপণ্ডিত এবং আইনজ্ঞ বৈষ্ণবদাসানুদাস, মদনমোহন গোস্বামী প্রভু অপমানিত হইলেন, যেহেতু তিনি দুর্ব্বলের পক্ষে সামান্য একটু প্রতিবাদ জানাইতে গিয়াছিলেন ! লোকের বুঝিতে আর বাকী রহিল না, নিস্তারিণীদের এখন বৃহস্পতির দশা। হরিশ দত্ত বাড়ী ফিরিবার সময় সেই দিনই বলিয়াছিল—

"জয়োঽস্তু টেঁপী-ভ্রাতানাং যেষাং পক্ষে জমীদারঃ।"

জমিদার যাহাদের সহায়, তাহারা এমনি নিরাপদই হয় ! দারোগা-পুলিশের হাত হইতে যে রক্ষা পায়, কাল-সাপের দংশনেও সে যে মরিবে না, ইহা সুনিশ্চিত। অতএব কেশব চক্রবর্ত্তীর পরিবারস্থ সকলেই বর্ত্তমানে এক একটি প্রহ্লাদ !

লোকের ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও নিন্দা তেমন ব্যাপক আর রহিল না! কুণ্ডলীকৃত হিংসা ও অসূয়া নিজ নিজ মনের মধ্যেই নিষ্ফল আক্রোশে, প্রভাতে মেঘাড়ম্বরের মত, কেবলি বৃথা গর্জ্জাইতে লাগিল।

অন্য সকলের মত নিস্তারিণীও নিঃসন্দেহ হইল, অসীম টোপ গিলিয়াছে, এখন খেলাইয়া ডাঙ্গায় তুলিতে পারিলেই হয়। পুত্রগণও

বুঝিয়াছিল যে, তাহারা জমিদারের একান্ত প্রিয়পাত্র এবং অতিশীঘ্রই এক মধুর সম্পর্কে এই দুইটি পরিবার চিরদিনের মত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চলিয়াছে। এ-কল্পনায় তাহারা ইতিমধ্যেই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতিও ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে। টেঁপী এখন আর নিজেকে চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর টেঁপী মনে করে না। সময় সময় মা ও ভাইদিগকে পর্য্যন্ত সে এখন আদেশ ও শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহারাও বিনা প্রতিবাদে তাহা গ্রহণ করে। চাবুক, লাগাম, ঘাস সবই প্রস্তুত, কেবল ঘোড়াটি আসিলেই হয়।

নিস্তারিণী, একদিন নয় উপর্য্যুপরি দুই-তিন দিন দ্বিপ্রহরে, অসীমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, কারণ এই ফাল্গুন মাসের মধ্যেই শুভকার্য্যটি যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, সেই বিষয়ে পাকা কথা কহিতে, কিন্তু ছোটবাবুর সহিত দেখাই হইল না। কার্ত্তিক নিস্তারিণীকে বৈঠকখানার বাহিরে বারান্দায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া, ছোটবাবুর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, প্রত্যেক দিনই জানাইয়াছে—বাবু নিদ্রিত, এখন দেখা হইবে না। নিস্তারিণীর বিশ্বাস, কার্ত্তিক নিশ্চয়ই অসীমকে তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানায় নাই। অসীম শুনিলে, নিশ্চয় সে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া, নিস্তারিণীর চরণবন্দনা করিত, সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া যাইত, কত কথা কহিত, ছাড়িতেই চাহিত না। ছোটবাবুর মত ছেলে ভূভারতে নাই, অমন স্বর্ণচন্দ্র পুত্র জগতে দুর্ল্লভ।

কার্ত্তিকের উপর নিস্তারিণী মনে মনে বিলক্ষণ কুপিত হইলেন। একবার দুই-হাত-এক-হইলে হয়, তাহার পর তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইবে, কার্ত্তিককে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া, অর্থাৎ তাহাকে জুতা মারিয়া,

কর্ম্মচ্যুত করিয়া, গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেওয়া। চাই কি, কুশণ্ডিকার দিনই তিনি কার্ত্তিককে বরখাস্ত করিবেন। ছোটবাবু এ-কথা একবার শুনিলে, রসাতল করিবেন! আর নিতান্তই যদি পুরাতন ভৃত্যকে তিনি তাড়াইতে না চাহেন, তাহা হইলে, তিনি বলিলে, ছোটবাবু তো ছেলেমানুষ, তাঁহার পিতার পর্য্যন্ত সে আদেশ লঙ্ঘন করিতে স্পর্দ্ধা হইবে না! তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিয়া অপমান?

এত-বড় বাড়ী এত-বড় জমিদারী, মাথার উপর কেউ নাই, নিজেই ছোটবাবু যখন নিজের মালিক, তখন তাঁহাকেই যে, এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র কর্ত্রীরূপে এই বাড়ীতে আমরণ বিরাজ করিয়া, সংসারে শ্রী ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। পুরুষ মানুষ সংসারের খুঁটিনাটি কি জানে? টেঁপী তো বিয়ের কণে'—ছেলে মানুষ! এত বড় জমিদারী রক্ষা করা কি একলা তাহার কাজ? তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া মরিবার সময় থাকিবে না। কাজেই, তাঁহার আদেশ সকলেই শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য হইবে।

কিন্তু এই দুই-তিন দিন তিনি যে কষ্ট করিয়া আসিলেন এবং বৃথা ফিরিয়া গেলেন, অসীমের সহিত একবার চোখের দেখাও হইল না, তাহার প্রকৃত কারণ কি? ঠিক করিলেন: তিনি একা গিয়াছিলেন, টেঁপী সঙ্গে ছিল না, তাই হয়ত ছোটবাবু তাঁহাকে আমল দেন নাই। ইহাই সম্ভব। ভিক্ষা করিতে গেলে ভেক চাই। টেঁপী নিস্তারিণীর ভেক। মাছে কি শুধু বঁড়শী গিলে? টোপ দিতে হয়। টোপ ছিল না, কাজেই সব বৃথা! কার্ত্তিক বেচারার দোষ কি? সে চাকর, তাহার কি তাঁহাকে অর্থাৎ তাহার মালিকের সুনিশ্চিত ভাবী শ্বাশুড়ীকে, দিনের

পর দিন মিথ্যা কথায় বিদায় দিতে কখনও সাহস হয়? তাহার চাকরীর কি মায়া নাই?

ছোটবাবুর নিশ্চয়ই দিবানিদ্রার অভ্যাস আছে। তাই জাগাইতে সে সাহস করে নাই! কার্ত্তিক তবে সত্য কথাই বলিয়াছে। জমিদারেরা রাত্রি অপেক্ষা দিনেই বেশী ঘুমায়।

যাহাই হউক, আজ আর নিস্তারিণী সংশয়ের কোন পথই রাখিলেন না। টেঁপীকে সঙ্গে লইয়া, অন্য দিনের অপেক্ষা একটু বিলম্ব করিয়াই তিনি ছোটবাবুর দ্বিতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বারান্দায় পৌঁছিতেই নিস্তারিণী দেখিলেন, অসীম আহার করিতেছে। কার্ত্তিক পাশে দাঁড়াইয়া।

ঢালের মত টেঁপীকে আগে করিয়া, নিস্তারিণী আস্তে আস্তে নীরবে কিঞ্চিৎ ত্রস্তভাবে, দুয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অসীম খাইতে খাইতে কাঁটা চামচ নামাইয়া রাখিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া, নমস্কার করিয়া কহিল—"আরে! টেঁপী যে, এই যে খুড়ীমাও এসেচেন! কি হল? ব্যাপার কি আবার? আসুন্, বসুন্—"

অসীমের সাদর অভ্যর্থনায় নিস্তারিণী খুব খুসী হইলেন: তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক্। সে কয়দিন সত্য সত্যই অসীম নিদ্রিতই ছিল।

অসীমের সম্মুখে কার্ত্তিক দুইখানি চেয়ার আনিয়া দিল। মা ও মেয়ে তাহাতে উপবেশন করিলেন। ইঁহাদের মুখ দেখিয়া মনে হইল, চেয়ার অপেক্ষা মেঝেয় সতরঞ্চির উপর বসিতে পাইলেই, তাঁহারা যেন স্বস্তি ও উপবেশন-সুখ অধিকতর উপভোগ করিতে পারিতেন।

নিস্তারিণী আজ কথা পাকা করিয়া যাইবেন, প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন, কহিলেন—"ব্যাপার কিছুই নয় বাবা। ছেলের কাছে কি মা আসে না? তুমি খাও বাবা, খেয়ে নাও আগে, তারপর সব কথা কইব।"

ছুরি, চামচ ও কাঁটা সহযোগে পুনরায় আহারে প্রবৃত্ত হইয়া, অসীম কহিল—"তবু ভাল! আমি ভাবলাম, আবার বুঝি কিছু ঘটেছে! আপনাদিকে দেখলেই এখন আমি আঁৎকে উঠি"—বলিয়া নিজেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

নিস্তারিণী মৃদু হাস্যের সহিত কহিলেন—"ষাঠ, ষাঠ, ষেঠের বাছা আমার,—ভয় কি?"

টেঁপী কহিল—"আমরা জুজু নেকি?"

অসীম সহাস্যে কহিল—"শুধু জুজু নয়, জুজু-বুড়ী—হুতুম্‌থুমো।"

নিস্তারিণী কিঞ্চিৎ দরদ দেখাইয়া কহিলেন—"আহা, ঘরে কেউ নেই কিনা, তাই এমন রাজা-ছেলে আমার, শান্‌কীতে খেচে—"

টেঁপী মাতাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া কহিল—"ধ্যেৎ, শান্‌কী ক্যানে হবে? একে বলে চীনে মাটির বাসন।"

অসীম তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিতে পারিলে বাঁচে।

নিস্তারিণী কহিলেন—"ও ঐ একই। যাকে বলে ভাজা চাল, তাকেই বলে মুড়ি। তা' ও চীনের মাটির বাসনই বা ক্যানে? তুমি খাবে রূপোর থালায় রূপোর গেলাসে—তুমি গাঁয়ের রাজা, তোমার কি মাটির বাসনে খাওয়া সাজে, বাবা? রূপোর ঐ খুন্তি-হাতাগুলো না করিয়ে থালা বাটি গেলাস করাতে হয়। হাতে খেয়ো! এ আবার কি বদখেয়াল? খোচাখুঁচি লেগে কখন কেটে কুটে যাবে—"

নিস্তারিণীই তো অসীমের এখন একমাত্র অভিভাবিকা। বিসদৃশ কিছু দেখিলে, তিনি তো বলিবেনই।

অসীম ম্লানভাবে হাসিল মাত্র। কথাটা ঘুরাইবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিল—"তারপর টেঁপী? তুই নিম্ন প্রাইমারী তো পাশ করেছিস্, না?"

টেঁপী ঘাড় নাড়িয়া নতমুখে জানাইল, হাঁ।

নিস্তারিণী কহিলেন—"শুধু পাঁশ করে নাই বাবা, পাঁচ টাকা জলপানিও পেইছিল—"

অসীম কহিল—"বেশ, বেশ, পড়াশোনা ছাড়িস্ নি—অভ্যেস রাখিস্—"

নিস্তারিণী নিজের বক্তব্যটি পাড়িবার হদিশ্ পাইলেন। কহিলেন—'গরীবের ঘরে কি ও-বিবিয়ানা সাজে, বাবা? সারাদিন ওর লেকাপড়ার ঝোঁক, এইজন্যে আমার কাছে কত বকুনী খায়। ভাত চড়িয়ে দিয়েও ও বসে থাকে না, রামায়ণ মহাভারত পড়ে। বড়লোকের ঘরে যখন যাবি, তখন বই নিয়ে বসে থাক্‌লে চল্‌বে—এখন গরীবের ঘরে কি—"

অসীম কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় কার্ত্তিক কতকগুলি চিঠি ও একটা প্যাকেট আনিয়া, অসীমের সম্মুখে টেবিলে রাখিতেই, অসীম দুইখানি চিঠি ও একটি প্যাকেট বাছিয়া লইয়া, বাকীগুলি ঠেলিয়া দিয়া কহিল—"এ-গুলো সেরেস্তায় দিগে যা—"

কার্ত্তিক সেগুলি লইয়া একছুটে নীচে সেরেস্তায় দিতে গেল।

প্রথম চিঠিখানি পড়িয়াই পুলকোদ্দীপ্ত মুখে অসীম আপনাআপনি ইংরাজীতে বলিয়া উঠিল—"বাস্—ভগবান্‌কে ধন্যবাদ।"

নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"খবর ভাল, বাবা?"

অসীম বিপুল পুলকে খানিকটা উত্তেজিত হইয়াই কহিল—"খুব ভাল খবর, খুড়ীমা—" বলিতে বলিতে দ্রুতপদে বারান্দায় আসিয়া, রেলিং-ঝুঁকিয়া চিৎকার করিয়া ডাকিল—"মল্লিক-কাকা, মল্লিক-কাকা—"

বৃদ্ধ জানকী মল্লিক অসীমের জমিদারীর ম্যানেজার। তাহার পিতার আমলের লোক। পূর্ব্বে সদর-নায়েব কথিত হইত, অসীম কিছু বেতন বাড়াইয়া দিয়া, পদের নাম নায়েব হইতে এখন ম্যানেজার করিয়া দিয়াছে।

জানকী উঠানে দাঁড়াইয়া—"যাই বাবা" বলিয়া, তাড়াতাড়ি দ্বিতলে উঠিয়া আসিয়া, হাঁপাইতে লাগিল। অসীম হস্তস্থিত পত্রখানি জানকীর নিকট ঠেলিয়া দিয়া কহিল—"এই দেখুন্, মল্লিক-কাকা, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের চিঠি। শ্যামাকান্ত ভট্‌চাজকে ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব হিসাব দাখিল করতে তলব করেচেন! সে যদি ১৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ হিসাব আর সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ না দিতে পারে, তাহলে তাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা হবে—"

জানকী কহিল—"ধর্ম্ম আছে, বাবা, ধর্ম্ম আছে। তা'হলে তোমার একবার এ সময়ে সহরে গেলে হত না?"

অসীম কহিল—"নিশ্চয়ই। কালই যাব। আপনিও সব ঠিকঠাক করে নিন্ গে, কাকা। আপনাকে সহরে রেখে আমি কল্‌কাতা যাব—"

জানকী কহিল—"হাঁ বাবা, আমিও তাই বলি—আচ্ছা—"

জানকী চলিয়া গেল।

অপর চিঠিখানি খুলিয়া, পড়িতে পড়িতে অসীম তন্ময় হইয়া পড়িল। চিঠি পড়া শেষ করিয়া, প্যাকেটটি খুলিল। প্যাকেটে একখানি ক্যাবিনেট আকারের ফটোগ্রাফ্। ফটোটি একজন সুবেশা সুন্দরী তরুণীর, তাহার হাতে অসীমেরই একখানা চিত্র। অসীম বহুক্ষণ ধরিয়া, প্রসন্নমুখে চিত্রখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একমনে নিরীক্ষণ করিয়া, পাশে রাখিয়া দিয়া, বারে বারে সেইটি দেখিতে লাগিল।

পূর্ব্বেকার কথাগুলি নিস্তারিণী ভাল ধরিতে পারেন নাই বলিয়া, সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওটা কিসের পট বাবা?"

—"ও একটি মেয়ের ফটো" বলিয়া অসীম ছবিখানি আগাইয়া দিল।

মা ও মেয়ে উভয়েই ছবিখানি মনোযোগসহকারে দেখিতে লাগিল।

নিস্তারিণী কহিলেন—"বেশ মেয়ে—তবে ঝুঁটিটা ভাল বাঁধা হয় নাই, থস্থস্ কর্‌চে, কান দু'টো একেবারে ঢেকে গিয়েচে। চোখ দুটো একটু ছোট, তা হোক্ গে, মোটামুটি বেশ মেয়ে, কি বল্ টেঁপী? তবে আমার টেঁপী যেমন সর্ব্ব-সুন্দরী, এমন লয় বাবা। এর ছেলে পিলে ক'টি?"

অসীম সকৌতুক হাস্যে কহিল—"এঁর এখনও বিয়েই হয় নি, খুড়ীমা।"

নিস্তারিণী গালে হাত দিয়া বিস্মিত ভাবে কহিলেন—"ওমা! বল কি বাবা? এত বড় ধেড়ে মেয়ের এখনও বিয়ে হয় নেই? হেঁঃ, আমার সঙ্গে ঠাট্টা কর্‌চ।"

অসীম কহিল—"না, খুড়ীমা, ঠাট্টা নয়।"

নিস্তারিণী কহিলেন—"এত বড় থুবড়ো মেয়ে ঘরে রেখে, এর বাপ

মায়ের মুখে ভাত ওঠে কি করে? বলি, বাপ মা কেউ নেই বুঝি? অবেস্তাও বুঝি খুব খারাপ?"

অসীম কহিল—"বাপ মা দুইই বর্ত্তমান। এঁর বাপ একজন জজ, মাসে হাজার টাকার উপর মাইনে পান।"

নিস্তারিণী কহিলেন—"তবে এখনো বিয়ে হয় নি কেন? বংশে কোনো দোষ-টোষ নেই ত?"

অসীম কহিল—"এমন বংশ আমাদের এ-তল্লাটে নাই।"

নিস্তারিণী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন—"ও—তাহ্লে বুঝিচি, বুঝিচি! তাই বল'—হেঁ হেঁ, তাই তো বলি; এত বড় মেয়ের এখনো বিয়ে হয় নেই ক্যানে! আমি তো শুনে তাই অবাক হয়ে গিইছিলাম! টেপী এই চৌদ্দয় পড়েচে, তাই রেতে আমার চোখে ঘুম নাই।"

নিস্তারিণী কি বুঝিলেন, অসীমের বোধগম্য না হওয়ায়, জিজ্ঞাসা করিল—"কি বুঝলেন বলুন ত?"

নিস্তারিণী বিজ্ঞভাবে কহিলেন—"এত-বড় ধেড়ে মেয়ে যখন, তখন কোন অপবাদ-টপবাদ—"

ইহার উপর ক্রুদ্ধ হইলে, ক্রোধের অপমান হয় ভাবিয়া, অসীম অপ্রসন্নমুখে বাধা দিয়া কহিল—"থাক্ থাক্, আর বুঝে কাজ নাই। এখন আপনারা কি জন্যে এসেছেন, সেইটে এইবার বলে ফেলুন, আমার ভয়ানক কাজ আছে। কাল আমায় বহরমপুর যেতে হচ্ছে।"

নিস্তারিণী একটু থতমত খাইয়া, এদিক-ওদিক চাহিয়া, নত নয়নে

কহিলেন—"আমি এসেছিলাম, কথাটা পাকা করে, একেবারে দিনক্ষণ ঠিক করে ফেল্‌তে, বাবা! ফাগুন মাসও যে যায়, গোপাল?"

অসীম বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কিসের দিনক্ষণ বলুন তো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না—"

"এই তোমাদের বিয়ের—আর কিসের?"

"আমার বিয়ে? কোথা? কার সঙ্গে?"

নিস্তারিণী প্রসন্নভাবে কহিলেন—"ক্যানে, এই তো—টেঁপীর সঙ্গে?"

অসীম তড়িৎপৃষ্টের মত সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কঠিনস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলছেন আপনি? টেঁপীর সঙ্গে আমার বিয়ে? কে এ ঘটকালী কর্‌ল? আমি তো এর বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানি না—"

নিস্তারিণী আকাশ হইতে পড়িলেন। কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন—"এ-কি বলচ বাবা? তোমাদের দু'জনের দু'জনকেই পছন্দ হয়েচে। টেঁপীর সঙ্গে তোমার বিয়ে, এ-কথা গাঁয়ের ইতর-ভদ্দর কে না জানে, বাবা? এই নিয়ে সেদিন খুনোখুনি পর্য্যন্ত হয়ে গেল—"

অসীম কহিল—"কাকে কাণ নিয়ে গেছে, কে বলল, আর অমনি আপনারা কাকের পেছনে পেছনে ছুটলেন? কি আশ্চর্য্য! এ কথা এমন স্পষ্ট করে' বল্‌তে আপনাদের লজ্জা হচ্ছে না?"

নিস্তারিণী কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিলেন। কহিলেন—"এতে নজ্জার কি আছে, শুনি? অমন ঘটা করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তুমি টেঁপীর বাপের ছরাদ করালে, অঘা-মারা ছেলে-তিনটেকে চাকরী করে দিলে, ভোলাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচালে—"

অসীম কহিল—"আপনার স্বামী কেশব চক্রবর্ত্তী মশায় আমাদের বহুদিনের পুরোণো কর্ম্মচারী ছিলেন। জানি, আপনারা গরীব। ছোটবেলায় চক্রবর্ত্তী মশায়ের কাছেই আমি প্রথম লেখাপড়া আরম্ভ করি, তাঁর পাঠশালায় পড়ি। কাজেই তাঁর শ্রাদ্ধে কিছু সাহায্য করেচি। তাঁর ছেলেগুলো বসে বসে মাটি হচ্ছিল, তাই যা' হয় এক একটা কাজে লাগিয়ে দিয়েছি—এ-শুধু আমার স্বর্গীয় শিক্ষকের প্রতি কর্ত্তব্যবোধে। তা' ছাড়া, চক্রবর্ত্তী মশায় লোক ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, অত্যন্ত ভাল। যা করেচি, সব তাঁরই সম্মানের জন্যে। ভোলার ব্যাপারে অবিশ্যি আমার কিছুই হাত ছিল না। দারোগাবাবু বল্‌লেন, কাউকে অকারণ রাগালে, রাগের মাথায় সে যদি কোন অন্যায়ও করে ফেলে, সেটা তত দোষের হয় না। তিনি নিজেই, আমার কথায় নয়, কেন না ভোলার জন্যে আমি তাঁকে কিছুই বলি নি, আইন অনুসারে মুক্তি দিয়ে গেছেন। এই তিলকে আপনারা এমনি তাল করেছেন? বলিহারি যাই" আপনাদের কল্পনাশক্তির—"

টেঁপীর চক্ষু দিয়া জল না পড়িয়া আগুনের হল্‌কা ছুটিতেছিল। নিস্তারিণী থতমত খাইয়া কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। কহিলেন—"কিন্তু বাবা—"

অসীম বিরক্তভাবে কহিল—"কিন্তু-টিন্তু এতে কিছুই নাই চক্কোত্তি-গিন্নী। আপনি লোক বড় সহজ নন্—"

নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিল—"ক্যানে? তোমার কি করিছি যে, আমি নোক সহজ লই?"

অসীম কহিল—"কোথাও কিছু নাই, একেবারে বিয়ের দিন কর্‌তে এসে

হাজির? আশ্চর্য্য! দয়া করাও যে এমন বিপজ্জনক, তা কি জান্‌তাম? যান—বাড়ী যান্‌। আকাশ-কুসুমে মালা গাঁথা ছেড়ে, যা হয়-রয়, তাতেই মন দিন্‌গে। এ-বাড়ীর ভাবী কর্ত্রী, আমার ভাবী বধূ—এই ইনি। বুঝেছেন্‌ এইবার?" বলিয়া সদ্যপ্রাপ্ত ফটোখানি দেখাইল।

টেঁপী মাতার গা টিপিয়া উঠিতে ইঙ্গিত করিল, কিন্তু নিস্তারিণী সেদিকে লক্ষ্যই করিলেন না। কহিলেন—"আজ তুমি এ-কথা বল্‌চ, এখন আমি এ আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে কি করি? কোথায় দাঁড়াই, বলতো?"

বিস্মিতভাবে রুক্ষকণ্ঠে অসীম জিজ্ঞাসা করিল—"তার মানে?"

নিস্তারিণীও তাহার স্বাভাবিক পরুষকণ্ঠে কহিল—"এ আর বুঝচ না? তোমাকে নিয়ে টেঁপীর নামে এত-বড় অপবাদ—পাঁচখানা গাঁয়ে ঢি-ঢি। এ-মেয়েকে এখন আর কে বিয়ে করবে? বিশেষ আমরা গরীব—আমাদের এমন সর্ব্বনাশ তুমি করবে জানলে, তোমাকে কি বাড়ী ঢুকতে দিতাম, না, তোমার টাকাই নিতাম—এখন তুমি বিয়ে করব না বলচ—"

নিস্তারিণী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

অসীম কহিল,—"চালাকী কর্‌বার আর জায়গা পেলে না? বে-ঈমান্‌ সব! গরীবকে সাহায্য কর্‌তে গিয়েছিলাম মাত্র, তার মেয়েকে বিয়ে করতে যাই নি। এখন বুঝতে পার্‌চি, খুব অন্যায় করেচি। কারণ সেই সূত্রে এ-অপবাদ তোমরাই রটিয়েছ, আমার ঘাড়ে ঐ মেয়েটাকে গছাবার জন্যে। উঃ—কি সাংঘাতিক লোক তোমরা!

তোমরা স্ত্রীলোক না হলে বুঝিয়ে দিতাম, এই চালাকীর কি পরিণাম! কার্তিক, এদের এখ্খুনি এখান থেকে বিদেয় কর্—আর কখনও যেন এ-বাড়ীর চৌকাঠ এরা না পেরোয়, বলে দে—”

বলিতে বলিতে রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে অসীম দ্রুতপদে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নৈরাশ্যের এমন মর্ম্মন্তুদ আঘাত নিস্তারিণী জীবনে আর কখনও অনুভব করেন নাই বলিয়া, এই বেদনায় সত্যসত্যই তিনি একেবারে মুষড়াইয়া পড়িলেন। জীবনে যাহাদের আশার অঙ্কুরই কখনও গজায় নাই, তাহাদের আবার নিরাশা কিসের? দীর্ঘ ৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিস্তারিণীর কখন কোনও আশারই সুযোগ হয় নাই, কাজেই সুযোগের এই সামান্য ইঙ্গিতেই, সে একেবারে অসম্ভবকে গ্রাস করিবার জন্য অতি-লোভী হইয়া উঠিয়াছিল। গাছের মাথায় চন্দ্রোদয় দেখিয়া, গাছে উঠিয়া, দুই হাত বাড়াইয়া চাঁদকে আঁকড়িয়া ধরিতে সে উদ্যত হইল, কিন্তু চাঁদ ধরা দিল না: নিস্তারিণী তরুশীর্ষ হইতে কঠিন ভূমিতলে পড়িলেন, সর্ব্বাঙ্গ থেঁৎলাইয়া গেল।

নিস্তারিণী টেঁপীর হাত ধরিয়া কোনও রকমে বাড়ী ফিরিয়াই সেই যে শুইয়াছেন, আজ চারিদিন অতীত হইতে চলিল, এখনও উঠেন নাই বা জলস্পর্শও করেন নাই। প্রবল জ্বর। জ্বরের ঘোরে মাঝে মাঝে অসম্বদ্ধ বহু প্রলাপও বকিতেছেন।

বাড়ীতে কেহই নাই। তিনটি ছেলেই এখন দস্তুরমত চাকুরে: দুইবার আহার করিতে বাড়ী আসে মাত্র; গভীর রাত্রে কেহ কেহ বাড়ী ফিরে, কেহ কেহ বাহিরেই নিশি যাপন করে। ক্ষেন্তি ও বুঁচি যথাক্রমে দ্বাদশ ও দশ বৎসর বয়স্কা বালিকা। সংসার চালাইতে, ভাবিতে, বিবেচনা করিতে, ব্যবস্থা করিতে, এখন একমাত্র কিশোরী টেঁপীই

সব। মায়ের অসুখে সে খুবই ভীত হইয়া পড়িয়াছে। দাদাদিগকে বলিল, তাহারা কেহই গ্রাহ্য করিল না। কেহ একবার মায়ের ঘরে উঁকি মারিয়াও দেখিল না—মা জীবিত কি মৃত, বা কি হইয়াছে। টেঁপী কিছু বলিতে গেলে, তাহারা ধমক দিয়া তাহাকে মারিতে আসে।

টেঁপী নিজেই গেল গ্রাম্য কবিরাজের নিকট ঔষধের জন্য। কতকটা গ্রামের মাতব্বরদের ভয়ে এবং কতকটা ঔষধের মূল্য অনাদায় আশঙ্কায়, ধন্বন্তরী-পুত্র 'ঔষধ প্রস্তুত নাই' বলিয়া, শ্যাম ও কূল দুই-ই রক্ষা করিলেন।

হতাশ হইয়া ছলছল নেত্রে টেঁপী বাড়ী ঢুকিতেই দেখে—তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর চৈতনপুর নিম্ন প্রাইমারি বিদ্যালয়ের মহামান্য দ্বিতীয় শিক্ষক বিদ্যাভীষণ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মর্করত্ন মহাশয় তাঁহার কক্ষের দুয়ারে তুরীয়-সমাধিতে মুদ্রিত নেত্রে উপবিষ্ট। পঞ্চাননের দেহটিই মাত্র ঘরে ছিল, কিন্তু তাহার মন তখন বড়-তামাকের প্রসাদে পক্ষীরাজের পিঠে চড়িয়া, কোন্ দূর তেপান্তরের মাঠের প্রান্তরে, মায়া সরোবরের তলে, লুক্কায়িত বিরাট রাজ্যের শূন্য স্বর্ণসিংহাসনে বসি-বসি করিতেছিল। টেঁপী ডাকিল—"বড়দাদা—"

বড়দাদা নিমীলিত চক্ষু দুইটি এক-চতুর্থ পরিমাণ খুলিয়া, সচকিতভাবে স্বাভাবিক গঞ্জিকাকর্কশ কণ্ঠে উত্তর দিল—"কে?"

টেঁপী কহিল—"বড়দাদা, দেড়টা টাকা শীগ্ গির দাও—হুমোবাতি ডাক্তারকে ডেকে মাকে একবার না দেখালে তো আর চলে না আজ চার দিন—"

পাঁচুর আর সিংহাসনে বসা হইল না। ভগিনীর ডাকে তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরিয়া আসিতে হইল বলিয়া, অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, দাঁত খিঁচাইয়া, মুখ ভেংচাইয়া, চেঁচাইয়া কহিল—"মর্‌চিস্ ক্যানে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্ তো? আ মর্ হতভাগী, পোড়ারমুখী—মরণ নেই? সারাদিন চেঁচামিচি?"

টেঁপী এ প্রকার ভ্রাতৃস্নেহ ও আদরে চিরাভ্যস্ত। কহিল—"মুয়ে আগুন তোর হতভাগা বিটলে! মর্‌চেন্, এই দোপোর বেলায় গাঁ্যাজা টেনে! এদিকে আজ চার দিন ধরে' কি যে হচে, তা জান? গাঁ্যাজায় দম দিয়ে তো বেশ বসে আছ—"

অন্য কোনও মৌতাতী লোক, তাহার প্রিয়তম নেশার নামোল্লেখে এমন অপমানিত বোধ করে না, যেমন গঞ্জিকাভক্ত মহাপুরুষগণ গঞ্জিকার নামে করে। ইহারা কখনও গাঁজাকে নিজে তো গাঁজা বলেই না, অন্য কাহাকেও বলিতে দেয় না। গাঁজাকে গাঁজা বলিলে নাকি গাঁজার ও তাহার ভাবৎ নিখিলবিশ্ব উপাসকবৃন্দের ঘোর অমর্য্যাদা হয়!

পাঁচু ক্ষেপিয়া উঠিল। কহিল—"কি? যত বড় মুখ লয়, তত বড় কথা? বড় ভায়ের সঙ্গে কথা বল্‌তে শিখিস্ নাই? জানিস, জুতিয়ে এখুনি তোর মুখ থেঁতো করে দেব? ভদ্দর নোকের ঘরে মুখ্যু হ'লে এমনিই হয়। ঐ মুখের জন্যেই তো এমনটা হ'ল।"

টেঁপীও দাদার উপযুক্ত বোন্। কহিল——"আমার মুখ যেমনই হোক্ না, তাতে তোর কি-রে ড্যাক্‌রা, খালভরা, গেঁজেল্? আমার মুখের জন্যে তোমার কি ছরাদ্ আটকাল'? মর্, মর্, বাসি মুখে

যেন জল পড়ে না! তুই মর্, ঘাটেপড়া গেঁজেল—আমি ক্যানে মরতে যাব?" বলিয়া মট্ মট্ করিয়া কয়েকটি আঙ্গুল মটকাইয়া লইল।

পাঁচু ঘুঁষি পাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল—"ছ্যাখ্, টেঁপী, বারে বারে "গেঁজেল" "গেঁজেল" করিস না বল্‌চি—ভাল হবে না। আমি তোর বাপের পয়সায় খাই? আমি দশ আঙ্গুলে রোজগার করি, বিশ আঙ্গুলে খাই।"

টেঁপীও কোমরে কাপড় জড়াইয়া সহোদরের সম্মুখে 'যুদ্ধং দেহি'-ভাবে দাঁড়াইয়া কহিল—"ওঃ—কি আমার রোজগেরে পুরুষ রে! ঘুঁষি দেখাচেন্—কর্‌বি কি তুই? মার্‌বি নেকি? বড্ড বা'ড় বেড়েচে—মার্ না, দেখি—তোরই একদিন, কি আমারই একদিন। দে না গায়ে হাত একবার, দেখিয়ে দিচি মজা! আমার হাত নাই? আমিও দোবো আচ্ছা করে ঝেঁটিয়ে গো-বেড়েন দিয়ে—দাদা বলে' খাতির কর্‌ব না।"

পাঁচুর বীররস বাধাপ্রাপ্ত হইল। কহিল—"এখন খাতির কর্‌তে হবে—আর না কর্‌লে চলবে না।"

টেঁপী কহিল—"দায় পড়েচে আমার, তোর খাতির করতে—"

পাঁচু দুই হাতে শূন্যে একটি বৃত্ত আঁকিয়া কহিল—"খাতির না কর্‌লে, রোজ দু' বেলা দু'থালা ক'রে পিণ্ডি জোগাবে কে? হাঁ, চল্‌তো যদি বিয়েটা হত। বিয়েই যখন হ'ল না, তখন আর তোর কিসের খোসামুদী?"

টেঁপীর ক্ষতস্থানে হাত পড়িল। সে সত্যই প্রাণমন দিয়া, কিশোরীর সকল অন্তর দিয়া, এক অজ্ঞাত অনির্ব্বচনীয় আকাঙ্ক্ষায় অসীমকে চাহিয়াছিল। অসীমের রূপে গুণে বা ঐশ্বর্য্যে সে হয়ত ততটা

ক্লিষ্ট হয় নাই, যতটা হইয়াছিল একটা অব্যক্ত দুর্ব্বোধ্য আকুলতায় —এক অপ্রকাশ্য পুলকভরা আত্মোৎসর্গের নিবিড় সুখকামনায় ; তিমির রাত্রির অবসানে আলো-অন্ধকারের বিরহসমাসন্ন বিদায়-পরিরম্ভনে জাগ্রত শান্ত উষায়, শতদলের প্রথম আত্মনিবেদনের প্রেমমৌন বিকাশে। জীবনে টেঁপীর এই প্রথম প্রয়াস, প্রথম আভাস এবং প্রথম নিরাশ-ও। সে নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত। কেন সে এমন ভুল করিল ? কেন সে অসীমকে কামনা করিল ? কামনাই যদি করিল, তবে পাইল না কেন ? অসীম অসীমই রহিয়া গেল ! তাঁহাকে ক্ষুদ্র সীমায় বন্দী করার কল্পনা, বাতুলতা নয় কি ? তবু, তাহার তাসের ঘর যে এমন রূঢ় আঘাতে হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িবে, ইহা সে ইতিপূর্ব্বে কখনও ভাবে নাই বা বুঝেও নাই। না-বুঝিয়াই লোক কষ্ট পায়—সেও তাহার নির্ব্বুদ্ধিতায় দুঃখ পাইল।

টেঁপী নরম হইয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল—"আমার বিয়ে হলে তোমার কি নাভ হত ?"

না হউক, এ আলোচনাতেও সুখ !

পাঁচু উত্তেজিত হইয়া কহিল—"আমার কি নাভ হত ? হেঁঃ, হলে' দেখ্‌তিস্ একবার ! তোর বিয়ে হলে, আমি—ছোটবাবুর বড়-সুমুন্দী—থাকতে, কি আর লায়েবী কর্‌তো, অই কোথাকার-কে ঐ জান্‌কে বুড়ো ? জামকী মল্লিক লয়—বুঝ্‌লি পোড়াকপালি, চৈতনপুর সদর কাছাড়ীর খাস-লায়েব হত, এই পাঁচু শর্ম্মা ! হতভাগী তুই, তোর জন্যেই ত' আমার এত বড় একটা দাঁও ফস্‌কে গেল ! এর চেয়ে তোর মরণই ভাল ছিল।"

বলিতে বলিতে বিরক্তভাবে পাঁচু গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। টেঁপীও মনে মনে অগ্রজের কথারই পুনরাবৃত্তি করিল—সত্যই, ইহা অপেক্ষা আমার মরণই ভাল ছিল !

কোমরের কাপড় অর্থাৎ যোদ্ধবেশ খুলিয়া ফেলিয়া, চোখ মুছিয়া, টেঁপী চুপচাপ নিদ্রিত মাতার পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

গত কয়েকমাস যাবৎ বাড়ীতে ও বাহিরে সকলের মুখেই অসীমের সহিত তাহার বিবাহ নিশ্চিত শুনিয়া শুনিয়া, এই বিষয়টায় সে এতই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল যে, এ-প্রস্তাব অসীম এমন অপমানসহ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, ইহা সে এখনও সঠিক যেন বিশ্বাসই করিতে পারিতেছিল না। এ কথা টেঁপী যতই ভাবে, ততই তাহার মাথা ঘুলাইয়া যায়।

রূপে গুণে বিদ্যায় ঐশ্বর্য্যে সম্মানে অসীমের মত পতিলাভ শতজন্মের তপস্যার ফল, সন্দেহ নাই। তাই দীন-দরিদ্রের ঘরের অশিক্ষিতা অনভিজ্ঞা টেঁপী প্রথমটা এ কথা বিশ্বাসই করে নাই, করিতে সাহসও করে নাই। কিন্তু সারাদিনরাত্রি মাতার ও ভ্রাতাদের জল্পনাকল্পনায় তাহার বিশ্বাসের ভিত্তি ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে গড়িয়া উঠিয়াছে, একদিনে গড়ে নাই। গ্রামের লোকের অপবাদরটনাও তাই টেঁপীর মিষ্ট লাগিয়াছিল। তাহার মাতা ও ভ্রাতারা আপত্তি করিয়াছে, কিন্তু সে একটি দিনের জন্যও ইহার প্রতিবাদ করে নাই; বরং মনে মনে অন্তর্যামীর নিকট আন্তরিক প্রার্থনা জানাইয়াছে—ঠাকুর, এ-অপবাদ যেন সত্যই হয় !

কিন্তু ঠাকুর টেঁপীর এ কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না।

ভাবিতে ভাবিতে টেঁপী ক্রমশঃ পুরুষ জাতির উপরই চটিয়া উঠিল। টেঁপী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যদি কখনও সুযোগ পায়, তাহা হইলে অসীমকে এবং তাহার সহিত সমগ্র পুরুষ জাতিকে এবং বিশেষ করিয়া বড়লোকদিগকে, সে এই অপমানের যথোচিত শিক্ষা দিবে। কেন? গরীব কি মানুষ নয়? ইহাতে যদি নিজের নাক কাটিয়াও উহাদের যাত্রাভঙ্গ করিতে হয়, তাহাও সে করিতে প্রস্তুত।

কেন করিবে না? সে তো উহার শ্রীচরণের দাসী হইতেই চাহিয়াছিল—স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে উন্মুখ হইয়াছিল—কিন্তু উদ্ধত ধনী সে দান পদাঘাত করিয়া প্রত্যাখ্যান করিল! কেন? কিসে সে উহার স্ত্রী হওয়ার অযোগ্য? হাঁ, সে লেখাপড়া তেমন শিখে নাই, তাহার পিতা জজ ছিল না বা মাইনেও হাজার-দু'হাজার পায় নাই। কিন্তু বিবাহ তো পিতা বা পিতার অর্থের বা মর্য্যাদার সঙ্গে নয়, বিবাহ কন্যার সঙ্গে। সে সেই ছবিখানার গতযৌবনা মেয়েটা অপেক্ষা কিসে হীন? রূপে? মনে? স্বামীসেবায়? কর্ত্তব্যে? সতীত্বে? কিসে সে ঐ থুব্‌ড়ো কুশ্রী মেয়েটা অপেক্ষা কম?…এত দম্ভ? এ-অহঙ্কার ভাঙিতেই হইবে!

উহারি জন্য গ্রামের লোক আজ তাহাদের শত্রু। উহারি জন্য তাহার এই দুঃসহ অপবাদ! ইহার পর, আর কি কোথাও তাহার বিবাহ হইবে? সারা-জীবন সে এই কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া, কি করিয়া কাটাইবে? না হয় সে গরীব। গরীবেরও প্রাণ আছে, প্রেম আছে, আশা আছে, কল্পনা আছে। গরীবও স্ত্রী হইতে জানে, গরীবেরও স্বামী

জুটে! অট্টালিকায় না হউক, কুটীরেও গরীবেরা স্বর্গ-সুখের আস্বাদন পায়। গরীবের মেয়েও সুখের সংসার রচনা করিতে পারে। বড়লোকের ঘরে গরীব ঢুকিলে বড়লোকের জাতি নষ্ট হয় না।

টেঁপীর চক্ষু ভরিয়া জল আসিল! কেন, কোন পাপে তাহার জীবন এমন অঙ্কুরেই জ্বলিয়া গেল? তাহার নিষ্পাপ উৎসর্গ-উন্মুখ জীবনকে বিমুখ করিয়া যে এমন ব্যর্থ করিয়া দিল, তাহার উপর কিসের দয়া? কিসের মায়া? টেঁপী আবার প্রতিজ্ঞা করিল,— এ-অপমানের প্রতিশোধ সে লইবেই। যেমন করিয়া হউক, যাহাই থাকুক ভাগ্যে, সে ইহার প্রতিশোধ লইবেই।

নিজের তপ্ত মস্তিষ্কের উগ্র অসম্ভব কল্পনায় সে হাসিয়া ফেলিল। গ্রামের দীনতম এক পরিবারের, সামান্য এক কিশোরী—সে প্রতিশোধ লইবে গ্রামের রাজার উপর!!! তাহার কি শক্তি! একি প্রলাপ সে বকিতেছে? তাহার মাথাও কি খারাপ হইয়া গেল নাকি? টেঁপী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

এ বিবাহ হইলে, সে অবশ্য হাতে স্বর্গ পাইত। তাহার ব্যক্তিগত সৌভাগ্য তো কল্পনার অতীত বটেই—তাহার মা ও ভাইয়েরাও এই বিবাহে নিজ নিজ সুখৈশ্বর্য্যের সন্ধান পাইয়াছিল। তাহার ভ্রাতারাও এতদ্দ্বারা নিজ নিজ ভাগ্যগঠনের এক একটা স্বপ্ন পর্য্যন্ত রচনা করিয়া বসিয়াছিল। এক সঙ্গে সকলের আশাতেই ছাই পড়িল।

আশা অবশ্য কাহারও পূর্ণ হইল না। তবে বিবাহের এই কথাবার্ত্তার মধ্যে তাহার মা-ভাইদের মনের কিছু গোপন কথা এবং তাহার নিজের ভস্মাচ্ছাদিত শক্তি ও সম্ভাবনার ইঙ্গিতটি ধরিতে, টেঁপীর আর বাকি

রহিল না। অর্থ তাহার নাই বটে, কিন্তু তাহার রূপ আছে। ভগবানের দেওয়া এ রূপ কি নিরর্থক? তাহার রূপের মূলধনে তাহার মা-ভাইয়েরা যদি সুখৈশ্বর্য্যের সাম্রাজ্য গঠন করিতে পারে, তাহা হইলে সেই রূপের অধিকারিণী হইয়া, সে কেন নিজের ভাগ্যগঠনে অসমর্থ হইবে? এই রূপের বিনিময়ে, ইচ্ছা করিলে টেঁপী বহু ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করিতে পারে। তাহার ধনে অন্যে ধনী হইবে—আর সে থাকিবে ভিখারিণী? অর্থেরই যদি এত আদর, তখন অর্থার্জ্জনেই সে এখন হইতে মনোনিবেশ করিবে। আজ তাহার অর্থ নাই বলিয়াই অসীম তাহাকে এমন অপমান করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল। সে যদি বড়লোক হইত, তাহা হইলে কি অসীম আজ তাহার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতে সাহস করিত? অর্থ চাই। বাঁচিতে হইলেও অর্থ চাই, সুখে থাকিতে হইলেও অর্থ চাই, প্রতিশোধ লইতে হইলেও অর্থ চাই। বড় ঘরে বিবাহ করিয়া, বড়লোকের বধূ হইয়া, অসীমকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া, সে তাহাকে অপমান করিবে।

টেঁপীর মনে পড়িল, ঘুঁটুকে দাদাকে। ঘুঁটুকে কতবার নিস্তারিণীকে কলিকাতা লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছে! ঘুঁটুকে বলিয়াছে, কলিকাতায় নিস্তারিণীকে সুখে রাখিবে এবং তাহাদিগকে সুপাত্রে অর্পণ করিবে।

ঘুঁটুকে অসীমের উপর চটা। বড়লোক যদি না জুটে, সে ঘুঁটুকেকেই বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিবে এবং স্বামী-স্ত্রী দুইজনে মিলিয়া অসীমকে জব্দ করিবে।

টেঁপী ঘুঁটুকেকে পত্র লিখিবে, স্থির করিল। এ গ্রাম তাহার

আর ভাল লাগিতেছে না, সে কলিকাতা যাইবে। এখানে তাহার যোগ্য পাত্রই বা কোথা? কলিকাতা রাজধানী: চাই কি, সেখানে সে হয়ত কোনও রাজপুত্রেরও অঙ্কলক্ষ্মী হইতে পারে!

নিস্তারিণী উঠিয়া বসিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন—"টেঁপী, বড় তেষ্টা নেগেছে, এক গেলাস জল দেতো মা!"

চিন্তামগ্ন টেঁপী চমকিয়া উঠিল। তড়াক করিয়া উঠিয়া, মাতার নিকট গিয়া, তাহার কপাল স্পর্শ করিয়া কহিল—"জ্বর ছেড়েচে যেন মনে হচে, মা—"

নিস্তারিণী কহিলেন—"মনে তো হচে। তুই ভাবছিলিস্ তাই বুঝি? আহা, মায়ের আমার সোনার বর্ণ এই ক'দিন ভেবে ভেবে একেবারে কালিঢালা হয়ে উঠেচে—"

টেঁপী চারিখানি বাতাসা ও এক গেলাস জল আনিয়া দিয়া কহিল,— "মা, ঘুঁটেকে দাদাকে নিকে দিই, আমরা কলকাতাতেই যাব। সে এসে আমাদিকে যত শীগ্গিরি পারে নিয়ে যাক্—কেমন?"

নিস্তারিণী কহিলেন—"ভেবে দেখি বাছা, তাড়াতাড়ি করিসনে, যে পোড়া অদেষ্ট! পোড়া শোলই যখন হাত ফস্কে পালায়, তখন আর কিছু বিশ্বাস করতে লারচি।"

টেঁপী কহিল—"তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা, আমি নিকে দিচি। ঘুঁটেকে দাদা তো তোমায় পই পই করে বলে গিয়েছে যে, সে তোমারি আর একটি ছেলে! তোমার সেবা যত্ন আদর হলেই আমি খুশী—"

নিস্তারিণী কহিলেন—"দেশ-ভুঁই বাড়ী-ঘর ফেলে—"

বাধা দিয়া টে'পী কহিল—"দাদারা তো থাকল বাড়ীতে, তারাই বাড়ী ঘর দেখ্‌বে। এ ছাড়া দেশে আর কি আছে আমাদের, মা—যে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে? জমিদারী থাকে, তেজারতী থাকে, চাষ-বাস, মান-সম্ভ্রম যাদের থাকে, তারা থাকতে চায় গাঁয়ে। গাঁয়ে আমাদের সে-সব কোনো বালাইও নাই, কোনও পেছ্‌টানও নেই। আমাদের ঝাড়া হাত-পা, হুট্‌ করলেই উঠ্‌তে পারি।"

নিস্তারিণী চিন্তিতভাবে কহিলেন—"কিন্তু সেখানে গিয়েই বা কি স্বর্গ হাতে পাব?"

টে'পীর মুখ খুলিয়া গিয়াছে। সলজ্জভাবে কহিল—"স্বর্গ না পাই সোয়াস্তি পাব, মা। নোকের এমন কথা শুন্‌তে হবে না। ক্ষেন্তী বুঁচী তবু এক একটা ভাল ঘর-বরে পড়্‌বে ত? দেশে তো আমাদের এই দুর্নাম—আমার জন্যে ওদের পরকাল ক্যানে নষ্ট হয়?"

নিস্তারিণী ম্লান হাস্যের সহিত প্রসন্ন মুখে কহিলেন—"বুঝিচি মা, বুঝিচি! বুঝ্‌বার বয়েস তো তোর হয়েছে—তা' বেশ। আমার আর কোন আপত্তি নেই, ঘুঁটুকে ছেলে বেশ ভালই। ছিনেমার অ্যাক্টোর, দেড়শো টাকা মাইনে পায়, কেউ তার নাই, ভালই হবে। গরীবের কাজকর্ম্ম গরীবের সঙ্গেই করতে হয়, মা! সেই ভাল—"

লজ্জায় টে'পীর কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। লজ্জাজড়িত কণ্ঠে কহিল—"যাও মা, তুমি বড্ড ইয়ে—আমি তাই বলচি নেকি? যাও—"

বলিতে বলিতে টে'পী ছুটিয়া বাহিরে পলাইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

রয়্যাল ফিল্মস্ কোম্পানির স্বত্বাধিকারী সুবোধ রায় মহাশয় থিয়েটার ও ফিলিম জগতে একজন বিশেষ সুপরিচিত ব্যক্তি। নিবাস ঢাকায় হইলেও, তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতাতেই।

প্রথম জীবনে সুবোধ কর্পোরেশনে কর্ম্ম না-করিয়া মাসের পর মাস বেতন লইত এবং প্রকৃত কর্ম্ম করিত শেয়ার-মার্কেটে। ক্রমশ এ ব্যাপারের সহিত কিছু টাকাকড়ির গোলমাল, দুই-একজন শিক্ষয়িত্রী-সংশ্লিষ্ট জনরব এবং খানপঞ্চাশেক বেনামী চিঠি প্রভৃতি একসঙ্গে মিলিত হইয়া, এমন একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটাইল যে, সুবোধের কর্পোরেশনের চাকরীটি একদিন গেল।

চাকরী গেলে বাঙালী সব ক্ষেত্রে একবারে অন্ধকার না দেখিলেও সর্ষপ-কুসুম অবলোকন করেই, কিন্তু সুবোধ তাহার কিছুই করিল না। বরং সুবোধের দিব্য দৃষ্টি লাভ হইল। সে দেখিল, কলিকাতার অলিতে গলিতে, পথে-ঘাটে—সর্ব্বত্র অপর্য্যাপ্ত অর্থ ছড়াইয়া আছে, কেবল কুড়াইয়া পকেটে পূরিতে পারিলেই হয়!

কিছুদিন পূর্ব্বে সুবোধের স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে—দুইটিই ছোট। সুবোধ তাহাদিগকে তাহাদের মাতুলালয় বিক্রমপুরে রাখিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত এবং অনেকটা নির্ঝঞ্ঝা হইয়া, স্থির ভাবে চতুর্দ্দিকে ভাল করিয়া নজর দিতে সময় ও সুযোগ পাইল। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ সে আর করিল না, কারণ তাহা

প্রয়োজন হইল না। সকল দিক বিবেচনা করিয়া, সুবোধ অনুভব করিল যে, প্রথমবারকার বিবাহ করাটাই তাহার হইয়াছিল বিশেষ অন্যায়। অবশ্য, সে কুকার্য্য কলিকাতা আসিবার বহু পূর্ব্বেই সে করিয়াছিল, সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে এবং নিতান্ত অনভিজ্ঞতাবশতই। তাহার জন্য এখন আর অনুতাপ করিয়া কি ফল? সুবোধ মানিতে বাধ্য হইল যে, ভগবান যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই।

এদিক-ওদিক এটা-সেটা বহু-কিছু সে করিল, কিন্তু তাহাতে যাহা উপায় হয়, তাহাতে সুবোধের মন উঠে না। সে চায় বহু, অনন্ত এবং তাড়াতাড়ি।

অনেক গবেষণা করিয়া, সে রাতারাতি কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিল। প্রথম হইল—প্যারাডাইস রেষ্টুরেণ্ট। দ্বিগুণ দামে পচা মাছ ও বাসি মাংসের বড় বড় গালভরা নামের বহু অখাদ্য ও পানীয় সাজাইয়া, সাইনবোর্ড ঝুলাইল—একমাত্র বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক খাদ্য-প্রতিষ্ঠান। এখানে ভিটা-কাটলেট, মণ্টেড্-চপ, কোফ্তা-দি-তুম্বা, মাটনউইচ (Mutton-Witch) অর্থাৎ মাংসসিদ্ধ, বাদসাহী-কোর্ম্মা, চিন্তাপাণ্ডু-চাট্নি অর্থাৎ তেঁতুলগোলা জল, ভীমসেনী-পরোটা, জলন্ধরী-ফুল্কা, এণ্টি-টি-বি চাপাটি, ডিমের মর্ম্মর-স্বপ্ন অর্থাৎ টুক্‌রা-করা ডিম-ভাজা, মাছের সাগরিকা অর্থাৎ মাছের ঝোল, মীনকেতন অর্থাৎ মাছ-ভাজা, মৎস্যগন্ধা অর্থাৎ মাছ সিদ্ধ, আলুর চন্দ্রিকা অর্থাৎ আলুসিদ্ধ করিয়া ভাজা, রামায়নী-সরবৎ, বেগমবাহার ঘোল, এণ্টি-ম্যালেরিয়া আইস ক্রীম সাহারাই-ডাব প্রভৃতি। ইস্কুল-কলেজের ছেলেরা এবং সৌখীন সম্প্রদায়ের ভীষণ ভীড় জমিল প্যারাডাইস্ রেষ্টুরেণ্টে।

বড় রাস্তার উপরে দোকান—দোকানের উপরে আবার—প্যারাডাইস্ ক্লাব। ক্লাবে তাস দাবা পিংপং প্রভৃতি খেলা ছাড়া, গোপনে মদ্যপানেরও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। মাঝে মাঝে কটা চামড়ার দুই-একটি নারী আসিয়া, মহিলার অভাব মোচন করিতে লাগিল। ক্লাব হুহু করিয়া জমিয়া উঠিল। অবিলম্বে ক্লাবে ছোকরা মেম্বারের সংখ্যা এমন বাড়িয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নীচের রেষ্টুরেণ্টের বিক্রয়ও এত বৃদ্ধি পাইল যে, ইহার উপর পুলিশের নজর পড়িল। ইত্যবসরে সুবোধ এই অল্প দিনেই বেশ কিছু উপায় করিয়া লইয়া, পুলিশের পদধূলি পড়িবার আগেই ক্লাব ও রেষ্টুরেণ্ট দুই-ই উঠাইয়া দিল।

সুবোধ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার লোক নহে। সে দিব্যদৃষ্টি-প্রভাবে দেখিল, বর্ত্তমান কালে কি-ধনী কি-গরীব সকল ঘরেই এখন নাচের নেশা অত্যন্ত প্রবল। নাচিবে যখন অন্যে, এবং সে না নাচাইলে, হয়ত অন্য কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাদিগকে নাচাইবে, তখন সে-ই কেন এই ব্যবসাটি হাতে করিবে না? প্যারাডাইস্ ক্লাবেই না হয় পুলিশের নজর পড়ে, কিন্তু নাচ-গানের ইস্কুল করিলে তো সে-ভয় নাই। তাহার সাপ মরিবে অথচ লাঠি ভাঙিবে না। অতএব সুবোধ প্যারাডাইস ওরিয়েণ্ট্যাল ডান্স সোসাইটি খুলিল।

নেশা লোকের বেশী ক্ষণ থাকে না। সময় থাকিতে ইহাদিগকে নাচাইয়া, দু'পয়সা রোজগার করিতে হইবে! প্রত্যেক বাপ-মাই জানে, বাঙালী পরিবারে মেয়েরা নাচে, যতদিন তাহাদের বিবাহ না হয়। বিবাহান্তে অবশ্য তাহারা নাচে না, নাচায়। তবু নাচের

এখন যখন এমন নেশা, তখন এই সময়ে এটি হস্তগত না করিলে, পরে নিশ্চয়ই পস্তাইতে হইবে।

সোসাইটির 'মটো' হইল—

ঘরের নাচঃ জরের নাচঃ
ঝড়ের নাচৈব কেবলম্।
কলৌ নাচ্‌তে র' নাচ্‌তে র'
নাচ্‌তে র'—গতিরন্যথা॥

বড় বড় হরফে, স্পষ্ট করিয়া লেখা, কাগজের বোডে উক্ত শাস্ত্রবাক্যটি সোসাইটির দেওয়ালে দেওয়ালে আঁটিয়া দেওয়া হইল।

কলিকাতা সত্যই মহানগরী : গঞ্জিকার ন্যায়, ইহা যোগীর ও ভোগীরই একমাত্র বাসযোগ্য। সোসাইটিতে স্থানীয় ও অস্থানীয় বহু যোগী ও যোগিনীর একত্র সমাবেশ ঘটিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না বা সুবোধকেও নৃত্যশিল্পী জোগাড় করিতে তেমন বেগ পাইতে হইল না। এই মহামেলায় প্রত্যহ যে কত যোগী হইতেছে ভোগী, আর ভোগী হইয়া পড়িতেছে যোগী—কে তাহার হিসাব রাখে?

শহরে একটি সম্প্রদায় আছে, যাহারা লোকচক্ষে—শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত এবং বিশেষ মর্য্যাদাসম্পন্ন। ইহারা দেহে ও মনে পশ্চিমের সবটুকু দোষ ও বিষ সানন্দে আত্মস্থ করিয়া লইয়া, সভ্য-ভব্য মান্য-গণ্য এবং আধুনিক হইয়া বিরাজ করে। ইহারা নিজেদের অনূঢ়া বয়স্থা মেয়েদিগকে পূর্ণ-স্বাধীনতা দিয়া, শিক্ষা ও সভ্যতার চূড়ান্ত আদর্শ স্থাপন করিয়া কৃতার্থ। ইহাদের ঘরের কয়েকটি মেয়ে প্যারাডাইস ওরিয়েণ্ট্যাল ডান্স সোসাইটিতে ভর্ত্তি হইল।

অমুক অমুক বাড়ীর মেয়েরা এই সোসাইটির ছাত্রী শুনিয়া, শহরের বিশিষ্ট সমাজে পরিচিত হইতে এবং সেই দশজনের মধ্যে একজন হইবার দুর্নিবার দুরাকাঙ্ক্ষায়, বহু বহিরাগত গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়েরাও দলে দলে আসিয়া জুটিতে লাগিল। এ আর-এক দল, যাহারা বড়লোকের গা-ঘেঁষিয়া চলিয়া, দাঁড়াইয়া, বসিয়া, নিজকে অতীব সম্মানিত ও গর্ব্বিত মনে করে।

ইহাদের নৃত্যানুরাগ ক্রমশ যতই সংক্রামক হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই বাজারের নর্ত্তকীরাও নাম ধাম বদলাইয়া, নূতন এক লেবেল মারিয়া, নির্দ্দিষ্ট পল্লী ছাড়িয়া, অনির্দ্দিষ্ট বড় রাস্তার উপর ভদ্র-মহল্লায় আসিয়া, ভদ্রনারী সাজিয়া, বাসা বাঁধিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে সুবোধের সোসাইটিতে বহু দেবী, রায়, গুপ্তা, মুখার্জ্জী, ঘোষ, ব্যানার্জ্জী, চ্যাটার্জ্জী, হালদার, সোম, মিত্র, দে, বসু, দাসগুপ্তা, দাস, সেন আসিয়া সমবেত হইল। কে কি বা কোথাকার—এ খবর লইবার আর কাহারও ইচ্ছা বা উপায় পর্য্যন্ত রহিল না। কলিকাতার বাড়ীওয়ালারাও এই মর্ম্মে সেই জন্য ফ্ল্যাটওয়ালা বাড়ী তৈরী করিতেই সমধিক মনোনিবেশ করিলেন।

একদা নর্ত্তকী বলিতে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্তা নারীদিগকেই বুঝাইত। এখন গণতন্ত্র সভ্যতা ও কলার আদর এবং রস ও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সাধারণ নর্ত্তকীর আসরে লোকের আর তেমন আকর্ষণ নাই। সকলেই ভদ্রমহিলার নৃত্য ও অভিনয় দেখিবার জন্য ক্ষিপ্তপ্রায়। বাজারে ভদ্রমহিলার চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায়, ভদ্রমহিলারও অভাব হইল না: বহু ঝিঞা বাজারে

পটল নামে চলিতে লাগিল ঃ বহু ফিঞ্জা ময়নার নামে বিকাইতে লাগিল। নৃত্যের আসর একমাত্র পদবীধারিণীদেরই একচেটিয়া হইয়া উঠিল।

সুবোধও তাহার সোসাইটি গঠন করিল ভদ্রনারীদ্বারা! ভদ্রনারীর নৃত্যে অর্থাৎ অর্থহীন অঙ্গসঞ্চালনেই এখন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দর্শকের ভীড়। সুবোধ অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বজনীন্ এই প্যারাডাইস ওরিয়েণ্ট্যাল ডান্স সোসাইটি হইতে আশাতীতরূপ রোজগার করিতে লাগিল। ইহার তুলনায় প্যারাডাইস্ রেষ্টুরেণ্ট বা প্যারাডাইস্ ক্লাবের আয় নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়াই বিবেচিত হইল।

অসীম এই সময় ভবানীপুরে একটি ছোট স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাকিয়া পড়িত। ভূষণ ছিল তাহার খানশামা সেক্রেটারী এবং ট্রেজারার। অসীমের বাসার সম্মুখেই একটি ত্রিতল ফ্ল্যাটওয়ালা-বাড়ীতে, বিজলী দেবী আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিল। নূতন বাসায় আসিয়াই বিজলীর সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি পড়িল রাস্তার ওপারের বাড়ীর অসীমের উপর।

বিজলীদেবী তখন তাঁহার যশের শীর্ষে। শহরে গায়িকা নর্ত্তকী ও অভিনেত্রী বলিতে একমাত্র বিজলীকেই বুঝাইত। বিজলী তখন একেবারে "মাঘ"—"মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ" ঃ বিজলী একাধারে শিক্ষিতা, ভদ্রনারী এবং এমেচারও। অবশ্য, এমেচার নামে বিজ্ঞাপিত ও পরিচিত হইলেও, উচ্চতর হারে পারিশ্রমিক না লইয়া তিনি কখনও কোনও আসরে অবতীর্ণা হইতেন না। এ-কথা সকলেই জানিত, তবু তাঁহার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী ভক্তগণ তাঁহাকে এমেচার-রূপে প্রচারিত করিয়া, দেবীকে

যতখানি সন্তুষ্ট করিত, তাহার শতগুণ বেশী আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত নিজেরাই।

বিজলীদেবীর রঙ্গাবতরণে ঘন ঘন কর্ণপটাহবিদারক করতালিতেই তাঁহার জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যাইত। কলিকাতার তথাকথিত শিক্ষিত ও ফৈরঙ্গ-বাঙালী ও অবাঙালী সমাজে বিজলীদেবীর স্থান ছিল আফিসের বড়-সাহেবেরও বহু উপরে—যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে আফিসের বড়সাহেবই ইঁহাদের একমাত্র ইষ্টদেবতা। কুল বা দেবতা ইহাদের কিছুই না থাকায়, কুলদেবতার কোনও প্রতিপত্তি বা বালাই এ-সমাজের নাই। বিজলীদেবীর মঞ্চাবতরণে তাই হাউস্-ফুল্ অনিবার্য্য!

স্বাস্থ্যবান্, সুদর্শন, তরুণ অসীমকে দেখিবামাত্রই বিজলীর দৃষ্টি যে একটু ঘোলাটে হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নাই। কিন্তু তাহার মৃত্যুবাণের সন্ধান দিবে কে? বিজলী ভূষণের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া, আস্তে আস্তে সমস্ত অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া ফেলিল! বিজলী যখন ক্রমশ জানিতে পারিল যে, অসীম জমিদার এবং সে-জমিদারীর মালিক সে নিজেই, তখন সে ভূষণের সাহায্যে উক্ত হাতীটি ধরিতে দস্তুরমত খেদা আরম্ভ করিল। খেদায় হাতী ধরা গেল না বটে, তবে ভূষণকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া অসীম গৃহ হইতে খেদাইল! বিজলী ভূষণকে বাহাল করিয়া, মীরজাফরের মুখরক্ষা করিল।

অসীমকে প্রকারান্তরে বিজলী জানাইয়া দিল যে, সে তাহার অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয় এবং অসীমের প্রতি তাহার কোনও আকর্ষণ নাই; কিন্তু মনে মনে, অসীমের আশা সে একেবারে ছাড়িল না।

বিজলী বুদ্ধিমতী : সে জানে—রমণী যেমন এক কথাতেই গৃহত্যাগিনী হয় না, পুরুষও তেমনি এত সামান্যেই ধরা দেয় না। এ-সব কার্য্য গভীর অধ্যবসায় ও রীতিমত সময়-সাপেক্ষ।

আজ না হয়. হইবে কাল। গুণ গুণ করিয়া মীরাবাঈয়ের একটা ভজন গাহিল—

—হরিসে ল্যাগি রহ'রে ভাই,
তেরা বনত বনত বনি যাই।

শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য বিজলীর বনিল না, কিন্তু ভূষণের বেশ বনিয়া গেল।

দিন পনের'র মধ্যেই, ভূষণ সেবায় শুশ্রূষায় আনুগত্যে এবং কর্ম্মতৎপরতায় বিজলীকে বেশ বশ করিয়া লইল। বিজলীকে ভূষণ দিদি বলিয়া ডাকিয়া, তাহার নারীর অন্তরের অবরুদ্ধ একটি দুয়ারে কঠিন আঘাত করিল। বিজলী সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না।

বিজলীর পশার-প্রতিপত্তিতে ক্রমশ যেন ভাঁটা আরম্ভ হইল। বহু নৃত্য-প্রতিষ্ঠান ও সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতায় বিজলী দেবী ধীরে ধীরে হঠিয়া যাইতে লাগিল। আর তাহার বিশেষ ডাক পড়ে না, কাজেই আয়ের দিক্ দিন দিন কমিতে লাগিল। ফ্ল্যাটভাড়া, চাকর, ঠাকুর, তাহাদের বেতন, টেলিফোন্, ইলেক্‌ট্রিক্, বাড়ীর বাহির হইলেই ট্যাক্সি, সংসারখরচ, শাড়ী ব্লাউস, প্রসাধন প্রভৃতির ব্যয়নির্ব্বাহের অবস্থা যখন ক্রমশঃ দিন দিন শঙ্কাজনক হইয়া উঠিতেছিল, ঠিক সেই সময় ভাগ্যদেবতা বিজলীকে উপঢৌকন দিলেন সুবোধচন্দ্রকে। সুবোধ বহুদিন হইতেই

বিজলীর নাম শুনিয়া ও তাহার নৃত্যগীতাদিতে মোহিত হইয়া, বিজলীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াই ছিল, কাজেই আত্মসমর্পন করিতে তাহার কালবিলম্ব হইল না। সুবোধের প্রথম প্রস্তাবই হইল—শীঘ্রই সে বিজলীকে আইনত বিবাহ করিবে।

বিজলী খুসি হইল। ভাবিল—ভূষণের শুধু গুণই নাই, পয়ও আছে। ভূষণের আদর ও কদর আরও বাড়িয়া গেল। অসীমকে দুর্লভ জানিয়া, আর ও-পণ্ডশ্রমে বিজলী মাথা ঘামাইল না। মাড়োয়ারীর মত ঝুনা ব্যবসায়ী বিজলী অসীমকে পাইলে অবশ্য খুবই খুসি হইত, কিন্তু তাহাকে পাইল না বলিয়া যে সে মনের দুঃখে লেকের জলে ডুবিয়া মরিতে যাইবে, এমন মেয়েও সে নয়। সে সুবোধকেই অসীম করিয়া লইবে! সে শক্তি ও আত্মবিশ্বাস তাহার আছে। সে তাহার আত্মজীবনচরিতের গোড়াকার কয়েকটি পৃষ্ঠা স্মরণ করিয়া, সুবোধকে পাইয়া কৃতার্থ ই হইল। আর্থিক অবস্থা এবং যৌবন ক্রমশ মরিয়া আসিতেছে দেখিয়া, তাঁতীর মত সে অতি-লোভী হইল না। সাংসারিক লোক তো? সে জানে, দৈনিক মুদীর দোকান হইতে জিনিষ আনা অপেক্ষা, মাস-কাবারী বাজার আনা ঢের ভাল। বিজলী সুবোধকে সাদর স্বাগত জানাইল।

সুবোধের হাতেও তখন বেশ কিছু কাঁচা পয়সা ছিল। দিন কয়েক বিজলীকে নাচাইয়া কিছু রোজগার করিতে করিতে, সুবোধ বুঝিল, নাচের বাজারে এত নাচিয়ে জুটিয়াছে যে, তত দর্শক নাই। পরের মেয়ে নাচাইয়া কাপ্তেনী হয়ত চলে, কিন্তু পয়সা

রোজগার হয় না। অথচ কাপ্তেনী কায়েম রাখিতে হইলে, পয়সার বিশেষ প্রয়োজন।

সুবোধ প্যারাডাইস্ ওরিয়েণ্ট্যাল ডান্স সোসাইটি তুলিয়া দিল। বাংলা দেশের এবং নৃত্যশিল্পের তদ্বারা যে কি পরিমাণ ক্ষতি হইল, তাহার সঠিক সংবাদ কেহ অবগত নয়, তবে এক বাড়ীওয়ালার যে এ ব্যাপারে প্রায় হাজার টাকা বাড়ীভাড়া বাবদ ক্ষতি হইয়াছিল এবং সে অর্থ যে সে অদ্যাপি পায় নাই, তাহার ইতিহাস সহজেই মিলে, কিন্তু টাকা মিলিবে না। কারণ, এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের বহু পূর্ব্বেই সুবোধচন্দ্র দেউলিয়া-আদালতের তিলককণ্ঠী ধারণ করিয়াছিল।

সুবোধ এবার আর এক নূতন ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিল। বিজলীর মত নৃত্য-গীত-অভিনয়পটীয়সী শিক্ষিতা তরুণী যখন তাহার হাতে, তখন সে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবেই, সে জানে—এবং করিলও। জনৈক সুবর্ণবণিক ধনী বন্ধুর অর্থে সুবোধ এক থিয়েটার খুলিল: বিজলী থিয়েটার।

অল্পদিনের মধ্যেই বিজলী থিয়েটার শহরের শ্রেষ্ঠ থিয়েটাররূপে পরিগণিত হইল। বিনোদিনী, কমলাবালা, ফুলকুমারী, শ্যামাসুন্দরী, দুর্গাবালা প্রভৃতি প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী এবং রাজাবাবু, ফটিক শীল, ঁখেণ্ড সেন, তারক রায়, যতীন পাল, কুঞ্জ হালদার প্রভৃতি যুগপ্রবর্ত্তক অভিনেতা হইতে আরম্ভ করিয়া, বহু রামা-শ্যামা এই বিজলী থিয়েটারেই আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং অদ্যাপি তাহারা সেই ভূতপূর্ব্ব বিজলী থিয়েটারেরই নাম ভাঙাইয়া খায়।

অথচ এ-হেন থিয়েটার মাত্র দুই বৎসরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। উচ্চ বেতনে সুবোধবাবু ছিলেন ম্যানেজার এবং বিজলী ছিল ইহার প্রধানা অভিনেত্রী। সুবোধবাবু বলেন, তাঁহার বণিক-বন্ধুর অহেতুক সন্দেহে এবং হাইকোর্টের অবিচারেই নাকি থিয়েটারটি উঠিয়া গেল। সুবোধবাবুর বন্ধু অবশ্য এখন পথের ভিখারী। পাওনাদার ও কর্ম্মীরা তাহাদের প্রাপ্য আদায়ের জন্য অনেক চেষ্টাই করিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই হইল না। সে সবের ফিরিস্তি দেওয়া অবশ্য বৃহৎছাগলাদ্য ঘৃত তৈরির মতই সুকঠিন।

বিজ্‌লী থিয়েটার যেমনি উঠিল, অমনি তাহার সদ্যনির্ব্বাপিত চিতাভস্মের উপর রয়্যাল ফিল্মসের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। বিজলী থিয়েটারের একটি গণেশ উল্টাইয়া, রয়্যাল ফিল্মসে সুবোধ ডবল গণেশ স্থাপনা করিল: একটি শুঁড়ওয়ালা, সেটি রহিল আফিসের তাকে—দিনান্তে উড়িয়া ব্রাহ্মণের ছুঁড়িয়া-দেওয়া একটা ফুলে সন্তুষ্ট হইয়া; আর শুঁড়হীন দ্বিতীয় গণেশটি থাকে—আম্‌ড়াতলার গদীতে টাকার থলে ও ব্যাঙ্কের চেক্ বই লইয়া গোপনে। সুবোধ মোটা বেতনে জেনারেল ম্যানেজাররূপে মোহড়া লইল। শুঁড়হীন গণেশের পরিচয়—সুবিখ্যাত টুটামল ঝুটামল ফার্ম্মের একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শেঠ রায় বাহাদুর গণেশীলাল বিলাসপুরিয়া নামক লক্ষপতি এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। শেঠজী অর্থে এবং পতিত্বে সত্য সত্যই একজন লক্ষপতি ব্যক্তি।

শেঠজী ফিলিমের ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করিতে নারাজ, তবে অর্থ যাহা লাগিবে তাহা তিনি সমস্তই দিবেন, এই বন্দোবস্ত। প্রকাশ্যে

ফিলিম ব্যবসা করিলে, তাঁহার ষ্টক এক্সচেঞ্জে এবং পাটের বাজারে নাকি বেইজ্জতী হওয়ার সম্ভাবনা। সুবোধ শেঠজীর ইজ্জৎ রক্ষা করিতে প্রাণপণ করিল। লোকে অবাক্ হইল, হঠাৎ এত টাকা সুবোধ রায় কোথায় পাইল ?

সুবোধের পূর্ব্বতন এবং বিশেষ করিয়া বিজলী-থিয়েটারের পাওনাদারেরা কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাহারা দিবারাত্র সুবোধের মারণমন্ত্র জপ করিতেছিল, তাহারা যুগপৎ সুবোধের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করিল। যে-সব কাগজওয়ালা বিজ্ঞাপনের টাকা অনাদায়ের জন্য সুবোধের নিন্দায় মুখর হইয়া উঠিয়াছিল, আস্তে আস্তে তাহারাও তাল-ফেরতা ধরিল। তার পর যেমন সব চিৎকার নীরব হয়, সুবোধ-সম্বন্ধীয় অপ্রিয় কথাগুলিও তেমনি আস্তে আস্তে একদিন বিস্মৃতির চোরাবালিতে হারাইয়া গেল। নিন্দার পঞ্চমুখ, প্রশংসায় শতমুখী হইয়া উঠিল।

চৈতন্পুরের ভূষণ গাঙ্গুলী এই রয়্যাল ফিল্মসের এক জন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী। সকলেই জানে, কোম্পানির স্বত্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত সুবোধ রায়। ভূষণ গৃহে রায় মহাশয়ের একজন অপরিত্যজ্য নিকট-আত্মীয় এবং অপরিহার্য্য এক আসবাব। আর ইহাও সবাই জানে যে, ভূষণ স্বনামধন্যা বিজলী দেবীর ভাই। বিজলী দেবী ভূষণের শুধু পরিচয়ই নয়, একমাত্র ভরসা এবং গর্ব্বও।

দশম পরিচ্ছেদ

রয়্যাল ফিলিমের দুই বৎসর বয়সে, মাত্র তিনখানি বাংলা ছবি তোলা হইয়াছে। ইহাদের নিজেদের ছবি তোলা এখন বন্ধ বলিয়া, দুইটি মাদ্রাজী কোম্পানি ষ্টুডিওটি ভাড়া লইয়া দুইখানি মাদ্রাজী ছবি তুলিতেছে।

ষ্টুডিওর নিজস্ব কার্য্য বন্ধ বলিয়াই, বহুদিন পরে ভূষণও এই সুযোগে একবার দেশে গিয়াছিল। মাঘ মাসে ভূষণ কলিকাতায় ফিরিতেই, সুবোধ হঠাৎ এক টেলিগ্রাম পাইয়া বাড়ী গিয়াছে, এখনও ফিরে নাই—কোনও খবরও দেয় নাই, সকলেই সে জন্য বিশেষ চিন্তিত। ষ্টুডিও চালাইতেছে, গণেশীলালের একজন বাঙালী কর্ম্মচারী।

গণেশীলাল ভাবিতেছেঃ সুবোধ না ফিরিলে এতগুলি টাকাই তাহার বরবাদ যাইবে। বিজলী চিন্তিতঃ কেন না, সুবোধ না ফিরিলে সে আবার অনাথ হইবে। ভূষণের আশা ভরসা সব সুবোধের উপরঃ সে না ফিরিলে, এতদিন সে যত কার্য্য অকার্য্য ও কুকার্য্য করিল, সমস্তই ব্যর্থ হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ষ্টুডিওতে ভূষণ একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী। তাহার কাজ প্রতিদিন মেয়েদিগকে বাসে করিয়া ষ্টুডিওতে আনা এবং কাজ শেষ হইলে, আবার বাড়ী-বাড়ী সকলকে পৌঁছাইয়া দেওয়া। ভূষণের ধারণা, ঈদৃশ গুরুতর এবং অসাধারণ কার্য্যের ভার, বিশেষ

অনুগ্রহ করিয়া, বিশ্বাসী বলিয়া, তাহাকেই দেওয়া হইয়াছে। এমন দায়িত্বপূর্ণ কাজ কি যার-তার উপর দেওয়া যায় ?

বেতন মাসিক ত্রিশ টাকা হইলে কি হয়, কিছু উপরি পাওনাও আছে। দিন-চুক্তি বা মাস-মাহিনার মেয়েদিগকে তাহাদের প্রাপ্য টাকার ভাউচারে সই ও সনাক্ত করিয়া, টাকায়-এক-আনা হিসাবে ভূষণ কিছু পায়: আলু পটলের দোকানে বা মেছুনীর নিকট মেস-বোর্ডিং-এর ঝি-চাকরেরা যেমন একটা দস্তুরী দাবী করে, কিম্বা গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের নিকট রাস্তার জমাদারসাহেব (!) পান খাইতে যেমন কিছু না আদায় করিয়া, ছাড়ে না।

ফিলিমের দ্বারা দেশে যেমন বহু অঘটন ঘটিয়াছে, তেমনি এই মেয়ে-জোগাড় করা আড়কাটিরও ফিলিম-সংজ্ঞা হইয়াছে—এসিষ্ট্যাণ্ট প্রোডাক্‌শান্ ম্যানেজার অর্থাৎ সহকারী ব্যবস্থাপক। ভূষণ রয়্যাল ফিল্মসের সহকারী ব্যবস্থাপক!

বিজলী দেবীর আত্মীয় এবং সুবোধবাবুর প্রিয় পাত্র হিসাবে ষ্টুডিওতে ভূষণের খাতিরও যথেষ্ট। রয়্যাল ফিল্মসের ছবির সহকারী ব্যবস্থাপক বলিয়া ভূষণের নাম ছাপা হয়, তাহার একটা মোহ আছে; শহর ও মফঃস্বলের বহু কাগজে উক্ত বিশেষণে তাহার নাম প্রকাশিত হয় এবং কেহ কেহ ভূষণকে "নটহস্তী"ও বলে —তাহারও একটা আকর্ষণ আছে; এবং মাঝে মাঝে ছবিতে—গণে একজন, মৃত সৈনিক, জনৈক লোক, নীরব ভৃত্য, মূক বেয়ারা, বয় প্রভৃতি বিশিষ্ট ভূমিকায় নির্ব্বাক অভিনয়

করিয়া, একদিন বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রাভিনেতা হইবার উচ্চাশাও সে রাখে। কাজেই ফিলিমের সংস্রব ভূষণ সহজে ছাড়িতে পারে না— ছাড়াইলেও নয়, তাড়াইলেও নয়।

ভূষণের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে: সে এক অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রাম্য জমিদার অসীমের খান্‌শামা বা রাঁধুনী হইতে জন্মে নাই! সে একদিন যশস্বী হইবে, ধনী হইবে, দশজনের মধ্যে একজন হইয়া বুক ফুলাইয়া চলিবে, কলিকাতা শহরে মোটার চালাইবে। এমন কি, সত্য-সত্যই "নটহস্তী" হইয়া, বাণীর কমলবন তচ্‌নচ্‌ করিয়া দিয়া, গিরিশ ঘোষ অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী প্রভৃতির যশকে পরিম্লান করিয়া দিবার দুরাকাঙ্ক্ষাও তাহার প্রবল। অতএব এখন তাহাকে সবই করিতে হইবে, মান-অপমান ভাবিতে গেলে চলিবে না। এখন তাহার কিসের মান? তাহাকে চিনে কে? কাজেই সুবোধের বিলম্বে সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। হতাশ হইয়া, সুবোধের নির্ব্বিঘ্ন প্রত্যাবর্ত্তন এবং দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া, মা কালীর নিকট সে একেবারে যোল-আনার পূজা পর্য্যন্ত মানসিক করিয়া ফেলিল!

ভূষণ জ্ঞানী লোক। সে নিজেকে জানে: তাহার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় যে কতদূর, তাহাও সে অজ্ঞাত নয়। এই জন্য সে বিজলী দেবী ও সুবোধবাবুর এত প্রিয়পাত্র। সর্ব্বদাই ইঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, এখানে সে তাহার নিজের আসন বেশ কাঁয়েমী করিয়াই রাখিয়াছে। সে খুব ভাল করিয়াই জানে যে, ইঁহাদের আশ্রয়চ্যুত হইলে, তাহার জীবন হইবে বৃক্ষবিচ্যুত শুষ্ক পত্রের মত সম্পূর্ণ ব্যর্থ, দুর্ব্বিষহ। আর ইঁহারা হাতে থাকিলে, তাহার

ভবিষ্যৎ থাকিবে মধ্যাহ্ন দিবালোকের মতই স্পষ্ট, সমুজ্জ্বল এবং ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা।

ইহাদের সংশ্রবে আসিয়াই ভূষণ আজ ছিনেমায় আক্টো করিতে পাইয়া শুধু বিখ্যাতই হয় নাই, পরম কৃতার্থ হইয়াছে:—অনন্ত নরকনিমজ্জিত তাহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের এতদ্বারা সশরীরে স্বর্গলাভ হইয়াছে! ইহাদের কাছে থাকিয়াই তাহার জ্ঞান অভিজ্ঞতা এবং দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়াছে! অসীমের কাছে থাকিলে কি হইত? সেই হাঁড়ি-হাতা-বেড়ি আর বেড়ি-হাতা-হাঁড়ি; সেই রান্নাঘর আর খাবার ঘর, আর খাবার ঘর আর রান্নাঘর: সকালে বিকালে দিনে রাত্রে সেই রান্না আর রান্না! ভাগ্যে সে বিজলী দেবীর সুনজরে পড়িয়াছিল! এই দিদিমণির দৌলতে কত বড় বড় লোকের সঙ্গেই না তাহার আলাপ হইয়াছে! বড়লোকদের সহিত শুধু আলাপ পরিচয়ই হয় নাই, তাঁহারা ভূষণকে রীতিমত ভালবাসেন, পাশে বসাইয়া চা-খাবার খাওয়ান, মাঝে মাঝে মোটর-গাড়ী করিয়া বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া যান্! একি কম সৌভাগ্যের কথা? অসীমকে কলিকাতায় চিনে কে?

ভূষণের এখানে কষ্ট দূরে থাক্, সুখের সীমা পরিসীমা নাই। এত সুখ সে কখনও আশা করে নাই। ষ্টুডিও হইতে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতন পায়: কাজের সময়, উপরিও মাসিক প্রায় ১০।১৫ টাকা হয়: বিনা খরচে দুই বেলা পরিপাটিরূপে আহার এবং বিনা-ভাড়ায় ইলেক্‌ট্রিক আলো ও পাখাসহ ত্রিতলে নিজস্ব স্বতন্ত্র একটি কক্ষে আরামে বাস। মাঝে মাঝে একটু-আধটু হুইস্কি-ব্রাণ্ডিও যে না

মিলে, তাহাও নয়। বিশুদ্ধ কুক্কুটমাংস এবং পরের পয়সায় বিলাতী হোটেলে আহার ত প্রায়ই লাগিয়া আছে।

ভাল ভাল ধুতি পাঞ্জাবী কোট জুতাও তাহার বহু জমিয়াছে: সামান্য একটু পুরাতন হইলেই, দাদাবাবু ভূষণকে দান করেন—সুতরাং এ-সবও তাহাকে কিনিতে হয় না। বিজলী দেবীর ভাই হইয়া কোঁচান-ধুতি, গিলে-করা পাঞ্জাবী এবং পাম্প বা সেলিম-শূ ছাড়া, সে পথেই বাহির হয় না। বাক্সে তাহার আট খানা, পোষাকী দেশী ও ছয় খানা আটপৌরে ধুতি, ছয়টা আদ্দির ও চারিটা লংক্লথের পাঞ্জাবী ও তিনটা কোট আছে। জুতাই তাহার চারি জোড়া। ডাকঘরে তাহার জমিয়াছে প্রায় তিন শত টাকা! যে-কোনও মুহূর্ত্তে সই করিয়া দিলেই, সে একেবারে কড়কড়ে তিনশো টাকার মালিক!

দিদিমণির বন্ধুবান্ধব সকলেই মস্ত বড়লোক: সে যদি প্রত্যেকের নিকট পাঁচটা করিয়াও টাকা চাহে, তাহা হইলে একদিনেই সে পাঁচশো টাকা বখশীশ জোগাড় করিতে পারে। কিন্তু সে নিরুপায়! বিজলী নিষেধ করিয়াই ভূষণকে এমন বিপদে ফেলিয়াছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে। তাহার তো খুবই ইচ্ছা, সে এই টাকাগুলি হাতাইয়া লয়! দিন দুই-তিন ঘুরিলেই অনায়াসে পাঁচশো টাকা হাতে আসে। কিন্তু বিজলীর শক্ত নিষেধ, সে অমান্য করিতে সাহস করে না। মনকে প্রবোধ দেয়, মন অত উতলা হোস্ না—অতি-লোভে তাঁতী ডুবে।

বিজলীর আর সবই ভাল, কিন্তু এই আজ্ঞাটিই অত্যন্ত অন্যায়। ভাবিলেই, ভূষণের মন খারাপ হয় বলিয়া, সে এই কথাটি ভুলিয়া

থাকিতে চায়। কিন্তু এ কি এত সহজে ভোলা যায়? যাহাই হউক্, এত সব সুবিধার উপর আবার আশাতীত সুবিধা: নিত্যনূতন ছিনেমা-তরুণীর সহিত বিনা পয়সায় রসালাপ! কোন্ জমিদারের ভাগ্যে এমন জোটে? এ সৌভাগ্য অসীমের কল্পনাতীত।

অবশ্য দিদিমণির আরও অনেক কাজ তাহাকে করিতে হয়। তাহাতে তাহার অপমান কিসের? ভূষণ ভাবে, বিজলী যদি তাহার নিজের সহোদরা কিম্বা জননীই হইত, তাহা হইলে সে কি করিত? করিত না? আর এ এমনই বা কি শক্ত কাজ? গোয়াবাগান হইতে দুই বেলা দুধ দোহাইয়া আনা, কুকুরগুলিকে সকাল-সন্ধ্যা হাওয়া খাওয়াইয়া একটু বেড়াইয়া আনা এবং দেখা-শোনা করা, টেবিল, চেয়ার, আস্‌বাবপত্রগুলি ঝাড়পোঁচ করা, দাদাবাবুর কাপড় কোঁচান, রাত্রি নয়টার পর আবকারি আইনকে ফাঁকি দিয়া মাল আনা, হাটবাজার করা—এতে কষ্ট কিসের? কত ম্যাট্রিক পাশ-করা ছেলে যে এ-কাজ করিতেছে! আর ইহাতে লাভ বই, তাহার লোকসান কোথায়? বাজারের দুই রকম হিসাব সে রাখে, যদ্বারা বিজলী খুশী হয় এবং সুবোধও, তাহার বহু কষ্টার্জ্জিত অর্থের অপব্যয় হয় না জানিয়া, প্রসন্ন থাকে। অথচ মাঝখান হইতে সে কিঞ্চিৎ লাভবান হয়। মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণ-ঠাকুর ডিম বা মাংস রাঁধে না, ভূষণ ষ্টোভে বা তোলা-উনুনে রাঁধিয়া দেয়, ঠাকুরের অসুখ-বিসুখ হইলে দুই-চারি দিন চালাইয়া লয়।

বিজলীর অনেক গুপ্ত ইতিহাস ভূষণ জানে, কারণ সে-সব ব্যাপার ভূষণের দৌত্যেই সফল এবং তাহার কর্ম্মতৎপরতা ও মন্ত্রগুপ্তিতে

অদ্যাপি সুবোধের অগোচর। আবার দাদাবাবুরও বহু ব্যাপারে সে গোপন ঘটকালী করে, তাহাও কেহই জানে না। ভূষণ এইরূপে দুইখানি নৌকা সমান চালায়, অথচ আজ পর্য্যন্ত কোনও দিকে এতটুকু টাল খাইতে কেহই দেখে নাই। মহর্ষি বাল্মীকি-কল্পিত পবন-কুমারের মত ভূষণ, সুবোধ ও বিজলীকে ত্রেতাযুগের রামসীতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, নির্ব্বিচারে তাহাদের সেবা করিয়া চলিয়াছে।

ভূষণ বলে, পেটে খেলে পিঠে সয়। কেন সে করিবে না? ইহাদের জন্য সে সব করিতে পারে। করিবেও সব। ইহাদের জন্য করিবে না তো কি, সে সেই চৈতনপুরের অসীম চক্রবর্ত্তীর জন্য করিবে? এবার দেশ হইতে ফিরিয়া, ভূষণ এতদিন পরে, অসীমের উপর হঠাৎ অত্যন্ত জাতক্রোধ হইয়া পড়িয়াছে। সব সময়েই সে অসীমের সঙ্গে ইহাদের তুলনা করে এবং নিজের মনে মনেই অসীমকে খাটো এবং অযোগ্য প্রতিপন্ন করিয়া, একটা অনাবিল আত্মপ্রসাদ এবং স্বস্তিদায়ক পুলক অনুভব করে। এতদিন ভূষণের এ সব কথা কখনও মনে হয় নাই; বা সম্প্রতি যেমন হইতেছে, অসীমের অস্তিত্বও তাহার ঈদৃশ পীড়াদায়ক ঠেকে নাই। সে নিজেও ভাল বুঝিতে পারিতেছে না, কেন তাহার এরূপ ভাবান্তর ঘটিল।

টেঁপীকে মনে পড়ে। বহু কল্পনা অকস্মাৎ একসঙ্গে ইন্দ্রধনুর মত তাহার মনের আকাশখানিকে বিবিধ বর্ণসম্ভারে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলে। টেঁপীকে কেন্দ্র করিয়া অনেক কথাই সে ভাবে, শেষ পর্য্যন্ত সব কথাই যায় হারাইয়া; টেঁপীকে মধ্যমণি করিয়া ভূষণ বহুমূল্য শতনরী গাঁথে, মধ্যপথে মালা যায় ছিঁড়িয়া; টেঁপীকে লইয়া সে সপ্তডিঙা

মধুকর ভাসায়, ঘাটেই ডিঙা যায় বান্‌চাল্‌ হইয়া। অথচ সে কি করিবে বা না করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারে না। লাভের মধ্যে হয় এই যে, তাহার অন্তরের গুপ্ত ক্ষতটি অকারণ পীড়িত হইয়া কেবল রক্তমোক্ষণই করে।

কয়েকদিন হইতেই ভূষণ মনে করিতেছিল—সে নিজে যখন ইহার কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না, তখন বিজলীর সহিত একবার পরামর্শ করিয়া দেখিলে তো হয়! বিজলীর মস্তিষ্ক এ বিষয়ে যথেষ্ট উর্ব্বর! সে হয়ত একটা উপায় বাতলাইয়া দিতে পারে। কিন্তু লজ্জা লাগে, ভূষণ বলি-বলি করিয়া গিয়াও বলিতে পারে না। বহুবার সে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মনের কথা মনে চাপিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছে।

মাঝে মাঝে ভূষণ নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হয়। কথার পিঠে কথা দিতে গিয়া এবং নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে, সে যে টেঁপীদের সেই দুর্বিনীত পরিবারটিকে, একবার নয় বহুবার, কলিকাতা আনিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে—সেটি কিন্তু বড় অন্যায় করিয়াছে! এ কথাটি না বলিলেই ভাল হইত! তাহার তো এই অবস্থা। যদি তাহারা আসিতে চায়, তখন কি হইবে? সে তো আনিতে পারিবে না—তাহা হইলেই সব ফাঁশ হইয়া যাইবে! ইহার পর, আর তাহাদিগকে ভূষণ মুখ দেখাইবে কি করিয়া? লজ্জায় কুণ্ঠায় গ্লানিতে ভূষণের মন হইতে টেঁপী পর্য্যন্ত পিছ্‌লাইয়া পড়ে! টেঁপীকে কেন্দ্র করিয়া ভূষণ যে তাহার কল্পলোক তৈরী করিয়াছে, সেটিও ধূলিসাৎ হইয়া যায়। অথচ টেঁপীকে তাহার চাই-ই। টেঁপীর ভগিনী দুইটিও ভবিষ্যতে তাহার বিশেষ কাজে আসিবে। সে কি অম্‌নি এই গুরুভার

নিজের স্কন্ধে লইয়াছে? লোকে গরু কিনে চাষ করিবার জন্য, নিছক গো-সেবার জন্য নয়। এত বোকা সে নয়। কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসা বাণিজ্য সে কতকটা বোঝে।

এখনও কিছুই ঠিক হয় নাই, যদি তাহারা ইহার মধ্যে একদিন সত্য সত্যই কলিকাতায় আসিয়া পড়ে! ঠিকানাও তো সে দিয়া আসিয়াছে। তাহা হইলে কি উপায় হইবে? বিশেষতঃ নিস্তারিণী যে দাঁহাবাজ মেয়েমানুষ! তাহাকে হাতে না রাখিলে তাহার সব মতলব পণ্ড হইয়া যাইবে। অথচ তাহাকে ভুলাইয়া রাখাও তত শক্ত বলিয়া মনে হয় না। নগদ কিছু টাকার প্রয়োজন। হাতে টাকা পাইলেই নিস্তারিণী খুসী। যতদিন সে ব্যবস্থা না হয়, ততদিন তাহাদের এখানে আনা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। তাড়াতাড়ি কিছু করাও ঠিক হইবে না। ভূষণের আসল অবস্থা প্রকাশ হইয়া পড়িলে, উহাদের কাছে তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না, এবং এখানেও লজ্জায় সে আর টিঁকিতে পারিবে না। ভূষণ মারা যাইবে! একেবারে হার্টফেল্ করিয়া মারা যাইবে!

বেলা প্রায় চারটা। দিবানিদ্রা অন্তে, বিজলী ভূষণকে খুঁজিতে আসিয়া, ত্রিতলস্থ চিলে-কোঠার পার্শ্বস্থিত ভূষণের ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া দেখিল, ভূষণ তক্তাপোষে বসিয়া সম্মুখের জানালাটি খুলিয়া দিয়া, একদৃষ্টে আকাশ পানে চাহিয়া চিন্তায় তন্ময়। বিজলী কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া রহিল, ভূষণের সেদিকে হুঁসও নাই। কয়েক দিন হইতেই বিজলী ভূষণের একটু অন্যমনস্কতা এবং উড়ু উড়ু মন লক্ষ্য করিতেছিল। গত ৪.৫ বৎসরের মধ্যে, কোনও বিষয়ের জন্য, কখনও সে ভূষণকে

চিন্তিত দেখে নাই। সেই ভূষণ এবার বাড়ী হইতে আসিয়া, এমন হঠাৎ চিন্তাশীল দার্শনিক হইয়া উঠিল কি জন্য? একটা কিছু ঘটিয়াছে নিশ্চয়!

বিজলী জানে, ভূষণের আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই যে কাহারও জন্য তাহার মন খারাপ হইবে; বিষয়-সম্পত্তি বলিয়া কোনও বালাই নাই, একখানা নিজস্ব কুঁড়ে ঘর পর্য্যন্ত তাহার নাই যে, বৈষয়িক ব্যাপারে সে চিন্তিত হইবে! স্বাস্থ্যও ভাল। তবে কি? একেই তো স্ত্রীজাতির কৌতূহল একটু অধিক। তাহার উপর বুদ্ধিমতী সে, ভাবিল—তবে কি? ভূষণচন্দ্র এতদিনে কাহারও প্রেমে পড়িল নাকি? প্রেমে না পড়িলে তো মানুষ এমন হয় না? নিশ্চয় এ প্রেমে পড়াই বটে—

বিজলীর কৌতুহল আর বাধা মানিল না। স্থির করিল, এ রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতেই হইবে। সত্যসত্য ভূষণ যদি প্রেমেই পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে, বিজলী ভীত হইল, ইহার অবস্থা খুবই গুরুতর—কখন্ আত্মহত্যা না করিয়া বসে! আহা, ভূষণকে যে তাহার বড় প্রয়োজন! কিছুতেই ভূষণের আত্মহত্যা করা চলিবে না। তাহা হইলে বিজলী যে ভয়ানক অসুবিধায় পড়িবে! প্রথম দফায় পুলিশেই ত' ভীষণ হায়রাণ করিবে। অগত্যা বিজলী তাহার প্রেমাস্পদের সহিত তাহাকে মিলিত করিয়া দিতেই মনস্থ করিল।

বিজলী আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিয়া তক্তাপোষে বসিতেই, ভুষণের চিন্তার ঘুড়ি গোপ্তা মারিয়া পড়িয়া, ছিঁড়িয়া গেল। অপ্রস্তুতভাবে ভূষণ জিজ্ঞাসা করিল—"এ কি? দিদিমণি? এমন লুকিয়ে লুকিয়ে যে—?"

বিজলী কহিল—"আমি না হয় লুকিয়ে এসেছি, কিন্তু তুমি যে ভাই লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করচ'—সে খবর তো আমায় কিছুই বল নাই এতদিন? ব্যাপার কি?"

হঠাৎ ভূষণের মাথায় রক্ত উঠিয়া, মুখ চোখ কাণ পর্য্যন্ত বেগুনী রং ধারণ করিল। ভূষণের দেহবর্ণ ময়লা বলিয়া, রক্তবর্ণ বলা চলে না। তাহার গলা শুকাইয়া উঠিল। আম্‌তা আম্‌তা করিতে করিতে কহিল—"হাঁ—না—আমি তো—আমি তো—টেঁপীর—"

বিজলী হাসিয়া উঠিল। কহিল—"তা আমায় লুকোচ্ছ কেন? বলই না সব কথা খুলে। আমার দ্বারা যদি তোমার কোনও সাহায্য হয়, আমি তা নিশ্চয় করব। আমার ছোটভাইটির একটি ছোট্ট টুক্‌টুকে বউ আস্‌বে, এ তো খুব সুখের কথা—এতে আর লজ্জা কি?"

ভূষণের জড়তা অনেকটা কাটিল; একটু সাহসও হইল। লজ্জায় মুখটা নীচু করিয়া, হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে কহিল—"আপনি ঠিক ধরেচেন দিদিমণি—"

বিজলী কহিল—"রোগটাই শুধু ধরেচি—কিন্তু সে বিশল্যকরণী লতাটি কোথায় পাওয়া যাবে?"

ভূষণ কহিল—"এ আমাদের গাঁয়ের কেশব চক্কোত্তির বিটি, দিদিমণি, টেঁপী। মেয়েটা বেশ ভালই, খু-উ-ব সোন্দর, বয়েস এই চৌদ্দয় পড়েচে। তারা খুব গরীব কি না, তাই—"

বিজলী কহিল—"থাম্‌লে কেন?—তারা খুব গরীব, তাতে কি হয়েছে—"

ভূষণ কহিল—"তারা গরীব বলে', দিদিমণি, আমাদের গাঁয়ের

জমিদার—ও—হাঁ, আপনি তো জানেন তাকে, সেই অসীম চক্কোত্তি—"

অসীমের নাম শুনিবামাত্র বিজলী হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠিল। সেই অসীম! যে-মূর্খ একদিন তাচ্ছিল্যভরে তাহার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল! অধিকতর মনোযোগসহকারে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ, অসীম—মনে পড়েচে। তাকে কি করেচে সে?"

ভূষণের কুণ্ঠা কাটিয়া গিয়া এখন সে অনেকটা সহজ হইয়া আসিয়াছে, কহিল—"সেই শা—ই টেঁপীর ওপর তাক্ করে' বসে আছে, দিদিমণি! কে জানে এতদিন তাকে হয়ত পগাড়-পারই করে ফেলেছে কি না—"

বিজলী কহিল—"অসীম টেপীকে বিয়ে করতে চায় না কি?"

ভূষণ জানাইল—"আপনি ক্ষেপেচেন, দিদিমণি? বিয়ে-টিয়ে করবে না, সে চায়—"

বিজলী বাধা দিয়া কহিল—"বুঝেচি, বুঝেছি—তুমি সেই মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাও?"

ভূষণ হাতে স্বর্গ পাইল। সে সাহ্লাদে জানাইল—"আজ্ঞে হাঁ, দিদিমণি! যদি টেঁপী হাতছাড়া না হয়ে থাকে এদ্দিন, তাহলে নিশ্চয় চাই, দিদিমণি! তবে তার মা যে পাহাড়ে বজ্জাত, তাতে আবার ভয়ও হয়।"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম?"

ভূষণ কহিল—"পয়সা পেলে তার অসাধ্য কিছুই নেই, দিদিমণি! ভয়ানক দাঁহাবাজ মেয়েমানুষ সে। তবে কি জানেন? তারা গরীব—

অসীম জমিদার—পঞ্চাশটা কি একশোটা টাকা তার কিছুই নয়, অথচ এই টাকাতেই টেঁপীর মা গ'লে একেবারে জল হয়ে যেতে পারে—"

বিজলী কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিল—"বেশ খবর নাও। টেঁপীকে অসীমের মুখ থেকে কেড়ে আনতেই হবে। যা' টাকা লাগে, আমি দেব—"

এই সুযোগে বিজলী তাহার অবিস্মৃত অবহেলার পরিবর্তে অসীমকে জব্দ করিবার এক বিকট কল্পনায় ও দানবীয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ভূষণ কৃতজ্ঞতায় দ্রব হইয়া গেল। বিজলীর পদধূলি লইয়া কহিল—"আর-জন্মে নিশ্চয় আপনি আমার গর্ভধারিণী মা ছিলেন, দিদিমণি—"

একাদশ পরিচ্ছেদ

শুধু পয়সাতেই সব হয় না বা শুধু যোগ্য লোক থাকিলেও চলে না: পয়সা ও লোক দুইই চাই। দুই-ই যাহার আছে, সেই ভাগ্যবান্। রায় বাহাদুর শেঠ গণেশীলাল সে-হিসাবে খুবই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি। প্রথমত, পয়সা তাঁহার আছে যথেষ্টই: বৎসরে দুই-চারি লক্ষ টাকা যদি অপব্যয়ও হয়, তাহাতে তাঁহার বিশেষ কিছু আসে-যায় না। আর দ্বিতীয়ত, তাঁহার উপযুক্ত দক্ষিণ-হস্ত ছিল—সুবোধ রায়। কাজেই শেঠজী ষ্টুডিওতে না আসিলেও, তাঁহার সময় এবং ইচ্ছা অনুযায়ী, সুবোধ প্রতি-রবিবারে বা ছুটির দিনে ষ্টুডিও-তরুণীদিগকে নিয়মিতভাবে রায় বাহাদুরের বাগানে লইয়া গিয়া হাজির করিত। অবশ্য যে দুই-চারি জন যাইত না, তাহাদের চাকরীও এস্থলে বেশী দিন স্থায়ী হইত না। মেয়েদের সঙ্গে শেঠজী বাগানের পুষ্করিণীতে একত্রে স্নান করিতেন, ব্যাডমিণ্টন খেলিতেন, ছুটাছুটি করিয়া ফুল তুলিতেন, কাঁনামাছি খেলিতেন, একত্রে দুইবার ভোজন করিতেন, চা ও অন্যান্য পানীয় উপভোগ করিতেন, দহিবড়া, চীনেবাদাম ভাজা, লাড্ডু, সন্দেশ, ফলাহার প্রভৃতি সর্ব্ববিধ চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় করিয়া, মধ্য রাত্রি নাগাৎ বাড়ী ফিরিতেন, কখন কখন ফিরিতেনও না।

সবাই জানিত, শেঠজী সুবোধের খুব অন্তরঙ্গ এক বন্ধু। শেঠজীকে কে না জানে? তাঁহার নাম কে না শুনিয়াছে? শেঠজীর বয়স প্রায় ষাঠ, কিন্তু তাঁহার দেহখানি ছিল সত্যই একটি দ্রষ্টব্য পদার্থ:

এমন বিশালায়তন দেহ সচরাচর বড় নজরে পড়ে না। শেঠজীর পায়ের এক-একখানি গোছ, ঠিক যেন এক-একটি ইলেক্‌ট্রিকের থাম্বা; ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ; বুল্‌ডগের মত মুখের মাংস ঝোলা, ক্ষুদ্র নাক, ছোট-ছোট চোখ, গোল মুখ, পুরু ঠোঁট, মোটা মাড়িতে ছোট-ছোট বিবর্ণ দাঁত—দুই-একটি ছিলও না—অথচ তিনিই ছিলেন সকলের অত্যন্ত প্রিয়। সকলেই তাঁহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। তিনি কাহাকেও ডাকিলে, সে কৃতার্থ হইত।

প্রত্যহই তিনি কোন-না-কোন নারীর গৃহে অকস্মাৎ বিনা-আমন্ত্রণেই উপস্থিত হইয়া, তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষকে উদ্ধার করিতেন। আজ বিজলীকে কৃতার্থ করিতে শেঠজী আসিয়াছেন।

বিজলী সমাদর করিয়া শেঠজীকে বসিবার ঘরে দুগ্ধধবল বালিশ-প্রচুর বিস্তীর্ণ গদীতে বসাইয়া, তাঁহার মাথা হইতে কালো গোল টুপীটি উঠাইয়া, একটা তা'কে রাখিয়া দিয়া, গলিত মধুর অপাঙ্গ হানিয়া কহিল—"ঠিকসে বসুন্, রায় বাহাদুর। আজ আর কোনো কথা শুনচি না—আজ খেয়ে দেয়ে তবে যেতে পাবেন।"

কেহ তাঁহাকে বসিতে বা কিছু খাইতে পীড়াপীড়ি করিলেই, তিনি ব্যস্ততা, কিম্বা অন্যত্র কোনও জরুরী কাজ বা ধর্ম্ম-কর্ম্মের একটা কিছু অজুহাত করিয়া, প্রথমটায় খুব আপত্তি জানাইতেন। এটি তাঁহার স্বভাব বা প্রথা বা অভ্যাস, যে যাহাই বলুক—রায় বাহাদুরের চালই ছিল এই।

শেঠজী কহিল—"লেকেন্, সম্‌ঝো ভাই, আমার যে বোড়ো জরুরী কাম আছে গদ্দীমে—"

বিজলী জানে, ইহা ভূমিকামাত্র। সাদর-ভর্ৎসনায় ধম্‌কাইয়া

কহিল—"তোমার লেকেনের নিকুচি করেচে। কাম আছে, কাম আছে! কাম আমারও আছে! খবরদার, ফের কোন ওজর করেচ কি—বুঝ্‌তে পার্‌বে। ভূষণ—"

দুয়ারের বাহিরেই ভূষণ সসম্ভ্রমে অপেক্ষা করিতেছিল। —"যাই দিদিমণি" বলিয়া পর্দ্দা সরাইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিজলী তাহার শয়নকক্ষস্থিত আলমারির চাবির তোড়াটি ভূষণের হাতে দিয়া কহিল—"বুককেস্‌ থেকে টাকা নিয়ে, আগে একটা হোয়াইট-লেবেল এনে দাও। তারপর দু'টো মুরগী নিয়ে এসে, ভাল করে' চারখানা কাট্‌লেট্‌ বানাও, ভাই। হোটেলে মুসলমানের রান্না শেঠজী খান্‌ না, জানত? উনি রাত্রে এখানে খাবেন, ঠাকুরকে বল। লুচি ভাজবার আগে যেন আমায় খবর দেয়।"

শেঠজী বিজলীর হাত দুইটি ধরিয়া, সবিনয়ে নিবেদন করিল—"লেকেন্‌ সম্‌ঝো বিজ্‌লীবিবি, আজ হামাকে মাফ্‌ কোরিতেই হোবে তুমাকে। আজ হামার উপাস আছে, একঠো পূজা-কিরিয়া আছে। লেকেন্‌, কাল হামি আসিয়ে সব কুছু খাবে, সম্‌ঝো—"

ভূষণ ইতিমধ্যে বোতল, গেলাস, সোডা, বিড়ি, সিগারেট প্রভৃতি রাখিয়া, চলিয়া গেল। বিজলী সুরাপাত্রটি ভরিয়া গণেশীলালের হাতে তুলিয়া দিয়া, কপট ক্রোধের ভাণে কহিল—"বাস্‌, বাস্‌—লেকেন্‌ সম্‌ঝো, কাল হামারও পূজা আছে। এখন লক্ষ্মীছেলের মত ঢুক্‌ করে, এইটে খেয়ে ফেল' দেখি—"

গণেশীলাল আস্তে আস্তে গেলাসে চুমুক দিল। কহিল—"বেশ, হুস্কিঠো খাই, মুর্‌গীঠো লেকেন্‌ আজ ছোড়িয়ে দাও। সম্‌ঝো, বিজ্‌লীবিবি—"

বিজলী অভিনয়ের ভঙ্গীতে চক্ষু পাকাইয়া কহিল—"ফের?"

গণেশীলাল অপ্রতিভভাবে কহিল—"আচ্ছা, আচ্ছা। বংগালীলোগ তো একদম ভোরষ্টো হোইয়ে গিয়েছে! সম্‌ঝো কিরিয়া-করম সব ছোড়িয়ে দিয়ে, বিল্‌কুল খিরিস্তান বনিয়েছে! লেকেন্, কাল গঙ্গা-সনান করিয়ে লিয়ে, বেরাম্‌ভনকো কুছ দান করিয়ে দিতেই হোবে, সম্‌ঝো। লেকেন্—এতো বাজে খরচ হুয়া না—"

হিন্দু ধর্ম্ম সত্যই উদার ও মহৎ।

"জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ।" ধর্ম্মাধর্ম্মের মধ্যে আবার পাপক্ষালন এবং সনাতন প্রায়শ্চিত্তবিধিই, বোধ হয়, হিন্দুধর্ম্মকে আজ হাজার বৎসরের এত অক্রিয়া ও কুক্রিয়ার মধ্যেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে! অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই গণেশীলাল তাহার সকালবেলাকার পূজা ও ক্রিয়ার কথা ভুলিয়া গিয়া, সদ্‌ব্রাহ্মণের তৈরি গরম ফাউল্‌-কাট্‌লেটে কামড় দিল। প্রমাণিত হইল, ধর্ম্মতত্ত্ব গুহাতেই নিহিত!

গণেশী কহিল—"লেকেন রায়বাবুর আক্কেল তো সম্‌ঝো, ভাই। আজ দো মাহিনা হোইয়ে গেলো, একঠো কারড্ ভি লিখলো নাই—সম্‌ঝো। লেকেন, কাম-ধাম ক্যায়সে চলে—"

বিজলী বাধা দিয়া ঝাঁঝের সহিত কহিল—"সে হতভাগা জোচ্চোরের নাম পর্য্যন্ত কর্‌বেন্ না আমার কাছে।"

গণেশীলাল বিজলীকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া, কোমল ভাবে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে সান্ত্বনা দিল—"রায়বাবু লেকেন আদমি বহুৎই আচ্ছা। কোই, সম্‌ঝো, বহুৎ জরুরী কামেই

আটক পোড়িয়েছে সম্‌ঝো, কি, বেমারী হোইয়েছে—নাইতো সে এমন বে-অকুফ্‌ লোক আছে নাই।"

বিজলী তাহা মানিতে চায় না। রায়বাবু লোকটি ভাল কি মন্দ এই লইয়া বহুক্ষণ তর্কাতর্কি চলিল। গণেশীলাল বলে—"লেকেন সুবোধ বাবু লোক বহুৎ বঁঢ়িয়া," বিজলী বলে—"তোমার মাথা মুণ্ডু আর ছরাদ।" গণেশীলাল হাসে। বোতল শেষ হয়। তর্কে হারিয়া বিজলী অবশেষে কাঁদিতে বসে।

বিজলী কহিল—"ঘর থেকে আমায় নিয়ে এসে, এমন করে' যে সে আমায় পথে বসাবে, তা কি জান্‌তাম, গণেশীবাবু?"

গণেশীলাল বিজলীর চক্ষু মুছাইয়া দেয়, সান্ত্বনা শোনায় এবং অনেক প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করে। বিজলী হয় বুঝে, কিম্বা বুঝে না, অথবা বুঝিয়াও বুঝে না—কেবল কাঁদে। ক্রমশ যুক্তিতর্ক হারাইয়া যায়। এই উভয়ের মধ্যে কে কাহাকে কত ভালবাসে, তাহার সাক্ষ্যপ্রমাণ জড় করে।

ভূষণ পাশে খাবার জায়গা করিল। উভয়েই ভোজনে বসিল।

খট্‌-খট্‌ খট্‌-খট্‌ খট্‌-খট্‌—

বহির্দ্বারে কে কড়া নাড়িল।

ভূষণ ছুটিয়া গেল। একখানা টেলিগ্রাম লইয়া সে পুনঃ প্রবেশ করিল। বিজলী তাড়াতাড়ি টেলিগ্রাম খানা পড়িল—চিটাগং মেলে পৌঁছিতেছি—সুবোধ।

গণেশীলালের মুখ শুকাইয়া উঠিল। কহিল—"লেকেন তোবে আজ হামি যায় বিজ্‌লীদেবী—"

বিজলীরও নেশা ছুটিয়া গেল। তবু মুখে ভরসা দিতে ছাড়িল না। কহিল—"যাবেন কেন? এত ব্যস্ত কিসের? বসুন না। আসুকই আগে, তারপর যাবেন।"

শেঠজী সুবোধের অনুপস্থিতিতে বিজলীর সহিত, গোপনে একটু আনন্দ করিতে আসিয়াছিলেন। আনন্দ হঠাৎ তাঁহার মাথায় চড়িল। ভয় হইল, সুবোধ দেখিলে কি ভাবিবে? বিজলীর সহিত শেঠজীর যে মাঝে মাঝে এভাবে দেখা সাক্ষাৎ হয়, সে খবর তো সুবোধ জানে না! অমন পবিত্র সুস্বাদু কুক্কুট-মাংসের কারিও শেঠজীর মুখে বিস্বাদ ঠেকিতে লাগিল।

বিজলী কহিল—"আপনি ঘাব্‌ড়াবেন্ না, শেঠজী। আপনি বসে' খান্, আমি সব ব্যবস্থা করে নেব'—"

শেঠজীর কতকটা সাহস হইল। জিজ্ঞাসা করিল—"লেকেন কি রোকোমে—"

বিজলী কহিল—"দু'মাসের মধ্যে সুবোধবাবুর কোনো খবর না পেয়ে আমরা যেন সবাই ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। তারপর এই টেলিগ্রাম পেয়ে, আমি আপনাকে টেলিফোন্ করে আনিয়েচি—"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া শেঠজী বলিল—"বহুৎ আচ্ছা, ভাই। সম্‌ঝো, হাম লোগ তাই·খুশী হোইয়ে জল্‌শা কোর্‌চি। বংগালী লোক ধরমসে ভরোষ্ট হোইয়েছে, সম্‌ঝো, লেকেন দেমাক্‌মে তো সব্‌সে উঁচা—ইস্‌মে কোই শক্ নেই।"

বিজলী কহিল—"জল্‌শা তো কর্‌চ—আমার সব আশা নিরাশ ত'?"

শেঠজী জিজ্ঞাসা করিল—"লেকেন্, কি আশা, বিজলী বিবি?"

বিজলী চোখের মুখের ও দেহের একটি অর্থপূর্ণ বিশিষ্ট ভঙ্গী করিয়া, মৃদু হাস্যের সহিত মুর্গীর ঠ্যাং চর্ব্বণ করিতে করিতে কহিল—"লাখো লাখো রূপিয়া রোজগার করচ, এত বড় কারবার চালাচ্ছ, এ-পাড়া ও-পাড়া চযে ফেল্‌চ' মেয়েদের পেছন-পেছন, রোজ রোজ নতুন্ নতুন্ চৌকা কর্‌চ—আর এই সোজা কথাটা বুঝ্‌তে পারছ না? ন্যাকা?"

—"লেকেন্ এতো নিরাশ কেনো সমঝো বিজ্‌লী বিবি? এখন তো লেও এই একশো রূপেয়া—ধীরে ধীরে সোব্ ঠিক হোইয়ে যাবে! বিবি সাহেব, ঘাব্‌ড়াও মাৎ—" বলিয়া কোটের নীচেকার ফতুয়ার পকেট হইতে একখানি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া, বিজলীর হাতে দিল। বিজলী সেখানি তাড়াতাড়ি ভূষণের হাতে দিল।

ভূষণকেও দশ টাকার একখানা নোট দিয়া রায় বাহাদুর কহিল—"আও ভাই, ভূষণবাবু, তুম্‌ভি খুশ্ রহো। লেকেন্, তুম্ খুশ্‌তো হাম্‌ভি খুশ্, বিজ্‌লী দেবীভি খুশ, সম্‌ঝো—লেকেন্—"

ভূষণ গলবস্ত্র হইয়া শেঠজীকে প্রণাম করিয়া, কৃতজ্ঞতার আনন্দ নিবেদন করিল।

বিজলী ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল—"আমি কি এই কথা বল্‌লাম নাকি? তুমি একটি আস্ত গাধা—"

রায়বাহাদুর রসিকতা করিয়া কহিল—"আরে রাম কহ, রাম কহ। লেকেন গাধ্‌ধা কি কল্‌কাত্তাকী সব্‌সে বঁঢিয়া, বিজ্‌লী বিবির সোঙ্গে দোস্তি কোরিতে পারে, সম্‌ঝো—"

বিজলী অভিমানাহতভাবে ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল—"দেখ্‌তেই পাচ্ছে সবাই, তাই তো কর্‌চে—"

সিঁড়িতে দ্রুতপদশব্দ শুনিয়া উভয়েই সচকিত ভাবে দুয়ারের পানে চাহিতেই দেখে—সুবোধচন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিল।

বিজলী তাড়াতাড়ি কলে হাতমুখ ধুইয়া, একখানা হাতপাখা লইয়া আসিয়া, সুবোধকে হাওয়া করিতে বসিল। ভূষণকে আদেশ দিল—"ভূষণ, বাবুর চান্ হতে হতে শীগ্‌গীর ঠাকুরকে আর খান্‌কয়েক লুচি ভাজ্‌তে বল। মাংস—"

ভূষণ সুবোধের জুতা খুলিতে খুলিতে, মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—"মাংস অনেক আছে, দিদি, শেঠজী কিছুই খায় নি। কাট্‌লেট্‌ও আছে। আমি বরং চট্ করে আগে দু'টো সোডা নিয়ে আসি।"

বিজলী অঞ্চলাগ্রে সুবোধের পিঠের ঘাম মুছাইতে মুছাইতে, জনান্তিকে কহিল—"সারাদিন গাড়ীতে এসেছেন, নইলে এখন স্নানটা না কর্‌লেই ভাল হ'ত। ভূষণ, এক বাল্‌তি জল উনুনে বসিয়ে দাও গে ভাই। এত রাত্রে ঠাণ্ডা জলটায় আর চান নয়। আঁচ আছে ত'?"

—"খুব আছে। আমি জল বসিয়ে দিয়েই যেচি"—বলিয়া ভূষণ দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সুবোধ কহিল—"তারপর, রায় বাহাদুর, খবর কি বলুন?"

গণেশী কহিল—"লেকেন্ খবোর্ তো সব ভালোই আছে, সম্‌ঝো, রায় বাবু। কাম ধাম ঠিকই চোলিয়েছে লেকেন্। আউর ভোয় কি আছে, আপনি যখন লেকেন আসিয়ে গেছিস্—বাস্।"

সুবোধ বিজলীকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কোন কষ্ট-টষ্ট হয় নি ত'?"

বিজলী সুবোধের পিছনে বসিয়াছিল। গণেশীলালের পানে আড়নয়নে চাহিতেই, শেঠজী অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। বিজলী কহিল—"কষ্ট আর কি? তবে তোমার কোনও খবর না পেয়ে আমরা যে কি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম, তা আর কহতব্য নয়। তোমার টেলিগ্রামটা পেয়ে, আমি শেঠজীকে নীচের দোকান হ'তে ফোন করিয়ে আনালাম। কেন না, ষ্টুডিওর লোকের মুখে শুন্‌লাম, উনিও তোমার জন্যে ভয়ানক ভাবিত হয়ে পড়েছিলেন।"

ইতিমধ্যে ভূষণ সোডা খুলিয়া দিল। সুবোধ শরীরটা তাজা করিবার অভিপ্রায়ে একটি বৃহত্তম পেগ ঢালিল। একটি বড় চুমুক দিয়াই, পরিপূর্ণ আরামে "আঃ" বলিয়া গেলাসটি নামাইয়া রাখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল—"তা' ভাবনা হবে বৈকি! তারপর ষ্টুডিওতে সব ঠিকমত চল্‌চে ত' রায় বাহাদুর? সে মাদ্রাজী ছবির আর দেরী কত?"

গণেশীবাবু কহিল—"হাঁ, চোলিয়েছে, লেকেন, শেষভি হোইয়ে গিয়েছে। সম্‌ঝো, এডিটিন্ আউর বেক-গ্রেন্ মুইজিক্ চোলিয়েছে আভি—লেকেন, আপকো এত্তো দেরী ক্যাহে হুয়া বাবুজী, উও তো বোলিয়ে—সম্‌ঝো—"

সুবোধ কহিল—"কি কুক্ষণে যে যাত্রা করেছিলাম শেঠজী, তা আর কি বল্‌ব। বাড়ী গিয়েই তো প্রথমটা জ্বরে পড়্‌লাম। অসুখ সারতে, বাধল জমিদারীর এক মামলা। সে মামলা শেষ করতে ঢাকা আর বিক্রমপুর, বিক্রমপুর আর ঢাকা কর্‌লাম পূরো একটি মাস। তারপর হঠাৎ মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। ফাল্গুন মাসের ২৯শে

মেয়ের বিয়ে দিলাম। ফাল্গুন মাসেই আসব সব ঠিক, এমন সময় চাটগাঁ থেকে আমার ভগিনীপতির এক টেলিগ্রাম পেয়ে চাটগাঁ ছুটতে হল। সেখানে তাঁর মেয়ে অর্থাৎ আমার ভাগ্নীকে নিয়ে আবার এক মস্ত কেলে—অর্থাৎ—অর্থাৎ—কিনা, এক—মহা—বিপদ। সেটার একটা হেস্তনেস্ত করে—"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার ভগিনীপতি মিঃ চ্যাটার্জ্জী? যিনি ডিষ্ট্রিক্ট জজ?"

—"হাঁ—"

—"তাঁর তো ঐ একটিই মেয়ে, শীলা—না? তাঁর আবার কি বিপদ?"

—"সে কথা এখন থাক। এর মধ্যে ঢাকায় এক স্বদেশী মোকদ্দমায় ছেলে হলেন গ্রেপ্তার। সে মোকদ্দমার তদ্বির করে, ছেলেকে খালাশ করে, তাকে তার মামাদের জিম্মা করে দিয়ে, তবে এই ফির্‌ছি! বিপদ কি কম? প্রাণ বেরিয়ে গেছে, শেঠজী।"

—"তাইত রাইবাবু, লেকেন বহুৎ মুসীব্বৎ হোইয়েছে আপনার সম্‌ঝো। লেকেন্ রামজী আছেন্ সম্‌ঝো। লেকেন কাল স্থবে আপনি ইষ্টুডিও চল্‌বেন্ তো?"

সুবোধ উত্তর দিল—"নিশ্চয়।"

রাত্রি সাড়ে এগারটা বাজিল। শেঠজী বিদায় লইল। সুবোধও দুই একটি সাধারণ গার্হস্থ সংবাদ লইয়া, গেলাসটি নিঃশেষ করিয়া, স্নান ঘরে ঢুকিল।

সুবোধের মুখের ভাব দেখিয়া বিজলী বিশেষ চিন্তিত হইয়া

পড়িল। ইঙ্গিতে ভূষণকে শয়নকক্ষে ডাকিয়া, মৃদুস্বরে কহিল—"শেঠজী, ভট্চাজ্ সাহেব বা সুকুমারবাবু যে এখানে আসা-যাওয়া করেন, এ খবর যেন ও না জান্তে পারে, সাবধান।"

ভূষণ ঘাড় নাড়িয়া বিজ্ঞভাবে জানাইল—"আপনি ক্ষেপেচেন দিদিমণি? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার কথা কাকে-কোকিলে টের পাবে না। কখন পেয়েচে আজ পর্য্যন্ত?"

বিজলী কহিল—"মহাদেব সেনের সঙ্গে যে দেওঘর গিয়েছিলাম, সেটাও যেন আবার কথায় কথায় বলে ফেলিস্ না, দেখিস্। তোর বুদ্ধিসুদ্ধি যে বড় কম—"

ভূষণ প্রতিবাদের সুরে কহিল—"আপনি কেবল আমার বুদ্ধিই কম দেখেন্, দিদিমণি। আমি বোকা হলেও একেবারে আমার বুদ্ধি না-থাকা নয়। কাজের বেলায় আমার ঠিকই মাথা খোলে। আপনি ক্যানে মিছে ভয় কর্‌চেন্?"

বিজলী সন্তুষ্ট হইয়া কহিল—"না, না, ভয় আবার কি? তোর মত ছোট ভাই থাকৃতে, আমার ভয় কিসের? তবু তোকে বলব না? হাজারবার বল্‌ব। এইবার টেঁপীকে একবার এখানে এনে ফেল্‌তে পারলে হয়।"

ভূষণ গদগদ হইয়া কহিল—"আমাকে বল্‌লেন, বেশ কর্‌লেন, দিদিমণি। আমাকে আপনি হাজার বার বলুন্ না। কিন্তু তারা আবার দাদাবাবুকে বলে দেবে না তো?"

বিজলী আশ্বাস দিল—"পাগল! তারা কেউ কিছুই বল্‌বে না, সে ভয় নাই। তারা সব জানে; তা ছাড়া, তাদিকে আমার টেপা আছে—"

ভূষণ প্রস্তাব করিল—"তবু, কাল সকালে, বরং একবার এক ছাঁকে বেরিয়ে, ভট্‌চাজ সাহেব আর স্কুমারবাবুকে গিয়ে বলেও তো আস্‌তে পারি যে, আয়ান্‌ ঘোষ এয়েচে—"

কলঘর হইতে স্থবোধের বাহির হওয়ার শব্দে, ভূষণ তাড়াতাড়ি আসন পাতিতে লাগিল। বিজলী অন্য ঘরে ছুটিয়া পলায়ন করিয়া উচ্চস্বরে কহিল—"ঠাকুর, বাবুর চান্‌ হয়েচে, খাবার নিয়ে এস।"

সম্মুখে বসিয়া বিজলী অতি-দরদের অভিনয়ে, এটা খাও, ওটা খাও, কেন খাবে না, পেট এখনও ভরে নাই, খাওয়া একেবারে কমে গেছে, মাথা খাও, আর একটু খাও, শরীরটা বড় কাহিল দেখাচ্ছে, প্রভৃতি বহু প্রিয়বাক্যে স্থবোধকে প্রীত করিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু স্থবোধের অন্যমনস্কতা বা গাম্ভীর্য্য তদ্দারা একটুও কমিল না দেখিয়া, বিজলী রীতিমত ভীত হইয়া উঠিল।

স্থবোধ আহার সমাধা করিয়া, বসিবার ঘরে আসিয়া, গদীতে একটি তাকিয়া ঠেস দিয়া, অৰ্দ্ধশয়িত হইয়া, একটি সিগারেট ধরাইল। বিজলীও তাহার সম্মুখে বসিল।

বিজলী অভিমানক্ষুণ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, এতদিনের মধ্যে একখানা পোষ্ট-কার্ড লিখেও কি একটা খবর দিতে নাই? আমার খবর না-হয় না-ই নিলে, শেঠজীকে তো একটা খবর দিতে হয়। বুড়ো মানুষ, বেচারা বড্ড ভাবছিল। আমি মলেই বা কি, আর বাঁচলেই বা কি! বরং মলেই বোধ হয় তোমার ভাল হয়, আবার নতুন এক হাঁড়ি কাড়তে পার।"

সুবোধ কঠোর কণ্ঠে কহিল—"আমারই বা তুমি কোন্ খবর নিয়েচ? আমার বাড়ীর ঠিকানা জান না? না, কখনও চিঠি লেখ নাই? না কি, চিঠি লিখ্‌তে জান না—শুনি?"

বিজলী অপ্রতিভ হইল, তবু তর্কের খাতিরে কহিল—"আগে লিখেছি, তখন ছেলেমেয়েরা ছোট ছিল। এখন তারা বড় হয়েচে। কি জানি, কার হাতে গিয়ে চিঠি পড়্‌বে, আর তুমি এসে বকাবকি করবে—এই ভেবেই আমি চিঠি লিখি নি। নৈলে এ আর এমন কি শক্ত কাজ? আমি ঠিক ভেবেচি—তুমি আমায় এই বলেই দুষ্‌বে। এই সন্ধ্যে-বেলাতেই শেঠজী আর ভুষণকে আমি ঠিক এই কথাই বলছিলাম—"

সুবোধ কহিল—"বটে? এত যখন ভাব্‌তে পার,' তখন ঐ ভূষণের নাম দিয়েও তো একখানা চিঠি লিখ্‌তে পার্‌তে? তাতে তো আর আমার বদ্‌নাম হত না! তোমার শেঠজীও ত' লিখ্‌তে পার্‌তো, তাই বা কোন্ লিখেছে? আর তুমিই বা কোন্ লিখিয়েছ? অথচ, আমার খবর না পেয়ে তোমরা যে আহার-নিদ্রা পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছিলে—তার নমুনাও তো বাড়ীতে পা দিতে দিতেই দেখ্‌লাম—"

বিজলী কহিল—"লিখলেও দোষ, না লিখলেও রাগ। আগালে ভেড়ের ভেড়ে, পেছুলে নির্ব্বংশের বেটা।

সুবোধ তিক্তভাবে কহিল—"আজ্ঞে না, তা নয়। তুমি যে কি চীজ, তা ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। তুমিও যেমন আমার পরমাত্মীয়— তোমার শেঠজীও তেমনি আমার দরদী বন্ধু!"

বিজলী কহিল—"শেঠজী তোমারই বন্ধু, আমার কে? তার কৈফিয়ৎ তাকে জিজ্ঞাসা কর'গে, আমায় কেন? তুমি যাওয়ার পর, এই আজ-ছাড়া, ওঁর সঙ্গে কি আমার আর কখনও দেখা হয়েছে যে, তোমায় চিঠি লিখতে বলব?" সুবোধ কতকটা আশ্বস্ত হইল—যাক্, শেঠজী তবে আজই প্রথম আসিয়াছিল।

ভূষণ দুয়ারে দাঁড়াইয়া, কাসিয়া সাড়া দিল। সুবোধ কহিল—"দুটো সোডা রেখে দিয়ে, তুমি শোওগে ভূষণ।"

ভূষণ আদেশ পালন করিয়া চলিয়া গেল, এবং কয়েক মিনিট পরেই পা টিপিয়া আসিয়া, চুপ করিয়া জানালার নীচে দাঁড়াইল।

সুবোধ আর একটি পাত্র পূর্ণ করিয়া লইয়া, একটু ঠেস মারিয়া কহিল—"বল্‌লে না, বিজলী দেবী, শেঠজী তোমার কে? —শেঠজীই তো দেখ্‌চি এখন তোমার সর্ব্বস্ব! আমিই বরং কে! বড় অসময়ে এসে পড়েচি, না?"

বিজলী আশঙ্কা করিতেছিল—ভট্টাচার্য্য সাহেব, সুকুমারবাবু, অন্য লোক বা বিশেষ করিয়া মহাদেব সেনের সহিত পক্ষাধিক কাল দেওঘর-প্রবাস প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাপারের। শেঠজীসংক্রান্ত ব্যাপার তো কিছুই নয়। এইবার তাহার সাহস হইল। কহিল—"দেখ,' তোমার মত এমন ছোট মনের লোক আমি কখনও দেখি নাই। আমি তোমায় যে কি বল্‌ব, তা ভেবে পাচ্ছি না।"

সুবোধের মনে আগ্নেয়গিরি অগ্নিউদ্গার করিতেছিল। কহিল—"ভেবে যে কিছু পাবে না, তা বুঝ্‌তেই পার্‌চি। তবে আমার অন্ন গ্রহণ করে,' আমার আশ্রয়ে থেকে, অন্য পুরুষের সঙ্গে যথেচ্ছ

ব্যবহার করতে—তোমার যে এতটুকু বাধ্‌ল না কেন, তাই ভেবে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি। কোনও ভদ্রনারী কি তা পারে? তোমাকে শিক্ষিত ভদ্র বলেই জানতাম, আর সেই জন্যেই তোমায় গ্রহণও করেছিলাম; কিন্তু তুমি যে সাধারণ গণিকাদের চেয়েও অধম, সেটা জানলাম্ আজ।”

বিজলী এইবার তাহার পাশুপত অস্ত্র ছাড়িল। চক্ষের জলে বুক্ষবস্ত্র সিক্ত করিয়া, সতেজে কহিল—“তুমি পশু, তুমি ছোটলোক, তুমি ইতর। তোমার মুখে ভদ্রাভদ্রের কথা শোভা পায় না। আমি ভদ্রঘরের কুমারীই ছিলাম, কিন্তু কে আমায় বিবাহের লোভ দেখিয়ে, অভদ্র এই রাস্তায় টেনে এনেছে? কে আমায় তোমার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে? কে আমায় তোমার বন্ধুদের সঙ্গে মদ্যপান করতে বাধ্য করেচে? কে আমায় মদ ধরিয়েচে? লজ্জা করে না বল্‌তে? প্রথম প্রথম যখন তোমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক্, তাদের সাম্‌নেও বেরুতাম না, তখন তুমি রাগ করতে না? জোর করে আমায় টেনে নিয়ে এসে তোমার বন্ধুদের কাছে, বসিয়ে দিতে না? জোর করে, আমার মুখে মদ ঢেলে দাও নি? ও—তখন ছিল বুঝি অহঙ্কার—সুবোধ রায় কলকাতার সেরা মেয়ে বিজলীদেবীকে হস্তগত করেচে, লোককে তাই দেখিয়ে বাহাদুরী হত—আমি বুঝি না?”

সুবোধ নীরবে শুনিতেছিল। বিজলী সহজ ভাষায় কহিতে লাগিল—“আর আজ ষাঠ-বছুরে থুড়্থুড়ো, কদাকার এক বুড়ো, বাপের নয় ঠাকুর্দ্দার বয়সী, একজন পুরাণো বন্ধুকে, সন্ধ্যাবেলা একটু ড্রিঙ্ক্ দিয়ে

খেতে দিয়েছি—শুধু তোমারি সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব বলে আট্‌কে রাখার উদ্দেশ্যে—আর অমনি হিংসেয় ফেটে মর্‌চ? আমি অসতী হয়ে গেলাম, না? কি লজ্জার কথা! এটা তুমি বুঝচ' না, মুখ্যু, আমার মনে যদি পাপ থাকত', আমি যদি এ লুকোতে চাইতাম, তা'হলে, তুমি আস্‌চ' শুনেও কি আমি ওকে এ বাড়ীতে রাখ্‌তাম? লুকিয়ে আমি যদি কিছু করি, তোমার সাধ্যি কি তুমি তা' ধর'। কিন্তু আমি তা করি না। সেটা আমি ঘৃণা করি।"

সুবোধের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে অপ্রভিত হইল, সত্যই তো! অথচ, এতশীঘ্র পরাজয় স্বীকারেও, অভিমানে আঘাত লাগে।

বিজলী কহিতে লাগিল—"আর এ আজ নতুনও নয়। শেঠজী চট্‌লে আমার বিশেষ কিছু ক্ষতি নেই: তোমাকেই আবার সেই চপ-কাট্‌লেটের দোকান করে, হয় সূপশিল্পী নয় রেঁস্তোরা শিল্পী হয়ে বেড়াতে হবে, এমন ষ্টুডিওর মালিক সেজে থাকা চল্‌বে না। বলে, যার জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর—"

সুবোধ হারিয়া মরীয়া হইয়া উঠিল। কহিল—"নতুন নয় বটে, তবে সে সব হত সাক্ষাতে, অসাক্ষাতে নয়।"

বিজলী কহিল—"সাক্ষাতে যা' হত', অসাক্ষাতে তার চেয়ে বেশী কি হয়েছে, শুনি? দেখ'—এ সব চাল শিকেয় তুলে রেখে দাও গে: তোমার মত লোকের চোখরাঙানি থোড়াই কেয়ার করে বিজলী সেন—"

সুবোধ চক্ষু পাকাইয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল—"কি? থোড়াই কেয়ার করে?"

বিজলী সত্যই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। সে চিৎকার করিয়া

কহিল—"আল্‌বাৎ, থোড়াই কেয়ার করে। কেন? মার্‌বে না কি? ঢের দেখেচি। জেনো সুবোধ রায়, আমি তোমার বিয়ে-করা স্ত্রী নই যে, অকারণ তোমার চোখরাঙানী আর গলাবাজী সইব। কুল যখন ছেড়েচি একবার, তখন তুমিও যে, তোমার বাবাও সেই। যে আমায় আদর কর্‌বে, যার পয়সা খাব, তারই সেবা কর্‌ব। তোমার যদি এখানে না পোষায়, তুমি এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে বিদেয় হয়ে চলে যেতে পার। বাস্‌—আমি তোমার ও ডব্‌ডবানির ধার ধারি না!"

সুবোধ বুঝিল—এ কুকুর নয়, সাপের জাত।

বিজলী শাসাইল—"কাল যদি আদালতে দাঁড়িয়ে বলি যে, এই লোকটা আমায় বিয়ে কর্‌বে বলে, আমার সর্ব্বনাশ করেচে, তা হলে কি হয়—তা' জান?"

সুবোধের নেশার আমেজ পূর্ব্বেই ছুটিয়া গিয়াছিল। বিজলী উঠিয়া দাঁড়াইয়া আড়চোখে দেখিল, ঔষধ ধরিয়াছে। বিজলী জোরে জোরে পা ফেলিয়া, নিজের ঘরে ঢুকিয়া, সজোরে খিল আঁটিয়া দিল।

সুবোধ বিমূঢ়ভাবে সেইখানে একাকী বসিয়া রহিল। ভাবিল—এতটা বাড়াবাড়ি করা বোধ হয় ভাল হইল না।

রাত্রি তখন দুইটা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ সুবোধের বহুদিনের অভ্যাস। স্নানাদি সারিয়া সুবোধ যেমন প্রাতরাশে বসিয়াছে, অমনি এলোমেলো রুক্ষ চুল, কোঁচপড়া আলুথালু শাড়ী, উস্কখুস্ক তৈলহীন দেহ, মুখ না-ধোওয়ার দরুণ গত রাত্রের পানের ছোপে বিবর্ণ ঠোঁট ও দাঁত, লালাভঁ ঘোলা-ঘোলা চোখ, হাঁই তুলিতে তুলিতে, বিজলী ধীরে ধীরে সুবোধের সম্মুখে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইল।

সুবোধ, মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়া দেখিয়া, যেমন আহার করিতেছিল, তেমনি করিতে লাগিল। গত রাত্রের কথাবার্ত্তাগুলি প্রভাতে স্থিরভাবে আলোচনা করিয়া, সকাল হইতে সুবোধ নিজে নিজেই একটু লজ্জিত এবং অপ্রতিভ অনুভব করিতেছিল। বিজলীর কথার সারবত্ত্বা ও অভিমানের যৌক্তিকতা অনুধাবন করিয়া, তাহার শেষের কথাটিতে সুবোধ দস্তরমত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই এই অপ্রিয় ব্যাপারটিকে চাপা দিবার জন্য, যা-হয়-একটা-কিছু বলিয়া, এই দুঃসহ ভয়াল নীরবতাটি ভাঙিতে সে মাথা কুটিয়া মরিতেছিল, কিন্তু কোন কথাই তাহার আসে না। কলের মত আহার করিতেছিল বটে, কিন্তু মন তাহার আহারে ছিল না। তাহার বুকের ঢিপ্-ঢিপ্ শব্দটি পর্য্যন্ত সে শুনিতে পাইতেছিল। থালা-বাটির টুং-টাং শব্দগুলিও মনে হইতেছিল, যেন বড় জোরে হইতেছে। এ-শব্দও তাহার অসহ্য।

বিজলী কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রায় দুইমাস পরে সাক্ষাৎ, অথচ গত রাত্রি হইতে এখন পর্য্যন্ত, সে কেবল তাহাকে আঘাতই করিতেছে। এতক্ষণ সে দাঁড়াইয়া আছে, সুবোধ দেখিয়াও দেখিল না ; মুখের একটি কথায় তাহাকে একবার বসিতে পর্য্যন্ত বলিল না। বিজলী বুঝিল, এখনও সুবোধের মন হইতে সন্দেহ ও রাগ অপসৃত হয় নাই। ইহাতে বিজলীর মনটাও প্রসন্ন হইল না। বিজলী সুবোধকে জানিত, তাহার মনটা অত্যন্ত সন্দেহ-প্রবণ। স্ত্রীর সহিত সুবোধ কিরূপ ব্যবহার করিত, সে জানে না—তবে বিজলীর সহিত ঠিক এই সন্দেহ-প্রযুক্তই, ইতিপূর্ব্বে আরও দুই-একবার তাহাদের মনোমালিন্য ঘটিয়াছে এবং বহু অপ্রিয় কথার আদান-প্রদানও হইয়াছে। এমন কি, একবার সুবোধ ঝগড়া করিয়া অন্যত্র চলিয়াও গিয়াছিল। শেষে অবশ্য ভূষণের মধ্যস্থতাতেই সে ফাট বন্ধ হইয়াছে। সেই সব ইতিকথার মানসিক আলোচনা করিয়া, বিজলী সন্ধিস্থাপনা করিতে উন্মুখ। অথচ পরাজয় স্বীকার না করিয়া, অন্য কি উপায়ে তাহা সম্ভব, তাহাই তখন তাহার একমাত্র গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বিজলী মনে প্রাণে জানে, সে কি! বাহিরে সে যতই অভিনয় করুক না কেন, আসলে সেগুলি যে মোটেই সত্য নয়, তাহা তো সে ভালই জানে। কাজেই, সুবোধ যদি আজ তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহার গতি কি হইবে? গত চারি-পাঁচ বৎসর একত্র বসবাস করিয়া, সুবোধের না হইতে পারে, বিজলীর একটা মমতা যে তাহার উপর জন্মিয়াছে, এ-কথা একেবারে অস্বীকার করাও যায় না। হয়ত সেটা স্বার্থপরতা : জগৎই স্বার্থপর, এবং স্নেহ সর্ব্বত্রই

স্বার্থময়। কোনও স্নেহ আত্মিক, কোনও স্নেহ বা বস্তুতান্ত্রিক। নিঃস্বার্থ স্নেহ যে মাতৃস্নেহ—বিজলী তাহা জানে না। এক্ষেত্রে তাহা সম্ভবও নয়।

স্ত্রীলোক ভাঙ্গে, তবু মচকায় না, বিশেষত প্রণয়িনী। হাঁড়ির ভাত একটি টিপিয়া সে জানিতে চাহিল, ভাতের কি অবস্থা।

মৃদু হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"গুড্ মর্ণিং, মিঃ রায়। আপনি কি তা'হলে আজই চললেন আমায় ছেড়ে?"

সুবোধ কথা কহিবার একটা অছিলা পাইয়া, হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। সহাস্যে কহিল—"মনে তো তাই করেছি, দেখি—"

বিজলী বুঝিল—এ যুদ্ধে জয়ী সে হইয়াছে সত্য, কিন্তু এ জয়ের ডিক্রি জারী করিতে গেলে, হারিবে সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কাজেই, বুদ্ধিমতী সে, নৌকার হাল ঘুরাইয়া দিয়া কহিল—"কেন? মনে আবার করা কেন? কত ভাল-ভাল মেয়ে তোমার জন্যে পথে দাঁড়িয়ে আছে দেখ' গে—একবার তু' করে ডাক্‌লেই দেখবে, দশ-বিশ জন এসে হাজির হবে'খন।"

সুবোধ আহারান্তে হাত মুখ মুছিতে মুছিতে, উচ্চহাস্যের সহিত কহিল—"বল কি? তা'লে দেখব' নাকি একবার চেষ্টা করে এই বুড়ো বয়সে?"

সুবোধের বয়স প্রায় চল্লিশ।

বিজলী চোখের ও মুখের এক বিচিত্র ভঙ্গীতে, সুবোধের গায়ে একটি মৃদু ধাক্কা মারিয়া কহিল—"আর কাজ নাই অত পৌরুষে!—খুব বাহাদুর—"

ভূষণ কহিল—"টেক্সি এয়েছে, দাদাবাবু—"

"আমার ব্যাগটা তুলে দাও—" বলিয়া, বিজলীকে কহিল—"তা' হলে যথারীতি ভূষণকে দিয়ে ষ্টুডিওতে আমার খাবারটা পাঠিয়ে দিও। আমি চললাম—দেখি গিয়ে, সেখানে আবার কি অবস্থা।"

"না, তা দেব না"—বলিয়া বিজলী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। সুবোধও সে হাসিতে যোগ দিয়া, হাল্কা হইয়া বাঁচিল।

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"কিসের মাংস হবে? লুচি খাবে না পরটা খাবে? চাট্‌নী কিসের দেব, আমের না লেবুর?—"

—"যা হয় দিও। তোমার যাতে রুচি, আমারও তাতেই। ঐ আর রোজ-রোজ জিজ্ঞাসা কর' কেন, বলত'? কবি বলেছেন—

'তোমার রুচিতে আমার রুচি'—" সুবোধ মিল খুঁজিতে লাগিল।

বিজলী কহিল—"হাঁ হাঁ, ঠিক—কবিনীও তাই বলেছেন—

—'তুমি গরু আর আমি তব মুচি'।"

উভয়ে আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

সুবোধ বলিল—"না না গরু নয়—

তোমার রুচিতে আমার রুচি
হউক্ পান্তা, পোলাও লুচি—"

আবার উভয়ের হাস্য।

দুইদিক হইতেই মেঘ কাটিয়া গেল। দুইজনেই স্বস্তির পুলকে তাজা হইয়া উঠিল।

সুবোধ তাড়াতাড়ি কোটটা পরিতে পরিতে মৃদু হাসিয়া কহিল—"বিজলী তো বিজলীই বটে। শক্ বড় কম মারে না।"

বিজলী গদগদ ভাবে সুবোধের গালে মৃদু একটা টোকা মারিয়া উত্তর দিল—"বিজ্‌লী শক্ মার্‌বে না তো কি, ফজ্‌লীর রস ছুঁড়বে ?"

সুবোধ সিঁড়িতে নামিতে নামিতে কহিল—"রসে আর কাজ নেই, শক্ না মার্‌লেই বাঁচি।"

বিজলী বালিকার মত খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া, বারান্দায় ঝুঁকিয়া হাত নাড়িয়া, ইংরাজী কায়দায় বিদায় দিয়া, কল ঘরে ঢুকিল।

সুবোধের ট্যাক্সি যেমনি মোড় ফিরিল, অমনি বিপরীত দিক হইতে আর একখানি দামী বড় মোটর আসিয়া, বিজলীর বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে তড়াক করিয়া নামিয়া, বিলাতী পোষাকে সজ্জিত এক ভদ্রলোক সোজা দ্বিতলে উঠিয়া আসিয়া, হলঘরের সামনে দাঁড়াইয়া, ডাকিলেন—"ভূষণ—"

ভূষণ বিজলীর শয়নকক্ষ পরিস্কার করিতেছিল, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া নমস্কার করিয়া কহিল—"দিদিমণি কলঘরে, আপনি একটু বসুন, সার।"

ভট্টাচার্য্য সাহেব সোফায় পা ছড়াইয়া হেলান্ দিয়া আরামে বসিলেন। ভূষণ ছাইদানসহ একটা টীপয় আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া গেল।

মিঃ ভট্টাচার্য্য কলিকাতার একজন বিশিষ্ট ধনী ও সুবিখ্যাত লোক। পয়সাকড়ি, ঘরবাড়ী, মোটরগাড়ী প্রভৃতি, বর্ত্তমান্ সভ্যযুগে সৌখীন ও ধনী বলিয়া প্রচারিত হইতে হইলে, যে-সব উপকরণের আবশ্যক—ভট্টাচার্য্যের তাহার কোনোটিরই অভাব ছিল না। সর্ব্ব সমাজে ও সম্প্রদায়ে প্রকাশ ভট্টাচার্য্যের অবাধ গতিবিধি।

প্রকাশ কলিকাতার একজন সার্ব্বজনীন অতিথি: অর্থাৎ, শহরে এমন কোনও উৎসব, চা-পার্টি, লাঞ্চ, ডিনার, বৈকালী, সভা-সমিতি বা জলশা হয় না, যাহাতে প্রকাশের নিমন্ত্রণ হয় না, এবং সেও হাজির থাকে না।

গভর্ণমেণ্ট-হাউসে যেমন নিমন্ত্রিতব্য লোকের এক ফিরিস্তি থাকে, কিছু হইলেই, অমনি সেই ফর্দ্দদৃষ্টে নিমন্ত্রণলিপি ছাড়া হয়—কলিকাতার বর্ত্তমান সুসভ্য অভিজাত সমাজভুক্ত মহামনীষীগণের বাড়ীতেও, আজকাল তদনুরূপ একটি সার্ব্বজনীন্ অতিথির তালিকা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। প্রকাশ ভট্টাচার্য্যের নাম যে উক্ত সব পরিবারের সমস্ত ফর্দ্দেই বর্ত্তমান—তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। প্রকাশ একজন সার্ব্বভৌম ব্যক্তি।

সারকুলার রোড, সিমেট্রি, কেওরাতলা ও নিমতলার শ্মশান হইতে আরম্ভ-করিয়া, ফার্পো, গ্রেটইষ্টার্ণ হোটেল, জমিদারী কাছারী, রাজবাড়ী, সর্ব্বপ্রকার চেম্বার, বাগান-বাড়ী, ষ্টীমার-পার্টি, টাউন হল্, ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট্, ক্লাব, লেক্, পার্ক, স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী সভা, পিঁজরাপোল, ফিল্ম ষ্টুডিও, রামকৃষ্ণ মঠ, কুষ্ঠাশ্রম, থিয়েটার-মঞ্চ, মদ্যপান-নিবারণী সভা, চরিত্রসংগঠনী সমিতি, সুনীতিসংরক্ষিণী সভা, ব্যায়াম সমিতি, খেলার মাঠ, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, হরিসভা, কালীবাড়ী প্রভৃতি বহু প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য স্থানে ও অস্থানে—সর্ব্বত্রই প্রকাশচন্দ্রের যথাবিধি নিমন্ত্রণ হয় এবং সেও রীতিমত যাতায়াত করে।

কিন্তু এ-হেন সার্ব্বজনীন এবং সার্ব্বভৌম প্রকাশের ভাগ্যে, এত সুখ সত্ত্বেও, বিবাহিত জীবনের সুখ কখনও মিলে নাই। তাহার প্রথমা পত্নী হঠাৎ কলেরায় (?) মারা যাইতে, পনের দিনের মধ্যেই সে দ্বিতীয়বার

দারপরিগ্রহ করিল। কিন্তু ইনিও, শোনা যায়, অব্যবহার্য্য। ইঁহার নাকি মাথা খারাপ হইয়া, এক্ষণে সম্পূর্ণ উন্মাদ অবস্থায় পিত্রালয়েই থাকেন। ডাক্তার কবিরাজেরা নাকি এমনও বলিয়াছেন যে, স্বামী-সন্দর্শনেই রোগিণীর মৃত্যু অবধারিত। এই কারণে, এ-স্ত্রীর সহিতও প্রকাশকে নিতান্ত অনিচ্ছা এবং দুঃখের সহিতই, সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।

প্রকাশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশের প্রচার-সচিব। ইনি কারণে অকারণে সর্ব্বত্র প্রকাশের গুণ কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান। ইনি বলেন, তাহাদের জীবংকালে, প্রকাশ স্ত্রী দুইজনকে এত ভালবাসিত যে, স্ত্রী ছাড়া দিবা-রাত্র তাহার অন্য কোনও চিন্তাই ছিল না। পত্নী-প্রেমে প্রকাশ একমাত্র শ্রীশ্রীরামচন্দ্রেরই সমতুল্য। কাজেই স্ত্রীর শোকে, প্রকাশ সহমরণের সুবিধা না পাইয়া, অপমরণের জন্যও প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা, প্রকাশকে বাধা দেয়। প্রকাশ না-মরিয়া, কোনওরূপে বাঁচিয়া রহিল। তাহার ঘরের চতুর্দ্দিকে কেবল দুই স্ত্রীর দামী এন্-লার্জমেণ্ট ও তৈলচিত্র। পত্নী-শোকেই সে এমন ম্রিয়মান ও উদাসীন।

প্রকাশ এক রকম সন্ন্যাসী বলিলেই চলে! কিছু না-করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে, পাছে পত্নীদ্বয়ের শোকে এবং দুর্ভাবনায় হৃদরোগ হয়, কিম্বা সংসারে বৈরাগ্য জন্মে, তাই সে অগত্যা আফিস যাতায়াত করে। পুত্র কন্যা কেহই নাই, কাজেই সংসারেও তাহার কোন বন্ধন নাই। প্রকাশ রাজযোগী, কর্ম্মযোগী।

দরদী আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যেই, প্রকাশ রাজর্ষি জনকের মত নির্লিপ্তভাবে সংসার করিতেছে। ইঁহারা এমন জোর না

করিলে, এত দিন হয়ত কবে প্রকাশ, হয় লোটা-কম্বল লইয়া বদ্রী-কেদারের পথে মহাপ্রস্থান করিত, আর নয়, রামকৃষ্ণ মঠে গিয়া নাম লিখাইয়া সন্ন্যাসী হইত।

হিতৈষীগণ প্রকাশকে সংসারেই রাখিয়াছেন, কিন্তু সংসারী করিতে পারেন নাই। উদাসীন প্রকাশচন্দ্র সেই জন্য বাড়ীতে প্রায় থাকেই না। সর্ব্বদাই বাহিরে কোন-না-কোন একটা সাধারণ জনহিতকর, যেমন পল্লী-গঠন, জাতিউন্নয়ন কিম্বা দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া, আক্রমণোদ্যত ভীষণ বৈরাগ্য-দৈত্যকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া, কোন রকমে দিনাতিপাত করে। বাড়ীতে বড় ও ছোট একুণে তিনটি সহোদর আছে, তাহারা প্রকাশের এই রাজ-যোগে সর্ব্বদাই শঙ্কিত।

প্রকাশের বয়স প্রায় চল্লিশ। দোহারা গড়ন, আবলুশ-বার্ণিশ রং, মুখে বসন্তের দাগ, দাড়িগোঁফ্ কামান, মুখটা গোল, কাণ দুইটি ছোট, নাকটা চ্যাপ্টা, নাকের ডগাটা মোটা এবং একটু বেগুনী রঙের, চোখ দুইটা গোল-গোল ছোট-ছোট কটা-রঙের, হাতের আঙ্গুলগুলি খাট-খাট মোটা-মোটা, পেটটি মোটা, কালো পুরু ঠোঁট, ফুলো গাল, শাদা দাঁত, মুখে বার্ম্মা চুরুট। শাদা দামী তস্‌রেটের স্যুট, ভেষ্টের দুই পকেটে ঢোকান, ভুঁড়ির উপর মোটা সোনার চেন—দেখিলেই মনে হয়, একজন রীতিমত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতেই, সদ্যস্নাতা বিজলী সুগন্ধিযুক্ত এলোচুলে একখানা পাত্‌লা ডুরে শাড়ী পরিয়া, সমস্ত ঘরখানিতে সুরভির একটা দমকা হাওয়া বহাইয়া, প্রবেশ করিতে করিতে, ইংরাজীতে কহিল—"বড্ড দুঃখিত, অনেক ক্ষণ তোমায় বসতে হয়েছে, না প্রকাশ ডার্লিং?"

ভট্টাচার্য্য সাহেব প্রীতভাবে উত্তর করিলেন—"কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, বস—"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"তারপর হঠাৎ, এমন অসময়ে যে? ভুল করে এখানে এস নি তো?" বলিয়া একই সোফায়, ভট্টাচার্য্যের পাশে তাহার গা ঘেঁসিয়া, ধপ্ করিয়া বসিয়া, পা দোলাইতে লাগিল!

উভয়ের সম্মুখে ভূষণ একখানা ছোট টেবিল আনিয়া, তাহার উপর চায়ের সরঞ্জাম, কয়েকখানি টোষ্ট, দুইটি হাফ-বইল্ ডিম, মাখন, কিছু আঙ্গুর, লেবু, শশা ও চারিটী ভাল সন্দেশ রাখিয়া চলিয়া গেল। ভট্টাচার্য্যের দিকে এক পেয়ালা চা এবং খাবারগুলি সরাইয়া দিয়া, বিজলী ইংরাজীতে কহিল—"ইচ্ছা কর।"

প্রকাশচন্দ্র একদম সাহেব, দেহের রংটি ছাড়া। একখানা টোষ্টে মাখন মাখাইতে মাখাইতে কহিল—"রাস্তা ভুলি নাই, তবে মনের ভুলে বলতে পার।"

বিজলী মুখের এক বিচিত্র ভঙ্গী করিয়া ও চোখ পালটিয়া, কহিল "চালাকী রাখ'। সে দিন প্যারামাউণ্ট সিনেমায় যাকে দেখেছিলাম, তোমার সে বান্ধবীটি কেমন আছে? কি নাম না তার? ছন্দা, হাঁ, হাঁ—ছন্দা। কত দিতে হয় তাকে মাসে?"

প্রকাশ জিভ্ কাটিয়া কহিল—"কি বল, বিজলী দেবী! সে এক মস্ত লোকের মেয়ে, কলেজে পড়ে! সে পয়সা নেবে কি?"

বিজলী বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"ও—তা'হলে তো ভালই। তার বাপ-মা তাকে এ-ভাবে রাত-দুপুর পর্য্যন্ত একলা ছেড়ে দিতে কোনো আপত্তি করে না?"

প্রকাশ কহিল—"ভদ্রলোকের সঙ্গে ছেড়ে দিতে আপত্তি কেন করবে? আর সে মেয়েও তো কচি খুকী নয়, বা মুখ্যুও নয়। সে এইবার বি-এ দেবে। এরা হচ্ছে এ-যুগের প্রগতিশীলা মেয়ে—আপত্তি করলেই বা শুনচে কে?"

বিজলী কহিল—"তা'হলে তো তোমাদের ভারী মজাই হয়েচে, বল'—"

"হাঁ, তা একটু হয়েছে বৈ-কি"—অর্থসূচক প্রসন্ন হাস্যের সহিত ভট্টাচার্য্য সাহেব চা-পানে মনোনিবেশ করিলেন।

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"এমন আর কতগুলি বান্ধবী তোমার আছে? সত্যি বল, প্রকাশ, মিছে কথা বলো না। জানতে আমার ভারী ইচ্ছে হয়, বাঙালীর মেয়েরা সভ্যতার মানস-সরোবর-পথে কতদূর এগুলো—"

প্রকাশ ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"ইচ্ছে করলে জোটে অনেকই, তবে আমি ইচ্ছে করেই জোটাই না। আমার মাত্র দুটী তিনটী সম্বল। এ-বিষয়ে জীবানন্দ রাজা বললেই হয়। একদিন জীবাকে নিয়ে আসব, শুন' তার কাছে, কত শুনতে পার। ছত্রপতি শিবাজীর অনুকরণে, জীবানন্দকে আমরা বলি—ছাত্রীপতি জীবাজী।"

বিজলী বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"বল কি, প্রকাশ?"

প্রকাশ কহিল—"এ আর বলাবলি কি? নিজের যদি একখানা গাড়ী থাকে, আর প্রত্যহ গোটা দশেক টাকা কেউ বাজে খরচ করতে পারে, তা'হলে অনায়াসে তার রোজ একাধিক নতুন নতুন বান্ধবী জুটতে পারে আজকাল।"

বিজলী চিন্তিতভাবে চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিতে দিতে, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মরুক্ গে। তারপর, ব্যাপার কি ?"

ভট্টাচার্য্য সাহেব অত্যন্ত বিনয়সহকারে কহিলেন—"এই তোমার কাছে একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে এসেছি, মিস সেন : আমরা তিন-চার জন বন্ধু, পরশু সন্ধ্যার ট্রেনে কাশ্মীর যাচ্ছি, সবার সঙ্গেই এক-একজন বান্ধবী থাকবেন। আমি তাই তোমার কাছে এলুম, তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও তো, খুব আপ্যায়িত হই। মাস দেড়েকের মধ্যেই আমরা ফিরবো। যাবে দয়া করে ? বল'—বল'—ভাবচ কি ? লক্ষ্মীটি—"

বিজলী কিঞ্চিৎ বিমর্ষভাব দেখাইয়া কহিল—"নিশ্চয়ই যেতাম। কাশ্মীর যাবার আর কার না ইচ্ছা হয়, তবে কি জান ? সম্প্রতি আমার একটু মুস্কিল হয়েচে।"

"হুর্‌রে" বলিয়া ভট্টাচার্য্য আনন্দে হাততালি দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল—"বাস্ !"

বিজলী কহিল—"বাস্ বলে' যে লাফিয়ে উঠ্‌লে ? আমার কথাটাই তো শুন্‌লে না।"

ভট্টাচার্য্য অধীর পু[illegible] বিজলীর গালে একটি মৃদু চপেটাঘাত করিয়া কহিল—"যেটুকু আমার শুন্‌বার দরকার, সেটুকু ঠিকই শুনেচি। বাকী যা আছে, এইবার বল'—খুব মন দিয়ে শুন্‌চি।"

বিজলী বিশেষ উৎসাহ না দেখাইয়া কহিল—"কাজলামী নয়, শোন' ভাল করে'। বস' দিকিন একটু ঠাণ্ডা হয়ে আমার কাছে—এখানে, এইখানে—আমার কাছে এস, আরো সরে' এসে বস ! হাঁ, শোন' এইবার—আমার যাওয়ার একটু অন্তরায় আছে, ভাই—"

ভট্টাচার্য্য হরিষে বিষাদ আশঙ্কায় হতাশভাবে বিজলীর মুখপানে চাহিয়া, ঝুঁকিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল—"অন্তরায়? অন্তরায় আবার কিসের? এই যে বল্‌লে, নিশ্চয়ই যাব—"

বিজলী বিষণ্ণ ভাবে কহিল—"'যাব' বলি নি, বলেচি 'যেতাম'। জান' তো, রায় দেশে গেছে আজ দু' মাস। বাড়ীর ভাড়া বাকী, প্রায় ছ'মাস; ধোপা, নাপিত, চাকর, বামুন, কেউ একটি পয়সা পায় নাই—এ অবস্থায় আমি কি করে যাই, তা' বল? এই দেনা মেটাতে এখন চাই অন্তত পাঁচশো টাকাঃ তোমার হুকুম শুন্‌তে গেলে—গয়নাগুলো আমায় সব বেচ্‌তে হয়। ধর', তোমার বাঞ্ছিত সঙ্গ পাবার লোভে, না হয় বেচলামই; কিন্তু গয়না বেচে, খালি গায়েই বা তোমার বান্ধবী হয়ে, তোমার সঙ্গে যাই কি করে? লোকে কি বল্‌বে? মস্ত সমস্যা!"

ভট্টাচার্য্য সাহেবকে লোকে জানে, বাজে খরচ তিনি মোটেই করেন না, সন্ন্যাসী মানুষ! কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গেরা জানে, গণহিতার্থ ঈদৃশ সৎকার্য্যে তিনি দাতা কর্ণেরও নমস্য।

গম্ভীরভাবে কহিলেন—"এই কথা? কি আশ্চর্য্য, বিজ্‌—তুমি একটা নির্ব্বোধ হংসী! ভূষণকে ডাক'—"

বিজলী ভুষণকে ডাকিল। ভূষণ আসিয়া দাঁড়াইতেই, প্রকাশ তাহাকে গাড়ী হইতে তাহার ব্যাগটা উপরে আনিতে কহিল।

ভূষণ ব্যাগ আনিল।

ব্যাগ খুলিয়া, একশো টাকার পাঁচ খানা নোট বিজলীকে দিয়া, বিজলীর মাথাটি সাদরে বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া, প্রকাশ কহিল—

"আ—ক্ষুদে শয়তান্। মনে করেচ'—আমায় ঠকাবে, না? এইবার? বাস্—আজ আর কাল, এই দুই দিনে, যে যা' পাবে মিটিয়ে দিয়ে, ঠিক হয়ে থাকা চাই। পরশু যাওয়া একদম্ পাকা। হাঁ, কাপড়-চোপড় কেনাকাটা কর্‌তে, আমি না-হয় সন্ধ্যেবেলায় আর একবার আস্‌ব, কেমন?"

বিজলী কৃতজ্ঞতায় ও প্রেমে গদগদ হইয়া ভট্টাচার্য্যের ভুঁড়িলগ্ন হইয়া ইংরাজীতে কহিল—"তুমি একজন দেবদূত! সত্যি, এইজন্যে তোমায় আমি এত ভালবাসি। কখনও তোমার কোনও কথাই তাই না-রেখে পারি না।"

প্রকাশ কহিল—"তা জানি ডিয়ার, তাই আমিও এ প্রস্তাব করতে সাহসী হয়েচি। আর এ-ও জানি, তুমি সুবোধকে ছেড়েও আমার সঙ্গে যেতে অস্বীকৃত হবে না। ভালই হয়েচে, সে ইডিয়টটা এ সময় এখানে নেই। ভগবান আমার সহায়।"

বিজলী একটু শ্লেষের সহিত কহিল—"তা তো হল! এ সময় তোমার সেই ছন্দা-গন্ধা-মন্দারা গেল কোথায়? তাদের কাউকে নাওগে না?"

প্রকাশ প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া গেল। কহিল—"তোমার মত এরাও তো এ-যুগেরই প্রগতা মেয়ে, বিচ্ছু! অথচ তোমার সঙ্গে এদের কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ—দেখ'।"

ভট্টাচার্য্যের বুকে ধিকিধিকি করিয়া তুষের যে আগুন জ্বলিতেছিল, হঠাৎ তাহা পেট্রোলের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

বিজলী প্রকাশের ভুঁড়ি ছাড়িয়া কণ্ঠলগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমার টেলিফোন্ নম্বরটা আমায় লিখে দিয়ে যাও, ডার্লিং। যদি তোমার সঙ্গে একটু কথা কইতে মন হয়?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়—এতো আমার সৌভাগ্য—" বলিয়া প্রকাশ একখানি কার্ড বাহির করিয়া, তাহার উল্টা পিঠে টেলিফোন্ নম্বরটি লিখিয়া দিল।

বিজলী বাঁকা চোখে চাহিয়া কহিল—"যাই বল', প্রকাশ, আমার চেয়ে তোমার বান্ধবীরা কিন্তু ঢের বেশী সুন্দরী আর শিক্ষিতা! তারা বহু গুণে শ্রেষ্ঠা সঙ্গিনী! আমার সঙ্গে কি তাদের কখনো তুলনা হয়? সত্যি, তাদের কাউকেই চেষ্টা কর', ভাল হবে—"

প্রকাশ মৃদু হাসিয়া কহিল—"এখনও নষ্টামি? স্ত্রীলোক জাতটাই বড় হিংসুটে—"

সুবোধের সহিত গত রাত্রের ঘটনা বিজলীর মনে উজ্জ্বলভাবে দীপ্যমান্ ছিল। কষায়কণ্ঠে কহিল—"স্ত্রীলোক হিংসুটে, আর যত মহানুভব, পুরুষেরা—না? দেখ, প্রকাশ, তুমি বেশী চালাকী করো না, তোমরা যে কি, তা' আমি ঢের জানি।"

প্রকাশ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল—"কি জান?"

বিজলী তেমনি সোৎসাহে কহিল—"স্ত্রীলোক তাদের স্বামী বা প্রণয়ীকে অন্যাসক্ত জেনেও, ক্ষমা করে, গ্রহণ করে এবং সেবা করে—অথচ পুরুষ স্রেফ্ সন্দেহ করেই, মহা অশান্তি ও অনর্থ ঘটায়।"

প্রকাশের মনের সপ্তস্বরা বীণার সব কয়টি তারই উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল, সহসা কি করিয়া যেন সব কয়টিই একসঙ্গে ছিঁড়িয়া গেল হঠাৎ প্রকাশ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

বিজলীর চক্ষু তাহা এড়াইল না। প্রসঙ্গটি ঘুরাইতে এবং প্রকাশের মনের বন্ধ ঘড়িটি চালাইবার জন্য, সরসভাবে প্রশ্ন করিল—"সত্যি, নাও না তোমার ছন্দাকে তোমার কাশ্মীরযাত্রার সঙ্গিনী করে? কেন সে যাবে না?"

প্রকাশ কহিল—"কি জান বিজলী, তারা হচ্ছে বাটন-হোলের ফুল—পথে বেরুতে হ'লে, বাটন্‌হোলে বেশ মানায় ভাল; কিন্তু তাদের দিয়ে মালা গাঁথা যায় না। যাক্, তাহ'লে এখন আমি উঠলাম। কথা সব ঠিক তো?" যথাযোগ্য বিদায়ী লইয়া প্রকাশ দ্রুত প্রস্থান করিল।

বিজলী নোট পাঁচখানি নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিয়া, বসিবার ঘরে বসিতেই, ভূষণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"একি কর্‌লেন দিদিমণি? দাদাবাবু যে এয়েছে, সেটা কি ভুলে গেলেন?"

পাখীর পালকের মত বিজলীর মনটা তখন লঘু। উচ্চহাস্য করিয়া কহিল—"ভুলি নি রে, ভুলি নি। হাতের-পাচ কি কেউ ছাড়ে কখনও?"

ভূষণ বিহ্বল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি করে যাবেন তা' হলে দিদিমণি? সুবোধবাবুকে ছাড়বেন—"

বিজলী ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"যাবও না, সুবোধকেও ছাড়ব না। দেখ্ না তুই। তুই শুধু চুপ করে বসে থাক্, আর দেখে যা'—কাউকে কেবল কিছু বলিস নি। সংসার কি করে করতে হয়, শেখ। আজ বাদ কাল তোর বউ আস্‌বে—সংসারী হ'তে শেখ্, ভূষণ, ওড়ম্বা হয়ে আর কদ্দিন বেড়াবি?"

ভূষণ মাথা চুলকাইতে লাগিল। কিছুই বুঝিল না, জিজ্ঞাসা করিল—"দাদাবাবু জান্‌তে পার্‌লে কি কেলেঙ্কারীটা হবে বলুন দেখি—"

বিজলী আশ্বাস দিল—"জান্‌তে পার্‌লে তো? তুই ভাব্‌চিস্‌ কেন ?"

ভূষণ কহিল—"তা' হলে টাকাটা তো ফেরৎ দিতে হবে—"

বিজলী কহিল—"পাগল ? টাকা একবার এলে কখনো কি কেউ তা' হাত-ছাড়া করে রে বোকা ?"

ভূষণের মাথা একেবারে খারাপ হইয়া গেল। তাহার সব গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। সে ভাবিয়াই পাইল না, এই কাশ্মীর-যাত্রা ও কলিকাতা-বাস, একসঙ্গে দুই কাজ, কি করিয়া করা যাইতে পারে।

বিজলী কহিল—"তুই ভাবিস্‌ না, ভূষণ, কোনও ভয় নেই টুডিও হ'তে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে, বেলা পাঁচটার আগে তুই একবার ভট্‌চাজ্জের চেম্বারে যাবি। গিয়ে ভট্‌চাজকে বল্‌বি যে, সুবোধ রায় হঠাৎ দুপুর বেলায় এসে গেছে। আপনি যেন সন্ধ্যে বেলায় আর যাবেন না। কাল দিনে দিদিমণি আপনাকে টেলিফোন করলে, একবার যেন এখানে আসেন—বুঝ্‌লি ? তারপর দেখ্‌বি—সব জল হয়ে গেছে।"

ভূষণ আব্‌ছা একটু যেন বুঝিল, কিম্বা বুঝিল না—বুঝা গেল না। ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বিজলী কহিল—"খাওয়া-দাওয়াটা তা'হলে চল' তাড়াতাড়ি সেরে ফেলিগে। আমি তোমার টেঁপীকে তোমার সঙ্গে গাঁঠছালা বাঁধিয়ে তবে ছাড়্‌ব। তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো ভূষণ। ভুলো না, তুমি আমার ভাই।"

ভূষণের মন খুশীতে ভরিয়া উঠিল। কহিল—"আমি তো, দিদিমণি, আপনার ভরসাই করি।"

বহুদিন পূর্ব্বে বিজলী থিয়েটারে সে 'জয়দেব' অভিনয় দেখিয়াছিল। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল তাহারি একখানি গান। ভাবাতিশয্যে বিজলীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধানিবেদনের উদ্দেশ্যে সোৎসাহে সে কহিল—

"তুমাসি মম জীবনং তুমাসি মম ভূষণং
মম শিরসি মুণ্ডনং সর-গরল খণ্ডনং—

কিনা, তুমি ভূষণের মাসী, মাসীই ভূষণের জীবন। তুমি আমার মাথা মুণ্ডন করে, কিনা মাথা মুড়িয়ে, সর আর ঘোল ঢেলে দাও। "দেহি পদপল্লবমদারং"—অর্থাৎ মাদারং—মা জননী, দাও, পায়ের ধুলো দাও—"

পরম ভক্তিভরে ভূষণ বিজলীর পদধূলি লইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বাড়ী হইতে ফিরিয়া, বহুদিন পরে ভূষণ ষ্টুডিওতে এই প্রথম আসিল: পরম উল্লসিতভাবে লঘুপায়ে ষ্টুডিওর সর্ব্বত্র ঘুরিয়া, সকলকে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইল: ষ্টুডিওর মালী, ভিস্তি, এমন কি, কুলিগুলি পর্য্যন্ত ভূষণের আপ্যায়ন হইতে বঞ্চিত হইল না।

সুবোধ নিজের কক্ষে বসিয়া পরিচালক ভূদেব মহাপাত্রের সহিত, কোম্পানির এবারকার নিজস্ব বাংলা ছবিখানি কি হইবে, কিরূপ হইবে, কেমন করিয়া হইবে—সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। ভূষণ সংবাদ পাইয়া, আস্তে আস্তে সেই ঘরে আসিয়া, এক পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া, মনোযোগসহকারে ইঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল। বিজলীদেবীর ভাই এবং সুবোধবাবুর প্রিয়পাত্র হিসাবে, ভূষণের সর্ব্বত্র অবাধ গতি।

ভূষণকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ রসাবিষ্ট হইয়া, ভূদেব জিজ্ঞাসা করিল— "আরে, নটহস্তী যে? এতদিন কোথা ছিলে?"

ডিরেক্টারের সাদর প্রশ্নে পরমোৎফুল্ল হইয়া, আদরে বাঁকিয়া চুরিয়া, ত্রিভঙ্গ হইয়া, গদগদ ভাবে ভূষণ উত্তর দিল—"আজ্ঞে, এইখানেই তো ছিলাম সার। একদিন আমি এয়েছিলাম, সার, আপনাকে বিজয়ার পেন্নাম করতে ইষ্টুডিওতে—আপনি তখন মাদ্রাজী ছবির শূটিন্ কর্‌ছিলেন, সার—"

সুবোধ কি লিখিতেছিল। হঠাৎ মুখ তুলিয়া বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা

করিল—"কাজকর্ম্ম না থাকলে এখানে আসা নিষেধ জান না? তুমি ষ্টুডিও এসেছিলে কি জন্যে?"

কথাকয়টি বলিয়া ফেলিয়াই ভূষণ কিন্তু বুঝিয়াছিল, সঙ্কট সন্নিকট। তবুও এই বিষম বিপত্তির মধ্যে একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া, কোন রকমে তোঁৎলাইতে তোঁৎলাইতে, ভূষণ কহিল,—"ইষ্টুডিওর ভেতরে আমি আসি নেই, দাদাবাবু, মাইরি বল্‌চি!—এই দিক্ দিয়ে যেছিলাম, ফটকে দারোয়ান্‌জী ডাকুল—তাই এক্‌টু দাঁড়িয়েছিলাম মাত্র। রুল্ আমি জানি, হুজুর।"

ভূদেব হাসিয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি যে এখানে ছিলে, তাতো জান্‌তাম না—"

ভূষণ কিঞ্চিৎ নিকটে আসিয়া, লিখনরত সুবোধের পানে আড়চোখে চাহিয়া, ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"ক্যানে সার্? কোনও কাজ-টাজ ছিল নেকি?"

ভূষণকে একটু খুশী করিবার নিমিত্ত ভূদেব কহিল—"কাজ আর কি এমন হাতী-ঘোড়া! সাম্‌নে থাক্‌লেই কাজ হয়। আর তা' ছাড়া, তোমার মত এক জন নামজাদা য়্যাক্টারের কাজের অভাব কি? তোমার কথা আমার একবার মনেও হয়েছিল, বুঝ্‌লে? তারপর ভাব্‌লাম, তুমি হয়ত এখানে নেই; তাই ঐ উড়ে-মালীটাকে দিয়েই কাজটা সেরে নিলাম।"

ভূষণের বড় দুঃখ হইল। আর একবার ছবিতে আক্টো করিবার সুবর্ণ সুযোগটি এমন করিয়া মাঠে মারা গেল? এ শুধু দুর্ভাগ্যই নয়, গভীর পরিতাপের বিষয়ও—সন্দেহ নাই।

বিষণ্নভাবে ভূষণ জিজ্ঞাসা করিল—"মাদ্রাজী ছবিতে, সার্? কি পাট সার?"

ভূদেব উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, সুবোধ তাহার দিকে এক তাড়া কাগজ আগাইয়া দিয়া কহিল—"এই নাও এষ্টিমেট্। এই টাকার মধ্যে পার্বে তো ছবি শেষ কর্তে? এবার কিন্তু এমন ছবি তুলতে হবে যাতে পয়সা পাওয়া যায়। জান তো—শেঠজী কি বলেছেন? এবার পয়সা না পেলে, কোম্পানি তিনি উঠিয়ে দেবেন—"

ভূদেব তাহার ট্যারা চক্ষুদুইটি ট্যার্‌চাভাবে একবার কাগজের উপর বুলাইয়া লইয়াই, সজোরে টেবিলে এক কিলাঘাত করিয়া, উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল—"কি বলেন সুবোধদা? বত্রিশ হাজারে একখানা বাংলা ছবি হবে না? একি ছেলেখেলা নাকি? বত্রিশ হাজারে—ছবি ছেড়ে, ছবির শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত হয়ে যেতে পারে।"

কথাটি খুবই সত্য। ইতিপূর্ব্বে ভূদেব ইহা অপেক্ষা অল্পব্যয়েই, রয়্যাল ফিলিমের তিন-তিনখানি ছবির শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া অনায়াসে সুসম্পন্ন করিয়াছে।

সুবোধ একটি সিগারেট ধরাইয়া, প্যাকেটটি ভূদেবের দিকে আগাইয়া দিয়া বিজ্ঞভাবে কহিল—"বাংলা ছবি, পঁচিশ-ছাব্বিশ হাজারের বেশী লাগ্‌তেই পারে না। তবে এবার আমি কল্‌কাতার সব সেরা আর্টিষ্টকে এই ছবিতে নামাব বলেই, বত্রিশ হাজারে উঠেচি। দেখি একবার শেষ চেষ্টা করে। এর উপর যিনি যাবেন, তাঁর কপালে তেঁতুল গোলা অনিবার্য্য! দেখ্‌চ তো, বেঙ্গল টকীজের দুর্দ্দশা?"

সুবোধকে সমর্থন করিয়া ভূদেব কহিল—"বেঙ্গল টকীজের কথা স্বতন্ত্র,

ও ছেড়ে দিন্, সুবোধদা। ওরা ব্যবসা করতে বসে নাই, ওরা বেকার-পালন আর অধম-তাড়ন করতে নেমেছে! রাজেন্দ্র মল্লিকের সদাব্রত-খানা আর বেঙ্গল টকীজের ষ্টুডিও-খানা—দুইই একজাতীয়। নৈলে, লাখ্-দেড়্-লাখ্ ফুট ফিলিম নষ্ট করে' কি, এক-একখানা ১০।১২ হাজার ফুটের ছবি কেউ করে? লোকের ওখানে লেখাজোখা নেই, মাইনেও অসম্ভব! দেশে যত ন্যাড়া-বুনে ছিল, ওখানে গিয়ে সবাই কীর্ত্তুনে হয়ে পড়েচে। কাজ করুক্ আর নাই-করুক্—মাসের পর মাস মাইনেটা ঠিকই পায় সবাই। শোনা যায়, কেউ কেউ নাকি দু'তিন বছরের মধ্যে একখানা ছবিতে, সামান্য একটা ছোটখাট ভূমিকাতেও নামে না, অথচ মাইনে ঠিকই পেয়ে যাচ্ছে। দেখেন না, ওখানে সব হ্যাট-কোট-পরা, সিগারেটের টিন্ হাতে, বুলি-দোরস্ত এক-একটি মাল ঘুরচে—যেন এক-একটি শিঙাপুরী কাকাতুয়া! কাছে গেলেই সরে যায়, পাছে ছোঁয়াচ লাগে। বেঙ্গল টকীজের লোক—এই অহঙ্কারে মাটিতে পা-ই পড়ে না; ভদ্রতার লেশমাত্র কারু নেই। সবাই ভাবে, সে যেন কি! কিছু জিজ্ঞাসা করলে, খ্যাঁক্ করে খেঁকি কুকুরের মত কামড়াতে আসে! খায় দায় বেশ তোয়াজে থাকে, আর বুলি কপ্চায়। ওদের কথা ছেড়ে দিন, সুবোধদা। ওখানে সব সাহেবী-কারবার: সবাই ওখানে এক-একজন বড়া-সাব্—"

সুবোধ অন্য একটা ফাইল পড়িতে তন্ময় হইয়াছিল। ভূদেব আপন মনেই কহিয়া যাইতে লাগিল—"সেদিন যোগেশদা বেশ বলেছে: বেঙ্গল টকীজের লোকদের সম্বন্ধে কি বলল জানেন, সুবোধদা? যোগেশদা বল্‌ছিল—যত ছিল ভবঘুরে, সব হল মোটুরে।"

স্ববোধ ফাইলটি বন্ধ করিয়া, বিরক্তভাবে কহিল—"অন্যের কুৎসায় তো বেশ উৎসাহ দেখছি: নিজের দিকে একবার তাকাও কি? ওরা খরচ করে যেমন, তেমনি ভাল ছবিও তোলে। তুমি কি করেচ? তিনখানা ছবিতেই তো তুমি এমন ধ্যাড়ালে, যে আমাদের লাখ টাকার গায়ে জল দিলে!—সস্তা হল বটে, তবে ছবি হল না। যাক্, এবার যেন আর তা' না হয়। চালুনীর মুখে ছুঁচের নিন্দে শোভা পায় না।"

ভূদেব একটু অপ্রতিভ হইল। কিন্তু হঠিবার পাত্র সে নয়। সদম্ভে কহিল—"স্ববোধদা আপনার মত লোকের মুখে এই কথা? কি-মাল দিয়ে কি-জিনিষ করেচি, সেটা একবার দেখুন? ডিরেকশান টেম্পো, জনতাদৃশ্য, ছবির ফ্রেমিং, ইশ্‌পীড্‌—আমার নিখুঁৎ। টেক্‌নীক্ আমার নতুন। যারা তা বোঝে না, তারাই শুধু আমার নিন্দে করে। গল্পেরও আমার কোন নিন্দে নাই: গল্প আমার ফাষ্ট' কেলাশ—সবাই বলেচে। ঐ সব আর্টিষ্ট দিন্ না আপনার যাকে ইচ্ছে—দেখি, সে ও-দিয়ে আমার থেকে কি ভাল ছবি তুলতে পারে? আমার ছবিতে আপনার তেমন লাভ হয় নি বটে, তাই বলে লোকশানও তো হয় নি। সেটা বলতে পারেন কি?"

স্ববোধ ভূদেবকে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে, ঈষৎ হাস্যের সহিত কহিল—"বেশ তো, নাও না এইবার। এবার তোমার হিরো হচ্ছে যতীন মজুমদার। আর সব লোকও নতুন নতুন দিচ্ছি, অর্থাৎ যারা অন্যান্য ছবিতে নাম করেচে! দেখি এবার তুমি কি কর! এবার উঠোনের দোষ দিলে, বুঝব, নাচতে তুমি মোটেই জান না।"

ভূদেব হতাশার ভাণে হাত-পা ছুঁড়িয়া, চোখ ও মুখের বহু বিচিত্র

ভঙ্গী করিয়া, কহিল—"বড় আপশোষ রয়ে গেল, সুবোধদা, ভূদেব মহাপাত্রকে কেউ চিনতে পারল না! হেঁঃ—যত সব মুখ্যু—সব মুখ্যু! চিনবে কি করে? পেটে কিছু থাকা চাই তো? বোমা মারলে পেটে তো 'ক' পাওয়া যায় না! এরা মানুষ নয়, সুবোধদা, এরা সব তরমুজ—এদের মাথায় কেবল জল আর বীচি। ইচ্ছে আছে আমার, যদি কখনও তেমন লোক পাই তো, দেখিয়ে দেব, বাংলাদেশকে আর বাঙালী জাতটাকে, ছবি কাকে বলে—আর কি করে ছবি তুলতে হয়! গুন্‌তিতে তো অনেকই হয়েছে, কিন্তু সেগুলোকে কি ছবি বলে? রাবিশ—রাবিশ—দু'রীল এক সঙ্গে বসে দেখা যায় না।"

ভূদেবের ভাবস্রোতে বাধা দিয়া, সুবোধ কহিল—"তা হলে এর কাষ্টিংটা—"

ভুদেব বলিয়া যাইতে লাগিল—"দেখিয়ে দেব' অন্ততঃ এই ছবিতেই খানিকটা। এমন এক নতুন টেক্‌নীকে এ-ছবি তুলব, সুবোধদা, যা এদেশে এখনও কেউ জানা দূরে থাক—কল্পনাও করতে পারে না। আপনি লক্ষ্য করে দেখুন, আমার প্রত্যেক ছবিতেই কিছু-না-কিছু নতুনত্ব আছেই। আমার এক-এক খানা ছবি, দেশের ফিল্মশিল্পকে দু'-একশো মাইল করে আগিয়ে দিয়েচে! পয়সার দিক দিয়ে সস্তা প্যাঁচের অভাবে, হয়ত পয়সা কিছু কম পেয়েচেন; কিন্তু টেক্‌নীকের দিক দিয়ে আমার ছবি যে কত উন্নত, তা' বুঝবার মত লোক বাংলাদেশে কে আছে? হেঁঃ! ছবি তোলে এরা? ছবির জানে কি? কাকে ছবি বলে, তা' জানে? ক'খানা ছবি দেখেচে এরা জীবনে? হেঁঃ—মনে করি, কিছু বলব না, কে বুঝবে আমার কথা? যে-দেশে "ভাঁড়ুদত্ত" আর "অন্নদাসে"র মত

ছবি পয়সা দেয় এবং এই ছবিই যেখানে প্রথম শ্রেণীর ছবির নমুনা, সেখানে ছবির যে কি কদর, তা' বোঝাই যাচ্ছে ! এখানে ছবি-তোলা নিছক বিড়ম্বনা। কোনই মানে হয় না—"

সুবোধ বিরক্তভাবে কহিল—"বলি, তোমার আত্মপ্রশংসা থামাবে ? কাজের কথা কিছু হবে-টবে, না, এইভাবেই সময় নষ্ট করাবে ?"

ভূদেব সলজ্জভাবে কহিল—"চুপ কর্‌লাম, সুবোধদা। কি জানেন ? দুঃখ হয়। বাংলাদেশের দর্শকও যেমন, কাগজওলারাও তেমনি। গুণীর আদর এদেশে কেউ জানে না। আচ্ছা বলতে পারেন, কাগজওলারা ঐ কুঞ্জ সেন, হিতেন ঘোষ, যদু বোস আর দেবী মিত্তিরের প্রশংসায় অমন পঞ্চমুখ কেন ? তাদের ও-গুলো কি ? ওকে কি ছবি বলে ? আরে, ছ্যাঃ, ছ্যাঃ—ঘেন্না ধরিয়ে দিলে বাপু ছবির উপর ! এরা আবার ডিরেক্‌টার ? কি জানে এরা ছবির ? অথচ তাদের কি পশার আর কি প্রশংসা ? তাদের নামে লোকের জিভে জল পড়ে ! কেন বল্‌তে পারেন ? রাবিশ—রাবিশ—"

সুবোধ হাতের কাগজগুলি আগাইয়া দিয়া কহিল—"হাঁ, হাঁ, সব রাবিশ। শোন'—হিরো দাও, যতীন মজুমদারকে। যতীনের সঙ্গে বিজলীদেবীকে মানাবে ভালই।"

ভূদেব নরম হইয়া কহিল—"আপনি তো বলচেন মানাবে ভাল। আমিও বলচি, এ-পার্ট যতীন ছাড়া আর কেউই করতে পারবে না ; কিন্তু বিজলীদেবী যতীনের হিরোইন্ হতে রাজী হলে তো হয়—"

সুবোধ একটু চিন্তিতভাবে কহিল—"এটা যা' বলেচ, ভুদেব। এ-একটা সমস্যা বটে—"

ভূদেব কহিল—"এই জন্যেই, সুবোধদা, সোসাইটি গার্ল অর্থাৎ কিনা ঐ ভদ্র-মহিলা নিয়ে ছবি করতে, আমি এত নারাজ।"

সুবোধ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"এ-কি বল্‌চ ভূদেব? সবাই তো ভদ্র-মহিলাই খুঁজচে, আর তাঁরা এসে জুটচেনও পালে পালে। সবাই চাইচে এঁদের, আর তুমি এঁদের উপর এমন চটা কেন?"

ভুদেবের ভাবস্রোতে আবার বন্যা আসিল। কহিল—"চটা কেন? তবে শুনুন্। প্রথমত, এরা পয়সা নেবে বেশী, বায়না করবে হাজার রকমের। তাঁরা পছন্দ করবেন তাঁদের পার্ট, এমন কি, হিরো পর্য্যন্ত। তাঁদের সঙ্গে আবার ভদ্র গেরস্ত-বাড়ীর মেয়েদের মত ব্যবহারও করতে হবে। তাঁরা যা' করবেন্, তা-ই বলতে হবে—আহা মরি, মরে-যাই, বাহবা কি বাহবা, চমৎকার! কিছুই যদি না হয়, তা'হলেও, হলো না—এ-কথা মুখ ফুটে বলা যাবে না, তা'হলেই মুখ ফুলে, হবে পাৎনা। বলবেন: ডিরেক্টার কিছুই জানে না, ভদ্র-মেয়েদের সঙ্গে কথা কইতে পর্য্যন্ত জানে না! তাঁকে অপমান করেচে! তিনি সে ডিরেক্টারের কাছে আর কাজই কর্‌বেন না! মোটা টাকা আগাম নিয়ে, ছবির মাঝামাঝি এমনি বেয়াদপি কর্‌বে যে, মালিক দেখ্‌বে চোখে অন্ধকার, আর ডিরেক্টার নিজের চাক্‌রী বজায় রাখতে, হবে সেই স্ত্রীলোকেরই আজ্ঞাধীন! এতে কখনও ভাল ছবি হয়?"

"রিহার্সাল তো দেবেই না। সময়ে কখনও আস্‌বে না। যতক্ষণ ষ্টুডিওতে থাক্‌বে, ততক্ষণ কেবল মোসাহেবদের সঙ্গে গাল-গল্প ও হাসি-ঠাট্টা, আর নয়ত, টেলিফোন্। কুঞ্জ সেন বল্‌ছিল, তাদের কৃষ্ণা দেবী নাকি শূটিং বন্ধ রাখিয়ে, টেলিফোন্ ধর্‌তে যায়। একটা

টেলিফোন আসা মানেই—আধ ঘণ্টা কাল শূটিং তো শূটিং, লাইনেরই সব কাজ-কর্ম্ম বন্ধ! এঁরা বল্‌বেন—ভদ্রমহিলা, অথচ আসেন তো, রোজ নতুন্ নতুন্ লোকের সঙ্গে, নতুন্ নতুন্ মোটরে। কোম্পানী মোটরের এলাওয়েন্স যা দেয়, তা জমে গিয়ে ব্যাঙ্কে। এ ছাড়া প্রত্যেক ভদ্রমহিলাকে পাহারা দিতে, গড়পড়ত্তা পাঁচজন করে ফিরিঙ্গি-বাবু হামেশাই থাকেন বডিগার্ড, সঙ্গীন্ উঁচিয়ে। ডিরেকশনে এদের মন কোথা? মন আর চোখ তো সারাক্ষণ সেই সঙ্গীদেরই উপরে। এতে কখনও কাজ হয়, সুবোধদা? কাজেই ছবি হল খারাপ, পয়সা দিল না—ডিরেক্টারের দোষ! ভাল হ'লেই, অমনি কাগজওলা থেকে শুরু করে'—অডিয়েন্স্, এমন কি, আপনারা পর্য্যন্ত বল্‌বেন—হবেনা? অমুক দেবী কি অপূর্ব্ব অভিনয়ই না করেছেন! কাগজে কাগজে অমনি সেই অমুক দেবীর ছবি, মুখে মুখে অমুক দেবীর নাম; এমন কি, অমুক দেবীর নামে বাজারে শাড়ী ব্লাউজ্ জুতা মায় বাস্ পর্য্যন্ত বেরুতে আরম্ভ করল! গরীব ডিরেক্টারের কথাটা, কারুর তখন মনেই পড়ে না। হুঁঃ—ভদ্রমহিলা! এ হচ্ছে দিল্লীকা লাড্ডু! ফিলিম থিয়েটারে ভদ্রমহিলা চলে না, সুবোধদা।"

"আচ্ছা, আচ্ছা—হিরো এখন থাক্, পরে ভেবে দেখ্‌ব"—সুবোধ কহিল।

ভূদেব হুঙ্কার দিয়া কহিল—"পরে ভেবে দেখবেন কি, সুবোধদা? হিরো-হিরোইনই যদি ঠিক না হয়, তা'হলে অন্য পার্টের জন্যে এত মাথাব্যথা কিসের?"

সুবোধ নরম সুরে কহিল—"একটা খস্‌ড়া করই না, ক্ষতি কি?

করতেই তো হবে। বিজলীদেবীকে আমি আর-একবার না হয় বুঝিয়ে বলব—এবার হয়ত তিনি আপত্তি না-ও করতে পারেন। কোম্পানির মাইনে খান্, কোম্পানির ভালমন্দ তাঁকে দেখতে হবে না? হাঁ, তারপর, হিরোর ভাইটা দাও ঐ ক্যাবলাকে। শান্তাকে দাও ঐ হিরোর কটকটে বোনটার পার্ট—সে বেশ করবে এ-পার্টটা, কি বল? লিখে নাও, লিখে নাও, নৈলে ভুলে যাবে—”

ভূদেব লিখিতে লাগিল।

ভূষণ স্বাবলম্বী। এতক্ষণ কোনও রকমে ধৈর্য্যধারণ করিয়া অপেক্ষা করিল; কিন্তু তাহার নাম কেহ করিল না দেখিয়া, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। এ-সব কথা তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

সবিনয়ে কহিল—“আমায় ভুলে গেলেন, সার? আমি এবার কিছুতেই সারের পেছু ছাড়ব না। আমাকে এবার একটা বড় পাট দিতেই হবে, সার্—”

সুবোধ বাধা দিয়া কহিল—“দাও, ভূদেব, ভূষণকে ঐ জমিদারের পার্টটা দিয়ে দাও—”

ভূষণ যেন আকাশ হইতে পড়িল। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—“আমাকে সার্? জমিদারের পাট সার? এবার আক্টো কর্‌ব তো হুজুর?”

সুবোধ প্রসন্নমুখে জানাইল—“হাঁ হে হাঁ, এবার তুমি কথা কইবে! তুমি আমাদের জন্ ব্যারিমূর—”

সত্যসত্যই ভূষণের মাথা ঘুরিয়া উঠিল! পুলকাতিশয্যে কিছুক্ষণের জন্য সে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব ভুলিয়া গেল। “নটহস্তী” খেতাব

পাইয়াছে, কিন্তু এতদিনের মধ্যে ছবিতে কখনও সে একটি কথাও বলে নাই। এবার সেই দুর্লভ সুযোগ আসিয়াছে। একেবারে জমিদারের ভূমিকায় সে চিত্রাবতরণ করিবে এবং নিশ্চয়ই অনেক আক্টোও করিবে! আনন্দাতিশয্যে তাহার মূর্চ্ছা হয় আর কি?

তবু আর-একবার কথাটা পাকা করিয়া লইবার জন্য, আহ্লাদে আত্মবিস্মৃত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিল—"তা হ'লে সার, ঐ জমিদারের পাটটাই আমার ঠিক হ'ল তো, সার? শেষে যেন, হুজুর, বদ্‌লে, আবার জমিদারের খান্‌শামা করে দিয়েন্ না, দেখ্‌বেন্—সার—"

ভূদেব ও সুবোধ একসঙ্গে কহিল—"না, হে, না। এবার তুমি ঠিক জমিদারই সাজ্‌বে। ভাবনা কি? পাকা জমিদার—"

আর বেশীক্ষণ এই ছোট্ট ঘরের বদ্ধ হাওয়ায় থাকিলে, ভূষণের নিশ্চিত দমবন্ধ হইত। সে ছুটিয়া বাহিরের মুক্ত হাওয়ায় আসিয়া বাঁচিল। ব্যাপারটি তলাইয়া বুঝিবার জন্য, ষ্টুডিওর জনবিরল একদিকে নিরিবিলি দেখিয়া, একটা গাছের তলায় আসিয়া বসিয়া, ভূষণ চিন্তা করিতে লাগিল।

আজ তাহার জীবনের সত্যই একটি স্মরণীয় দিন। এতদিনে সে সত্যসত্যই ছিনেমা-আক্টর হইল! সুবোধ তাহাকে কত ভালবাসে? একেবারে জমিদার? জমিদারের বিষয় সে যাহা জানে, তাহা সে হলফ্ করিয়া বলিতে পারে, অন্য কোন আক্টরই তাহা জানে না। এমন কি, যতীন মজুমদারও জানে না। তাহার অসীমকে মনে পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে টেঁপী, নিস্তারিণী, ক্ষেন্তি, বুঁচী, মায় পচা, বটা, ভোলা—কত লোক, কত কি!

ভূষণ একাকী বৃক্ষতলে বসিয়া, কি ভাবে জমিদারের রূপ দিবে, তাহা দেখিয়া লোকে কি বলিবে, সাপ্তাহিক কাগজওয়ালারা তাহার স্থ-অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া কি টিপ্পনী করিবে, সেই সব কল্পনায় তন্ময় হইয়া গেল। হয়ত তাহার জমিদার-অভিনয় দেখিয়া, কলিকাতার অন্য সব ফিলিম কোম্পানী তাহাকে পাকড়াও করিয়া চুক্তিবদ্ধ করিতে, কত জাল ফেলিবে। ইহাতে অন্তত যে চার-পাঁচটা ফৌজদারী কি হাইকোর্ট কেস্ও হইবে না, কে বলিতে পারে? কিন্তু সে কি তখন বিজলী' ও সুবোধকে ছাড়িয়া যাইবে? যাইতেও পারে। ভূষণ তো ইহাদিগের নিকট চিরকালের জন্য দাসখৎ লিখিয়া দেয় নাই!

ভীড়ের মধ্যে হাত ধরাধরি করিয়া চলিতে চলিতে যেমন একজন যাত্রী হাত ছাড়াইয়া হঠাৎ ভীড়ের ভিতর অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমনি ভূষণের মাথায় নানা সুখ-কল্পনার ভীড়ে, টেঁপী হঠাৎ হারাইয়া গেল।

দারোয়ান রূপু তেওয়ারি দুই হাতে খৈনি টিপিতে টিপিতে আসিয়া, ভূষণকে অভিবাদন জানাইয়া, তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিতে করিতে কহিল—"রাম-রাম, ভুষণবাবু। কঁহি সব খবরিয়া আচ্ছা বা নু? বহুৎ রোজ রেঁায়াকো ন্য দেখ্‌লি—"

তাহার মধুর দিবাস্বপ্নটী ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, ভূষণ মনে মনে বিলক্ষণ চটিল, কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ করিল না। ভদ্রতা রক্ষা করিয়া কহিল—"আপনার সব ভাল ত' দরোয়ান্‌জী? দেশে গিয়েছিলাম, কাল মোটে এইচি। এবার আমাদের বাংলা ছবি হচে কিনা, তাই বড়বাবু আমায় তার করেছিলেন, এক জমিদারের পাট নেবার জন্যে। এ খুব বড় আর শক্ত পাট, কল্‌কাতায় এ কর্‌বার লোকই পাওয়া

য়েচে না। তাই কি করব, তাড়াতাড়ি আস্‌তে হ'ল—কোম্পানির মাইনে খাই, কোম্পানির নোক্‌শান্ তো করতে পারি না—য়্যাঁ?"

রূপু খুসী হইয়া খৈনিটি মুখে পূরিয়া কহিল—"আচ্ছাই ভইল্, রামজীকো কিরপা, ভূষণবাবু। নোক্‌ড়িকো তো ইয়ে বুড়ী হালং না? কা কইল্ যায়? হাঁ, রোঁয়াকো একঠো বহুৎ জরুরী খৎ আইল্ বা। সব্ কোই লেনেমে ইন্‌কার্ কৈলন, পিউন্ সাব্ তো ওয়াপিস্ লীয়ে যাওৎ রহ্‌লক্; হম্‌নি দেখ্‌লি কি রোঁয়াকো খৎ বৈরং—বৈরং যব্ তো জরুর-ই হোলা, হম্ রখ্ দেলেবানি—"

ভূষণ কৃতজ্ঞভাবে কহিল—"বেশ করেচেন দরোয়ানজী। চিঠিটা তা'হলে দেন্—কত মাশুল নেগেচে?"

দারোয়ান্‌জী উর্দ্দির পকেট হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া ভূষণের হাতে দিয়া কহিল—"দুইয়ে অনা লেলক্। সরকারী মাশুল উহে ঠিক বা! জাস্তি ক্যয়্‌সন্ লে সেকিলে? লিঁউ—"

ভূষণ রূপুকে দুই আনা পয়সা দিয়া চিঠিখানি দেখিয়াই চিনিতে পারিল, এ চৈতনপুরের বিষ্ণুময়রার হাতের ঠিকানা-লেখা খাম। ভূষণ তাহার ঠিকানা লিখাইয়া, এই খামখানা নিস্তারিণীকে দিয়া আসিয়াছিল।

রূপু চলিয়া যাইতে, ভূষণ চিঠিখানি খুলিল। দারোয়ানের সম্মুখে খুলিলে, পাছে তাহার বিদ্যা ধরা পড়ে! বহু কষ্টে ভূষণ কয়েকটি কথা পড়িল, কিন্তু তাহাতে চিঠির মর্ম্ম কিছুই বোধগম্য হইল না। ভূষণ একটু গোলযোগে পড়িল। কে এমন বিশ্বাসী লোক আছে যে, তাহাকে এই চিঠিখানা পড়িয়া দিবে? বিজলী পড়িয়া দিতে পারে—

কিন্তু চিঠিতে কি-আছে, না-আছে, সম্যক্ না-জানিয়া, একেবারে বিজলীর নিকটই বা ইহা দাখিল করে কি করিয়া? বিজলী-না-জানিলেই-ভাল-হয়, এমন কোন কথাও তো থাকিতে পারে চিঠির মধ্যে! চিঠিখানি আসিয়াছেও অনেকদিন! ব্যাপার কি জানিবার জন্য তাহার কৌতূহলও জন্মিল অদম্য। ভূষণ রীতিমত চঞ্চল হইয়া উঠিল। টেঁপীর চিঠি পাইয়া অনুমান করিল, তাহা হইলে টেঁপীর বিবাহ হয় নাই। ভূষণ আর এক নূতন আনন্দে বিভোর হইল।

এমন শুভদিনে, ভূষণ একটি তথ্য আবিষ্কার করিয়া বড়ই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। তাহার বড় দুঃখ হইল, কেন সে অন্ততঃ বাংলা লেখাপড়াটাও শিখে নাই? ইংরাজী না জানুক দুঃখ নাই, বাংলা না-জানাটা অতীব পরিতাপের যতটা না হউক, নিতান্ত অসুবিধার বিষয় যে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র রহিল না! চিঠিখানা পড়িতে না পারিয়া, তাহার কান্না পাইল। চিঠির বিষয় না জানিয়া সে আর এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিল না। জমিদারের পার্টের কথাও সে ভুলিয়া গেল। ভূষণ প্রতিজ্ঞা করিল, আজ হইতেই সে বিজলীর নিকট লেখাপড়া সুরু করিবে।

সে তো এখনও বহু দেরী! আপাতত কি করিয়া এ চিঠির বিষয় সে অবগত হয়? কোনও অভিনেতা বা কেরাণীর নিকট যাওয়াও ঠিক নয়। বিজলীদেবীর ভাই, সামান্য একখানা বাংলা চিঠি পড়িতে পারে না, এ কি কম লজ্জার কথা? তাহার উপর, এই চিঠিতে লিখিত কথা লইয়া তাহারা হয়ত তামাশা করিবে, হাসি ঠাট্টা

করিবে এবং আরও পাঁচজনে বলাবলি করিবে! এ হয় না। ভূষণের মনে পড়িল, ষ্টুডিওর ছুতার-খানায় তাহার মিতা ভূষণমিস্ত্রিকে।

ভূষণমিস্ত্রির খোঁজে আসিয়া, ভূষণ শুনিল যে, মিস্ত্রি কয়দিন হইতে অনুপস্থিত। অগত্যা ভূষণ লজ্জার মাথা খাইয়া ষ্টুডিওর বাহিরে, চায়ের দোকানে আসিয়া, দোকানদারের শরণাপন্ন হইল। দোকানী ভূষণকে চিনে, পড়িয়া দিল।

বাণানভুল ও বাক্যাশুদ্ধি সংশোধিত করিলে, চিঠিখানি এইরূপ দাঁড়ায়ঃ—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

পরে ঘুঁটেকে দাদা আপনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শতকোটি আশীর্ব্বাদ জানিবেন। আমাদের সকলের শতসহস্র ভক্তিপূর্ণ প্রণাম লইবেন। বিশেষ পরে, আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে জানিবেন। অর্থাভাবে সংসার প্রায় অচল এবং লোকের উপদ্রবে গ্রামে বাস করাও আমাদের অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। পরম পূজ্যপাদ দাদা মহাশয়েরা এখানে চাকুরী করিতেছেন, তাঁহারা পুরুষ মানুষ, তাঁহাদের কোনও ভয় বা অসুবিধা নাই। তাঁহারা বাড়ী আসা এক রকম ছাড়িয়া দিয়াছেন, বলিলেই হয়। দাদারা কোনও খোঁজ খবরও করেন না। এ বিধায় আমরা তিন ভগিনী ও পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণীই সবিশেষ কষ্টে পড়িয়াছি! আপনি বলিয়াছিলেন, সেই মত লিখিতেছি যে, পত্রপাঠ আপনি এখানকার চৈতনপুর মোকামে পদার্পণ করিয়া, আমাদিগকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া, আমাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। আপনি বড় চাকুরী করেন, আপনি আমাদের আত্মীয়, আপনার বাড়ীতে

ভাত র<U+0981>াধিয়া, বাসন মাজিয়া, দাসীবৃত্তি করিয়া খাইতেও আমাদের লজ্জা নাই। যত শীঘ্র পারেন, আমাদিগকে লইয়া যাইতে আজ্ঞা হয়। বিলম্বে আমরা অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারি। শ্রীচরণে নিবেদনমিতি, অলমিতি বাহুল্যেন— শ্রীচরণসেবিকা

শ্রীমতী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী।

পত্র শুনিয়া ভূষণের মুখে উল্লাস ও পুলকদীপ্তি আর চাপা রহিল না।

খপ্ করিয়া দোকানীর হাত হইতে চিঠিখানি ছোঁ মারিয়া লইয়া, দোকানীকে একটি কথা পর্য্যন্ত না বলিয়া, মনের আনন্দে তন্ময় হইয়া, ভূষণ দোকান হইতে একরকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল।

বিস্মিত হইয়া চা-ওয়ালা ভাবিল—লোকটা পাগল নাকি ?

ষ্টুডিওর ফটকে ঢুকিতেই, তিন চারিজন বালক ভৃত্য ছুটিতে ছুটিতে ভূষণের নিকট আসিয়া জানাইল—"অনেকক্ষণ থেকে বড়বাবু আপনাকে খুঁজ্‌চেন—শীগ্‌গীর যান—দৌড়ে যান—"

ভূষণ দৌড়িল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে সুবোধের কক্ষে আসিয়া দেখিল, তখনও ভূদেব সেখানে উপবিষ্ট।

সুবোধ কহিল—"এই যে ভূষণ। শোন'—তেরো-চৌদ্দ বছরের একটি বেশ সুন্দরী মেয়ে তোমার জানা আছে ? আন্‌তে পার ? আমাদের এই বইয়ে হিরোইনের ছোট বোনের পার্টটা কর্‌তে পারে ?"

ভূদেব কহিল—"ভেবে বল', ম্যাষ্টোর, ছবিতে এ মেয়ে হবে আবার তোমার স্ত্রী—"

ভূষণ চট করিয়া কহিল—"আছে সার। খুব সোন্দর মেয়ে সার্—"

সুবোধ সজোরে টেবিলে এক চাপড় মারিয়া, উৎসাহিত ভাবে

কহিল—"ব্যস্! তা'লে আর ভাবনা কি? গোলমাল তো সব চুকেই গেল। রইল কেবল বিজলীদেবীর ব্যবস্থা, আর যতীন মজুমদারের কণ্ট্রাক্ট। কেমন? এ আমি এই হপ্তার মধ্যেই ঠিক করে ফেল্‌চি—তুমি কিচ্ছু ঘাব্‌ড়িও না, ভূদেব। স্থবোধ রায় যা' ধরে, তা' করে—"

ভূদেব কহিল—"আমি কি ঘাবড়াবার ছেলে স্থবোধদা? দেখচেন তো এতদিন। দেখ্‌বেন্ এইবার ভূদেব মহাপাত্রর কেরামতী এই ছবিতে! দেখাবেন ডেকে আপনার কুঞ্জসেন, জিতেন্ ঘোষ, যদু বোস্ আর দেবী মিত্তিরকে একবার এই ছবিখানা। দেখ্‌বেন, আমার এই ছবি দেখে তাদের চোখ কেমন ছানাবড়া হয়ে যায়! হেঃ—যত সব হাতুড়ে, তারা হল কিনা ডিরেক্টার! রাবিশ্—রাবিশ্!"

স্থবোধ কহিল—"তা'হলে তোমার সিনারিওটা দিচ্ছ কবে? তোমার গল্পটা আবছা আবছা যা মনে পড়চে, তাতে মনে হয়, সেটা চল্‌বে।"

ভূদেব নিতান্ত তাচ্ছিল্যসহকারে উত্তর দিল—"গল্প আমার কখনও খারাপ হয় না, স্থবোধদা। রবিবাবু-শরৎবাবুর চেয়ে সাহিত্যজ্ঞান আমার বড় কম নয়। আর সিনারিও? ও লিখ্‌তে আর কতক্ষণ? দিন-দশেক বড় জোর? আপনি তো জানেন, স্থবোধদা, সিনারিও-ফিনারিওর বড় ধার আমি ধারি না! ঠিক সিনারিও কি কখনও লেখা সম্ভব? না কেউ লেখে? যারা তা' বলে, তারা মিথ্যে কথা বলে। ওসব ধাপ্পা! সিনারিও আবার কি? ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে। এ সব সেটে দাঁড়িয়ে ঠিক 'করে' নিতে হয়, সে মাথা চাই—"

স্থবোধ কহিল—"তা তো হল, তোমার গল্পটা, ভাই, একটু অদল-বদল করতে হবে—"

ভূদেব আশ্বাস দিল—"নিশ্চয় করব, বলুন। ভাল পরামর্শ পাই কই? তবে, এমন প্লট, এমন খাঁটি ফিল্ম-ষ্টোরি, এমন গল্প, বাংলা ছবিতে যে এই প্রথম—এ স্বীকার কর্‌তেই হবে। হীরেন সেনকে বলেচি, ডায়ালগগুলো লিখে দেবে—সে লিখ্‌লে আমি ঠিক করে দেব।—হাঁ, নামটা তা'হলে কি রাখা যায় বলুন দেখি? কতকগুলোই নাম আমি ঠিক করেচি। আপনার কোন্‌টা পছন্দ বলুন: কায়া ও ছায়া, মায়ার খেলা, ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ, অনিন্দিতা, বশোরা গোলাপ, মেথর-দুহিতা, বিয়ের আগে, টায়রা, বাঈজী, কোটাল পুত্রের ঘাটাল যাত্রা—"

সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল—"নামের সঙ্গে তোমার গল্পের সামঞ্জস্য কই ভূদেব?"

ভূদেব বিজ্ঞভাবে কহিল—"শেক্‌স্পীয়ার কি বলেছেন জানেন তো? নামে কিছুই আসে-যায় না, সুবোধদা। দর্শকরা চায় ছবি। যা' দেখাবেন সেখানা ছবি হলেই, তারা খুসী। গল্পের সঙ্গে নামের না-ই বা মিল থাকল? তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। আজকাল লোকে যা চায়, এমনি গল্প, আর এমনি নাম হলেই—ব্যস্‌! কেল্লা ফতে।"

সুবোধ সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কহিল—"আমার আপত্তি নেই, কিন্তু হয়ত এই নিয়ে কাগজওলারা আবার খ্যাচ্‌-খ্যাচ্‌ শুরু করবে—"

ভূদেব অভয় দিয়া কহিল—"কাগজওলাদের কাণ মলে দিন। ঐ এক নিউস্যান্‌স্‌! যত সব বখাটে ছোকরারা আজকাল হয়েছে কাগজের সম্পাদক! ও ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। দর্শকরা যদি নেয়—কাগজওলারা মাথা ফাটিয়ে মরে গেলেও, আমাদের কোনও ক্ষতি হবে না—এ আপনি নিশ্চিত জানবেন, সুবোধদা। দু'একখানা

কাগজকে, ওরি মধ্যে, একটু বেশী করে বিজ্ঞাপন দেবেন; তাদের টাকাটাও তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দেবেন। তারপর ষ্টুডিওতে নিয়ে এসে একদিন, আমাদের ঐ ভুলোর দোকানের পচা ডিমের একখানা ডবল্ মামলেট, আর অখাদ্য এক পেয়ালা চা দেবেন, দেখবেন—তারা কৃতার্থ হয়ে গিয়ে, কাগজে কাগজে কেমন ভাঁটি-উলী স্বরে গান ধরে—"

সুবোধ কহিল—"তা'হলে ছবির নাম রাখ,' অনিন্দিতা—"

ভূদেব সোল্লাসে কহিল—"ঠিক! আমারও ঐ নামটাই পছন্দ। বাস—অনিন্দিতা। পাক্কা।"

সুবোধ কহিল—"আর শোন'। আজকাল লোকে যা চায়, তা যেন সবই একটু-একটু দিও। এই ধর—দু'খানা ভাটিয়ালী, খান-দুই কীর্ত্তন, আর খান-চারেক আধুনিক গান! খান পাঁচেক নাচ চাই-ই: একক, কথাকলি, ওরিয়েণ্ট্যাল, ক্লাসিক্যাল, ভারত-নৃত্য সব মিলিয়ে অবিশ্যি। গোটা-দুই নাচ চাই সব মেয়েদিকে দিয়ে।—একটা থিয়েটারের সীন্, একটা কারখানা, একটা ল্যাবরেটরী, আর একটা পাটগুদাম যেন নিশ্চয় থাকে ভাই, দেখ'। গ্রামের দৃশ্যে একজোড়া ভাল ঘুঘু যেন দেখিও। ডায়ালগ্‌গুলো যেন হয় আধুনিক—"

ভূদেব জিজ্ঞাসা করিল—"আধুনিক?"

সুবোধ কহিল—"হাঁ আধুনিক। অর্থাৎ আজকাল্ ছেলেরা যে ভাষায় কবিতা আর গল্প লেখে। ছবিতে চাকর-বাকর,ঝি-বামুন, বেয়ারা-দারোয়ান পর্য্যন্ত কথা বলবে এমনি ঘুরিয়ে যে, চট্ করে যেন তার মানে না বোঝা যায়। কথার মানে বোঝা গেলেই তার মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে যায়। বাংলা কথায় বারো আনা থাকবে ইংরিজী বুক্‌নী। ইংরিজী যদি না

লিখতে পারো. তো আমায় জিজ্ঞাসা করে নিও, যা-তা যেন লিখো না! মোদ্দা কথা, ছবি হবে একদম আধুনিক। একটা মডার্ণ ছেলে থাকবে, সে তার মাকে বলবে—"দেখ' মা, তুমি যদি ভোর পাঁচটায় বৌকে বেড-টী দিতে না পার, তা'হলে আমার ওয়াইফ্‌কে সাটিস্‌ফাই (খুসী) করা আমার পক্ষে অত্যন্ত শক্ত হয়ে পড়বে।" বৃদ্ধ বাপকে বলবে—"তুমি মডার্ণ লাভের কি জান? এ-বিষয়ে কোনও কথা বলতে এসো কেন? যা' জান না, লাইক য়্যান্ ইডিয়ট্ (বোকার মত), তা বলতে এলে, তোমার এজুকেটেড (শিক্ষিতা) বধূমাতা অর্থাৎ আমার ওয়াইফ, যদি তোমার কাণটা একটু মলেই দেন, তা তিনি বিশেষ অন্যায় করবেন্ না।" বিলিতী হোটেল চাই, ক্যাবারেও চাই। হাঁ—মেয়েদের ইস্কুল বা হোষ্টেল একটা চাই-ই। লেক, বড় ফটকওলা একটা মস্ত বাড়ী, বাগান, রেডিও, অর্গ্যান বা পিয়ানো একটা, টেলিফোন্, মোটর তো থাক্‌বেই একখানা—বুঝ্‌তেই পারছ। একটা জনতা চাই, ভূদেব, কোনও রকমে সেটা ঢোকাতেই হবে। নৌকাবিহার হলে ভালই হয়। জাহাজে রেঙ্গুন বা বিলাতযাত্রা, নিদেন একটা চা-বাগান কিন্তু না থাক্‌লেই চল্‌বে না। বিলাতের দু' একটা দৃশ্য দিতে পার্‌লে, লোকে খুসী হয়। ট্রেন, ঝড়জল, গৃহদাহ, খুন্, বিচারদৃশ্য, বৈঠকখানার আড্ডা, গুণ্ডা, নারীহরণ, মারামারি এ সব তো থাক্‌বেই জানি, তবুও তোমায় আর একবার মনে পাড়িয়ে দিচ্ছি, কিছু মনে করো না। গোটা-দুই লোকের পাগল হওয়া, গোটা পাঁচ ছয় জ্বলন্ত চিতা, বড়লোক বাপের ছেলেকে ত্যজ্যপুত্র করার দুএকটা দৃশ্য, বস্তি হতে ধনীপুত্রের বধূ-সংগ্রহ,

অসবর্ণ প্রেম ও বিবাহ, হাঁসপাতাল, হিরোইনের গৃহত্যাগ ও নার্স হওয়া, ভূমিকম্প, মোটর-দুর্ঘটনায় জ্ঞান হারিয়ে স্মৃতিবিলোপ, একটা গোঁড়া পরিবার, একটা বাঙালী-সাহেব পরিবার, তোমার ছবিতে যদি না থাকে—তাহলে আমি লিখে দিচ্ছি, যতই নতুন্ টেক্নীক্ দেখাও, ছবি একটি দিনও চল্‌বে না।"

ভূদেব বিজ্ঞভাবে সজোরে মাথা নাড়িয়া জানাইল—"আমার মত একজন বিখ্যাত লেখকের পক্ষে—এ আর শক্ত কি, সুবোধদা ?"

সুবোধ কহিল—"না, তাই বল্‌চি। হাঁ, আর একটা ফাজিল মেয়ে, একজন বখাটে ছোক্‌রা, একজোড়া অবিবাহিত তরুণ-তরুণীর স্বামীস্ত্রীর অভিনয় এবং শেষ পর্য্যন্ত বিবাহ না করেই একত্র বসবাসের দৃশ্য যেন নিশ্চিত থাকে। এ সব লোকে খুব নেয়। সেক্স-আপীল যেন প্রত্যেক মেয়েই দেয়, এদিকে বিশেষ নজর রেখো—হাঁ, আর ডায়ালগে যেন হিন্দুমুসলীম ঐক্যের উল্লেখ, হিন্দুসমাজকে তীব্রভাবে নিন্দা, বর্ত্তমান্ মন্ত্রীমণ্ডলের জয়গান—"

ভূদেব বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এতে কি হবে ?"

সুবোধ কহিল—"এই তো ? বুঝ্‌লে না ভাই ! এই গুলোই হচ্ছে আসল। বিশেষত শেষের এ-দুটো থাকলে, তোমার ছবির আর কখনো মার নেই ! তা ছাড়া, এ দুটো থাক্‌লে, এ ছবির সেন্সার-সার্টিফিকেট পেতেও কোন বেগ পেতে হবে না। চাই-কি, প্রধান মন্ত্রীকে দিয়ে ছবির উদ্বোধনটাও করাতে পারি। তাতে ছবিখানার কি ভীষণ পাব্লিসিটি হবে, তা কিছু বুঝ্‌চ ?"

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ভূদেব মহাপাত্র রয়্যাল ফিল্মসের পোষ্য লেখক এবং ডিরেক্টার। ভূদেবের লেখাপড়ার গুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং প্যারীচরণ সরকার মহাশয়দ্বয় ব্যতীত, অন্য কাহারও নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না। চিত্র-গল্প রচনায় তাহার প্রতিভার উন্মেষক যে বিলাতী ছবি—এ-কথা ভূদেব স্বীকার করে না: কেহ বলিলে, সে তীব্রভাবে এবং উচ্চস্বরে তাহার প্রতিবাদ করে। অবশ্য, চিত্র-পরিচালনা বিদ্যায় এইখানেই তাহার হাতে খড়ি এবং সুবোধই তাহার গুরু—এ-কথা ভূদেব কখনও অস্বীকার করে না।

ভারতবর্ষের ইদানীন্তন ছোট-বড়-মাঝারি চিত্র-পরিচালন-মহারথীদের সকলেই যেমন, কোন-না-কোন এক বিচিত্র জগতের অখ্যাত অজ্ঞাত কর্ম্মকেন্দ্র হইতে অকস্মাৎ একদিন প্রভাতে 'ধূমকেতুমিব কিমপি করালম' চিত্রপরিচালকরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং অন্যের অনেক অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া, বহু অচিত্র ও কুচিত্র নির্ম্মাণান্তে, কেবল প্রচারের সূচিকাভরণেই কোনও প্রকারে অদ্যাপি বাঁচিয়া থাকিয়া নিতান্ত ভাগ্যবলে যশ, অর্থ ও বিলাস এবং বাড়ী, গাড়ী ও শাড়ীর সুখ উপভোগ করিতেছেন, ভূদেব মহাপাত্রও তাহাদেরই একজন মন্দভাগ্য সতীর্থ। তিনিও যে অনতিবিলম্বে আর-এক জন কুঞ্জ সেন, হিতেন ঘোষ, দেবী মিত্তির বা যদু বোস্ হইবেন না, কে বলিতে পারে?

ভূদেব অদৃষ্টবাদী। কথায় কথায় বলে—ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র

নচ বিদ্যা ন পৌরুষং। কর্ম্মক্ষেত্রে দেখাও যাইতেছে তাহাই। কাজেই ভূদেবের কথায়, সুবোধ সম্পূর্ণ না হউক কতকটা আস্থা রাখে। একবার যাহা মশ্‌জিদ, চিরকালই সেটি যেমন মশ্‌জিদ—তেমনি একবার যে ডিরেক্টার, চিরকালই সে ডিরেক্টার। পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারে, কেহ কোনও কার্য্যে অযোগ্য প্রতিপন্ন হইলে, তাহাকে সে-কার্য্য হইতে অপসারিত করা হয়—ইহাই সাধারণে জানে এবং এইটিই সাধারণজ্ঞানসম্মত; কিন্তু চিত্র-জগতে সবই বিচিত্র এবং অসাধারণ! যে-ডিরেক্টার যত খারাপ ছবি তুলে, সে তত বেশী সুযোগ পায়। উপর্য্যুপরি তিনখানি ছবি খারাপ করায়, চতুর্থ ছবি পরিচালনায় ভূদেবের দস্তুরমত দাবী জন্মিয়াছে। রয়্যাল ফিল্মসের ডিরেক্টার বলিতে, আপাতত ভূদেব মহাপাত্রকেই বুঝায়।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে সে কি করিত, ইতিহাসে তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। অতএব আমরাও সে পৌরাণিক কাহিনী উদ্‌ঘাটনে সময়ের অপব্যয় করিব না। ভূদেবকে আমরা প্রথম দেখি—শেঠ গণেশীলালের নিজস্ব মোটরচালকরূপে। এ-কার্য্য ভূদেব এমন বিশ্বস্ততা সহকারে এবং নিখুঁতভাবে পরিচালনা করিত যে, রায়বাহাদুর অতীব প্রীত হইয়া ভূদেবকে করিলেন, চল্লিশ টাকা বেতনের ড্রাইভার হইতে একেবারে ষাট টাকার প্রাইভেট সেক্রেটারী, অর্থাৎ প্রাইভেট সিক্রেটের তরী। ভূদেব হইল, শেঠজীর ব্যক্তিগত গোপন কার্য্যের একখানি বোঝাই-নৌকা! অতএব শেঠজীর সান্ধ্যভ্রমণে খাশ-ড্রাইভারও ভূদেবই রহিয়া গেল।

ভূদেব এ-পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কালে, কিছুদিন গণেশীলালের নাতি-

দের গৃহ-শিক্ষকও নিযুক্ত হইয়াছিল ; কিন্তু অধ্যাপনা, মোটরচালনা এবং রায়বাহাদুরের বহির্দৃশ্য-সংস্থানে ব্যবস্থাপনা, এই ত্রিবিধ কর্ম্ম সুচারুরূপে চলে না দেখিয়া, রায়বাহাদুর নিজেই ভূদেবকে অধ্যাপনা হইতে মুক্তি দিলেন।

শেঠজী নিজে প্রচণ্ড কর্ম্মী বলিয়া কর্ম্মী লোককে তিনি খুব পছন্দ করেন। কর্ম্মবীর সুবোধকে তিনি আবর্জ্জনা-স্তূপ হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। ভূদেবও কখনও কোনও কাজে না বলে না। এ তাহার মহৎ গুণ। আর সর্ব্বাপেক্ষা তাহার মহত্ত্ব, বেতনের জন্য সে কোনও হাঙ্গামা করে না ; যখন দাও, যাহা দাও, তাহাতেই সে খুসী। এ যুগে ঈদৃশ লোক সুদুর্ল্লভ—মহাপুরুষ বলিলেই হয়। ভূদেব সে হিসাবে নিশ্চয়ই একজন মহাপুরুষ। কাজেই, রায়বাহাদুরের চিত্ত জয় করিতে তাহার মোটেই বিলম্ব হয় নাই। 'বামুনের গরু'র সমাদর সর্ব্বযুগে সর্ব্বত্র। ভূদেব ছিল সত্য সত্যই শেঠজীর বামুনের গরু।

"অনিন্দিতা"ই রয়্যাল ফিল্মসের চতুর্থ ছবি, ভূদেবেরও হইবে এইবার চতুর্থবার চিত্রনির্ম্মাণ-মঞ্চ। এক-একখানি ছবি শেষ হয়, আর ভূদেবের কুড়ি টাকা করিয়া বেতন বাড়ে। 'অনিন্দিতা' সম্পূর্ণ হইলেই, ভূদেবের বেতন হইবে মাসিক একশোত্রিশ। ট্রামের একখানা অল্‌সেক্‌শান্ টিকিট আছে, কাজের সময় কখন কখনও ষ্টুডিওর গাড়ী পায়—বেশ চলিয়া যায় ঃ ভূদেবের কোনও অভিযোগ নাই। বেণীর মত ইহা দাও, উহা দাও—বলিয়া সে উৎপাত করে না, গোপালের মত যাহা পায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট। আর্টিষ্ট সেট্ সংস্থান সজ্জা সঙ্গীত প্রভৃতি লইয়া, ডিরেক্টারেরা প্রায়ই হাঙ্গামা বাধায়, কিন্তু এ-সব বিষয়ে ভূদেবের কোনও

কুশলতা ছিল না। সে গলিতদন্তা লোলচর্ম্মা চল্লিশবৎসরবয়স্কা কুশ্রী নারীকে সুন্দরী তরুণী নায়িকার ভূমিকা দিতে, এতটুকু ইতস্তত করে না: সে ষ্টুডিওর ডোবায় পুরীর সমুদ্রবিভ্রম ঘটাইতে পারে: মাত্র চারিখানা ফ্ল্যাটে ভূদেব, রাজসভা শয়নকক্ষ বিলাতীহোটেল হইতে দরিদ্র গৃহস্থের ঘর, অফিস এমন কি ঘোড়ার-আস্তাবল, গুলির-আড্ডা পর্য্যন্ত রচনা করিবার শক্তি রাখে। ভূদেব শক্তিশালী ডি়রেক্টার।

ভূদেব শেঠজীর নিজের লোক, এ হিসাবে সুবোধও তাহাকে খাতির করে এবং বিশ্বাসও করে। ষ্টুডিও সংক্রান্ত বহু গোপন তথ্য, অকুণ্ঠিতভাবে সুবোধ ভূদেবকে বলে এবং সময় সময় তাহার সহিত বিশেষ গুপ্ত বিষয়েরও আলোচনা করে।

ভূদেব ছবির গল্প লেখে, গল্পের জন্য পঞ্চাশ টাকা করিয়া পায়। 'অনিন্দিতা' গল্পের জন্য সুবোধ একশত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। ভূদেব সুবোধের গুণগ্রাহিতায় বিশ্বাস রাখে।

ভূদেব প্রস্তাব করিল, গল্প সে তো সুবোধের নির্দ্দেশমত ঠিকই লিখিবে এবং ছবির পরিচালনাও তো সে-ই করিবে। কিন্তু ভিলেনের ভূমিকায় এবার সে নামিলে কিরূপ হয়?

সুবোধ সানন্দে সমর্থন করিয়া কহিল—"চমৎকার হবে। যতীন্ মজুমদার হিরো, বিজলীদেবী হিরোইন্, আর তুমি যদি ভিলেন্‌টা হও, তা'হলে তো একবারে ত্র্যহস্পর্শ!"

ভূদেব কহিল—"আমাদের "বাবুই বাসা" ছবিতে, গানের সুর কিন্তু ভাল হয় নি, সুবোধদা।"

'বাবুই-বাসা' ইহাদের তৃতীয় চিত্র। কলিকাতার সাতটি ছবিঘরে

মাত্র সাতাশ দিন চলিয়াছে। বাবুইবাসা একখানা সামাজিক চিত্র। এ ছবিখানি একটী বিশেষ কারণে সে সময়ে অসাধারণ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ছবির অন্তর্গত এক থিয়েটারের "অজ-বিলাপ" দৃশ্যে, অজ-বিলাপকে রূপায়িত করিতে, ভূদেব চিৎকাররত প্রায় পাঁচশো ছাগলের এক বিরাট শোভাযাত্রা এই দৃশ্যে দেখাইয়া, এমন এক অসাধারণ কৃতিত্ব ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল যে, মাত্র ঐ একটী দৃশ্যের পরিকল্পনাই ভূদেবকে বাংলার চিত্র-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক "নিমতলাদর্পণ" এই ছবি দেখিয়া, দেশের লোকের ভোট সংগ্রহ করিয়া, ভূদেবকে সেই সময় "অজ-গর" উপাধি দিয়াছিল। ভূদেব ঠাট্টা মনে করিয়া প্রথমে চটিয়াছিল। পরে সম্পাদক মহাশয় যখন পরসপ্তাহে পত্রিকা মারফৎ জানাইলেন যে, "অজ-গর" উপাধি যদি অপমানের হয়, তাহা হইলে ওস্তাগর, বাজীগর, কারিগর প্রভৃতি শব্দও কি অমর্য্যাদাকর? ভূদেব নিজের ভুল বুঝিয়া, সম্পাদককে সেই দিনই সন্ধ্যায় এক হোটেলে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল।

সুবোধ কহিল—"বেশ, এবার তা'হলে খোঁড়া বিষ্ণুকে ডাক'। তার দেওয়া সুর তো ভালই হবে।"

ভূদেব কহিল—"কি দরকার? আমিই মিউজিক দেব—কেন আমি পারি না?"

ভূদেব গান গাহিতে পারে, সুবোধ জানে। কিঞ্চিৎ চিন্তিতভাবে কহিল—"তা যদি পার তো দেখ', আমার কোন আপত্তি নাই।"

ভূদেব প্রীতভাবে কহিল—"এইবার ক্যামেরা আর রেকর্ডিং-এর

কাজটাও একটু ভাল করে দেখে নিতে হবে, সুবোধদা। এর পর, আস্‌চে-ছবিতে ফটোগ্রাফী আর রেকর্ডিং-এর ভারও আমিই নেব। দেখিয়ে দেব নিকটাত্মীয়দিকে—ভূদেব মহাপাত্তর, যে-সে পাত্তর নয়। আচ্ছা—উঠলাম আজ, সুবোধদা'—ন'টা বাজে—"

ভূদেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"হাঁ, আমি কাল থেকে দিন-পনের আর ষ্টুডিও আস্‌চি না—সুবোধদা—"

সুবোধ শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন হে? কি হ'ল আবার?"

ভূদেব কিঞ্চিৎ আত্মপ্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া কহিল—"গল্পটা লিখে, সিনারিওটা শেষ কর্‌তে হবে ত? গানগুলোর সব সুর ঠিক কর্‌তে হবে ত? এ-সব কি এই দুর্য্যোগ বর্ষার মধ্যে, কল্‌কাতায় বসে হয়? তাই দিন-পনেরর জন্যে একবার বাইরে যাব মনে কর্‌চি—"

সুবোধ ক্ষুণ্ণ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"বাইরে আবার কেন মিছেমিছি, এ সময়—"

ভূদেব বাধা দিয়া কহিল—"কলকাতায় বসে', কোনও লেখকের কোনও ভাল রচনা আজ পর্য্যন্ত হয় নি, সুবোধদা। রবীন্দ্রনাথের ভাল লেখা যত দেখেন, সব কলকাতার বাইরে বসে লেখা: শরৎবাবুরও শ্রেষ্ঠ রচনা সব হয়েছে, বাইরে থেকে অর্থাৎ বর্ম্মায় যখন তিনি ছিলেন: বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলাও কাঁথির বালিয়ারিতে লেখা, জানেন?"

সুবোধ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"তা'হলে কোথায় যাবে?"

ভূদেব বিজ্ঞভাবে কহিল—"এখনও ঠিক করি নি—তবে, হয় কোয়েটা, নয় রেঙ্গুন—এই দুয়ের একটা কোন জায়গায় যাব, মনে করছি।"

সুবোধ একটু দমিয়া প্রস্তাব করিল—"তা—শিলাইদ' না হয়—শিয়াল-দ' বা মাল-দ'—কাছে-ভিতে কোথাও গেলে হত না ?"

ভূদেব তাহার স্বাভাবিক প্রথা অনুযায়ী, হাত পা ছুঁড়িয়া, উচ্চকণ্ঠে কহিল—"কাছে ভিতে ? মানে ? তোমার এই শিমুলতলা মধুপুর পুরী দার্জ্জিলিং ওয়াল্‌টেয়ার শিলং ? রাবিশ্—রাবিশ ! টি-বিতে এ সব জায়গা একেবারে ভরা ! কল্‌কাতার যত টি-বি রোগীরা গিয়ে গিয়ে, এই জায়গাগুলোকে একেবারে অখাদ্য করে ছেড়েচে ! এখানে কি কোনও ভদ্রলোকে যায় ? হুঁঃ—আপনিও যেমন ! চল্‌লাম্ সুবোধদা—নটা বাজ্‌ল ।"

ভূদেব ঝড়ের মত সবেগে বাহির হইয়া গেল ।

সুবোধ কহিল—"ভূষণ, তুমি তাহলে বাসায় যাও। উনি জিজ্ঞেসা করলে, বল'—আমি বড়বাজারে শেঠজীর সঙ্গে একবার দেখা করতে গেছি। নতুন ছবির টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করতে হবে ত ? আমার ফিরতে একটু রাত্তির হতে পারে—"

ভূষণ "যে আজ্ঞে" বলিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, সুবোধ পুনরায় ডাকিল—"ভূষণ, শোন—"

ভূষণ ফিরিয়া দাঁড়াইতেই, সুবোধ কিঞ্চিৎ নিম্নস্বরে মৃদুহাস্যের সহিত, জিজ্ঞাসা করিল—"কোনও নতুন্ খবর-টবর আছে ?"

ভূষণও চাপা গলায় উত্তর দিল—"কৈ দাদাবাবু ? কোনও খবরই তো এখন নেই—বাড়ী থেকেই তো বেরুলাম আজ। এইবার খবর হবে—"

সুবোধ সহাস্যে কহিল—"আচ্ছা, যাও ।"

ভূষণ পথে আসিয়াই অত্যন্ত নিস্তেজ এবং শঙ্কিত হইয়া পড়িল।

বৈকালে তাহার প্রকাশ ভট্টাচার্য্যের চেম্বারে গিয়া, তাঁহাকে একটি বিশেষ জরুরী কথা বলার প্রয়োজন ছিল—কিন্তু ভূষণ সেটি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। এখন উপায়? "অনিন্দিতা" ছবিতে জমিদারের ভূমিকা, টেঁপীর চিঠি, তাহাদিগকে কলিকাতা আনয়ন প্রভৃতির আনন্দ ও পুলক—তাহার মাথায় উঠিল।

যাহাই হউক্, বাড়ীতো ফিরিতেই হইবে! কপালে যাহাই থাকুক্ না কেন? নিতান্ত বিষণ্ণ মনে এবং অত্যন্ত ভীতভাবে ফাঁসির আসামীর মত ভূষণ ট্রামে উঠিল।

ট্রামে বসিয়া ভূষণ চিন্তার অতলান্তিক মহাসাগরে ডুব মারিল। মনে মনে অনেক যুক্তি করিল, কিন্তু কোনটিই তাহার পছন্দ হইল না। সে বিলক্ষণ জানে, বিজলীদেবী বা স্ববোধরায়কে ধাপ্পা দিবার মত প্রতিভা তাহার নাই, অন্তত এখনও জন্মে নাই। সে দুশ্চেষ্টায় বিপদই সমূহ এবং এ সময়ে সে দুঃসাহসিক কার্য্যও সম্পূর্ণ অনুচিত।

ইঁহাদের বিরক্তিভাজন হওয়া মানে, নিজের সর্ব্বনাশকে নিজে আমন্ত্রণ করা: অতএব অপরাধ-স্বীকার করিয়া, শাস্তি গ্রহণই এখন একমাত্র পন্থা।

অপরাধীর মত শঙ্কিত মনে, শাস্তির বিভীষিকায় ত্রস্ত, কম্পিতচরণে, পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিতেই, বসিবার কক্ষে বিজলীদেবী ও ভট্টাচার্য্য সাহেবের হাস্যমধুর কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া—ভূষণের প্রাণ উড়িয়া গেল। উচ্চকিত হইয়া মধ্যপথে থমকিয়া দাঁড়াইয়া, ভূষণ শুনিতে লাগিল, কথাবার্ত্তাটা কি বিষয়ে চলিতেছে।

বিজলীদেবী প্রেমগদগদভাবে জানাইতেছিলেন যে, ফিলিম লাইন

আর তাঁহার ভাল লাগে না। তিনি চাহেন, কোনও বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বিবাহিত বধূরূপে, গৃহের কোণে আত্মবিলুপ্ত অবস্থায় সংসারধর্ম্ম এবং স্বামীসেবা করিয়া, পরম সুখে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহন। আর এই মহানগরী কলিকাতায়, সে রকম ভদ্রলোক—বিজলী দেখিয়াছে—একমেবাদ্বিতীয়ম্, এই প্রকাশ ভট্টাচার্য্যকেই।

ভট্টাচার্য্য সাহেবের মুখ দেখা না গেলেও, ভূষণ মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইল, তাঁহার মুখমণ্ডল হাউয়ের আলোকে উদ্ভাসিত আকাশের মত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কহিলেন—"এ কি সত্যি, বিজলীদেবী ?"

বিজলী কহিল—"মিথ্যার এতে কি আছে ? কথা মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু বিবাহ তো মিথ্যা হতে পারে না। স্ত্রীলোক যত যা-ই করুক, তারা বহুবল্লভা নয়।"

ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিল—"কেউ কেউ তবে বহু নিয়ে চলে কি করে ?"

বিজলী বাধা দিয়া কহিল—"তুমি যেটা চলা দেখ্‌চ, প্রকাশ, ওটা চলা মোটেই নয়—টানা-হেঁচ্‌ড়া। আমি জানি—অর্—অর্থাৎ—অর্থাৎ কিনা—শুনেচি, জান্‌ব আর কি করে, বল ? বহু নিয়ে ওরা চলার ভাণ করে মাত্র—নইলে ওদের চলে না। সংসার চলে এক পথে, ওদের মন চলে অন্য পথে। এই বহুর উপদ্রবেই ওরা জীবন্মৃত। তুমি জান কিনা জানি না, এই বহুর উৎপাত হতে আত্মরক্ষা করতে, ওরা লোকের বাড়ী দাসীবৃত্তি পর্য্যন্ত গ্রহণ করে। তবে, বিলাস যারা ছাড়তে পারে না, তারাই কেবল দিনরাত মদ খেয়ে আপনাকে ভুলে থাক্‌তে চায়, কিন্তু ভুলতে পারে না। এ দুঃসহ যন্ত্রণা কি অত সহজে

ভোলা যায় ? যায় না। তাই যন্ত্রণা যখন নিতান্ত অসহ্য হয়, তখন আত্মহত্যা ক'রে—বাঁচে। কেন, খবরের কাগজে পড় না ? প্রায়ই তো বেরোয়, অমুক মেয়ে গলায় দড়ি দিয়েচে, অমুক মেয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেচে ! কেন ওরা শুধু-শুধু আত্মঘাতী হয়—ভেবেচ কি কিছু ?"

প্রকাশ গুম হইয়া শুনিতেছিল।

বিজলী কহিল—"শুধু যে বাইরের মেয়েরাই পুরুষের উপদ্রবে আত্মহত্যা করে, তাই নয়। অনেক গেরস্ত-ঘরের মেয়েও, তাদের স্বামীর উচ্ছৃঙ্খল দাবী আর জবরদস্তি সইতে না পেরে, মরে' আত্মরক্ষা করে—তা জান ?"

প্রকাশ অন্যমনস্ক। বিজলী ভাবিল, প্রকাশ তাহার বাঙমাধুর্য্যে মোহিত হইয়াছে। কহিতে লাগিল—"স্ত্রীলোক সংসার ত্যাগ ক'রে কখনও বিবাগী হয় না বা সহজে তারা মরতেও চায় না। তারা বাঁচতেই চায়। অসহ্য মনস্তাপেই নারী মৃত্যু বরণ করে। স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক কামনাই হচ্ছে—ঘর-সংসার, গেরস্তালি আর ছেলেমেয়ে। স্ত্রীলোক—টাকাকড়ি গাড়ীবাড়ী ধনদৌলৎ কিছুই চায় না। স্ত্রীলোক চায় স্বামী।"

বহুদিনের একটা ঘটনা প্রকাশের মনটিকে শ্রাবণ-আকাশের মত নীরন্ধ্র কালিমায় হঠাৎ ছাইয়া ফেলিল। এই বিদ্যুৎ-ঝলকে যৌবন-শতদল-ফুল্ল একখানা সুন্দর মুখ, ক্ষণিক আলোয় হঠাৎ অস্পষ্টভাবে একবার উদ্ভাসিত হইয়া, তখনি আবার গভীর তিমিরের অতলে হারাইয়া গেল। তাঁহারি বাড়ীতে, একতলার অন্ধকার একটা ঘরে, উদ্বন্ধনে মৃতা এক সুন্দরী তরুণীর কথা মনে পড়িল। প্রকাশের সেই প্রথমা স্ত্রী ! প্রকাশ এ স্মৃতিটিকে তাড়াতাড়ি চাপা দিতে চেষ্টা করিল।

বিজলীর সান্নিধ্যে অঙ্গস্পর্শে এবং প্রেমালাপে, তাহার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে যে একটা তাপের স্থষ্টি হইতেছিল, সেটার উপর দিয়া হঠাৎ যেন চলমান্ একটা বরফস্তূপ চলিয়া গেল!

প্রকাশ ক্রমশ একটু আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতেছিল। বিজলী সেটি অনুভব করিয়া, উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ভাবিল, বিবাহের কথাটাতেই হয়ত প্রকাশ এমন চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি কহিল—"তুমি দেখ' প্রকাশ, স্বামী চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল মিথ্যাবাদী পাজী—সব, কিন্তু স্ত্রী ঠিক তার বিপরীত। স্বামী যে-দুষ্ক্রিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকাশ্যে করে' বেড়াচ্ছে, স্ত্রী তা জীবনে একদিন বা একটিবারও কর্‌বার, কল্পনা পর্য্যন্ত কর্‌তে পারে না। স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করে, কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করেচে, কখনও শুনেচ কি?"

আবার এক আঘাত! সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে, বিজলী প্রকাশকে এমন আঘাতের পর আঘাত করিতে লাগিল, যাহার যন্ত্রণা প্রকাশ আর লুকাইতে পারে না! প্রকাশের দ্বিতীয়া স্ত্রীই ইহার উদাহরণ। সে প্রকাশকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে, কাহার আশ্রয়ে আছে, কি করিতেছে—কে জানে? সে ছিল বড়-লোকের শিক্ষিতা সুন্দরী তরুণী কন্যা—প্রকাশ পছন্দ করিয়া, তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল।

প্রকাশ আর থাকিতে পারিল না, ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিল—"অন্তত, একটা ব্যাপার আমি জানি—স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে চলে গেছে।"

বিজলী কহিল—"তুমি ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখ,' প্রকাশ—তার স্বামীই হয়ত তার জন্যে দায়ী। শুধু তার চলে যাওয়াটাই বিচার কর' না। কেন গেল, সেইটাই বিশেষ বিচার্য্য।"

প্রসঙ্গটা প্রকাশ বন্ধ করিতে চায়। জিজ্ঞাসা করিল "বল' কি বিজলী? তুমি এত সব জান্‌লে কি করে?"

বিজলী কহিল—"জান্‌লাম কি করে? থিয়েটারে-ষ্টুডিওতে ও-পাড়ার অনেক মেয়েই আসে ত? ওদিকে আমি জিজ্ঞাসা করি—"

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল—"ওরা বলে?"

বিজলী জানাইল—"তা বল্‌বে না কেন? স্ত্রীলোকের কাছে স্ত্রীলোকের কিছুই লুকোছাপা থাকে না! এমন কি, তাদের যে কে প্রিয়তম, সে খবরও তারা বলে। বহু লোক নিয়ে তারা সংসার করে বটে, তবে তার মধ্যে একজন থাকে তাদের সত্যি প্রিয়তম—তাকে তারা জীবনে কখনও পাওয়া দূরের কথা, হয়ত দ্বিতীয়বার চোখেও দেখে না, তবুও তারি কাছে পড়ে থাকে—তার প্রাণ মন। এখানে থাকে শুধু প্রাণহীন দেহ, যা' নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি কর্‌তে আসে প্রত্যহ ভদ্র-শকুনির দল।"

ভট্টাচার্য্য সাহেবের মনটা তখনও কুণ্ঠামুক্ত হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি শিক্ষিতা হয়ে, ওদের সঙ্গে এ ভাবে আলাপ কর' কেমন করে, বিজু? আমি তো অবাক্ হয়ে যাচ্ছি—"

বিজলী কহিল—"তুমি অবাক্ হচ্ছ, কারণ, তুমি জান না। মেয়েরা শিক্ষিতাই হোক আর অশিক্ষিতাই হোক, স্ত্রীলোক জাতটাই হচ্ছে এক অখণ্ড। বাইরে যে যত ভড়ংই করুক, সবারি ভেতরে আছে সেই আদিম যুগের নারীটি—সে সমানভাবে সব মেয়ের মনেই বাস করে।"

প্রকাশ জোর করিয়া প্রফুল্ল হইয়া, জিজ্ঞাসা করিল—"সত্যি বিজলী দেবী, এ সব কথা আমি কখনও ভাবি নি।"

বিজলী কহিতে লাগিল—"আশ্চর্য্য হবে, প্রকাশ, কি-ভদ্র কি-অভদ্র প্রত্যেক ঘরেই মা মাসি পিসি বোন্ বৌদিদি জা' প্রভৃতি মেয়েরা তাদের যৌন জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত পরস্পর আলোচনা করে। পুরুষেরা তা পারে? বাড়ীর কথা ছেড়ে দাও—প্রতিবেশীদের মেয়েরাও, মেয়েদের মধ্যে যে সব আলোচনা করে, পুরুষেরা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও তা' কখনো করে না। ঝি-চাকরাণীরাও বাড়ীর মেয়েদের পারিবারিক অনেক গোপন কথা জানে।"

প্রকাশ উচ্চহাস্য করিয়া কহিল—"বল' কি? স্ত্রীলোক এত ছ্যাব্‌লা?"

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিল। আর দেরী করা ঠিক হইবে না ভাবিয়া, ভূষণ গলার সাড়া দিয়া, দুয়ারে আসিয়া দর্শন দিল।

ভূষণকে দেখিয়াই প্রকাশ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হে এখন আস্‌চ? এখনও অপেক্ষা কর্‌ছিলে বুঝি? আচ্ছা বোকা ত' তুমি?"

বিজলী কহিল—"তা না করে' কি করে বল'? ও-তো জানে না যে তুমি এখানে। আমি বলেচি—কাজেই, আমার লক্ষ্মণ ভাই, তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে, বসেই আছে! তারপর বোধ হয়, দারোয়ানরা ফটক বন্ধ কর্‌বার সময়, ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কি ভূষণ?"

ভূষণ অকূলে কূল পাইল। গভীর শঙ্কামলিন মুখে মধ্যাহ্ন ভাস্করের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। কহিল—"দিদিমণি ঠিক ধরেচেন। আমি সায়েবের জন্যে বসেই আছি, বসেই আছি, চাপ্‌রাশী কিছুই বল্‌তে পারে না—আমি আর কর্‌ব কি? অথচ দাদাবাবুর খবরটাও না দিলেই নয়—"

তড়াক্ করিয়া উঠিয়াই প্রকাশ কহিল—"ওঃ! তোমার কথাতো আমি

একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম, বিজ্‌ল্‌! ভাগ্যিস্‌, রায় এসে পড়ে নাই! আজ তা'হলে চলি। কাল দুপুরে আবার খোঁজ নেব, কেমন? নাইট—নাইট।"

বিজলীও উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রকাশ আর কালবিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল।

বিজলী ক্লান্তভাবে সোফাটায় চিং হইয়া শুইয়া পড়িয়া, হাই তুলিতে তুলিতে, কহিল—"ওঃ—বাপ রে বাপ্‌। সেই বেলা দু'টো হতে গজর-গজর করে মাথা ধরিয়ে দিয়েচে। বিকেল থেকে বলচি—সুবোধ এসেচে, কোন্‌ সময় এসে পড়বে! তোমায় দেখলে, মহামুস্কিল হবে! কত রকম ভাবে বল্‌লাম—তা কি বোঝে? যেমন হোঁদলকুৎকুতে চেহারা, তেমনি হাতীর মত বুদ্ধি—একটা ক্যাডাফ্যারাস! ভয়ে আমার বুক দুর্‌ দুর্‌ করছে, অথচ মুখে কথা বল্‌চি—না বল্‌লেও নয়! যতই হোক্‌, লোকটার শাঁস আছে, চটাই বা কি করে? তার উপর, আজ সকালেই নগদ পাঁচশো টাকা, এখন আবার দুশো—"

ভূষণ জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ, সে টাকার কথা কিছু হল' দিদিমণি?"

বিজলী কহিল—"আমিই তুল্‌লাম। বললাম, তোমার টাকাটা তাহলে ফেরৎ নিয়ে যাও—আমি তো তোমার সঙ্গে যেতে পারলাম না, সুবোধ এসে গেছে।"

ভূষণ বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"এই বলে টাকাটা দিয়ে দিলেন?"

বিজলী সহাস্যে কহিল—"ক্ষেপেছিস? এমন ভাবে বল্‌লাম যে, সে

টাকা নেওয়া তো দূরের কথা, উল্টো আরও, ঐ ত্যাখ্না, দু'খানা একশো টাকার নোট দিয়ে, তবে গেল! যাও, তুমি হাত মুখ ধোও গে ভাই, এইবার। বড্ড কষ্ট হয়েছে, আহা, মুখ শুকিয়ে গেছে। কিছু খাও আগে।"

ভূষণ খুশী হইল। দিদিমণির ডবল লাভ হইল। আজ নিশ্চয়ই একটা বিশেষ কোনও যোগ ছিল! অর্দ্ধোদয় কখনও নয়, এ নিশ্চয় পূর্ণোদয় যোগ! তাহার ফাঁড়াটাও অভাবিতরূপে কাটিয়া গেল!

কতক আহ্লাদে কতক উত্তেজনায়, ভূষণ পকেট হইতে টেঁপীর চিঠিখানা বাহির করিয়া বিজলীর হাতে দিয়া, নত মুখে গদগদ ভাবে কহিল—"টেঁপী এই চিঠি নেকেচে দিদিমণি—"

বিজলী উদ্দীপ্ত মুখে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া, উল্লসিত ভাবে কহিল—"চিঠি লিখেচে? কি লিখেচে? দেখি—" তাড়াতাড়ি চিঠিখানি পড়িয়া ফেলিয়াই, কহিল—"বাস্, ভূষণচন্দ্র, এইবার তোমার পোয়া-বারো। অসীম তা'হলে কিছু কর্‌তে পারে নাই, বোঝা যাচ্ছে। বাস্! আর বাধা কি? একেবারে মেঘ না চাইতেই জল। নিয়ে এস, নিয়ে এস এদিকে তাড়াতাড়ি। আর কালবিলম্ব নয়।"

ভূষণ যদি জল হইত, তাহা হইলে গড়াইয়া সে এতক্ষণ নর্দ্দামা দিয়া কোন্ কালে কোথায় চলিয়া যাইত। হাত রগরাইতে রগড়াইতে বাঁকিয়া চুরিয়া দাঁড়াইয়া, আহ্লাদের প্রাচুর্য্যে কণ্ঠরুদ্ধ অবস্থায়, কোনও রকমে কহিল—"আপনি গুরুজন থাকতে, আমি আর কি বল্‌ব, দিদিমণি—"

বিজলী আশ্বাস দিল—"আচ্ছা, যা' হয় শীগ্‌গীরই আমি করচি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।—ষ্টুডিওতে আজ কি হল?"

ভূষণও ভাবিতেছিল, কি করিয়া এই কথাটা এইবার তুলে এবং কি উপায়ে আরও একটি কথা সে দিদিমণিকে জানায়।

ভূষণ ক্ষুৎপিপাসা ভুলিয়া গেল। কহিল—"আমাদের নতুন্ বই আজ ঠিক হয়ে গেল। বইয়ের নাম "অলিন্দিতা"। খুব ভাল বই হবে, দিদিমণি। আপনার হিরো হবে, যতীন্‌বাবু। আমি হব এক—"

বিজলী বাধা দিয়া কহিল—"কে হিরো? যতীন? কোন যতীন্? যতীন্ মজুমদার, না যতীন পাকৃড়াশী?"

ভূষণ মূঢ় ভাবে কহিল—"তাতো জানি না, দিদিমণি। যতীন্ যতীন্‌ই তো শুন্‌লাম—তাই বল্‌লাম, যতীন্‌বাবু। আমি হব এবার এক জমিদার। এবার আমি ডাইনোক্ বল্‌ব।"

বিজলী অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। ভূষণের কথাটি ভাল করিয়া তাহার কর্ণগোচর হইল না।

বিজলী চিন্তিত ভাবে কহিল—"যতীন্ পাকৃড়াশী কি হিরো করবে? এ তা হলে যতীন মজুমদারই হবে! নিশ্চয়! সে ছাড়া এ আর কেউ নয়।"

ভূষণ সমর্থন করিয়া প্রসন্নমুখে কহিল—"তবে তাই হবে দিদিমণি। আপনার কথাই ঠিক। যতীন মজুমদারের মত আক্টোর কি আর আছে? কলকাতায় এখন থিয়েটারে বাইস্কোপে কলের-গানে রেডিওতে যেখানেই যাও, সেইখানেই আছে যতীন মজুমদার। আক্টোও করে সে তেমনি সরেশ! সাধে কি লোকে যতীন-যতীন করে হেদোয়?"

বিজলী তাচ্ছিল্যসহকারে কহিল—"লোকটা ভয়ানক অর্থ-পিশাচ!"

ভূষণ কহিল—"নোকে হাই বলে বটে, কিন্তু সে ছাড়া চলেও

না তো কারো। আর অর্থপিচাশ নয়-ই বা কে, দিদিমণি? যতীন জমায়, জমিয়ে সম্পত্তি করে,—আর সবাই উড়িয়ে কাপ্তেনী করে। এই ত তফাৎ?"

বিজলী বিরক্তভাবে কহিল—"তুই কি জানিস ফিলিমের যে, যা নয় তাই বক্‌চিস?"

ভূষণ বিনীতভাবে কহিল—"তা কেন বল্‌চেন দিদিমণি? কোন্ ছবিতে আর কোন্ কোম্পানীতে যতীন মজুমদার লেই বলুন? শুনিচি, সে টাকাও যেমন লেয়, কাজও করে তেমনি ফাষ্টো কেলাশ। আমাদের মধ্যে থিয়েটার-ছিনেমায় একমাত্র যতীন মজুমদারই তো সম্পত্তি করেচে। কাশীপুরে ৪।৫ খানা বাড়ীই হুহু করে তুলে ফেল্‌ল এই অল্প কদিনে দেখুন্ না! ও-এলাকাটা তো এক রকম তারই হয়ে পড়েছে, দিদিমণি।"

বিজলী তিক্ত কণ্ঠে কহিল—"ও রকম কঞ্জুষ যে—সে করবে না তো, কে কর্‌বে?"

ভূষণ কিয়ৎক্ষণ বিজলীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া, কহিল—"মরুক গে যতীন মজুমদার। আমার জন্যে এবার আপনাকে একটু খাট্‌তে হবে, দিদিমণি। আমার ডাইনোক্‌গুনো আপনাকে ভালো করে বলিয়ে, রেশ্ত্যাল দিইয়ে দিতে হবে।"

তবুও ভূষণের কথা বিজলী শুনিল না। কহিল—"ছ্যাখ' ভূষণ, কয়েকদিন তুমি একটু সাবধানে থেক': সিঁড়িতে খুব খর নজর রেখ'। হুপ্‌ করে কেউ যেন একবারে উপরে না চলে আসে। সুবোধ যে এসেছে, এ কথা অনেকে এখনও শোনে নাই—বা জানেও না—"

ভূষণ ক্ষুণ্নভাবে আশ্বাস দিল—"সে আর আমায় বল্‌তে হবে না, দিদিমণি, আমি তো আর কচি খোকাটি নই। এদ্দিন রয়েছি আপনার বাড়ীতে, আর এ কথা জানি না?"

বিজলী কহিল—"তা কি জানি না? তুমিও বেরিয়ে গেলে আর অমনি কুঞ্জসেন ডিরেক্টার মুখুজ্জ্যেসাহেব ব্যারিষ্টারকে নিয়ে এসে হাজির। বহুদিন আসে নাই, আমি তো অবাক। যাই হোক, সিঁড়ি থেকেই তো তাদিকে বিদেয় করলাম।"

সিঁড়িতে সুবোধের পদধ্বনি শ্রুত হইতেই, বিজলী উঠিল।

ভূষণ কহিল—"দিদিমণি, তাহলে আমার ডাইনোক—"

বিজলী বিরক্তভাবে কহিল—"হবে হবে—"

বিজলীর ঔদাসীন্যে ভূষণ মুখে কিছু বলিতে না পারিলেও, মনে মনে অত্যন্ত আহত হইল। টেঁপীর কলিকাতা আগমন অপেক্ষাও প্রিয়তর যে ব্যাপার—অলিন্দিতা ছবিতে সে জমিদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া এবার ডাইনোক্ বলিবে—এ সংবাদে বিজলী এতটুকু খুসী হইল না?

অত্যন্ত স্বার্থপর স্ত্রীলোক তো? কেবল নিজের গণ্ডাই চিনে? ভূষণের ক্ষুৎপিপাসা গিয়া কান্না পাইল। ক্রমশ সে মনকে বুঝাইল—জমিদারের পার্টটা একবার সে করুক্, ছবিখানা মুক্ত হউক—তারপর ভূষণ ইহার শোধ দিবে! এই নারীকে পদাঘাত করিয়া সে চলিয়া যাইবে। ভূষণ চৌরঙ্গীতে, সাহেবরা যেখানে থাকে, সেইখানে গিয়া একটা ফ্ল্যাট লইয়া বাস করিবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে চা-পানান্তে, একটি সোফায় পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁসি বসিয়া সুবোধ ও বিজলীর "অনিন্দিতা" ছবি সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল। দুইজনের মুখই অপ্রসন্ন এবং মনটাও বিশেষ প্রফুল্ল বলিয়া মনে হইল না।

বিজলী জিদ ধরিয়াছে, যতীন মজুমদারের সহিত সে কিছুতেই অভিনয় করিবে না। যতীন্‌কে কোম্পানীতে ঢুকাইলে, সে রয়্যাল ফিল্মস পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিবে।

সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল—"এ তোমার অদ্ভুত জিদ্, বিজলী—"

বিজলী দৃঢ়ভাবে কহিল—"অদ্ভুতই বল' আর কিম্ভূতই বল'—কথা আমার ও-ই—"

সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল—"কিন্তু কেন? কারণ তো কিছু আছে। বেশ, তুমি তার সঙ্গে প্লে কর' না: কিন্তু কেন করবে না, সেটা তো বল্‌বে—"

বিজলী তীক্ষ্ণভাবে কহিল—"আমার প্রত্যেক কথার আর কাজের যে তোমায় কৈফিয়ৎ দিতে হবে—এটা কি তোমার অদ্ভুত আশা নয়?"

সুবোধের সংযত বিরক্তি ক্রমে রোষের সীমানায় প্রবেশারম্ভ করিল। কিঞ্চিৎ তিক্তভাবে কহিল—"আশা আমার মোটেই অন্যায় নয়, বিজলী দেবী। কারণ, তোমার সঙ্গে আমার ঠিক সাধারণ ব্যবসাদারী সম্বন্ধ নয়। তাছাড়া, এবার যখন বত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে', শহরের

সব সেরা আর্টিষ্টকে নিয়ে ভাল করে একখানা ছবি তুল্‌বার মতলব করা গেছে, আর যতীনকে নেওয়াও যখন এক রকম সব ঠিক, তখন কোম্পানীর মাইনে-করা আর্টিষ্ট হয়ে যে তুমি তার সঙ্গে প্লে কর্‌বে না—কোম্পানী জান্‌তে চাইবে না—কেন?”

বিজলীও কর্কশকণ্ঠে উত্তর দিল—“তোমাদের কোম্পানীতে অভিনয় করা না-করার উপর কি আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নির্ভর করচে? তা যদি করে, তাহলে এ তাসের ঘর তুমি এই মূহূর্ত্তে ভেঙে দিয়ে চলে যেতে পার। আর তা' যদি না মনে কর', তা'হলে এ দুটো জিনিষ একত্রে মেলাতে যেও না। মাংসে আর ক্ষীরে কেউ মিশিয়ে খায় না।”

সুবোধ জোরে জোরে গড়গড়ার নলে টান দিতে লাগিল। কহিল—“বেশ, কারণ যখন তুমি বল্‌বেই না, তখন এ নিয়ে আর তর্কাতর্কি করাও আমার ঠিক হবে না: ব্যাপারটা তাতে তেঁতোই হবে বেশী, মীমাংসা কিছুই হবে না। তবে, এর ফল যে তোমার পক্ষে অত্যন্ত অপ্রিয় হবে, সে আমি এখন থেকেই তোমায় বলে রাখ্‌চি। তখন কিন্তু আমায় দোষ দিও না—”

একটা বুভুক্ষিত হিংস্র কুকুরের খাদ্যাপহরণ করিলে তাহার মুখে ও চোখে যেমন একটা মারাত্মক হিংস্রতা ফুটিয়া উঠে, বিজলীর মুখেও তেমনি একটা ছায়া পড়িল। সে চঞ্চল হইয়া উঠিয়া, সুবোধের সম্মুখে রক্ষিত একখানা চেয়ারে গিয়া ধপ্‌ করিয়া বসিয়া, জিজ্ঞাসা করিল—“কি অপ্রিয় ফলটা হবে, শুনি—”

সুবোধ মনে মনে একটু দমিলেও, কথায় তাহা তেমন বোঝা গেল

না। কহিল—"কোম্পানী তোমায় বরখাস্ত করতে পারেঃ বসিয়ে বসিয়ে তো তোমায় মাইনে দেবে না?"

বিজলী জানে—কোম্পানী কে এবং কোম্পানীর এই উকীলটিই বা কে! বিজলী একবার মনে করিল, শেঠজীকে বলিয়া স্ববোধকে কিঞ্চিৎ জব্দ করে। পরক্ষণেই বুঝিল, তাহাতে কোনও লাভ হইবে নাঃ হয়ত সে আশু কোনও ফল পাইতে পারে, কিন্তু তাহা স্থায়ী না হইবারই সমধিক সম্ভাবনা। গণিকাগৃহে আসিয়া সকলেই প্রবল পরাক্রমশালী রাবণের ভূমিকা অভিনয় করে—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি তাবৎ দেবতা ও উপদেবতার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে বলিয়া বড়াই করে—এবং দাতা কর্ণকেও দানের প্রতিশ্রুতিতে হার মানাইয়া দেয়—কিন্তু প্রকৃত কার্য্যকালে আর তাহাদের দর্শনই পাওয়া যায় না এবং দর্শন মিলিলেও, তাহারা তখন চিনিতে পারে না।

প্রতারণার এ ব্যবসা, প্রতারক লইয়াই কারবার! কাজেই, উভয়ের কেহই কাহাকেও বিশ্বাস করে না। অবিশ্বাসের মূলধনে দিন দিন অবিশ্বাসের পুঁজিই বাড়িয়া উঠে। বিজলী গণেশীলালকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে সাহসী হইল না। যে-জিনিষ যতক্ষণ আয়ত্বের অতীত, দুর্ল্লভ থাকে, ততক্ষণই থাকে তাহার মোহ এবং আকর্ষণী শক্তি। সুলভ হইলেই তাহার ইন্দ্রধনু যায় মিলাইয়া। নারীর বেলাতেও এ কথা খাটে। বিজলী শেঠজীর উপর যে মোহ বিস্তার করিয়াছে, তাহার কতকটা এই স্ববোধ রায়ের আশ্রয়ে থাকার জন্য দুর্ল্লভ বলিয়াই।

বালির উপর ঘর বাঁধিয়া, বেশী খাল কাটিতে বিজলীর ভয় হইল। কহিল—"বেশ, তোমরা যদি নোটিস্ দাও, অন্য কোথাও যাব—"

সুবোধ কহিল—"যেখানেই যাবে, সেইখানেই দেখ্‌বে যতীন আছে। তা' ছাড়া, এখানে তোমার যে ইজ্জৎ, অন্য কোথাও গেলে তুমি কি এ-সম্মান পাবে, মনে কর ?"

বিজলী শুনিল, কিছু উত্তর করিল না।

সুবোধের সাহস হইল। কহিল—"যতীনের সঙ্গে অভিনয় কর্‌তে পেলে যে-কোনও অভিনেত্রী কৃতার্থ হয়। যতীনের নামের সঙ্গে, তারও সুনাম হয়। তোমার অভিনেত্রী হওয়ার প্রবল সখ। এতদিনে সে সুযোগ যদি এল, তুমি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌চ। রয়্যাল ফিল্‌ম্‌স্‌ ছাড়লে, অভিনেত্রী বলে' তোমায় আর কেউই গ্রহণ কর্‌বে না—এ ঠিক জেনো।"

দুই হাঁটুর উপর দুইটি কনুই রাখিয়া এবং দুই হাতের দুই করতলে মাথাটা ধরিয়া, নতনেত্রে বিজলী নীরবে বসিয়া রহিল।

সুবোধ জোর করিয়া ঈষৎ হাসিয়া, জিজ্ঞাসা করিল—"কী ? ভাবচ' কি ? বল'। আমার ষ্টুডিও যাবার সময় হল যে—"

বিজলী সোজা হইয়া বসিয়া, কহিল—"কপালে যা-ই থাক্‌, যতীনের সঙ্গে আমি প্লে কর্‌ব না।"

সুবোধ তীক্ষ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"তাহলে, এই তোমার শেষ কথা, বিজু ?"

বিজলী ছাদের নীচে কার্নিশের নীল রেখাটির উপর চক্ষু নিবিষ্ট করিয়া কহিল—"নিশ্চয়ই।"

সুবোধের মনে ধিকি-ধিকি করিয়া সন্দেহের যে একটা ক্ষীণ রশ্মি জ্বলিতেছিল, সেটি ক্রমশ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

সুবোধ স্থির করিল, নিশ্চয় ইহাদের মধ্যে কোনও গুরুতর রহস্য আছে। এ রহস্য ভেদ করিতেই হইবে।

সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল—"যতীনের সঙ্গে কি কখনও তোমার কোনও ঝগ্‌ড়া বা মনোমালিন্য হয়েছিল?"

বিজলী সহজ ভাবে কহিল—"ঝগ্‌ড়া মারামারি হওয়া দূরের কথা, আমি তাকে চিনিই না, কখনও চোখেও দেখিনি।"

সুবোধের চিন্তার খেই হারাইয়া গেল।

সুবোধের হইল উভয়-সঙ্কট। বিজলী যদি যতীনের সঙ্গে অভিনয় না করে, তাহা হইলে সত্য সত্যই তাহাকে বরখাস্ত করিতে হইবে; নহিলে ইহাকে রাখিয়া, অন্য হিরোইনের চেষ্টা করিতে গেলে, লজ্জায় তাহার মাথা কাটা যাইবে! গণেশীলাল সেদিন সুবোধকে প্রকারান্তরে জানাইয়া দিয়াছে যে, সে ইহাদিগকে দয়া করিয়া ষ্টুডিও করিয়া দিয়াছে, প্রায় লাখ টাকা খরচ করিয়া তিন খানা ছবিও করাইয়াছে, তবুও ইহারা নিজের পায়ে যদি নিজে দাঁড়াইতে না পারে, তাহা হইলে শেঠজী কোম্পানি উঠাইয়া দিবে। সুবোধের সেই হইতে সত্যই একটু ভয় হইয়াছে। এ-কোম্পানি যদি উঠিয়াই যায়, তাহা হইলে সে কি করিবে? অন্য কিছু করিবার সব পথও যে তাহার আজ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে!

সুবোধের মনটা ক্রমশ তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। কহিল—"বেশ তা হলে আজই নোটিস্ পাবে। কোম্পানির মঙ্গল আমি সর্ব্বাগ্রে দেখ্‌ব। যতীনকে আমি এ ছবিতে নেবই। কত আর লোকশান দেওয়া যায়? উপর্য্যুপরি তিন-তিনখানা ছবিতেই তো দেখা গেল, তোমার নামে ছবি চলে না!"

বিজলী উদাসীন ভাবে কহিল—"বেশ, যার নামে ছবি চলে, তার নামেই চালাও। আমার তাতে আর বলবার কি আছে? তবে দয়া করে,' নোটিস্‌টা আমায় যেন আজই পাঠিয়ে দিও—"

বলিয়া বিজলী উঠিয়া দাঁড়াইতেই, মশ্‌লা-মাখা দুই হাতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভূষণ আসিয়া কহিল—"দিদিমণি, একটিবার রান্নাঘরে আসতে হবে যে। কোর্ম্মা তৈরিটা একেবারে ভুলে গিইচি—"

গড়গড়ার নলে জল ঢুকিয়া যাওয়ায়, সুবোধ সেটি ফুঁ দিয়া বাহির করিতে ব্যস্ত। বিজলী ভূষণের পানে চাহিতেই, ভূষণ চোখের এক আবাহনী ইশারা করিল।

বিজলী বিরক্তির অভিনয় করিয়া কহিল—"বেশ্‌ করেচ, লক্ষী ছেলে! ভুলে গিইচি—তবে আর কি? এমনি করে' পার্ট মুখস্থ করো—আর এন্‌-জি করে', ভূদেব মহাপাত্তরের কাছে কাণ মলা খেয়ো। চ'ল—"

বিজলী ভূষণের অনুসরণ করিয়া রান্নাঘরের দিকে গেল। সুবোধ গভীর চিন্তান্বিত ভাবে গড়গড়া টানিতে লাগিল। তামাক নিঃশেষ হইয়া, কল্কের আগুন পর্য্যন্ত নিভিয়া কোন্ কালে ছাই হইয়া গিয়াছে, সুবোধের সেদিকে লক্ষ্যই ছিল না।

রান্নাঘরে ঢুকিয়া, খিল খিল্ করিয়া হাসিয়া, ভূষণ কহিল—"কেমন? তবে যে বলেন, আমার বুদ্ধি নেই?"

সকৌতূহলে বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি?"

পাশের অন্ধকার ভাঁড়ার-ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, বিজলীর কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল—"যতীন্ মজুম্‌দার সায়্ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এয়েচেন। আমি

ভাঁড়ার-ঘরের ঘুপ্‌চির মধ্যে তাকে লুকিয়ে রেখেছি। মশার কামড়ে বেচারী মরে গেল—"

আতঙ্কিত ভাবে বিজলী বলিয়া উঠিল—"যতীন্ মজুমদার?" ভাঁড়ার-ঘরের দিকে মুখ ফিরাইতেই, চারি চক্ষের মিলন!

যতীন মাথাটা বাহির করিতেই, ভূষণ ভিতরে লুকাইতে ইঙ্গিত করিল। যতীন পুনরায় ভাঁড়ার-ঘরের অন্ধকার গুহায় অদৃশ্য হইল।

বিজলীর মুখখানা অকস্মাৎ নীরক্ত পাংশুবর্ণ হইল। তাহার গলা শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া উঠিল। বিমূঢ়ভাবে চুম্বকাকৃষ্ট লোহার মত যতীনের নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া, কম্পিতকণ্ঠে অতিকষ্টে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি?"

যতীন সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল—"যাক্, তবু চিন্‌তে পেরেচ। আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি চিন্‌তেই পার্‌বে না আমায়—"

বিজলীর কণ্ঠস্বর কতকটা সহজ হইয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল—তোমায় ভোলা আমার অসম্ভব। যাক্, এমন হঠাৎ? কি মনে করে?"

যতীন কহিল—"একটা কিছু মনে করে' নিশ্চয়ই। কিন্তু মশার কামড়ে যে ম'লাম—"

বিজলী কোমলভাবে কহিল—"আর একটু মশার কামড় সহ্য কর', যতু। আমি ওঁকে আগে বিদেয় করি, তারপর ধীরে সুস্থে বসে', কথা কইচি। পালিও না যেন—"

যতীন রহস্য করিয়া কহিল—"পালাব বলে' তো আসি নি, কথাবার্ত্তা কইতেই এসেচি। তবে ততক্ষণ বেঁচে থাক্‌লে হয়! আচ্ছা, এ মশাগুলি কি জার্ম্মান মশা?"

বিজলী মৃদু হাসিয়া কহিল—"তুমি বরং ভূষণের কাছে, এই জায়গাটায় এসে বস।"

যতীন বাহিরে আসিয়া,হতাশার অভিনয়ে হাত নাড়িয়া কহিল—"কর্ত্তা-গিন্নিতে যে ভাবে প্রেম-আলাপ হচ্ছে, তাতে আজ এ শেষ হলে হয়—"

বিজলীর অন্তরের সঞ্চিত তিক্ততার খানিকটা উপচিয়া পড়িল। কহিল—"যা শুনেচ, তা প্রেম-আলাপ নয়, প্রেম-বিলাপ।"

যতীন কহিল—"আলাপে প্রেমের ভূমিকামাত্র, প্রেম জমে বিলাপেই ভাল—"

বিজলী ম্লান হাসিয়া কহিল—"সেটা হাড়ে হাড়ে জানি।"

ভূষণ কহিল—"রান্না হয়ে গিয়েচে দিদিমণি—"

বিজলী কহিল—"ওঁর খাবার জায়গা কর' গিয়ে আমি যাচ্ছি।"

ভূষণ সুবোধের খাবারের জায়গা করিতে গেল।

এদিক-ওদিক চাহিয়া, ভয়ে ভয়ে অথচ গভীর উৎকণ্ঠিতভাবে, চুপি চুপি বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"আমার খোকা কেমন আছে, যতু? কত বড় হয়েচে সে?"

যতীন কহিল—""ভালই আছে, শুনিচি!"

বিজলী সজলচক্ষে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার নাম-টাম করে? তার মা-বাপের পরিচয়—"

ভূষণ ফিরিয়া আসিতেই, বিজলী তাহার প্রশ্ন অসম্পূর্ণ রাখিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল।

বিমর্ষভাবে সুবোধ আহারে প্রবৃত্ত হইল। গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে, বিজলী কোর্ম্মার ডেক্‌চিটি লইয়া হাজির হইল:

বনের বুল্‌বুল্‌—মনের ফুল-হার
এসেছ যদি প্রিয়, দিব না ছেড়ে আর।

আহার বন্ধ করিয়া, হাত গুটাইয়া, বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে মুখব্যাদান করিয়া, সুবোধ একদৃষ্টে বিজলীর মুখপানে চাহিল।

বিজলী গাহিয়া চলিল—

বাঁধিতে গিয়ে তারে বাঁধনে চারি পাশে
আপনি বাঁধা পড়ি, শাসন মানে না সে—
দিনের আলো-শেষে রাতের আঁধারে সে
আপনি ফিরে আসে শূন্য নীড়ে তার—
বনের বুল্‌বুল্‌—মনের ফুল-হার।

সুবোধের আহার হইয়া গেল! চোখ দুইটি কপালে উঠিল। ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ হইল: বিজলীর নিশ্চয় মাথা খারাপ হইয়াছে! মাসিক দুইশত টাকা বেতনের ষ্টুডিওর চাকুরীটি যাইবে, অভিনয় করিয়া বাংলাদেশে সে যে খ্যাতি চাহিয়াছিল—সে উচ্চাশার গোড়াতেও ছাই পড়িবে! আরও হয়ত ভাবিয়াছে, সুবোধও রাগ করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবে! একি কম আঘাত? মর্ম্মান্তিক! সুবোধই যদি এক সঙ্গে এতগুলি সর্ব্বনাশের সম্মুখীন হইত—তাহা হইলে তাহার কি হইত? সে একেবারে পাগল হইত, নয় হার্টফেল্‌ করিয়া মারা যাইত। বিজলীর হার্ট হয়ত নাই, কিম্বা পাথরের মত ভীষণ শক্ত, তাই ফেল্‌ করিল না। মাথাটা দুর্ব্বল বলিয়া মাথাটাই খারাপ হইল! সুবোধ চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সে তাহার একমাত্র মূলধন হারাইতে বসিয়াছে। এখন উপায়?

সুবোধের বিমূঢ় ভাব দেখিয়া, বিজলী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। বিজলীর মস্তিষ্কবিকৃতিতে সুবোধের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল।

বিজলী সরস সাবলীল ভঙ্গিমায় জিজ্ঞাসা করিল—"কি দেখ্‌চ অমন অবাক্ হয়ে আমার মুখপানে? খাও—খাবারগুলো যে ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল!"

সুবোধ অপ্রকৃতিস্থের মত কহিল—"য়্যাঁ?…খাই…কিন্তু—"

বিজলী আবার খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দুয়ারে ষ্টুডিও-মোটারের হর্ণ।

বিজলী দ্রুতপদে বহির্বারান্দায় গিয়া, চিক্‌টা একটু ফাঁক করিয়া, ড্রাইভারকে কহিল—"বাবু খেতে বসেছেন, লালু, একটু অপেক্ষা কর'—"

সুবোধ আহার শেষ করিয়া, হাতমুখ ধুইতে ধুইতে ভাবিল, মাথা বিজলীর নয়, তাহার নিজেরই বুঝি খারাপ হইয়াছে! আচমনের শেষে সুবোধ মাথায় ঘাড়ে ও কাণ দুটিতে বেশ করিয়া জলের ঝাপ্‌টা দিয়া, চিন্তিতভাবে বসিবার ঘরে আসিয়া বসিল।

ভৃত্য পাণ ও তামাক দিয়া, গড়গড়ার নলটি বাবুর হাতে ধরাইয়া দিয়া, চলিয়া গেল।

বিজলী অত্যন্ত সহজভাবে মৃদু হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাব্‌চ বল' ত?"

সুবোধ কহিল—"ভাবচি—আমি হয় স্বপ্ন দেখ্‌চি, নয় আমি পাগল হয়েচি—"

বিজলী ঈষৎ অপাঙ্গ হানিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন বল ত? ও—আমার এই ভাবভঙ্গী দেখে?"

সুবোধ স্বীকার করিল—"সত্যি, তাই। কি যে তোমার মনের কথা, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না, বিজলীদেবী—"

বিজলী তেমনি গদগদ ভাবে কহিল—"আর বুঝ্‌তে চেষ্টা কর' না! যা' বুঝিয়ে-লোক তুমি, তার খুব পরিচয় দিলে!"

সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল—"কেন বল' ত?"

বিজলী লঘু হাস্যে হেলিয়া দুলিয়া কহিল—"তুমি একটি আস্ত গরু। সকাল থেকে যে তোমার সঙ্গে ঠাট্টা কর্‌ছিলাম, এটা তুমি কিছুতেই ধর্‌তে পার্‌লে না?"

সুবোধ বিহ্বলভাবে কহিল—"ঠাট্টা করছিলে?"

বিজলী কহিল—"আজ্ঞে হাঁ, মশায়! যতীনের সঙ্গে অভিনয় না-করার আমার কি কারণ থাক্‌তে পারে? যখন শুন্‌লে, আমি তাকে চিনিও না, জানিও না! অথচ কোনও কারণও দর্শাচ্ছি না। চাক্‌রী চলে যাবে—তবুও বল্‌চি, করব না! তখনও কি তুমি বুঝ্‌তে পারলে না? তোমার সঙ্গে দেখ্‌চি ঠাট্টা করাও বিপজ্জনক—"

সুবোধ গোলোকধাঁধাঁর মধ্যে যেন ঘুরপাক খাইতে লাগিল। বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাট্টা কর্‌ছিলে? সত্যি বল্‌চ? আমি কি এতই বোকা?"

বিজলী ধীরভাবে কহিল—"বেশ—ধর', ঠাট্টা করি নাই। কিন্তু আমার সেই জিদের পর, এর মধ্যে এমন কি ঘট্‌ল যে, আমি আমার মত পরিবর্ত্তন কর্‌লাম? আমি তো তোমার কাছেই রয়েচি, আর কেউ এসে আমায় শিখিয়েও দিয়ে গেল না। তবে কি হল এরি মধ্যে যে, অমন ঘোর অমতের পর, হঠাৎ এত মত?"

সুবোধ ভাবিতে লাগিল! গোলোকধাঁধাঁটা, গো-লোকদের জন্যই ঠিক! বিজলীর কথায় অবিশ্বাসের কিছুই তো নাই। সত্য সত্যই সে একটি গরু! কিন্তু মনটা কেন প্রসন্ন হয় না? কোথায় যেন কাঁটা বিধিয়া আছে, সেই জায়গাটা কেবলি খচ্‌খচ্‌ করিতেছে। তর্কেই বা সুবোধ বিজলীকে হারাইতে পারে না কেন? যুক্তিতে না পাইলেও, সুবোধের বিশ্বাস—বিজলী এখনই মিথ্যা বলিতেছে; সকালেই সে তাহার আসল মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে। প্রথম হইতেই তাহার মনে রহস্যের যে একটা সন্দেহ জাগিয়াছে, সেটি অপসৃত না হইয়া, ধীরে ধীরে বিস্তৃতই হইতে লাগিল। কোর্মা রাঁধিতে গিয়াই এই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। কোর্মার সঙ্গে এ রহস্যের কোনও যোগসূত্র নাই ত? ভূষণ কিছু বোধ হয় জানে। এ রহস্যময় ব্যাপারটায় ভূষণের কোনও হাত নাই ত? সুবোধের হাসি পাইল—ভূষণ আবার একটা মানুষ?

সুবোধকে চিন্তিত দেখিয়া, বিজলী কহিল—"আমি অভিনেত্রী, অভিনয় আমার পেশা—ভুলে যাচ্ছ কেন? তোমাদের ছবি তিনখানা আমার অভিনয়ে বা নামে চলে নাই সত্য, কিন্তু আমার অভিনয়ের কি অসাধারণ শক্তি—তা বোধ হয় এইবার রয়্যাল ফিল্মসের প্রধান সচিব মশায় স্বীকার করবেন।"

সুবোধ স্বীকার করিতেছে অনেক কথাই, কিন্তু বিশ্বাস করে কই? কহিল—"এর পূর্ব্বে, আমি তোমায় যত বার বলেচি, যতীন্দ্রের সঙ্গে প্লে করতে, কখনও তুমি রাজী হও নি এবং কেন যে রাজী নও, অদ্যাবধি তার কোনও কারণও বল' নাই! কাজেই এ আপত্তি তোমার নতুন নয়।

প্রথম শুন্‌লে, হয়ত ঠাট্টাই মনে করতাম। কিন্তু আজ আর তা করতে পারচি না—"

বিজলী সহজ ভাবে কহিল—"তুমি লোকটি বড় সহজ নয়! ভারী খুঁৎখুঁতে, সন্দিগ্ধ লোক তো তুমি! এই রকম লোকই অকারণ মনঃকষ্ট পায় সব চেয়ে বেশী—"

সুবোধ সলজ্জভাবে কহিল—"তা' তুমি যা-ই বল, খট্‌কা আমার একবার লাগ্‌লে, সহজে যায় না।"

বিজলী গভীর আন্তরিকতার অভিনয় করিয়া কহিল—"তুমি বাজারের স্ত্রীলোকদিকেই চেন', ভদ্রমহিলা কখনও দেখ' নাই। তাই মুড়ি-মিছরীর এক দর করেই, এমন গোলযোগে পড়েছ! বুঝবে একদিন। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম্ম কেউ বোঝে না।"

সুবোধ একটু নরম হইয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল—দাঁতের মর্ম্মও বুঝি, সত্যি মিথ্যেও বুঝি—"

বিজলী বাধা দিয়া কহিল—"কিচ্ছু বোঝ' না। ভেবেছিলাম, নিজের কথা নিজের মুখে বলা পাপ, বলব না; কিন্তু তুমি যখন না বললে বুঝ্‌বে না, তখন শোন: যতীনকে কোনও দিনই তোমরা সত্যি করে' নিতে চাও নি: কারণ তার দক্ষিণা দেবার ক্ষমতা তোমাদের ছিল না। পাছে, লোকে তোমায় দোষ দেয়, কিপ্‌টেমি করে' সস্তায় ছবি তোল' বলে', তাই আমি বায়না ধরলাম—যতীনের সঙ্গে প্লে করব না। তুমি সর্ব্বত্র তাই রটিয়েই, সেই সব নিন্দে হ'তে অব্যাহতি পেয়েছ। বল ঠিক কি না?"

সুবোধ সত্য সত্যই বিজলীর মুখে জনকনন্দিনী সীতার মুখচ্ছবি

প্রতিফলিত দেখিল! পুলকাতিশয্যে বিহ্বল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—
"বল' কি, বিজু?"

বিজলীর মুখমণ্ডলও অস্বাভাবিক রকম উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিল—"ঠিক কি না, স্থিরভাবে ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করে দেখ'। যাক্, বেলা প্রায় একটা বাজে, গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে প্রায় ঘণ্টা দুই। ষ্টুডিও কখন যাবে?"

সুবোধ উত্তেজিতভাবে কহিল—"হোক্ গে দেরী! এবার তবে যে—"

বিজলী কহিল—"প্রথমটা অমত করে' দেখ্‌লাম, যতীনকে নেওয়া তোমার ঠিক সত্যি কিনা! তাই প্রাণপণ শক্তিতে অভিনয় কর্‌লাম, অভিনয়ে তোমায় মুগ্ধও কর্‌লাম। যখন বুঝ্‌লাম যে এবার যতীনকে নিতে তোমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন মনের কথাটি খুল্‌লাম। ব্যাপার তো এই, অত্যন্ত ছোট—অথচ তুমি এই তিলকে একটা তালই শুধু কর্‌লে না, তাল কেটেও ফেল্‌লে।"

নিজের বুদ্ধিহীনতায় সুবোধ অত্যন্ত লজ্জিত হইল। অবস্থার জটিলতাটি কিঞ্চিৎ সরল করিবার জন্য পুলকিত ভাবে সুবোধ কহিল—

"কত রঙ্গ জানো তুমি, কত রঙ্গ জানো—
ভরা গাঙে জাল ফাইল্যা ডাঙায় বসে' টানো॥

এবার বিজলীর পালা! বিজলী মুখটা একটু বিষণ্ণ করিয়া কহিল—
"উঃ কি ভয়ানক লোক তুমি! অম্লান বদনে বল্‌লে—আজই নোটিস্ দেব?"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কোটটা পরিতে পরিতে সুবোধ বিজলীর মনে

সান্ত্বনার একটা প্রলেপ দিবার উদ্দেশ্যে কহিল—"কিছু মনে কর' না, বিজু! জান' তো, পরের টাকায় ব্যবসা কর্‌চি। তিনখানা ছবিতে প্রায় লাখের উপর টাকা লোক্‌সান হয়েছে। গণেশীলাল সেদিন বলেই দিল স্পষ্ট, এখন থেকে সে আর একটি পয়সাও দেবে না। খামখেয়ালী লোক, জান ত'? এ ছবিখানাও যদি ফেল্ হয়, তাহ'লে শেঠজীর তেমন কিছু হবে না, তবে এতগুলি প্রাণীর সঙ্গে, তুমি-আমিও পথে বসব। অথচ, কিছু পেলে ষ্টুডিওটা বজায় থাকে। তাই একটু অতিরিক্ত সাবধানী হতে হয়েছে এখন থেকে।"

আবার হর্ণ।

সুবোধ দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বিজলী বারান্দায় দাঁড়াইয়া সুবোধকে বিদায় দিল। গাড়ীখানি দৃষ্টির অতীত হইলে, ফিরিয়া আসিয়া, দেখে—বসিবার ঘরে যতীন মজুমদার মহাশয় সোফার উপর পরম আরামে হাত পা ছড়াইয়া, কাৎ হইয়া অর্দ্ধশয়িত।

বিজলী যতীনের সম্মুখে বসিয়া, একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"যাক্ বাবা, নিশ্চিন্দি! মস্ত একটা দুর্ভাবনা কাট্‌ল'।"

যতীন সশ্লেষে জিজ্ঞাসা করিল—"বল কি?"

ভূষণ আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইল। যতীন কহিল—"যাও শীগ্‌গীর তবে খেয়ে এস। কথাটা সেরে আমায় আবার গ্লোব-ফিলিমে যেতে হবে। এত দেরী হবে তা কি জান্‌তাম?"

বিজলী কহিল—"খাব' পরে। তোমার কথাটাই আগে সেরে নাও না।"

যতীন কহিল—"তা হবে না। ব্যাপারটা গুরুতর। খেয়ে-দেয়ে স্থির হয়ে না বস্‌লে, হবে না। যাও—যাও—আগে খেয়ে এস—"

বিজলী খাবার ঘরের দিকে অগ্রসর হইলে, ভূষণ যতীনকে ঢুম্ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া, হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে নিবেদন করিল—"আমার পাটের ডাইনোক্‌গুনো, সার, আপনাকে সার, ঠিক করে দিতেই হবে, সার—"

ভূষণের কথার সম্পূর্ণ অর্থবোধ হইবার আগেই, বিজলী ডাকিল—"ভূষণ—"

—"যাই দিদিমণি" বলিয়া অত্যন্ত বিরক্তভাবে ভূষণ ছুটিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া, আঁচলে হাত-মুখ মুছিতে মুছিতে, হাসিভরা মুখে, বিজলী ঘরে ঢুকিতেই, যতীন হাঁই তুলিতে তুলিতে ধড়্‌মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সে একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল।

একটা টীপয়ের উপর, ভৃত্য কতকগুলি পান, একটু চূণ ও জর্দ্দার একটি কৌটা-সহ একখানা রেকাবী রাখিয়া চলিয়া গেল।

ভূষণ এক প্যাকেট সিগারেট ও একটি দিয়াশলাই আনিয়া যতীনের সম্মুখে রাখিয়া, ঘরের মধ্যেই সসম্ভ্রমে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। ভূষণের মুখমণ্ডল উত্তেজনা ও পুলকের দীপ্তিতে সমুজ্জল।

যতীন জিজ্ঞাসুভাবে ভূষণের ও বিজলীর মুখের দিকে চাহিতেই, বিজলী কহিল—"ভূষণ, তুমি ভাই কোথাও বেরিও না যেন। ঠিক চারটে বাজলেই যতীনবাবুকে একটু চা দিও। অ-বেলায় খেলে—এখন একটু বিশ্রাম কর' গে যাও—"

ভূষণের ইচ্ছা নয় যে, সে যায়। সে যেন কি-বলিবার জন্য উস্‌খুশ করিতেছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছে না। এমন সুযোগ পাইয়াও, বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রাভিনেতা যতীন মজুমদারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সে একটু আলাপ জমাইতে পারিতেছে না—ইহা কি কম ক্ষোভের বিষয়? অথচ বিজলীর আজ্ঞার বিরুদ্ধে কিছু বলিতেও পারে না। বিজলীর উপর তাহার রাগ হইতে লাগিল। ভূষণের পা হঠাৎ এক অদৃশ্য শক্তিতে যেন মেঝের সঙ্গে জুড়িয়া গেল!

ভূষণের মুখে হতাশার এক ম্লান ছায়া লক্ষ্য করিয়া, বিজলী কহিল—"কিচ্ছু ভেবো না ভাই, আমি যতীনবাবুকে বলে'-কয়ে' সব ঠিক করে' দেব'। এবার তোমার অভিনয় যাতে এক্কেবারে ফাষ্টো কেলাশ হয়, সে ভার যতীনবাবু নিশ্চয় নেবেন—"

মেঘাচ্ছাদিত ভূষণের মুখ-চন্দ্রমা, মেঘমুক্ত হইল। ভূষণ কহিল—"আপনারই তো ভরসা, দিদিমণি! সারকে বলতেই আমার সাহস হয় না—" বলিয়া ঢক্ করিয়া যতীনকে ভক্তিভরে এক দণ্ডবৎ করিয়া, বিজলীর নির্দ্দেশমত, ভূষণ প্রসন্ন মনে বিশ্রাম করিতে গেল।

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—"এ চীজটিকে সংগ্রহ করলে কোত্থেকে?"

বিজলী কহিল—"এ এক অনাথ ব্রাহ্মণসন্তান। আমার আশ্রয়ে এসে পড়েচে, কি আর করব? আছে! এ এখন আমার ধর্ম্ম-ভাই। ছবিতে প্লে করার এর ভারী সখ—"

যতীন কহিল—"এ সখ তো এ-যুগে আবালবৃদ্ধবণিতা, সকলেরই আছে। এও যে সে ব্যায়রামের ছোঁয়াচ-ছাড়া নয়, তা এ বাড়ীতে পদার্পণ করামাত্রই বুঝতে পেরেছি!"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম?"

যতীন মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিল—"আমাকে দেখেই তো খুব খাতির-যত্ন করে' বসাল', নমস্কার করল, কুশল জিজ্ঞাসা করল, সুবোধ আছে 'বলে' আমাকে সাবধান করে দিয়ে লুকিয়ে পর্য্যন্ত রাখল—এক-কথায়, অত্যন্ত পরিচিতের মত এমন আপ্যায়িত করল' যে, আমি তো অবাক্। অথচ আমি ওকে মোটেই চিনতে পারলাম না। তারপর তোমায় ডেকে দিল।"

বিজলীর প্রাণ উড়িয়া গেল! যতীনের সহিত অভিনয় করিতে বিজলী যে নারাজ ছিল, উল্লুকটা সে কথাটিও ইহার মধ্যে যতীনকে বলিয়াছে নাকি? যদি সত্যই বলিয়া থাকে, তাহা হইলে আজই উহার এ-বাড়ীতে শেষ দিন! অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"আমাদের নতুন্ ছবি সম্বন্ধে তোমায় কিছু বলে নি?"

যতীন কহিল—"হাঁ, হাঁ—কি যেন বল্‌ছিল আমি ভাল বুঝ্‌তেই পার্‌লাম না ওর কথা। কি—জমিদার হিরো হিরোইন আমি—ভাল করে কাণই দিই নি! আর এ সব র‍্যাবিশ শুনবার মত তখন আমার মেজাজও ছিল না। ব্যাপার কি বল দেখি?"

বিজলী নিশ্চিন্ত হইয়া, উচ্চহাস্য করিয়া কহিল—"আমাদের এবার যে ছবি হবে, তাতে তোমায় নেওয়া হচ্ছে হিরো, আর ঐ ভূষণের কি একটা জমিদারের পার্ট আছে! সেই আনন্দে ওর মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়েছে!"

যতীন্ উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমি হিরো? বল' কি? 'এ যে অসম্ভব বাণী, মহারাণি'—"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"কেন? অসম্ভব কেন? ভূদেবের কাছে কাজ কর্‌তে চাও না বুঝি?"

যতীন কহিল—"আমি তো আমার রেট থেকে একটি পয়সাও কম নেব' না। আমার পূরো টাকা যদি ওরা দেয়, তাহ'লে ভূদেব কেন, তোমার ঐ ভূষণের ডিরেক্‌শানে কাজ করতেও আমার এতটুকু আপত্তি নেই। টাকা নেব', মুখে রং মাখ্‌ব—তা' সে যে-ই মাখাক। ও-সব ভূয়ো অভিমান আমার নেই, কালিদাসি—"

বিজলী বাধা দিয়া কহিল—"আমি আর কালিদাসী নেই, এখন আমি বিজলী! সেটা কেন ভুলে যাচ্ছ, বন্ধু?"

যতীন্ কহিল—"বহু দিনের অভ্যাস, আর দেখা-ও হল বহু দিন পরে, তাই কালিদাসীটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়! বেশ বিজলী, বিজলীই সই! এতেও আমার কোন আপত্তি নেই! অন্তর্জলি, গঙ্গাজলি, জলাঞ্জলি, বিজলী—যা' হয় একটা জলী হলেই হল! জলীয় তো সবই—"

বিজলী একটু তীক্ষ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"জলীয়, মানে?"

যতীন্ ঈষৎ হাসিয়া নির্ব্বিকারভাবে কহিল—"স্ত্রীলোক জাতটাই হচ্ছে জল জাতীয় অর্থাৎ জলীয়ঃ যতক্ষণ একটা আশ্রয়ে থাকে, বেশ থাকে—সুস্বাদু নির্ম্মল পানীয়ঃ এতে পেট ভরে না বটে, তবে জীবনধারণে জল হচ্ছে একান্ত অপরিহার্য্য এবং প্রতিমুহূর্ত্তে ব্যবহার্য্য—এইজন্যে লোকে জলকে জীবনও বলে। অথচ এই জল আশ্রয়-ছাড়া হয়ে একবার মাটিতে পড়্লেই, সে অমনি হয়ে ওঠে একেবারে অব্যবহার্য্য এবং বিষাক্ত। মাটিতে প'ড়ে, সে মাটিকে পর্য্যন্ত কাদা করে' তোলে। মাটি যদি শক্ত হয়, তা'হলে মাটির উপর দিয়ে সে কেবল নীচের দিকেই গড়াতে থাকে।"

যতীন কথাকয়টি বলিয়াই বিজলীর মুখভাবে এক আরক্ত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে লাগিল। বিজলীর অন্তরে কথাটা যে জোরেই আঘাত করিল, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বেশ স্পষ্টই বুঝা গেল।

করুণভাবে বিজলী ক্ষমাভিক্ষার মত যতীনের মুখপানে চাহিতেই, যতীন দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

প্রসঙ্গটি বদ্‌লাইবার জন্য বিজলী কহিল—"আমি অনেক জিদ করে এবার এই ছবিতে তোমায় নেওয়াচ্ছি, যতু—"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—"ছবিতে তো নেওয়াচ্ছ, টাকা পয়সা ?"

বিজলী জানাইল—"একেবারে পাই-পয়সা যা' বল্‌বে, তাই দেবে! আরে, একি অমনি সহজ মনে করচ? আজ প্রায় মাসাবধিকাল ধেঁতানোর পর, সবে মাত্র আজ সকালেই সুবোধবাবু রাজী হলেন।"

যতীন্ কহিল—"দেখো! টাকা-পয়সা যদি ঠিক ঠিক দেয়, কাজও তা'হলে ঠিক-ঠিক পাবে। সেটা তাদিকে এখন থেকে বেশ ভাল করে' বুঝিয়া দিও। তা' নৈলে তারাই ঠক্‌বে। জান' তো—টাকা না'পেলে মুখের রং তুলে, থিয়েটার হতে তৃতীয় অঙ্ক থেকেই, আমার পালান' অভ্যেস আছে!"

বিজলী মোলায়েমভাবে কহিল—"তা' তারা ভালই জানে। তুমি এ সব কথা ঠিক করে' নিও, ভাই। তোমার দেনা-পাওনার মধ্যে আমি তো থাক্‌ব না। তবে একটা কথা তোমায় আমার রাখ্‌তে হবে, যতু—" বিজলীর কণ্ঠ মিনতিতে সকরুণ।

যতীনের কণ্ঠেও সহানুভূতির সুর ধ্বনিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কি কথা, দাসী? ওঃ—বিজলী!"

বিজলী কহিল—"তোমায় আমায় যে কোনও দিন অতিনিকট সম্বন্ধ ছিল, সে কথা যেন কেউ ঘূণাক্ষরে না টের পায়। এমন কি, আমরা যে পরস্পরকে চিনি বা কখনো কেউ কাউকে দেখেচি, এতটুকুও কেউ যেন না বুঝ্‌তে পারে। লক্ষ্মিটি, তোমার পায়ে ধরি—আমার এই উপকারটি করো, যতু—"

যতীন কহিল—"তা' বেশ, এ আর এমন কঠিন কি? তাই হবে। কিন্তু কেন বল দেখি?"

বিজলী কহিল—"সুবোধবাবুর কাণে উঠলে, আমার সর্ব্বনাশ হবে। তিনি আমায় ভদ্রমহিলা বলেই জানেন।"

যতীন কহিল—"আমার দ্বারা অবিশ্যি কিছুই প্রকাশ হবে না, এ নিশ্চিত জেনো। তোমার যাতে অপকার হয়, এমন কাজ কখনও আমি করি নাই, আজও করব না—মরে গেলেও, না! এ কথা বোধ হয়, তুমি বিশ্বাস কর্‌বে।"

পূর্ব্বকৃত অন্যায়ের লজ্জায় বিজলীর মাথা নুইয়া পড়িল। যতীনের পানে সে চাহিতেই পারিল না। নতমুখে কম্পিতকণ্ঠে কহিল—"তা' জানি, যতু! আমিই নির্ব্বোধ, নিতান্ত হতভাগিনী—"

বিজলীর কণ্ঠস্বর নিদারুণ অনুশোচনার অব্যক্ত বেদনায় গভীর।

যতীন পূর্ব্বস্মৃতির উত্তর-বায়ুকে রোধ করিবার অভিপ্রায়ে, কিঞ্চিৎ সরসভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কিন্তু এত ভয়ই বা কিসের? ও-তো তোমায় ফাঁসিও দেবে না, কালাপানিও পাঠাবে না! বড়জোর, দিন-কয়েক তুমি একটু একলা থাক্‌বে! তারপর যেমন সবারি হয় এবং নিত্যি অগুন্তি হচ্ছে, এক রাজা যায়, আর অন্য রাজা হয়। তা এত ভাবনা কিসের? ক'ল্‌কাতা শহরে এই যে তোমাদের পঞ্চাশ-ষাঠ হাজার রূপসী আছে, তাদের মধ্যে পঞ্চাশী থেকে পঞ্চদশী পর্য্যন্ত, কেউ কি আজ পর্য্যন্ত না খেতে পেয়ে, মরেচে—কখনও শুনেছ? অথচ দেখ' গিয়ে—ভাল-ভাল এম্‌-এ, এম্‌-এস্‌-সি, প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ, ডক্টরেট্‌, সামান্য মাইনেতে সাধারণ একটা চাকরীর জন্যে, সারা দিন-রাত

ক্ষ্যাপা কুকুরের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কত যোগ্য লোক, কিছুই করতে না পেরে, শেষে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করচে। তোমার ভয় কি? তুলসীদাসজী লিখেছেন—

গোরস গলি-গলি ফিরে
সুরা বৈঠে বিকায়—

শুঁড়িবাড়ীতে যা পাওয়া যায়, সেটা ঠিক সুরা নয়—বরং বে-সুরা বলতে পার'। সুরা আসল, তোমরাই—এই সুরাতেই মানুষ সত্যিকারের মাতাল হয়।"

বিজলী সলজ্জভাবে একবার যতীনের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া, তখনি আবার মুখ নীচু করিয়া যেমন ছিল, তেমনি বসিয়া রহিল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও যতীনের মনে পূর্ব্বস্মৃতির জোয়ার আসিল।

বিজলীর মনের পর্দ্দায় তখন একখানা নীরব চিত্রনাট্য প্রদর্শিত হইতেছিল ঃ

বিজলীকে যতীন গ্রহণ করিয়াছিল সে এক দারুণ দুর্দ্দিনে, যে দিন বিজলী অত্যন্ত নিঃসহায় নিঃসম্বল ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল একেবারে কলিকাতার অকরুণ রাজপথে। যতীন যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া বিজলীকে আশ্রয় দিয়াছিল। বিজলী তখন ছিল, অজ্ঞাত অখ্যাত কালিদাসী নাম্নী গৃহবিতাড়িতা, অন্তঃসত্ত্বা, বিশিষ্ট ভদ্রঘরের এক তরুণী।

বাল্যকালে পিতামাতাকে হারাইয়া, অষ্টমবর্ষীয়া কালিদাসী তাহার একমাত্র জ্যেষ্ঠা ভগিনী উমাদাসীর নিকট কলিকাতায় আসে। উমা কলিদাসী অপেক্ষা প্রায় ১০।১২ বৎসরের বড়। উমার স্বামী

আনন্দ গুপ্ত কলিকাতায় একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং বড়লোক। মাতৃস্নেহে উমা কালিদাসীকে মানুষ করিল।

কালিদাসী যখন ম্যাট্রিক পাশ করিয়া আই-এ পড়িতেছিল, সেই সময়েই পড়িল তাহার জীবনে গভীর যবনিকা। কিছুদিন হইতেই আনন্দবাবুর সহিত গোপনে কালিদাসীর এক অবৈধ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। কালিদাসী প্রাণপণে ভগিনীপতির এই পাশবতাকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু সফল হয় নাই। উমা স্বামীকে যেমন ভয় করিত, তেমনি প্রাণ দিয়া ভালও বাসিত। কালী তাই উমাকে আনন্দর কু-প্রস্তাবের কথা বলিতে সাহসী হইল না। সে ভয় করিল। ভাবিল—হয়ত, তাহার কথা দিদি বিশ্বাসই করিবে না: বিপরীত ফল হইবে, তাহাকেই হইতে হইবে গৃহহীন: গৃহস্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া সে-গৃহে অনধিকারীর কখনও একটি দিনও বাস করা চলে না—অথচ সংসারে দিদি-ছাড়া তাহার আর কেহই ছিল না: আনন্দবাবু নিশ্চয় একথা অস্বীকার করিবেন। দিদি কি তখন ভগিনীর জন্য স্বামীর কথা অবিশ্বাস করিবে? প্রবলের অত্যাচারে সে-ই মিথ্যাবাদিনী প্রমাণিত হইবে! লজ্জায় ও অপমানে যাবজ্জীবন সে-ই তুষানলে পুড়িবে। কালিদাসী শক্তিহীন, নিঃসহায় অবস্থায় আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল! তাহার ফলে, কালিদাসী হইল সন্তানসম্ভবা।

উমা ভগিনীকে বিসর্জ্জন দিয়া, নিজের ঘরের ছিদ্র বন্ধ করিল: সর্পদ্রষ্ট অঙ্গুলিটি কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া, সে নিজের জীবন রক্ষা করিল। তাহার পুত্রকন্যা আছে, সমাজসংসার আছে, সহরে মান-সম্ভ্রম আছে। কালিদাসী সেই দুর্ব্বলদেহে নিরাশ্রয় ও নিঃসম্বল হইয়া দাঁড়াইল

একেবারে পথে। কালিদাসীর তখন আঠার বৎসর বয়স। যতীন এই সময়ে তাহাকে আশ্রয় দেয় এবং নিজ ব্যয়ে তাহাকে বিপন্মুক্ত করে। যতীন কালিদাসীর সেই পুত্রের ব্যয়ভার বহন করিতেও স্বীকৃত হয়। সে পুত্রের বয়স এখন প্রায় আট বৎসর।

কালিদাসী যতীনের আশ্রয়ে থাকিতে থাকিতে, একদিন যতীনের অজ্ঞাতে যতীনেরই এক ধনী বন্ধুর সহিত পলায়ন করে। কিন্তু অল্পদিনেই সে তাহার কৃতকার্য্যের অনুরূপ ফল পায়। যতীন তাহাকে সত্যই ভালবাসিত। সামান্য আয়ে, যতীন তাহাকে অতুল সুখে রাখিয়াছিল। যতীনের বন্ধু প্রদ্যোৎ শীলের রূপ-যৌবন গাড়ী-বাড়ী ও টাকা-কড়ির মোহে প্রলুব্ধ হইয়া আসিয়া, কালিদাসী এখানে সে স্নেহের শতাংশও পাইল না! অল্পদিনেই সে আবার নিরাশ্রয় হইল। তারপর যেমন হয়, বহু গিরিদরীমরুপর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া, কালিদাসী বিজলীদেবী হইয়া, অকস্মাৎ :ভদ্রমহিলারূপে ভবানীপুরের একটি ফ্ল্যাটে আসিয়া একদিন আবির্ভূতা হয় এবং নৃত্যে গীতে ও অভিনয়ে কিছু দিনের জন্য শহরে এক ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। আজও সে তাহারই জের টানিয়া চলিয়াছে।

এইজন্যই যতীনের নিকট হইতে বিজলী কেবলই দূরে সরিয়া থাকিতে চেষ্টা করিত। যতীনের নিকট মুখ দেখাইতেও সে এতদিন সাহস করে নাই। যতীন তাহার সব জানে, যতীন তাহাকে ভালবাসিত—তাই যতীনকে বিজলী ভয় করে ঃ যতীনের সম্মুখে দাঁড়াইতে তাহার পা কাঁপে, কণ্ঠরুদ্ধ হয়, সাহস হয় না।

আচম্বিতে সেই যতীনকে আজ তাহারি ঘরের এক কোণে বিনাহ্বানে

সমাগত দেখিয়া, তাহার মন আর যতীনকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না। দৃষ্টির বাহিরে এবং সুদূরে থাকিয়া, এত দিন যাহা সম্ভব হইয়াছিল, যতীনের সম্মুখীন হইবামাত্রই, সেই অতীত দিনের সব কুণ্ঠা এবং গ্লানি তাহাকে লজ্জাকর অনুশোচনার অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। নিজের ক্ষুদ্রতায়, অপরাধে এবং নির্ব্বুদ্ধিতায়, সে নিজেই মরিয়া গেল।

এতদিন সে যতীনের নামে ভয়ে শিহরিয়া উঠিত। ভাবিত—না জানি, যতীন তাহাকে দেখিয়া কি একটা কাণ্ডই না করিয়া বসিবে! অথচ যতীন কিছুই করিল না। তবু বিজলী সহজ হইতে পারে না। যতীন যেন বিজলীকে আজ আবার নূতন করিয়া জয় করিল: যাদু করিল: সম্মোহিত করিল। যতীনের কাছে বসিতে পাইয়া, তাহার সহিত সহজ ভাবে কথা বলিতে পাইয়া—সে আজ সত্য সত্যই কৃতার্থ হইল। এত সুখ বুঝি সে আর কখনও পায় নাই।

যতীনের সঙ্গে এতক্ষণ কথাবার্ত্তায়, যতীনের দিক্ হইতে বিভীষিকাময় পুরাতন প্রসঙ্গের কোনও উচ্যবাচ্য না দেখিয়া, বিজলী বিস্মিত হইল। নিজের বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ যেন হঠাৎ আগ্নেয়গিরির লাভা ছড়াইয়া তাহার সমস্ত অন্তরখানিকে দগ্ধ করিয়া দিতে লাগিল। বিজলীর কেবলি মনে হইতে লাগিল—যতীনের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া সে প্রায়শ্চিত্ত করে: বিপুল পর্ব্বতপরিপিষ্ট মনটিকে ভারমুক্ত করে: মনের ময়লা কাটাইয়া মনটাকে লঘু করে। কিন্তু তাহাও সে পারে না—কে যেন তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া আছে! যে তাহার জীবনদাতা, যে তাহার জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি এবং বংশ-পরিচয় পর্য্যন্ত জানে, যে তাহার মূঢ়তা-পঙ্কের পঙ্কজটিকে অদ্যাবধি সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছে—

তাহার কাছে কিসের অহঙ্কার? কিসের অভিমান? কিসের প্রতিবন্ধক? কিসের লজ্জা?···কিন্তু তবু পারে না। গত আট-নয় বৎসরের মধ্যে তাহার মনের যে বন-পথে একটিও লোকচলাচল হয় নাই, সে পথটি বিজলী আজ হঠাৎ দেখিল—ভীষণ কণ্টকাকীর্ণ, দুর্গম; সর্পশ্বাপদসঙ্কুল, বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক! সে-পথে অতীত দিনের একটি পদচিহ্নও আজ আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! পথের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই, আছে কণ্টকের ক্ষেতে কেবল কাঁটার ফসল! সেই পথহীন অরণ্যের মধ্যেও, বিজলীর অস্পষ্ট মনে পড়িল—একটি সুকুমার শিশুর মুখ। কালবৈশাখীর দুরন্ত ঝড়ে, বহু দিনের পড়ো-বাড়ীর খোলা দুয়ার-জানালাগুলি যেমন অনবরত খুলিয়া ও বন্ধ হইয়া, চৌকাঠে ঘন ঘন বীভৎস-ঝঞ্চনায় আঘাত করে এবং অল্প অল্প করিয়া ধ্বসিয়া পড়ে, কিন্তু চৌকাঠ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পায় না—তেমনি বিজলীর চিন্তাগুলি তাহার মনের পড়ো-বাড়ীতে, কেবলি মাথা কুটিতে লাগিল। বিজলীর অন্তরখানি একটা অব্যক্ত ব্যথায় আতুর হইয়া উঠিল! বিজলী মুক্তি চায়, পায় না—সে ছুটিয়া পলাইতে চায়, পথ নাই। তাহার দুই চক্ষু বহিয়া দরদর ধারায় জল পড়িতে লাগিল। যতীন তাহা লক্ষ্য করিল না।

যতীন অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া, আপন মনে সিগারেট টানিতেছিল। বিজলী সন্তর্পণে চোখের জল মুছিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিয়া, অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"গোরস হয়েই আমরা জন্মাই, তারপর তোমরাই তো আমাদিকে সুরা করে তোল'।"

যতীন চট করিয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল—"মিথ্যা কথা। পৃথিবীতে পাশাপাশি চোরও আছে, গৃহস্থও আছে। চোর চুরি করবেই,

গৃহস্থের উচিত সাবধান হওয়া। ঘর খুলে রেখে গৃহস্থ ঘুমুবে, আর চোরে চুরি করলে, হবে চোরের দোষ? এ যুক্তি একমাত্র স্ত্রীলোকের মাথাতেই সম্ভব, তাই স্ত্রীলোকেরাই ঠকেও বেশী। পৃথিবীতে চোরের সংখ্যাই বেশী, দাসী, সাধু আজ এক রকম নেই বললেই হয়। আনন্দবাবুর দোষ আমি কখনও দিই নাই, আজও দিচ্ছি না—তুমি তো জান!"

বিজলীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। সবিনয়ে কহিল—"সে আলোচনায় এখন আর কি হবে? অন্যায় আমারই, স্বীকার করচি—তবে বহু ঠেকে শিখেচি বলে', আর ঠেকতে ইচ্ছা হয় না। তুমি আমায় ক্ষমা কর', তোমার কাছেও আমি কম অপরাধী নই—"

যতীন বাধা দিয়া কহিল—"সে কথা ছেড়ে দাও, দাসী, আমি আর সে যতীন মজুমদার নই। তোমার ব্যাপারেই আমার চোখ ফুটেছে। আমি এখন সংসার-ধর্ম্মে সম্পূর্ণ মন দিয়েছি।"

বিজলী হঠাৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কহিল—"ভালই করেছ। এ কথা শুনে সত্যি আমি ভারী খুসী হলাম। আমার মনে হয়েছিল, তুমি হয় ত—"

যতীন কহিল—"আরে রাম। আমি ঈডিয়ট নই। এ হচ্ছে ঈডিয়ট-দের যুগ—"

বিজলী বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"ঈডিয়টদের যুগ?"

যতীন কহিল—"নিশ্চয়। এদেশে একদিন ছিল, যখন গণিকারা রূপে ও গুণে পুরুষকে মোহিত করত, আর তারা বিশেষ এ-হাত ও-হাত হতেও পছন্দ করত না। তারপর এল থিয়েটারের অভিনেত্রী আর

নর্ত্তকীদের যুগ! এখন চলেছে সিনেমা-অভিনেত্রীদের যুগ। লোকে এখন আর রূপ-গুণ দেখে না, সিনেমা-অভিনেত্রী শুন্‌লেই অমনি আকৃষ্ট হয়, তা অভিনয় সে যেমনি করুক্ না! এর উপর আবার জুটেছে বহু "ভদ্র মহিলা"। অর্থাৎ ও-পাড়া ছেড়ে কোনও রকমে বড় রাস্তায় একটা ফ্ল্যাটে একবার এসে পড়্‌তে পার্‌লেই হ'ল! ব্যস্—অমনি রেখা, রেবা ছায়া, মায়া যা-হোক্ একটা নামের সঙ্গে, যে-কোনো একটা উপাধি জুড়ে দিয়ে, কোনো-রকমে একটা ষ্টুডিওতে দু' একবার যাতায়াত কর্‌তে পার্‌লেই—আর মারে কে? একেবারে ভদ্রমহিলা—একদম ভাটপাড়ার মা-ঠাকরুণ! অমনি পালে পালে কেতা-দোরস্ত ফিট্‌ফাট্ ভদ্রসন্তানের দল, মোটর নিয়ে দিবারাত্র দোরে ধন্না দিয়ে এদের মাথা দেয় বিগ্‌ড়ে। এরাও অমনি পান্তা ভাত আর ফুলুরি ছেড়ে, ধর্‌ল কাঁটা চামচে হোটেলে খাওয়া! আর এই সব ভদ্র-দালালের দালালীতে, অল্প দিনেই জমে ওঠে তাদের পশার! ষ্টুডিওর প্রচারসচিবকে দু'টো মিষ্টি কথা বলে', তার গা ঘেঁযে একটু বসে', একটু হেসে, একবার তাকে বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে', অর্থাৎ তারি পয়সায় তাকে একদিন খাইয়ে, তারও দেয় মাথা ঘুরিয়ে! কোম্পানি ছেড়ে সে আরম্ভ করে তার বিশেষ-মেয়েদের পাব্‌লিসিটি: অমুক কোম্পানির নব আবিস্কার! বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা অমুক দেবী অমুক চিত্রে প্রথম চিত্রাবতরণ কর্‌চেন্! ভক্তগণ তাদের নামে ইংরিজি-বাংলায় প্রবন্ধ লিখে দেয়; ইংরিজি বাংলায় বাঁকা-বাঁকা করে তার নাম সই করে দিয়ে, কাগজে কাগজে তাই ছাপিয়ে দেয়। তার ইণ্টারভিউ বেরোয়, তার নানা রকমের ছবি ছাপা হয়, তার জীবনচরিত পর্য্যন্ত বেরোতে আরম্ভ করে—"

বিজলী সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল—"জীবনচরিত বেরোয়? কি বল, যতু?"

যতীন কহিল—"জীবনই নাই তার জীবন-চরিত! সত্যি কথা বল্‌তে গেলে, একটা গল্প বেরোয়—আর কি? কি রকম জান? অমুক পাঁচ বছর বয়স থেকেই নাচে গানে ও অভিনয়ে এমন প্রতিভার পরিচয় দিয়েচেন যে, সকলেই একবাক্যে বলতো, কালে এ-মেয়ে অপূর্ব্ব প্রতিভার অধিকারিণী হবেন। সীনিয়র কেম্‌ব্রিজ বা ম্যাট্রিক পাশ করে', ইনি অভিভাবকদের অমতেই সামাজিক ও সাংসারিক বহু ক্ষতি সহ্য করে, চিত্রশিল্পীর দুঃখময় জীবন বরণ করেছেন। এঁর আগমনে চিত্রশিল্প ধন্য হয়েছে! ইত্যাদি ইত্যাদি—"

বিজলী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

যতীন কহিল—"হাসচ যে? যা' বল্‌লাম, তার একটা বর্ণও মিথ্যে নয়, দাসী! নাম করব না, সেদিন একটা ষ্টুডিওতে একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। সম্প্রতি "বালীগঞ্জিকা" কাগজে তার সম্বন্ধে ঠিক ঐ সব কথাই বেরোয়। আমি পড়ে বিশ্বাসও করেছিলাম, তাই খুব সম্ভ্রম করে তার সঙ্গে সেদিন কথা কইচি। ক্রমে বেরিয়ে পড়্‌ল, দু' বৎসর পূর্ব্বে ঘোলাডাঙার এক বস্তিতে সে থাক্‌তো এবং সে সম্পূর্ণ নিরক্ষর! নিজের নাম পর্য্যন্ত সই করতে জানে না। সে স্বীকার কর্‌ল, 'তাদের পাব্‌লিসিটি অফিসারের তার উপর একটু দুর্ব্বলতা আছে, সে-ই সব লেখে-টেখে। কল্‌কাতার সব ক'টা ষ্টুডিওতেই তো ঘুর্‌চি, আর সারাদিন এই সব ভদ্রমহিলাও দেখ্‌চি। অনেককে প্রথম নজরেই চিনি—ভদ্রমহিলাটি কোন্ মহল্লা থেকে

এসেচেন ! অনেকের মুখ চিনি, অনেকের কথা আবার অন্যের মুখে শুনি !”

বিজলী সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল—“দেখে শুনে তুমি কি কর ?”

যতীন কহিল—“আমি আর কি কর্‌ব ? চুপ করে থাকি ! ভদ্রই হোক্ আর অভদ্রই হোক্—আমার তাতে কি ? আমি টাকা পাই, অভিনয় করি—ব্যস্। তবে এই সব দেখে-দেখে, ভদ্রলোকদের উপরও যেমন ঘেন্না ধরেছে, ‘ভদ্রমহিলা’দের উপরও তেমনি অশ্রদ্ধা জন্মেছে ! সিনেমায় ভদ্রমহিলা নাম শুন্‌লেই এখন আমার দস্তুরমত আতঙ্ক হয় ! আমার জানা-মেয়েই তো পাঁচ-ছয় জন রয়েছে—যারা এখন বেশ ভদ্রমহিলা ব’লে চালিয়ে যাচ্ছে ! লোকেও তাই বিশ্বাস করে—কেউ কেউ আবার তাদিকে বিয়েও কর্‌চে। বল এখন, এ সব লোককে ঈডিয়ট্ বল্‌ব না তো, কি বল্‌ব ?”

বিজলীর মনে একটা খট্‌কা লাগিল ! যতীন্ সব ফিল্ম-কোম্পানিতেই কাজ করে—কাজেই কলিকাতার প্রায় সব অভিনেত্রীকেই সে চিনে। তবে কি ফিল্মের সব ভদ্রমহিলাই তাহারি মত ?

বিজলী কোমলভাবে জিজ্ঞাসা করিল—“তবে কি সত্যি ভদ্রমহিলা কেউই নাই ?”

যতীন কহিল—“থাক্‌বে না কেন ? আছেন বৈকি ! তবে তাঁদের সংখ্যা যত শোন’, তত নয়—মাত্র দু’ একজন ! বাকী সব বোগাস্—”

বিজলী স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল—“তা যাই বল’, আমার সম্বন্ধে সুবোধবাবুর যখন এই ধারণা, তখন সেটা থাক্ না, যতদিন থাকে ! ভেঙে-তো কোনো লাভ নেই।”

যতীন কহিল—"নিশ্চয় না। থাক্—যত ধাপ পা দিতে পার', দাও। আমি নিষেধ কর্‌ব না! তবে আশ্চর্য্য হচ্ছি, অমন একটি বাস্তু-ঘুঘু সুবোধ রায়, সে এতদিনের মধ্যে তোমার কোনো সন্ধান পায় নাই? আর পাবেই বা কি করে?"

বিজলী কহিল—"সেই জন্যেই তো তখন বল্‌লাম—নিশ্চিন্দি হলাম, সে গেল। ভারী সন্দেহী লোক সে!"

যতীন বিজ্ঞভাবে কহিল—"তা সম্ভব! যে নিজেকে যত চালাক মনে করে, সে-ই তত বেশী বোকা। এই দেখ' না, কচ্ছিস্ তো বাপু, বাইরের অজানা এক মেয়ের সঙ্গে প্রেম। অথচ এমনি ঈডিয়ট, সে ভাবে—এ নারী যেন একমাত্র তারই। আরে মর, টাকা-পয়সার মত স্ত্রীলোকও যে হাত-ফের্‌তায় চলে এবং হাত-বদ্‌লেই যে এ আজ তাদের কাছে এসেছে—এটা তারা কিছুতেই মান্‌বে না। অমন ঝুনো সুবোধকেই দেখ' না, এই সামান্য কথাটা তার বুদ্ধির অগম্য! বল', এ ঈডিয়টের যুগ কি না?"

বিজলীর এ কথা আর ভাল লাগিতেছিল না। উত্তরে সে ম্লান ভাবে একটু হাসিল মাত্র।

যতীন কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিল—"কিম্বা এমনও হতে পারে, দাসী—"

বিজলী নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি?"

যতীন কহিল—"হয়ত সুবোধ সবই জানে, শুধু মনকে চোখ ঠারে। আমি জানি, আমার এক বন্ধুর মাছ ধর্‌বার ভারী সখ। বিশেষ রকম

খরচপত্র আর তোড়জোড় করে', সে প্রায়ই ছিপ কাঁধে করে' মাছ ধর্‌তে বেরোয়, কিন্তু মাছ কখনই ধর্‌তে পারে না। সন্ধ্যাবেলায় যখন বাড়ী ফেরে, তখন কোনও একটা বাজার থেকে, সে একটা কি দু'টো বড় বড় মাছ কিনে নিয়ে গিয়ে, সবাইকে দেখায়—সে কেমন মাছ ধরেচে! সুবোধও তাই কর্‌চে না ত'? কে জানে? যাক্ গে, ও-আলোচনা করে' আমাদের কি লাভ! তোমার ভাল হ'লেই ভাল। তবে এটা যে ঈডিয়টের যুগ, তা তুমি আর অবিশ্বাস কর্‌তে পার' না, দাসী—"

বিজলী কহিল—"বলি, দাসী বলা ছাড়বে না? বিজলী, বিজলী মুখস্থ কর'—জলীয় বিজলী—"

যতীন উচ্চহাস্য করিয়া কহিল—"বিজলী বিজলী, ব্যস্, আর ভুলব না। ওঃ—তুমি যে এখন অন্যের দাসী, এটা চট্ করে মুখস্থ করা শক্ত! যাক্—দাও, ওসব এন্-জি করে দাও।"

অনেকক্ষণ হইতে খোকার খবরের জন্য বিজলীর মন আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার উৎকণ্ঠাও যেমন প্রবল, লজ্জাও তেমনি গভীর। বিজলী খোকার মা সত্য, গর্ভধারিণীও বটে, কিন্তু প্রসবের পরমুহূর্ত্ত হইতেই, সে তাহাকে হারাইয়াছে! প্রথম কয়েক দিন সে খুব কাঁদাকাটা করিয়াছিল। যতীন তখন কালিদাসীর একমাত্র অভিভাবক—সে খোকাকে সঙ্গে সঙ্গে স্থানান্তরিত করিয়াছিল, আর আজও সে তেমনিই আছে। কালিদাসী তখন সত্যসত্যই শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা! যতীন তাহাকে নিতান্ত দুর্দ্দিনে আশ্রয় দিয়াছিল বলিয়া, যতীনের বিপক্ষাচরণও সে করিতে পারে নাই, যতীনের উপর কৃতজ্ঞতাবশত রূঢ়ও হয় নাই। বরং

তদানীন্তন সেই নিরাশ্রয় অনিশ্চিত অবস্থায় এ ভারমুক্ত হইয়া, কতকটা সে আশ্বস্তই হইয়াছিল। তাহার সুনিশ্চিত পঙ্কিল জীবনস্রোতে, মাতৃস্নেহের ক্ষণিক দৌর্ব্বল্যে, শিশুটিকে টানিয়া আনিয়া, তাহার জীবনটাকে পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইতে না দেওয়ায়, কালিদাসী যতীনের কার্য্যে শেষে খুশীই হইয়াছিল বেশী! যতীনের দূরদৃষ্টিতে, কালিদাসী কৃতজ্ঞই হইয়াছিল: কালিদাসী ভাবিয়াছিল—দিনে দিনে মাতাপুত্রের ব্যবধান মেরু-প্রসারী হউক, ক্ষতি নাই: তাহার পুত্র জগতে দাঁড়াইবার স্থান পাইবে তো! সে বাঁচিবে! এ ঘৃণিত পরিচয় অপেক্ষা, পরিচয়হীনতার রহস্যও তাহার খোকার জীবনে সমধিক কল্যাণকর হইবে!

জননী তাই সন্তানকে ভুলিল। সন্তান জানিল না, তাহার পিতৃমাতৃপরিচয়। সন্তানের সেবাশুশ্রূষায়, লালনে পালনে, তাহাকে কোলে-পিঠে করিয়া, খাওয়াইয়া পরাইয়া সাজাইয়া শোয়াইয়া, তাহার জন্য বহু ব্যথা ও বেদনা বরণ করিয়া, তাহার জন্য বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া, আশঙ্কায় উৎকণ্ঠায় হর্ষে বেদনায়, চক্ষের উপর তিলে তিলে বাড়িয়া উঠে যে-সন্তান, এবং তাহাকে ঘিরিয়া জন্মে যে-স্বর্গীয় মাতৃস্নেহ, বিজলীর তাহা হয় নাই! খোকার স্মৃতি তাহার মাতৃস্নেহের ক্ষীরোদ-সিন্ধুমন্থনজাত নহে, এ একটা অবিস্মৃত কালরাত্রির ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের সুমধুর কৌতূহল মাত্র। বিজলীর অন্তরে মাতৃস্নেহের সুধাসমুদ্র শুকাইয়া গিয়া, সেখানে জন্মিয়াছে কৌতূহলের এক পঙ্ক-পল্বল!

খোকার কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাই বিজলীর লজ্জা পাইতেছিল।

যতীন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি চিন্তা করিয়া, একটু নড়িয়া চড়িয়া

বসিয়া কহিল—"যাক্, বাজে কথা তো সারাদিনই হল', এইবার আমার কাজের কথাটা সেরে নিই—"

বিজলী বাধা দিয়া খপ্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমার খোকার কথা একটু বল' না? সে কত বড় হয়েচে? কার মত হয়েচে? লেখাপড়া করচে? কোন্ ক্লাসে পড়চে? তুমি যাও তার কাছে? তার—"

যতীন বাধা দিয়া অভিনেতার ভঙ্গীতে কহিল—"আমি শ্রুতিধর নই, বিজলী দেবী। মোট কথা, তোমার ছেলে বেশ সুস্থ আছে, সুখে আছে, এবং লেখাপড়াও করচে।"

বিজলীর চক্ষু দুইটি অকারণে জলে ভরিয়া উঠিল। ভিখারীর মত অতি বিনীত নিবেদনে প্রার্থনা করিল—"একটি বার, মাত্র একটিবার আমায় দেখাবে, যতু, আমার খোকাকে? আমি কিছুই বল্‌ব না। আমি তার কাছেও যাব না, শুধু দূর হতে তাকে একবার দেখে আস্‌ব—"

যতীন কহিল—"এখন আর তা' অসম্ভব। তবে যদি কখনও সে সুবিধা হয় তো নিশ্চয় তোমায় দেখিয়ে দেব—"

বিজলী আহতভাবে প্রশ্ন করিল—"কেন?"

যতীন জানাইল—"তোমার ছেলে এখন মস্ত এক বড়লোকের পুষ্যিপুত্তুর! রাজা বল্‌লেই হয়!"

বিজলী পুলকাতিশয্যে করতালি দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। কহিল—"কোথা? কার? আমার খোকা কার পোষ্যপুত্র? রাজপুত্র? সে খুব সুন্দর হয়েছে বুঝি?"

যতীন গম্ভীরভাবে কহিল—"আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করো না, আমি বল্‌ব না। কোন রকমে প্রকাশ পেলে, তোমার ছেলেরই তাতে সমূহ ক্ষতি হবে!"

ভীত সন্ত্রস্তভাবে বিজলী কহিল—"তবে থাক্, তবে থাক্—আর বলো না! আমি শুন্‌তে চাই না। একবার তুমি আমায় দেখিয়ে দিও শুধু—তোমার দু'টি পায়ে পড়ি—"

যতীন আশ্বাস দিল—"বল্‌লাম তো—দেব।"

ভূষণ চা ও খাবার লইয়া ঘরে ঢুকিতেই দেওয়াল-ঘড়িতে চারটা বাজিল।

বিজলীর ইঙ্গিতে ভূষণ অন্যত্র অবস্থান করিতে লাগিল।

যতীন তাড়াতাড়ি চা-পানে প্রবৃত্ত হইয়া কহিল—"সারাটা দিন তো কেবল বাজে কথাতেই কাট্‌ল! যে কাজের জন্যে এলাম, তার তো এখনো কিছুই হল না—"

বিজলী আহত ভাবে কহিল—"আর কি আমার সঙ্গ তোমার ভাল লাগে না, যতু?"

যতীনের কণ্ঠে একটা হতাশার ব্যথাভরা স্বর উঁকি মারিল। কহিল—"আর ভাল লাগা না-লাগার কথা ছেড়ে দাও, বিজলী—"

বিজলী ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া, স্যাণ্ডালের ষ্ট্র্যাপ-ঘেরা তাহার শ্রীচরণখানির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

যতীন কহিল—"তারপর, ব্যাপার হচ্ছে—আমার এক বিশেষ বন্ধু, একটা ভয়ানক মুস্কিলে পড়েচে, তাকে একটু সাহায্য করতে হবে তোমায়—দা—বিজলী—"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"কে তোমার বন্ধু? আর আমি তাকে কি সাহায্য করতে পারি?"

যতীন কহিল—"আমার বন্ধুকে তুমি চিনবে না। আমায় সে ধরেচে, আর আমি ধরচি তোমায়—"

বিজলী কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি? ব্যাপার কি?"

যতীন্ একটু নিম্নস্বরে বিজলীর দিকে ঝুঁকিয়া কহিতে লাগিল—"বন্ধুর অবিবাহিতা এক আত্মীয়া হঠাৎ সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েচেন্, তাঁকে বিপন্মুক্ত করতে হবে!"

বিজলীর মনে পড়িল, তাহার নিজের জীবনের এক অনুরূপ কাহিনী! জিজ্ঞাসা করিল—"তা' আমি কি করব?"

যতীন কহিল—"মস্ত বড়লোকের মেয়ে, বিশেষ শিক্ষিতা মেয়ে, একটা ভুল করে ফেলেচে—বুঝ্‌তেই পারচ, বিজলী, যেমন অনেক মেয়েই করে। আমার বন্ধুটি আবার সেই মেয়েরই একজন নিকট আত্মীয়। কাজেই ব্যাপারটা যেমন করেই হোক্ ধামাচাপা দিতে হবে। টাকা-পয়সা ডাক্তার-নার্স অযুধ-পত্র মায় চাকরবাকর বাড়ী যা দরকার, যা চাইবে, সব পাবে। খরচপত্রের জন্যে কিচ্ছু আটকাবে না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাবে—কেবল তোমায় দাঁড়িয়ে থেকে, এইটি করাতে হবে। আমি বা আমার বন্ধু থাকব' আড়ালে। তোমায় এর দিদি-টিদি একটা কিছু হয়ে, নিজের কর্তৃত্বে কাজটা সম্পূর্ণ করাতে হবে।"

বিজলী মৃদু হাসিয়া কহিল—"তারপর পুলিশ কেস হলে, আমি যাব' জেলে—"

যতীন কহিল—"সে ভয় এতটুকু নেই। আর সে দুর্দ্দিন যদি আসেই, তাহ'লে আমরাও বাদ যাব না। সুতরাং সে ভয়, তুমি মোটেই কর' না। কথা হচ্ছে, ডাক্তারদের কাছে আমরা কেউই আত্মপ্রকাশ কর্‌ব না—সেটা কর্‌বে তুমি। তার জন্যে তোমার দক্ষিণা, বন্ধু বলেছে, এক হাজার টাকা দেবে—"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"কে তোমার এই বন্ধু ?"

যতীন বলিল—"বল্‌লাম তো, তাকে চিনতে পারবে না, আর এখন তার নামও বলব না। তুমি যদি রাজী হও, তা'হলে এই হপ্তার মধ্যেই এটা শেষ কর্‌তে হবে। বুঝ্‌তেই পার্‌চ ত', হাঁসপাতালে বা অন্য কোথাও করাতে গেলে, এ কথা প্রকাশ হয়ে পড়্‌তে পারে। তাই যতটা গোপনে সম্ভব, সারতে হবে। অনেক নার্সও আছে, জানি—যারা এ সব কাজের ভার নেয়—কাজ সুসম্পন্নও করে, মালও পাচাড় করে,' এমন কি, রোগিনীর শরীর পর্য্যন্ত সারিয়ে, তবে ছেড়ে দেয়। তাদের কাছেও পাঠাতে আমাদের সাহস হয় না, কেন না, সেখানেও শুনেছি, ভয়ানক ভীড়। ভীড়ের মধ্যে ক'দিন এ চাপা থাকবে ? হয় ত, এদের পরিচিতই দু'একজন বেরিয়ে যেতে পারে সেখানে! তারি জন্যে তোমার কাছে আসা।"

বিজলী চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি ঠিক বলচ, এতে আমার বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই ?"

যতীন কহিল—"বল্‌লাম তো, বিপদ যদি হয় তো তোমার একার হবে না, আমাদের সবারই একই অবস্থা হবে।"

বিজলী আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়িয়া, জানাইল—"তা' হলে, করব।

তুমি যখন বল্‌চ, তুমি যখন আছ এর মধ্যে, আর তুমি যখন অভয় দিচ্ছ—তখন আমার আর অমত নেই।”

যতীন পরম আশ্বস্ত ভাবে কহিল—“বড্ড সুখী হলাম, বিজলী। এখনো তুমি আমায় বিশ্বাস কর, দেখ্‌চি।”

বিজলী নতমুখে কহিল—“অবিশ্বাসের কোন কাজই তো তুমি আমার সঙ্গে কখনও কর' নি—”

যতীন বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“পুরাতন প্রসঙ্গ থাক্‌। তা'হলে কোথায় কি হবে, বল' তো?”

বিজলী একটু ভাবিয়া কহিল—“তা'হলে ধর্ম্মতলা এলাকায় একঁটা ফ্ল্যাট নাও। আমি সুবোধবাবুর কাছ থেকে দেশে যাবার নাম করে', দিন-পনেরর ছুটি নিয়ে গিয়ে সেখানে থাক্‌ব। ভূষণটাকেও কাছে রাখব, আমার নিজের একজন বিশ্বাসী লোক চাইত, লোকজন ডাক্‌তে, ফাইফরমাশ খাট্‌তে—”

যতীন প্রসন্ন মনে বিজলীর প্রস্তাবে স্বীকৃতি দান করিয়া কহিল—“উত্তম। এখন তোমারও একটা পরিচয় চাই ত? ডাক্তার-নার্সদিকে ঠিক ঠিক চালিয়ে নিয়ে যেতে হলে, তোমাকেও একটা কেষ্ট-বিষ্টু কিছু হতে হবে ত?”

বিজলী কহিল—“তা তো ঠিক, এটা আমার মনেই হয় নি। কি পরিচয় দেব?”

যতীন একটু ভাবিয়া কহিল—“ধর,' তোমার নাম সুদক্ষিণা-দেবী। মফঃস্বলের কোনও জমিদারের বিধবা পত্নী। এই রোগিণীর জ্যেষ্ঠা।”

বিজলী সহাস্যে কহিল—"চমৎকার—তাহ'লে এ পার্টের রিহার্স্যাল কে দিইয়ে দেবে ?"

যতীন হাসিয়া উত্তর দিল—"এর রিহার্স্যাল দরকার হবে না। এ পার্ট তোমার করা আছে। হাঁ, তাহলে কাল কি পরশু আমার বন্ধুকে একবার নিয়ে এসে, তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেব'। কেমন ? টাকা পয়সা যা' লাগ্‌বে, তাকে ব'লো, তোমায় সে সব দিয়ে যাবে। আর তুমিও ইত্যবসরে ছুটির দরখাস্ত দাও। এইখানেই তো ছ'টা বাজল! আমার জন্যে ষ্টুডিওতে সব বসে' আছে—আমি এইবার যাই।"

যতীন তরতর করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল। বিজলী বারান্দায় আসিয়া, চিকের পর্দ্দাটা একটু ফাঁক করিয়া, যতক্ষণ দেখা গেল, যতীনের পানে প্রলুব্ধভাবে চাহিয়া রহিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গড়িয়াহাট রোডের মাঝামাঝি।

বহির্দ্দিকে লাল ইঁটের অনতিউচ্চ প্রাচীর-ঘেরা, বিস্তৃত একখণ্ড জমির ঠিক মধ্যখানে, নবনির্ম্মিত সুদৃশ্য একখানি শাদা বাড়ী। প্রাচীরের গা-ঘেঁষিয়া, ভিতরে মেহেদী গাছ ও বহু বিচিত্র লতা ও কাঁটা-ফুলের গাছে, সুসমতল জমির ছাঁটা-ঘাসে এবং বাড়ীটির চারিদিকে ঝাউ ও অন্যান্য বিদেশী কতকগুলি ছোটবড় তরু-লতায়, এক পরম নয়নাভিরাম শ্যামলিমা রচনা করিয়া, বাড়ীখানিকে শুভ্রতর করিয়া তুলিয়াছে।

বড় রাস্তার উপর ফটক। ফটকের দুই দিকে দারোয়ানের দুইটি গুম্‌তি। ফটকের পাথরের থামে কোল্যাপ্‌সিবল্‌ গেট্‌। থামের বাহিরে ঝক্‌ঝকে পিত্তল-ফলকে ইংরাজী ও বাংলায় গৃহস্বামীর নাম লেখা। ফটক হইতে ছোট একটি পীচের রাস্তা গাড়ী-বারান্দার নীচে দিয়া ঘুরিয়া গিয়া, ফটকের দক্ষিণ ধারে আসিয়া শেষ হইয়াছে। এই পথ-মধ্যবর্ত্তী বৃত্তভূমির মধ্যস্থলে প্রণামরতা মার্ব্বেল পাথরের একটি নারীমূর্ত্তি, আগন্তুকগণকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছে।

একতলা সমান উঁচু, লম্বা লম্বা সিঁড়ির সারি: সিঁড়ির দুই দিকে দুই থাক্‌ করিয়া ফুলের ও পাতাবাহারের টব। সিঁড়ির পরেই ছোট এক বারান্দা, বারান্দার সম্মুখেই বহুমূল্য বিলাতী আস্‌বাবে সুসজ্জিত

প্রকাণ্ড একটা হল্। বারান্দার দুই দিকেই উপরে উঠিবার দুইটি সিঁড়ি। ভূমধ্যঘরে ভৃত্যদের আবাস ও গ্যারাজ্।

সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্ব। একখানা বড় বুইক্-গাড়ী ফটকে আসিয়া দাঁড়াইতেই, গুর্খা দারোয়ান সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিয়া, গাড়ীর দরজার নিকট দাঁড়াইল। ভিতর হইতে মিহি গলায় প্রশ্ন হইল—"বড়ী বাবা হ্যায় কুঠীমে, বাহাদুর?"

"হুজুর—"

গাড়ী গাড়ী-বারান্দার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। উড়িয়া-মালী ছুটিয়া আসিয়া, নমস্কার করিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

শ্রীমান ভগবান মহান্তি ওরফে ভগা নিবেদন করিল—"মেমসাহেব আর বড় বাবা, হুজুরের জন্যে উপরে অপেক্ষা করচেন—"

—"ও আচ্ছা—" বলিয়া দামী বিলাতী সান্ধ্য পোষাকে সুসজ্জিত সুধীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় দামী সিগারেটের টিন হাতে, গাড়ী হইতে নামিয়া তর্‌তর্ করিয়া উপরে চলিয়া গেল।

গাড়ীখানি বাড়ীর বাম দিকস্থ গাড়ীর প্রতীক্ষাস্থানে চলিয়া গেল।

ভগা তাহার আত্মীয় ও সহকর্ম্মী শ্রীমান্ জগন্নাথ ওরফে জগাকে ডাকিয়া, তাহাকে সাবধান করিয়া দিল—কোথাও যেন সে এখন না যায়: রায় সাহেব আসিয়াছেন, বখ্‌শীষ লাভ সুনিশ্চিত। সে যেন সারাক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া এইখানেই অপেক্ষা করে।

বড়লোকদের বাড়ীতে ঢুকিবার ছাড়পত্র সর্ব্বপ্রথম সহি করে, ফটক-রক্ষক দারোয়ান—ঘরের গাড়ী দেখিয়া: ট্যাক্সিতে গেলে, ফৈরঙ্গ-পোষাক কতকটা সাহায্য করে। তারপর আগন্তুকের জীবন-যৌবন

মান-সম্ভ্রম সব মালী-বেয়ারার হাতে গিয়া পড়ে। কাজেই, কাজ হাতাইতে হইলে, তাহাদের হাত সর্ব্বাগ্রে রৌপ্যমণ্ডিত করা প্রয়োজন। সুধী এ-সব ভালই জানে।

সুধী উপরে উঠিবামাত্র সকন্যা বিনোদিনী দেবী আগাইয়া আসিয়া, অতিথিকে শুভ সন্ধ্যা জ্ঞাপন করিয়া, কহিল—"কি গো রিচ্ ম্যান্স্ সন্ (বড় লোকের ছেলে), জ্যাঠাইমাকে যে একেবারে ফর্‌গেট্-মি-নট (ভুলে গেলে)—"

সুধী ইঁহার ইংরাজী-জ্ঞানের সহিত কিছুদিন হইতে পরিচিত বলিয়া, ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন হইয়া, কহিল—"জ্যাঠাইমাকে ভুল্‌ব? ভারি মজার কথা তো? নন্দার মত আপনিও যদি অবুঝ হন জ্যাঠাইমা, তা' হলে সত্যিই আমায় এ বাড়ী ছাড়্‌তে হবে—"

নন্দা অভিমানিনীর অভিনয় করিয়া কহিল—"চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া! যদি এ বাড়ী ছাড়্‌তেই হয়, তা' হলে এম্‌নি ছাড়্‌লেই তো পারো! আমায় মিছামিছি দোষী না করে' কি তা হয় না? ও—কুকুরকে গুলি কর্‌বার আগে, তার বদ্‌নাম দেওয়াই—রীতি, বুঝি?"

বিনোদিনী কন্যাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া কহিল—"ডোণ্ট্, ডোণ্ট্ (না, না) নন্দা, কত ভাগ্যে সানি (ছেলে) এসেছে! আর সে হোমে এণ্টার নট্ এণ্টার (বাড়ী ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তেই), তুই অমনি কুইড়ল্, (ঝগড়া) বিগিন্ (আরম্ভ) কর্‌লি? ট্রূথ্ (সত্যি), এতে সুধী বসে কোন্ মাউথে (মুখে)? দিস ইজ ভেরি ব্যাড্ (এ ভারি অন্যায়)! সুধী আমার ভেরি গুড্ বয় (খুব ভাল ছেলে), নন্দাই ঝগড়াটে! তুমি এ সব কিছু মাইণ্ড-এ (মনে) কর না, বাবা! তুমি অলেজ্ (সর্ব্বদা)

এ বাড়ীতে আস্‌বে। এম্‌নিই তো সানি (ছেলে) আমার অত্যন্ত ফেস্‌-থীফ্‌ (মুখচোরা), তার উপর তুই যদি এমনি করে জয়েন্‌ করিস্ (লাগিস্), তা'হলে সত্যি সুধী আর এ হোমে (বাড়ীতে) উইল্‌ কাম্‌ নট্‌ (আস্‌বে না)। সিট্‌ ডাউন্‌, সিট্‌ ডাউন্‌, ফাদার (বস', বস', বাবা)।"

সুধী হাসিতে হাসিতে সম্মুখস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

বিনোদিনী সুধীর হাত ধরিয়া তাড়াতাড়ি তুলিয়া দিয়া, টানিতে টানিতে এবং চলিতে চলিতে কহিল—"নট্‌ হিয়ার (এখানে নয়)। চল' ড্রয়িং রুমে (বসিবার ঘরে)—" বলিয়া সত্যসত্যই সুরুচিসঙ্গতভাবে অপূর্ব্বসুসজ্জিত প্রকাণ্ড এক হল্‌ঘরে আনিয়া, একখানা সোফার নিকট দাঁড় করাইয়া, হাত ছাড়িয়া দিয়া, কহিল—"হিয়ার সিট্‌ ডাউন্‌ (এইখানে বস)। নিউ (নতুন) সোফো—খুব কষ্ট্‌লি (দামী)—"

সুধী মাকড়্‌শায় ধরা আরশুলাটির মত, উদ্দিষ্ট দামী সোফাটিতে বসিল। মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে নন্দাও নীরবে সুধীর পাশে বসিল।

বেয়ারা আসিয়া দাঁড়াইল।

মিসেস্‌ ভট্টাচার্য্য বেয়ারাকে দেখিয়াই কহিল—"ব্যায়্‌রা, সাহেবের শূজ্‌ (জুতা) জোড়াটা ঝেড়ে দাও, ডার্টি (ময়লা) আছে! দামী কার্পেটখানা ব্যাড্‌ (খারাপ) হয়ে যাবে।"

সুধী অপ্রস্তুতভাবে নিজের জুতার পানে চাহিয়া, অপরাধীর মত অপ্রতিভ ভাবে কহিল—"কৈ, জুতোয় তো ধুলো নেই, জ্যাঠাইমা—"

বিনোদিনী-মেমসাহেব কহিল—"ডাষ্ট (ধুলো) নেই কি? শিওলি

(নিশ্চয়) আছে। ডাউন্ (নীচে) হতে আপ্ (উপর) ওয়াকিং (হেঁটে) এলে, আর নোংরা লাগে নি? তাই কখনো হয়? ব্যায়্রা ভাল করে’ ঝেড়ে দাও—”

খাবার টেবিলের প্লেট ডিশ্ গ্লাস প্রভৃতি পরিষ্কার-করা ঝাড়নটি বেয়ারার কাঁধে ছিল, সে সেই ঝাড়নেই সুধীর জুতা জোড়াটার উপর ও তলাটা মুছিয়া দিল।

মিসেস্ ভট্টাচার্য্য সম্মুখস্থ আর একখানি গদি-চেয়ারে বসিয়া কহিতে লাগিল—“এই কার্পেটখানা ইয়েষ্টারডে (কাল) আমি মার্কেট থেকে ফোর্-হাফ-হাণ্ড্রেড রুপীজে (সাড়ে চারশো টাকায়) কিনে এনেছি। দোকানী বলে’ দিয়েছে, এ কিছুতেই ডেষ্ট্রয় (নষ্ট) হবে না— ওন্‌লি সী (কেবল দেখ্‌বেন্) যেন ডাষ্ট (ধুলো) না লাগে!”

বেয়ারা আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে দেখিয়া, গৃহকর্ত্রী বলিল— “আমার আর বড় বাবার স্যাণ্ডেলের বটম্ (নীচেটা)ও মুছে দাও। কি জানি, ডাষ্ট (ধুলো) লেগে থাকৃতে পারে।”

বেয়ারা এ আদেশও পালন করিল।

মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করিল—“হোয়াট ঈট (কি খাবে) সুধী? বল’—”

সুধী কহিল—“ছেলের খাওয়া, মা-ই ভাল জানেন—”

বিনোদিনী অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া এক মুখ হাসিয়া, অলক্ষিতে জিহ্বার সাহায্যে বাঁধান দাঁতের পাটিটিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, কহিল—“—দেখ্‌লি নন্দা, ছেলের আমার ওয়ার্ড (কথা) কেমন সুইট্-মীট্ (মিষ্টি)! তা’ হবে না? সান

(ছেলে) যে আমার প্রিন্স্ (রাজপুত্তুর)! মিঃ রায় চৌধুরী তো কিং-ই (রাজাই)—কেবল রাজা টাইটেল (খেতাব)টাই পাচ্ছেন না।"

নন্দা সুধীর দিকে মধুর অপাঙ্গ হানিয়া, শিশুর মত সরল ভাবে কহিল —"মা পরের ছেলেদের সবই ভাল দেখেন। দেখ্‌তে পারেন না কেবল আমাদের দুই বোন্‌কে—"

সকলে একসঙ্গে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

গৃহিণী কহিল—"আজ ডিনার না খেয়ে তুমি, কাণ্ট গো (যেতে পার্‌বে না)। এই আমার ওয়ার্ডার (হুকুম)। ব্যায়্‌রা, সাহেবকে পেগ্ দাও। আমায় আর বাবাকে টু (দুটো) অরেঞ্জ স্কোয়াশ্ (কমলালেবুর রস)—"

সুধী জিজ্ঞাসা করিল—"ছন্নুকে দেখ্‌চি না?"

মিসেস্ ভট্টাচার্য্য কহিল—"ছন্নু গন্ টু থিয়েটার (থিয়েটারে গেছে)—"

ছন্নুর ভাল নাম ছন্দা, নন্দার কনিষ্ঠা। সুধী আতঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"থিয়েটারে?"

নন্দা হাসিয়া কখনও সুধীর কোলে, কখনও সুধীর পিঠে, কখনও মাতার হাঁটুতে, লুটোপুটি খাইতে লাগিল।

নন্দা এই বৎসর বি, এ, পাশ করিয়াছে। গায়ের রংটা তাহার বেশ পরিষ্কার—গৌরবর্ণ: অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও দেহের সঙ্গে বেমানান নয়: কাজেই অনায়াসে তাহাকে সুন্দরী বলা যাইতে পারে। বয়স ২৩।২৪, এখনও অনূঢ়া!

বারো-আনা ইংরাজী ও চার-আনা বাংলায় আধ'-আধ' স্বরে নন্দা কহিল—"কেমন? কেমন জব্দ? দেখ্‌লে মা? ঠিক আমি যা' ভেবেছি—"

বলা বাহুল্য কন্যার ইংরিজী মাতার মত নয়।

সুধী অধিকতর বিস্মিত হইয়া ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া নন্দার মুখপানে চাহিল। নন্দা কহিল—"তুমি বুঝি ভেবেছ,' ছনু বাংলা-পাড়ার থিয়েটারে গেছে?"

সুধী বিমূঢ়ভাবে স্বীকার করিল—"হাঁ, তাইত! আমাদের থিয়েটার আজ তো কোথাও নেই—"

নন্দা কহিল—"তা বুঝিচি গো, বুঝিচি! ছনুরা একটা শো করচে, যুদ্ধভাণ্ডারে টাকার জন্যে! "হ্যাম্‌লেট" প্লে হবে—একসেল্‌শিয়র বোর্ডে"—

সুধী আশ্বস্ত হইয়া কহিল—"তবু রক্ষে! আমি ভেবেছিলাম, ছনু বুঝি বাংলা-পাড়ায়, বাজে মেয়েদের অভিনীত, সেই ইৎরেমি আর নোংরামি দেখ্‌তে গেছে! বাপ্‌! বাংলা থিয়েটারের নাম শুন্‌লেই আমার বিভীষিকা হয়! দেখ্‌তে যদি কখনো বসি, তো হয়ত হার্টই ফেল্ হবে!"

বিনোদিনী কহিল—"ঠিক! জেণ্টল্‌ম্যান্‌-লেডীজ (ভদ্রসমাজে) কেউ বাংলা থিয়েটার দেখে নাকি? তুমি লাফ্‌ করালে (হাসালে) বাবা, সুধী?"

সুধী বিজ্ঞজনোচিত গাম্ভীর্য্যসহকারে কহিল—"আপনি জানেন না জ্যাঠাইমা! আমাদের ভদ্রসমাজেরও কেউ কেউ লুকিয়ে বাংলা থিয়েটারে যায়— আমি জানি।"

মিসেস্ ভট্টাচার্য্য গালে হাত দিয়া বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া কহিল—"হোয়াট সে (কি বল), সুধী? বাংলা-পাড়ায় ডার্টি (নোংরা) আর ব্যাড্ স্মেল্ (দুর্গন্ধময়) হলে, ততোধিক আন্‌সিভিলাইজ্‌ড্ (অভব্য) লোকদের সাইড্-এ (পাশে) বসে', বাংলা থিয়েটার যারা সী করে (দেখে), শিওর্লি (নিশ্চয়) তাদের হেড্ ব্যাড্ (মাথা খারাপ)। আমার মনে হয়, তারা হিডন্ (লুকিয়ে) যায়, তাদের ওয়ার্ড (কথা) নট্ ক্যাচি (ধর্ত্তব্যই নয়)।"

নন্দা কহিল—"না, মা, প্রকাশ্যেই যায়। আজকাল একটা রেওয়াজ হয়েছে: বাংলা থিয়েটার বা ছবিতে গিয়ে, অনেক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা সৎসাহস দেখায়।"

এই অত্যাশ্চর্য্য অসম্ভব সংবাদে বিনোদিনীর চোখ কপালে উঠিল!

সুধী জানাইল—"নন্দা ঠিকই বল্‌চে জ্যাঠাইমা, আমিও এ কথা শুনেচি।"

নন্দা কহিল—"শুধু যায় না, মা, আমাদের ক্লাসেই কয়েকজন ছিল, তারা নিয়মিত বাংলা ছবি আর থিয়েটার দেখ্‌ত—আর জোর-গলায় আমাদিকে সেই সবের তারিফ শোনাত! এক-একজন আবার এমন নির্লজ্জও ছিল যে, বাংলা ছবিকে ইংরিজী ছবির সঙ্গে তুলনা করে', বাংলা ছবির কত গৌরব করত!"

সকলে আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

মেমসাহেব কহিল—"আমার মনে হয়, ওই সব নোংরা থিংস্ (জিনিস্) যারা সী করতে গো করে (দেখতে যায়), তারা জেণ্টেলম্যান (ভদ্রলোক) নয়, পুয়োর (গরীব) লোক। ওরা অমন মেনি সাম্‌থিং

(অনেক কিছু) করে, যা' উই কাণ্ট ডু, (আমরা করতে পারি না)— ডাইং ক্লিনিং (মরে' সাফ) হয়ে গেলেও না। ওদের ওয়ার্ড (কথা) সেপারেট (স্বতন্ত্র)। তবে নন্দা, তোমায় আমি ওয়ার্ণিং (সাবধান) করে দিচ্ছি, মা, যারা বাংলা থিয়েটার কি ছবি দেখে, তুমি তাদের সঙ্গে যেন ডোণ্ট মিক্শ্চার (মিশো না)। তাদিকে কখনও হোমে ডোণ্ট ইন্‌ভিটেশন (বাড়ীতে নেমন্তন্ন করো না)।"

সুধী বিজ্ঞভাবে কহিল—"এবার ছন্নুর পরীক্ষার বছর, এখন এ সব বাজে কাজে সময় নষ্ট না করাই উচিত। বি-এস্-সি পরীক্ষাটিতো বড় সহজ নয়! জ্যাঠাইমা কি বলেন?"

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া কহিল—"ঠিক! বিয়ে-সি পরীক্ষা ভয়ানক হার্ড (শক্ত)। তবে ছন্নু আমার ডটার (মেয়ে) ভেরি গুড্ (খুব ভাল), এই যা ভরসা! আবার উইথ্-উইথ্ (সঙ্গে সঙ্গে) এ-ও তো দেখ্তে হবে, সুধী—মেয়েরা বিগ্ (বড়) হচ্ছে: সোসাইটি (সমাজ) সিভিলিজেশন্ (সভ্যতা) ওয়ার্লড্ (সংসার) প্রভৃতিও তো হাজ (আছে)। টু-ফোর প্লেসে (দু'চার জায়গায়) না গেলেই বা ওয়াকিং (চলে) কৈ? দিনরাত ওয়েল্-এর ফ্রগ্ (পাত্‌কোর ব্যাং) হয়ে থাকলেও তো, নট ওয়াকিং (চলে না)।"

সুধী ইত্যবসরে দুইটি পেগ শেষ করিয়া, তৃতীয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কহিল—"তাতো ঠিক। সমাজে মিশ্‌তে হবে, পাঁচজনের সঙ্গে বেড়াতেও হবে, আত্মনির্ভরশীলতাও অভ্যাস করতে হবে—এ সব তো চাই-ই, জ্যাঠাইমা। আপনাদের পরিবার তো রামা-শ্যামার বাড়ীর মত সাধারণ নয়! অভিজাত বংশের মর্য্যাদা

তো রাখতে হবে! এ তো হাজার বার! জ্যাঠামশায় বুঝি ছন্নুর সঙ্গে গেছেন?"

মেমসাহেব কহিল—"না, না তিনি কেন ছন্নুর সঙ্গে যেতে যাবেন? তাতে ছন্নুর সেল্‌ফ্‌-রেস্‌পেক্ট (আত্মসম্মান) সরি (ক্ষুণ্ণ) হবে না? ছন্নু থিঙ্ক্‌ করবে (ভাববে), তাকে এলোন্‌ (এক্‌লা) ছেড়ে দিয়ে আমরা যেন বিলিভ্‌ (বিশ্বাস) করি না! এজুকেটেড্‌ (শিক্ষিত) মেয়ে মাইণ্ডে (মনে) পেন্‌ (ব্যথা) পাবে।"

নন্দা কহিল—"বাবা এখানে নাই। একটা কেসে তিনি মফঃস্বল গেছেন। ছন্নু গেছে পরিমলের সঙ্গে।"

সুধী কিঞ্চিৎ অপ্রসন্নভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কখন গেছে?"

নন্দা কহিল—"গেছে ব্রেক্‌ফাষ্ট খেয়েই, বেলা এগারটায়। আজ তাদের ফুল্‌ রিহার্সাল কি না? ফির্‌তে রাত্রি হবে, সে বলে গেছে! তুমি পরিমলকে চেন?"

সুধী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বিনোদিনী কহিল—"পরিমল ইজ্‌ এ ভেরি গুড বয় (খুব ভাল ছেলে)। এম-এ পাশ করেচে। ওয়ার (যুদ্ধ) থাম্‌লেই বিলেত যাবে। তুমি পরিমলকে নো (জানো)? কল্‌কাতায় অবিশ্যি ওদের হোম (বাড়ী) নাই। এখন একটা বাড়ী হায়ার (ভাড়া) করে আছে, তবে ল্যাণ্ড (জমি) কিনেছে, ওর বাপ, সুন্‌ (শীগ্‌গির) বাড়ী করবে, হিয়ারিং (শুন্‌চি)। পরিমলের বাবা রিটায়ার্ড (অবসরপ্রাপ্ত) ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, নাউ (এখন) রাজপুর এষ্টেটের দেওয়ান্‌, রায় বাহাদুর অখিল ঘোষাল—চেন, তাঁকে?"

সুধী কহিল—"খুব চিনি! অখিল ঘোষাল আমাদের এষ্টেটে

ম্যানেজারীর জন্যে একবার দরখাস্ত করেছিল। জানেন তো, বাবাকে! তিনি ভয়ানক সাহেব—সাহেব ছাড়া তিনি কাউকে রাখবেন না বলে,' অখিল ঘোষালের দরখাস্ত বাতিল করেছিলেন।"

মিসেস ভট্টাচার্য্য উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন—"দ্যাট্‌স্ অল্ রাইট্ (ঠিক)! সাহেব না কীপ করলে (রাখলে) প্রেস্‌টীজ (মর্য্যাদা)ও ঠিক থাকে না। আচ্ছা, তোমার বাবা অমন ইউরোপীয়ান্ (সাহেব), আর তোমাদের হোমের (বাড়ীর) ডটাররা (মেয়েরা) অর্থাৎ তোমার সিসটার (বোন) তিনটি অমন পর্দ্দানশীন কেন? এতদিনের উইদিন (মধ্যে) তাদিকে তো একদিনও এখানে আন্‌লে না?"

নন্দা একটু ঠেস্ মারিয়া কহিল—"না, মা, এখানে এলে ওঁর বোন্‌দের মর্য্যাদাহানি হবে! তুমি কি বলচ মা, তাঁদিকে এখানে আনা ছেড়ে দাও, কতদিন বলেছি, আমাদিকে একবার ওদের বাড়ী নিয়ে গিয়ে, ওর মা-বোন্‌দের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে—তাই-ই ও বড় দিয়েছে?"

হুইস্কি যাহা পারে নাই, নন্দা তাহাই করিল। সুধীর কাণ দুইটি লজ্জায় গরম এবং লাল হইয়া উঠিল। অপ্রভিত ভাবে ঢোক গিলিতে গিলিতে সুধী কহিল—"কি করব জ্যাঠাই-মা, বাবা বাইরে সাহেব, কিন্তু ভিতরে ভয়ানক গোঁড়া, একদম সাবেকী। মেয়েরা বাড়ীর বের হবে, এটা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। কাজেই অন্য বাড়ীর মেয়েরাও যে অকারণ এ-বাড়ী সে-বাড়ী করে বেড়াবে, এ-ও তাঁর দু'চক্ষের বিষ। তারপর যদি তিনি শোনেন, ছন্দা থিয়েটার করচে—তা'হলে তো তিনি হার্টফেল করে নির্ঘাৎ মারা যাবেন!"

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল—"তিনি জানেন তুমি ড্রিঙ্ক কর, হোটেলে খাও—"

সুধী তৃতীয় পেগ্ শেষ করিতে করিতে কহিল—"ঠিক জানেন না, তবে সন্দেহ করেন।"

বিনোদিনী কহিল—"এইবার ডিনার গিভ্ (দিই) ? আমি লুকিং (দেখি)—" বলিয়া গজেন্দ্রগমনে বিনোদিনী ভোজনাগারের দিকে রওনা হইয়া, আল্‌মারি খুলিয়া রূপার কাঁটা, চামচ ও দামী পোর্সিলেনের বাসনগুলি বাহির করিয়া, বয়ের জিম্মা করিয়া দিতে লাগিল।

বেয়ারা চতুর্থ পেগ্ দিয়া গেল।

সুধী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

বিনোদিনী ছিল যেন তাহার ভাব-নির্ঝরিণীমুখে জগদ্দল এক পাথর। সুধী নন্দার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া, তাহার দক্ষিণ হস্তখানি নিজের হাতে লইয়া টিপিতে টিপিতে, ইংরাজীতে কহিল—"নন্দা—প্রিয়তমা—"

সুধীর হাতখানা ছুঁড়িয়া দিয়া, ঝাঁঝের সহিত নন্দা কহিল—"যাও, যখন-তখন তোমার ঐ প্যান-প্যানানি আমার ভাল্-লাগে না। দেখা হলেই কেবল প্রিয়তমা আর প্রিয়তমা, ডার্লিং আর ডার্লিং! অথচ কাজের বেলায় ঢুঁ ঢুঁ—"

সুধী অপ্রস্তুতভাবে ঢোক গিলিতে গিলিতে, পুনরায় নন্দার হাতটি মুঠার মধ্যে ধরিয়া, বিনীত ভাবে কহিল—"আমায় তুমি কেবল অবিশ্বাসই কর', নন্দা, আমার যে কোথায় কি এবং কতটা অসুবিধা, সেটা তুমি মোটেই দেখ্‌চ না—"

নন্দা তেমনি অভিমানের সুরেই কহিল—"দেখ', সত্যি কথা বল্‌তে

কি, মার সাম্‌নে তখন আমি ভাল করে' কিছু বল্‌তে পার্‌লাম না বটে—তবে আমার মনেও ভয়ানক একটা খট্‌কা লেগেছে!"

সুধী জিজ্ঞাসা করিল—"কি খট্‌কা, ডার্লিং?"

নন্দা কহিল—"তুমি কিছু মনে কর' না, সুধী। আমাদের দু'জনের বিয়ে যখন নিশ্চয় হবে, তখন সব জিনিষ এখন থেকে খোলাখুলি বোঝাপড়া হ'য়ে থাকা ভাল—"

সুধী চতুর্থ পেগ আরম্ভ করিতেই, নন্দা বাধা দিয়া কহিল—"আর না এখন। কথাটা ভাল করে' শোন: প্রায় তিনমাস তোমায় আমায় এত মেলামিশি কর্‌চি, অথচ একটি দিনের জন্যেও তুমি আমাকে তোমাদের পরিবারে পরিচিত করে দিলে না! তোমার মা-বাপ না আসুন, তোমার বোনদিকে পর্য্যন্ত একটি দিনও এখানে আনলে না। কতদিন আমি বলেছি, আমাকে পর্য্যন্ত তোমাদের বাড়ীতে একটি বারও নিয়ে গেলে না! এ সব ব্যাপার খুবই সন্দেহজনক নয় কি? আমাদের এ সম্বন্ধ বাবা এখনও শোনেন নি—মা-ই কেবল জানেন। বাবা শুন্‌লে, প্রথমেই তিনি তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ করতে চাইবেন—"

সুধী উচ্চহাস্য করিয়া কহিল—"এই কথা? বেশ, এই হপ্তার মধ্যেই আমি তোমাদের সবাইকে আমাদের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত করে' দিচ্ছি। কিন্তু, আমার বিশেষ অনুরোধ—বিয়ের কথাটা এখন তাঁদের সঙ্গে যেন না হয়! জানো তো বাবাকে?"

নন্দা কহিল—"তাহলে বাবার মত না নিয়ে, তুমি এত দূর এগুলে কেন? যখন জান' তোমার বাবা অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী নন, তখন তোমার আমাকে এ ভাবে প্রতারিত করা তো উচিত হয় নি।"

সুধী মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা নন্দা, মুখের কথা, অন্তরের প্রীতি-ভালবাসা, প্রিয়তমের শপথ—এ সব কি তুমি কিছুই বিশ্বাস কর' না? তুমি আধুনিকা, বি-এ পাশ করেচ, বয়সও হয়েছে, অথচ এই সব কুসংস্কার থেকে তো মুক্ত হতে পার নি? লোক-দেখান বিয়েটাই কি সব?"

নন্দা তীক্ষ্ণভাবে কহিল—"না, বিয়েটা কেন সব হতে যাবে? বিনা-দায়িত্বে ভদ্রকুমারীর যৌবন-উপভোগই সব! তুমি যে এত বড় পশু, এ আগে বুঝি নি! আজ তুমি এ কথা বল্‌তে সাহস করচ, কেন না তোমার কাছে এখন আমি সুলভ হয়েচি বলে! ডায়মণ্ডহারবার ডাক-বাংলোতে, সেদিন প্রথম যখন স্বামী-স্ত্রী বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে—তখন বাবা, অসবর্ণ বিবাহ, বিবাহের অপ্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি সমস্যাগুলোর কথা তো তোমার মনে উদয় হয় নি?"

কনেষ্টবলের রুলের গুঁতায় ঋজু দেহ হঠাৎ ন্যুব্জ হওয়ার মত, সুধীর ঘনায়মান নেশাটি নন্দার কথায় বাঁকিয়া দাঁড়াইল। কহিল—"খুবই হয়েছিল নন্দা, তবে বলি নি: কেন না, তখন বলবার দরকার হয় নি। আজও হত না, যদি বাবা হঠাৎ মত না বদলাতেন্।"

নন্দা অস্থির ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম?"

সুধী বিশেষ সাবধানতার সহিত, ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল—"বাবা বলেছিলেন, আর একরকম সব ঠিকঠাক্‌ও হয়ে ছিল, গত আষাঢ় মাসেই অর্থাৎ রথের দিন, আমাদের দুই ভাইকে এষ্টেট ভাগ করে দিয়ে, বোনতিনটিকে সঙ্গে নিয়ে, বাবা আর মা কাশী চলে যাবেন। সেখান থেকেই তাদের বিয়ে দেবেন। কাজেই

বাবার কথা বলি নি ঃ জানি, আমি হব অচিরে স্বাধীন, আমার নিজের মালিক! তখন আমার ইচ্ছামত আমি বিয়েও কর্‌ব—"

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল—"তা হ'ল কৈ?"

সুধী কহিল—"দুর্ভাগ্য! আমি কি কর্‌ব বল? বাবা হঠাৎ মত পরিবর্ত্তন করে বসলেন—বোন্‌দের বিয়ে না দিয়ে, তিনি কাশীবাসী হবেন না। কাজেই বাধল' এই মুস্কিল। এখন এ কথা কোনো প্রকারেই রাষ্ট্র করা ঠিক নয় ঃ ঘুণাক্ষরে বাবার কাণে গেলেই, তিনি তৎক্ষণাৎ আমায় ত্যজ্যপুত্র করে বস্‌বেন—আর তাহলেই কি সর্ব্বনাশটা হবে, বুঝ্‌তেই পারুচ। আসল বিয়ে আমাদের হয়ে গেছে। একটা লোক-জানান' উৎসব শুধু বাকী। সে না হয়, কিছুদিন পরেই হবে! বিলেতে তো এমন এক্‌সার হচ্ছে।"

নন্দা অবুঝ নয়। সুধীর কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে চুপি চুপি কহিল—"কিন্তু, গুপ্ত প্রেমে ভগবানের অভিশম্পাত আছে ঃ সেই ভয়ই যে সব চেয়ে বেশী—বিশেষ করে' আমার পক্ষে—"

সুধী কহিল—"সে ভয় কর্‌তে গেলে চলে না ডার্লিং।"

নন্দা কহিল—"বৃথা তর্ক করো না! চল্‌তে গেলে সেই ভয়ই আগে।"

সুধী কহিল—"তা' হ'লে মোটার চড়াও ঠিক নয় ঃ যে-কোনো মুহূর্ত্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ঘরের মধ্যে বাস করাও ঠিক নয়, এখনি ভূমিকম্প হতে পারে—"

হঠাৎ আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল। ব্যস্তভাবে গৃহিণী আসিয়া কহিল—"কাম্ ফাদার (এস বাবা) একটু ডিলে (বিলম্ব) হয়ে গেল।

রুপোর কাঁটা চামচ আর পোর্সিলেনগুলো সব ওল্ড্ (পুরাতন) হয়ে গেছে। ওয়ান্ ইয়ার (এক বৎসর) এর বেশী কোনো থিং (জিনিষ)ই আমরা ব্যবহার করি না! তাই এই চেঞ্জে (বদলাতে) ডিলে (দেরী) হল—ভেরি সরি (অত্যন্ত দুঃখিত)—"

সুধী ও নন্দা গৃহিণীর অনুসরণ করিয়া, মূল্যবান্ আস্‌বাবে সুসজ্জিত ভোজনকক্ষে আসিয়া. ভোজনে বসিল। বেয়ারা অর্দ্ধপীত হুইস্কির গেলাসটি সুধীর সম্মুখে রাখিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করিল—"তোমাদের সিনেমায় আবার ডিলে (দেরী) হবে না তো?"

সুধী কহিল—"না, না, এখনো সাড়ে নটার অনেক দেরী।"

বিনোদিনী আশ্বস্ত হইল। কহিতে লাগিল—"আমার খাট বিছানা টেবিল চেয়ারের পর্য্যন্ত জেল্ (মেয়াদ) ওয়ান্ ইয়ার (একবৎসর)। কাল আমি হোয়াইট্-লে-অ্যাণ্ড-ল কোম্পানির শপে (দোকানে) নিজে গিয়ে, লাইক (পছন্দ) করে' কিনে এনেছি, চার-ডজন রূপোর কাঁটা চামচ আর ভেলুয়েবল্ (দামী) চার-ডজন পোর্সিলেন ডিনার-সেট। নগদ হাফ্ সিক্স হাণ্ড্রেড রুপীজ (সাড়ে ছ' শো টাকা)। গভর্ণমেণ্ট হাউসেও এই জিনিষই যায়। অনেকে টু-থ্রি ইয়ার (দু' তিন বছর) ধরে' কি করে যে ওয়ান (এক)ই সেট ব্যবহার করে, তা' আমার ইন্‌টিলিজেন্সের পাষ্ট টেন্‌স্ (বুদ্ধির অতীত)।"

সুধী নন্দার মুখ বন্ধ করিতে, তাহার মাতাকে প্রশ্রয় দিতে লাগিল। কহিল—"বহু রাজা-মহারাজার বাড়ীতেও তো যাই জ্যাঠাইমা, কিন্তু আপনার মত এমন সৌখীন্ এবং সূক্ষ্ম রসবোধ আমি কারু দেখি নি।"

মিসেস্ ভট্টাচার্য্য উৎসাহিত হইয়া কহিতে লাগিল—"আমার ফ্যামিলিতে (পরিবারে) মান্থলি (মাসিক) টু থাউজ্যাণ্ড রুপীজ-স্পেণ্ড্ (দু'হাজার টাকা খরচ)। ডার্টি (নোংরা) আমার টু আইজের পইজন্ (দু'চক্ষের বিষ)। বাংলা-পাড়ার লোকেরা শুনিচি ওয়ান্ (এক) থালা, ওয়ান্ (এক) বাটি আর ওয়ান্ (এক) গ্লাসে, টুয়েণ্টি ইয়ার (বিশ বৎসর) পর্য্যন্ত বেশ কাট্ করে দেয় (কাটায়)।"

সুধীও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল—"আমিও ঠিক ঐ কথাই শুনিচি, জ্যাঠাইমা। আর তা না করে,' করেই বা কি তারা বলুন্? গরীব লোক ত। যে পাড়ায় তারা বাস করে,' তা' যদি আপনি দেখেন জ্যাঠাইমা, তা'হলে আমি শপথ করে বল্‌তে পারি, আধ ঘণ্টার মধ্যে, আপনি নিশ্চয় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবেন—"

মেমসাহেব আহার ছাড়িয়া মাথার উপর বিদ্যুৎ-পাখা সত্ত্বেও হাতপাখা ঘুরাইয়া, নিজেকে তাড়াতাড়ি হাওয়া করিতে লাগিল, যেন সত্যসত্যই তাঁহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম ঘটিল! নেটিভ-পাড়ায় লোকে যে কি করিয়া থাকে—বিনোদিনী দেবীর নিকট এ এক প্রচণ্ড সমস্যা হইয়া পড়িল!

বিস্মিত ভাবে কহিল—"ওমা, হোয়াট সে (কি বল্‌চ), সুধী? তারা ম্যান (মানুষ) ত? তারা কি এজুকেটেড্ (শিক্ষিত)? তবে তারা বুঝি সব পুয়োর ম্যান (গরীব লোক)? ইয়ুরোপীয়ানদের (সাহেবদের) আফিসে ক্লার্ক (কেরাণী) বুঝি? ওঃ! তাহলে তো সব —লো-ক্লাস (ছোট লোক)!"

সুধী কহিল—"তা ছাড়া আর কি?"

বিনোদিনী কহিল—"শ্যামবাজারে ওঁর একবার কমিশনে যাবার ওয়ার্ড (কথা) হয়। আমি যেতে দিই নিঃ এণ্ড-এ (শেষে) কি টু-ফাইভ থাউজাণ্ড (দু'পাঁচ হাজার) রুপীজের (টাকার) জন্যে কলেরা পক্স (বসন্ত) কি টি-বি-র) ছোঁয়াচ-টোঁয়াচ লাগিয়ে আস্‌বেন ?"

আহার শেষ হইল।

সুধী কহিল—"নটা বাজ্‌ল' নন্দা, তুমি শীগ্‌গীর তৈরি হয়ে নাও। জ্যাঠাইমার তো রাত জাগা সয় না—"

বিনোদিনী কহিল—"না বাবা, ওটা কাণ্ট ডু (পারি না)। তোমরা হোয়্যার গোয়িং (কোথায় যাচ্ছ) ?"

সুধী কহিল—"ক্যাপিটলে।"

সকলেই গাত্রোত্থান করিল। গৃহিণী আদেশ দিল—"সেদিনের মত রিটার্ণ কর্‌তে (ফির্‌তে) যেন থি্‌ (তিন্‌টে) না হয়—"

সুধী কহিল—"সত্যি জ্যাঠাইমা, সেদিন ভয়ানক দেরী হয়েছিল। কি কর্‌ব বলুন ? রাত বারোটার পর নন্দা দেবীর খেয়াল হল, বালী-ব্রিজ্‌ দেখ্‌বার। কাজেই যেতে আস্‌তে দেরী হয়ে গেল !"

বেয়ারা একখানা টেলিগ্রাম ও সই করিবার কাগজ এবং পেন্সিল লইয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া কহিল—"তার মেম্‌ সাব।"

তারের নামে সকলেই সচকিত হইয়া উঠিল।

আটলক্ষ টাকা মুনাফার চন্দনার রাজা হরগোবিন্দ রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীন্দ্রনাথের সম্মুখে, বিদ্যার স্বরূপ যাহাতে প্রকাশিত না হইয়া পড়ে, সেই জন্য টেলিগ্রামখানা কন্যার হাতে ঠেলিয়া দিয়া, বিনোদিনী কহিল—"দেখ' তো মা, নন্দা ! এস্পেক্‌টেক্‌লটা (চশমাটা)

আফ্‌টারনূন্ (বিকেল) থেকে পাচ্ছি না, কোথায় ফেলেছি। বোধ হয়, কোনও মহাল থেকে কোনও ম্যানেজার তার কর্‌চে। না? হি ইজ নট ইন (তিনি তো নাই)—টোমরো (কাল) একটা ম্যান (লোক) দিয়ে টেলিগ্রামখানা তাঁর কাছে সেণ্ড করে' (পাঠিয়ে) দিও।"

টেলিগ্রাম পড়িয়া, নন্দার মাথা ঘুরিয়া গেল। সুধীর নিকট ক্ষমা চাহিয়া, জননীকে বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া, নন্দা কহিল—"বাবার বড় বিপদ, মা! সেই অসীমটা বাবাকে জেলে দেবার ষড়যন্ত্র করেচে! পাঁচ হাজার টাকা আর মিঃ আয়মাদার ব্যারিষ্টারকে কালই বহরমপুর পাঠাতে বলেচেন।"

মেমসাহেব বাংলা-পাড়ার ছোটলোকদের মত, ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে, গব্য কেরানীদের কথিত বিশুদ্ধ খাঁটি বাংলা ভাষায়, কম্পিতকণ্ঠে কহিল—"কি হবে, মা নন্দা? এখন উপায়? তখনি মিন্‌সেকে পই পই করে বলেছিলাম, ওকে অত লেখাপড়া শিখিও না, বি-এ পাশ করিও না, মুখ্যু করে রাখ—আমাদের সুবিধে হবে। তা তখন শোনা হ'ল না। এইবার ঠ্যালা সামলাও!" দুই হাত বারে বারে কপালে ঠেকাইয়া—"হেই মা কালী, মা রক্ষাকালী, মা মঙ্গলচণ্ডী, মা কালীঘাটের কালী, বাবা সত্যনারায়ণ, তোমাদের ষোলো আনার পূজো দেব, প্রভু! আমাদিকে বাঁচাও, ওঁকে রক্ষা কর!" উল্লিখিত দেব-দেবীগণ ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া, বোধ হয়, মেম্ সাহেব বাংলাতেই প্রার্থনা জানাইল।

সুধী বাহিরে আসিতেই, নন্দা কহিল—"তুমি একটু ওখানে অপেক্ষা

কর, সুধী, হঠাৎ মার শরীরটা খারাপ হয়ে পড়েচে—মাকে শুইয়ে রেখে আমি আস্‌চি—"

সুধী জিজ্ঞাসা করিল—"টেলিগ্রামের খবর ভাল তো? তুমি বেরুবে ত?"

নন্দা কহিল—"টেলিগ্রামের খবর ভালই। আমি আস্‌চি—"

বিনোদিনীকে ধরিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া, নন্দা কহিল—"তুমি কিচ্ছু ভেব না, মা। এখন তো আমি সিনেমায় যাচ্ছি—তাড়াতাড়ি—সময়ও বেশী নেই! কাল সকালে স্থির হয়ে ভেবে চিন্তে, যা হয় একটা কিছু ঠিক করা যাবে। এখন আমি চল্লুম, গুড্‌-নাইট্‌ মামি ডিয়ার—"

বিনোদিনী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই, নন্দা মাতার কক্ষ ছাড়িয়া, সুধীকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া লইয়া দ্রুতপদে একেবারে নীচে।

ভগা গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। জগা গাড়ীর অপর দিক হইতে ক্রিসেন্‌থিমামের একটি বাটন্‌-হোল্‌ ও ছোট একটা তোড়া, সুধী ও নন্দার হাতে দিল। সুধী উভয়কেই দুই টাকা করিয়া চার টাকা বখশিশ দিল।

গাড়ী চলিল।

ক্যাপিটল সিনেমা ছাড়াইয়া, সুধীর নির্দ্দেশমত গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল পার্ক ষ্ট্রীটের একটা সুবৃহৎ বাড়ীর সম্মুখে। বাড়ীখানি বহু ফ্ল্যাট-সম্বলিত, যেন একটি মৌচাক—প্রতি ছিদ্রেই মধুকর।

লিফ্‌ট্‌ম্যান্‌ প্রেমিকযুগলকে চারিতলায় তুলিয়া দিল। উভয়ে একটি ফ্ল্যাটের রুদ্ধদ্বারে দাঁড়াইয়া, বোতাম টিপিতেই ভিতরে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল।

দরজায় পিতলের ফলকে লেখা—Mrs. N. R. Shodrie (মিসেস্ এন্, আর, শোড্রি)। চোখ মুছিতে মুছিতে আধা-বয়সী এক হিন্দুস্থানী আয়া ও তাহার ১০।১২ বৎসর বয়স্ক পুত্র আসিয়া, দুয়ার খুলিয়া দিয়া, সেলাম করিয়া, পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল।

ছোক্‌রা দ্রুতপদে আগে আগে গিয়া, একটি কক্ষের তালা খুলিয়া বাতি জ্বালিয়া দিল। রমনীটি বহির্দ্বারে খিল দিয়া, যথাস্থানে চলিয়া গেল।

ঘরে আস্‌বাবের মধ্যে একটি সেক্রেটেরিয়েট টেবিল, তাহার উপর কিছু কাগজ খাম প্যাড সম্বলিত একটি লেটার-কেস্, একটা ঘণ্টা, গোটা দুই ফাউণ্টেন্ পেন্, একটা সোফা, খান তিনেক গদি-মোড়া চেয়ার, পাশে পালঙ্কে মশারি খাটান' দুগ্ধফেণনিভ এক শয্যা প্রভৃতি। জিনিষগুলি সবই দামী এবং আধুনিক রুচিসম্মত। সুধী ও নন্দা একত্রে সোফায় বসিল।

ছোক্‌রা জানাইল, দারোয়ান্ আজ ভাড়া লইতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। আবার কাল আসিবে, বলিয়া গিয়াছে।

সুধী অভয় দিল—বাড়ী ভাড়া, এবং তাহাদের মাতাপুত্রের বেতনের টাকা সে আনিয়াছে। যাইবার সময় দিয়া যাইবে।

ছোক্‌রা একটা পেগ্-টেবিলে খানিক-খানিক খরচ-হওয়া হুইস্কি ও ব্র্যাণ্ডির দুইটি বোতল ও দুইটি গেলাস রাখিয়া, দুইটি সোডা খুলিয়া, একপাশে দাঁড়াইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শ্যামাকান্তবাবুর পত্নীর পিতামাতা পুত্রীর প্রতি আদরে এবং দেব-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধায়, স্বদীয় কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন—রাই রাধা বিনোদিনী। শ্যামাকান্ত-প্রিয়া এতদিন এই নামেই আত্মপরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। গত বৎসর দশেকের মধ্যে, সাংসারিক অবস্থার হঠাৎ আশাতীত আমুল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, ইঁহার আচার-ব্যবহার, স্বভাব-অভ্যাস এবং মতিগতিরও বিলক্ষণ বিপর্য্যয় ঘটিল। প্রথমত ইঁহার নজর পড়িল, নিজের নামটির উপর: এটি অত্যন্ত সেকেলে এবং সাম্প্রদায়িক মনে হওয়ায়, গোড়া কাটিয়া আগাটি মাত্র রাখিলেন। রাই রাধা বিনোদিনী হইলেন মিসেস বিনোদিনী ভট্টাচার্য্য: বিনোদিনী দেবী বলিলে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন না বটে, তবে বিশেষ খুশীও হন্ না: মেম্‌সাব বলিলে পুলকিত হন—না বলিলে, রীতিমত চটেন্।

স্বামীর নামেও হিঁদুয়ানীর চূড়ান্ত গোঁড়ামি এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার নিজের প্রতি অপমানসূচক কটাক্ষ অনুভব করিয়া, শ্যামাকান্তকেও তাঁহার নামটি পরিবর্ত্তন করিতে ধরিয়া বসিলেন। স্বামীর নাম শ্যামাকান্ত হইলে, তাঁহাকে হইতে হয় নৃমুণ্ডমালিনী উলঙ্গিনী শ্যামা। তিনি কি শ্যামা? ছি ছি, কি অসভ্য ইঙ্গিত! ভদ্রসমাজে কি আজ কাল এ নাম কখনও চলে? না কি তিনি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণা? বিনোদিনী গৌরবর্ণা না হইলেও, তাঁহাকে অনায়াসে ফর্‌সা এবং

সুন্দরী বলা চলে। স্বামীকে নাম বদলাইয়া—আধুনিক ধরণের 'শিহরণ' 'অনিমেষ', 'সুবিমল', 'সুকোমল', 'সুললিত', কি 'সুবসন্ত' গোছের একটা কিছু রাখিতে বহু সাধ্যসাধনা করিলেন, কিন্তু বেরসিক শ্যামাকান্ত ঈষৎ হাসিয়া বরাবর একটি কথাই বলিয়াছেন—তাঁহার মস্তিষ্ক এখনও ততটা খারাপ হয় নাই!

উপাধিটাও তেমনি বিদ্‌ঘুটে! ভট্টাচার্য্য! বাংলা-পাড়ায় পুরোহিতকে বলে ভট্টাচার্য্য। ভট্‌চাজ্ মহাশয় মানে চাল-কলা নৈবেদ্য-বাঁধা অসভ্য অশিক্ষিত নোংরা এক শ্রেণীর গরীব লোক! উপাধি শুনিলেই লোকে ঘৃণা করেঃ ভাবে, নিম্নশ্রেণীর লোক। বাসু, মিটার, ডাট্, সির্‌কার্, গুপ্‌টা, মালিক, হল্‌ডার, রে—কি সুন্দর! চ্যাটার্জ্জী, ব্যানার্জ্জী, মুখার্জ্জিও তবু মন্দের ভাল! কিন্তু এমনি দূরদৃষ্ট—বিনোদিনীর হইল ভট্টাচার্য্য? শ্যামাকান্ত উপাধিটিও ছাড়িবে না! বিনোদিনী নিরুপায়!

বয়স হয়ত ইঁহার অনিচ্ছাক্রমে এবং অজ্ঞাতে কিঞ্চিৎ বেশীই হইয়া পড়িয়াছে—যদিও তাহাতে ইঁহার দোষ বা হাত তেমন কিছুই ছিল না! পঞ্চাশ এমন কিছু যে বেশী, তিনি তাহা মনে করেন না, অথচ অন্য-কেহই তাহা স্বীকার করে না। সর্ব্বত্র সকলেই তাঁহাকে ইঙ্গিতে ও অবহেলায় কেবল এই কথাটাই মনে করাইয়া দেয় যে, তিনি বৃদ্ধা—এজন্য তাঁহার মনটা সব সময় তেমন প্রফুল্ল থাকে না। তিনি পঞ্চাশকে ভুলিয়া থাকিতে চাহেন, কিন্তু পঞ্চাশ তাহার চাষের ফসল পূরাপুরি আদায় করিতেছে—চর্ম্মের লোলতায়, দৃষ্টির দুর্ব্বলতায়, দেহের স্থবিরতায় এবং দন্তের ক্রমশ পতনেঃ চিরতুষারাবৃত অতিশীতল স্নিগ্ধ-আলোকোদ্ভাসিত মৃত্যুর

মেরুলোকপথযাত্রীর মস্তকে পতৎ-তুষারকণার অবিলোপ্য শুভ্রতাতেই বিনোদিনী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাতর। তবু বিনোদিনীর ক্ষমতায় ও হাতে যাহা ছিল, তাহার সদ্ব্যবহার তিনি ষোল-আনাই করিতেন। পঞ্চাশের ফসল যাহাতে চুরি হয়, তাহার জন্য তিনি প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করিলেন। ফলে, পঞ্চাশের কঠিন-কঠোর হাতের সঙ্গে তাঁহার কোমল-মধুর হাতের সারাদিন রীতিমত হাতাহাতি লাগিয়াই থাকিত।

প্রভাতে শয্যাত্যাগ কাল হইতেই, তিনি প্রসাধন রূপচর্য্যা ও বেশ বিন্যাস প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন, সারাদিন এটা-সেটা খুঁটিনাটি চলে এবং শয্যাগ্রহণের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার বিরাম থাকে না। তথাপি মনঃপুত হয় না: কোথায় যেন কিসের অভাব থাকিয়া যায়—মন খুঁৎখুঁৎ করে। ঠিক যেমনটি তিনি চাহেন, সেইটি শুধু হয় না: হয়, চুলের বিশ্বাসঘাতকতা, নয়, দেহের বিদ্রোহ, আর নয়, শাড়ী-ব্লাউজের অবাধ্যতা—একটা-না-একটা তাঁহার মনকে পীড়িত করিয়াই তুলে!

স্বামী-স্ত্রীতে ইহা লইয়া সময় সময় বিরোধ বাধে: চব্বিশ এবং বাইশ বৎসর বয়স্কা কন্যাদ্বয় মৃদু বিদ্রূপ করে: অন্যান্য মহিলারা ইঁহার সজ্জা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া হাসাহাসি করে, গা-টেপাটেপি করে: বিনোদিনী সে সব দেখিয়াও, দেখেন না—সেদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপই করেন না! তিনি মনে করেন, বর্ত্তমান ভদ্রসমাজে পরিচিত হওয়ার ইহাও একটা সোপান। অপরিচিত থাকা অপেক্ষা এ-ভাবে পরিচিত হওয়াও, তাঁহার মতে, ঢের বাঞ্ছনীয়। অবশ্য ভদ্রসমাজ অর্থে, ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী বুঝেন, ধনী-সম্প্রদায়! অর্থ থাকিলেই ভদ্র হয়। গরীব লোককে

তিনি দুই চক্ষে দেখিতে পারেন না : তাহারা ভদ্রপদবাচ্যই নয়, তাহারা ছোটলোক!

মেমসাহেবের মতে কলিকাতা সহরটি এক বিচিত্র চিড়িয়াখানা বিশেষ : যাহারা গরীব, তাহারা রাস্তার খেঁকী কুত্তা; কলিকাতায় যাহাদের বাড়ী নাই, তাহারা ধোপার গাধা; যাহারা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করে, তাহারা শূকর। যাহারা আধুনিক নয়, তাহারা বন্য-মহিষ, গৃহপালিত পর্য্যন্ত নয়; যাহারা বিলাতী কায়দা পালন করে না, তাহারা উল্লুক; যাহারা পর্দ্দা মানে, তাহারা পেচক; যাহারা ঠাকুর-দেবতা মানে, পৌত্তলিক, তাহারা ছাগল। যাহারা হোটেলে বা পার্টিতে যায় না, তাহারা ছুঁচা; যাহাদের মেয়েরা লরেটোতে পড়ে না, তাহারা গরু; যাহাদের মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে না, তাহারা বাঁদর। আর একযোগে এই সমস্ত লোক, একেবারে অসভ্য অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য—লোফার! সময় সময় মুখ ফস্কাইয়া 'লভার' বলিয়া ফেলিলেও, লোফার অর্থ ই তাঁহার উদ্দেশ্য।

গণনায় বিনোদিনীর বয়স পঞ্চাশ হইলে কি হয়, আসলে কিন্তু তাঁহার বয়স মাত্র দশ বৎসর! দশ বৎসর বাড়ী হইয়াছে, গাড়ী হইয়াছে এবং আজীবন সুকঠোর তপশ্চরণ করিয়া মাত্র এই দশ বৎসর হইল, সিদ্ধ হইয়া নবজীবন লাভ করিয়া—তিনি দ্বিজ হইয়াছেন। দশ বৎসর আগেকার চল্লিশ বৎসর কাল, তিনি দস্যু রত্নাকররূপে বল্মীকস্তূপে আত্মগোপন করিয়া তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। সেই বিস্মৃত বল্মীক-যুগের কথা তিনি কাহাকেও বলেন না, আমরাও বলিব না। তপস্যার কথা কি ঢাক পিটাইয়া বলিবার?

স্বামী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র এবং এম্-এ, বি-এল্ঃ কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য একজন ভকীল। দুই কন্যাঃ দুইজনেই লরেটোতে পড়িত। এ ক্ষেত্রে তাঁহার তো নিরক্ষর থাকা সাজে না! এ যে নিতান্ত অপমানকর অবস্থা! বাড়ীর গৃহিণী তিনি, তাঁহার সহিত তাহা হইলে আয়ার প্রভেদ কোথায়? বিনোদিনী ঝোঁক ধরিলেন, লেখাপড়া শিখিবেন। পত্নীর লেখাপড়া শিখিবার মারাত্মক উৎসাহে, শ্যামাকান্তবাবু অগত্যা প্রতিবেশিনী মিশনরী স্কুলের একজন বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রীকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে বিনোদিনীর হাতে খড়ি হইল। কাগজ কলম খাতা পেন্সিল কালি বই প্রভৃতির পাহাড় তৈরি করিয়া, তাহার উপরে বৎসর-দুই বাংলা ও ইংরাজী সরস্বতার সহিত রীতিমত মুখোমুখি ও হাতাহাতি করিয়া, অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, একদিন মাতা সরস্বতী ও শিক্ষয়িত্রী উভয়কেই সেই পাহাড়ের চূড়া হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া, প্রসাধন ও রূপচর্য্যাতেই বিনোদিনী সবিশেষ মনোনিবেশ করিলেন।

তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যারা তাঁহার অপেক্ষা কত ছোট, অথচ কেমন ইংরাজী ও বাংলা পড়ে, লেখে এবং বলে—আর তিনি তাহাদের গর্ভধারিণী জননী হইয়া তাহা পারিবেন না? এ অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। তাঁহার মনে হইয়াছিল, মেয়েদের আগেই তিনি বি-এ পাশ করিয়া ফেলিবেন! মানুষের সব ইচ্ছা যেমন পূর্ণ হয় না, বিনোদিনীর বি-এ পাশ করা এমন কি ইংরাজী ও বাংলা শিক্ষার অভিলাষও তেমনি অপূর্ণই রহিয়া গেল। দূরস্থিত পর্ব্বতকে কাছেই মনে হয়ঃ পথিক চলিতে আরম্ভ করিয়া তবে বুঝিতে পারে, পর্ব্বত কোথায় এবং

কত দূরে! বিনোদিনীও পাঠ আরম্ভ করিয়া, এই তথ্যটি বুঝিয়াছিলেন। বৎসর দুই ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া তাঁহার আর ধৈর্য্য রহিল না। ভাবিলেন, যাহা শিখিয়াছেন, কাজ চলার মত, তাহাই যথেষ্ট। দশ বৎসর বয়স ভাবিয়া পাঠারম্ভ করিয়া, বিনোদিনী বুঝিলেন, তাঁহার বয়স পঁয়তাল্লিশই ঠিক।

অথচ গৃহের মর্য্যাদা তো রাখিতে হইবে! আয়া বয় বেয়ারা মালী হইতে স্বামী কন্যা কন্যার বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি সকলের সঙ্গেই বিনোদিনী বেপরোয়াভাবে ইংরাজী বলিতে আরম্ভ করিলেন! তাঁহার মুখে ইংরাজী ছাড়া কথাই আসে না। শ্যামাকান্তবাবু ও কন্যা দুইজন নরম গরম কোমল-কঠোর আবেদন-নিবেদন প্রভৃতি বহু উপায় অবলম্বন করিয়াও, বিনোদিনীর ইংরাজী বলার অভ্যাস ছাড়াইতে পারিল না। ইংরাজী তিনি বলিবেনই! শুভানুধ্যায়ীরা আশা ছাড়িয়া দিল।

কন্যারা পরে দেখিল, মাকে খুসী রাখিতে পারিলে, তাহাদের ব্যক্তিগত সুবিধাই বেশী। তাহারা জননীকে ইংরাজী বলায় এবং আধুনিক সাজসজ্জা প্রসাধন এবং রূপচর্য্যায় বেশী করিয়া উৎসাহিত এবং সহায়তা করিতে লাগিল। কন্যারা নিজ নিজ খেয়ালখুসীমত ঘুরে ফিরে, যায় আসে—জননী মেয়েদের প্রগতিতে পুলকিত এবং গর্ব্বিত হইতে লাগিল। মেয়েদের অনুচিত বহু টুকিটাকি বিনোদিনী স্বামীর নিকট পর্য্যন্ত তুলিত না, নিজেই ঢাকিয়া লইত। শ্যামাকান্ত কিছুই জানিতে পারিত না। বাড়ীর সকলেরই ধারণা, সংসার বেশ সুখে সুশৃঙ্খলায় এবং বিনায়াসেই চলিয়া যাইতেছে: জলের উপরটা দেখিয়া, কোথায় যে চোরাবালি, সেটা কোনও দিনই সঠিক বুঝা যায় না।

সারারাত্রি ভাল ঘুম হয় নাই। স্বামীর টেলিগ্রামের কথাটাই কেবল যখন-তখন মনে পড়িয়াছে, আর ছাঁৎ-ছাঁৎ করিয়া ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। সারারাত্রি কত এলোমেলো দুশ্চিন্তা আসিয়া বিনোদিনীর মনে যে জট পাকাইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। খারাপটাই মানুষের মনে আগে উদয় হয়। এ মোকদ্দমার খারাপ ফল—বাড়ীসুদ্ধ সকলেরই একসঙ্গে অপমৃত্যু! বিনোদিনী আর ভাবিতে পারে না—শিহরিয়া উঠে, ভয়ে চিৎকার করিতে যায়, কে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরে!

স্বামীর উপর রাগ হইল। হাইকোর্টের ভকীল হইয়া একি কাঁচা কাজ করিয়াছে, বল তো। আইনজ্ঞ হইয়া যদি এমন বোকামি করে, তাহা হইলে সে মূর্খের কপালে বিড়ম্বনা হইবে না তো, কাহার হইবে?

শ্যামাকান্তর আর ইহাতে কি হইবে? সে না হয়, যাহা ছিল, পুনরায় তাহাই হইবে! পুরুষ মানুষ তাহার কি? কিন্তু বিনোদিনী যে ইহাতে একেবারে মারা পড়িবে! এই দশ বৎসরে তবু সে একটা বাসযোগ্য বাড়ীতে বাস করিতেছে, দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতেছে, দুই-একটা টাকা-পয়সাও নাড়াচাড়া করিতেছে, দুই-একখানা ভাল কাপড় জামা বা একটু-আধটু সোনা-রূপার মুখ দেখিতেছে, দুই-একজন ভদ্রলোকের সহিত মিশিতেছে: কিছুই-নাই আর নিত্য-নাইয়ের জ্বালায় চিরকাল জ্বলিয়া-পুড়িয়া, হাড়গুলি পর্য্যন্ত তাহার ভাজা-ভাজা হইয়াছিল, সে আগুনটা সবে মাত্র নিভিয়াছে, দেহটা কেবল একটু সুস্থ হইয়াছে: চিরজীবন খাটিয়া, সবে মাত্র একটু বিশ্রাম মিলিয়াছে। আর অমনি এই বিপদ? সারারাত্রি বিনোদিনী অসীমের পরাজয় ও মৃত্যু

এবং স্বামীর কল্যাণ-কামনা করিয়া, যথাসময়ে অর্থাৎ বেলা সাড়ে আটটায় শয্যা ত্যাগ করিল।

স্নান-প্রসাধনাদি সেদিন কোনও রকমে তাড়াতাড়ি সারিয়া, সাড়ে নয়টায় চায়ের টেবিলে আসিয়া দেখে, কন্যাদ্বয় তখনও অনুপস্থিত। তিক্তকণ্ঠে বিনোদিনী ডাকিল—"ও নিনা, ও ছনু, এত ডে (বেলা) হল, এখনো তোদের স্লীপ ব্রেক কর্‌ল না (ঘুম ভাঙ্‌ল না) ? আচ্ছা লেজি (আল্‌সে) লক্ষ্মীলীভিং (লক্ষ্মীছাড়া) ডটার (মেয়ে), তোরা যাহোক্ বাপু—"

হিন্দুস্থানী আয়া জানাইল—"বাবারা এখনো লৌটি নেহি—"

একেই তো সাংসারিক নানা দুশ্চিন্তায় ও স্বামীর আসন্ন বিপদে রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নাই, সে জন্য মেজাজটা মোটেই ভাল ছিল না, তাহার উপর বেকুফ আয়াটার ভাল করিয়া না-দেখিয়া না-জানিয়া উক্ত বেগারী ধরণের উত্তরে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল! দাঁত মুখ খিঁচাইয়া কহিল—"ইউ আর এ ঈডিয়ট্ (তুই একটা গাধা)! রিচ ম্যানস হোমে ওয়ার্ক (বড়লোকের বাড়ীতে কাজ) কর্‌তে এসেছিস্, এখনো ল্যাংগোজ (ভাষা) দোরস্ত কর্‌তে পারিস্ নি ? এখনো হোম্ রিটার্ণ করে নি (বাড়ী ফেরেনি) কি! এতটুকু নোলেজ (জ্ঞান)ও কি তোর নট্ (নাই) ? ইষ্টুপিট—"

বলিয়া গশ্ গশ্ করিতে করিতে বিনোদিনী একে একে নন্দা ও ছন্দার শয়নকক্ষে ঢুকিয়া দেখে, দুই বোনের কেহই তখনও সত্যই বাড়ী ফিরে নাই—তুষার-ধবল শয্যাদুইটি প্রভাতের ঝরা মল্লিকারাশির মত অস্পৃষ্ট পড়িয়া আছে। বিনোদিনীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া

পড়িল। পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া, বিনোদিনী বিস্মিতভাবে চুপচাপ বসিয়া পড়িল।

বেলা প্রায় দশটা। ছন্দা গতকল্য বেলা এগারটায় রিহার্সালে গিয়াছে, এখনও রিহার্সাল চলিতেছে নাকি? নন্দা গত রাত্রে সাড়ে নয়টার প্রদর্শনীতে সিনেমায় গিয়াছে, সিনেমা কি এখনও ভাঙে নাই? কত বড় ছবি? এমন অদ্ভুত ছবির কথা তো বিনোদিনী কখনও শোনে নাই? নিশ্চয়ই দুইজনের পথে কোনও বিপদ ঘটিয়াছে! কলিকাতার রাস্তায়, বিশেষত মোটরে, যে-কোনও সময়ে বিপদ ঘটিতে পারে! আশ্চর্য্য কি? কিন্তু একই দিনে দুই জনেরই কি একই বিপদ ঘটিল?···ব্যাপারটা অত সহজও তো মনে হয় না! তবে কি?···সুধী ও পরিমল দুইজনই তো বেশ ভাল ছেলে!···বড়লোকের ছেলে, শিক্ষিত—তবে কি...বিনোদিনীর মনের এক কোণে সন্দেহের একটা মাকড়শার-জাল দেখা গেল!···উঁহু······অসম্ভব! ··তবে বিষয়টা ভাল করিয়া জানিতে হইবে।···ইহাদের আজকাল ফিরিতে প্রায়ই রাত্রি অধিক হয়! শেষে কি—

"চা ঠাণ্ডা হইয়ে গেলো মেম্‌সাব" আয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও বিনোদিনী চা-খাবারের দিকে নজর দিল না। করুণভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আয়া, পথে তাদের কোনও এক্সিডেণ্ট (দুর্ঘটনা) হয় নি তো?"

আয়া মুখ ফিরাইয়া, শ্লেষের সহিত উত্তর দিল—"হামি গোরীব লোক, মেম্‌সাব্, বোড়োলোকদের কোথার হামি কি জান্‌বে?"

বিনোদিনীর মনে পড়িল, সেদিন তো নন্দা বালী-ব্রিজ দেখিতে চাহিয়াছিল, কাল আবার তাহার সারা-ব্রিজ দেখিতে খেয়াল চাপে

নাই তো ? নন্দা যদি সারা-ব্রিজ দেখিতে গিয়া থাকে, তাহা হইলে ছন্দা নিশ্চয় সারনাথ দেখিতে গিয়াছে !

সিঁড়িতে সতর্ক পদক্ষেপের চাপা শব্দ শুনিয়া, বিনোদিনী মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল, কপালে সিঁদুরের এক ফোঁটা, হাতে কলাপাতায় মোড়া কিছু ফুল-বেলপাতা, নন্দা উপরে উঠিতেছে।

বাড়ী ঢুকিতেই জননীকে এবং তাহার রোষ গম্ভীর মুখ দেখিয়া, নন্দার মুখ শুকাইয়া গেল। চম্ করিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। রক্তহীন পাংশুমুখে জোর করিয়া প্রফুল্লতার মুখোস চাপাইয়া, শুষ্ককণ্ঠে, কাষ্ঠহাসি হাসিয়া, জিজ্ঞাসা করিল—"খুব ভাব্‌ছিলে বুঝি মামি, ডিয়ার ?"

রাগে দুঃখে বিনোদিনীর মুখ দিয়া হঠাৎ কথাই বাহির হইল না। কি বলিবে, ঠিক করিতে না পারিয়া ভাবিতেছে ! নন্দা মাতার কাছে আসিয়া গা-ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া, পুনরায় তেমনি আবদারের স্বরে কহিল—"কি ভাব্‌চ, মামি ? আমার উপর রাগ করেচ মাদার ডার্লিং ?"

বিনোদিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না। তুবড়ীর মত জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল—"তোমাদের গ্রোথ্ (বাড়) বড্ড ইন্‌ক্রীজ হয়েছে (বেড়েছে) ! নমিনেটিভ (কর্ত্তা) বাড়ী না থাকায় তোমাদের ভারি মজা হয়েচে, না ? আসুন তিনি এইবার হোম (বাড়ী), আমি তাঁকে অল্ টেল্ করে (সব বলে) দিচ্ছি। এ সব আর আমি সইতে পারুচি না—"বলিয়া বিনোদিনী কাঁদিয়া ফেলিল।

নন্দা হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনোদিনী সরোদনে বলিতে লাগিল—"এমন করে আমার মাউথে (মুখে) তোরা ইঙ্ক্ (কালি) দিবি, এ আমি কখনও ভাবি নি।

বলি, নাইট্-লিভ্, (রাত্রিবাস) হোয়ার (কোথা) হল? হুজ্-উইথ্ (কার সঙ্গে)?"

নন্দা মরীয়া হইয়া উঠিল। শেষ চেষ্টা স্বরূপ রুদ্ধ গলায় অতিকষ্টে কথা কহিবার শক্তি সঞ্চয় করিয়া, কহিল—"মা, তুমি লোকের ভব্যতা জ্ঞানের খুঁং ধর,' আর তোমার মুখে এই কথা? তুমি সবাইকে অসভ্য অশিক্ষিত বলে' ঘৃণা কর, আর তোমার এই ব্যবহার? তুমি আমায় কোন্ মুখে এমন জঘন্য কথা বল্লে? তোমার মেয়ে হয়ে আমি কোনও খারাপ কাজ করতে পারি? তোমার বিশ্বাস হয়? এতদিন তবে তোমার কাছে কি শিখ্লাম? ছি, মা, তোমার মত কাল্চার্ড (শালীনতা সম্পন্ন) লেডীর মনে, নিজের নির্দ্দোষ মেয়ের সম্বন্ধে এই জঘন্য ধারণা? তোমার মেয়ের সম্বন্ধে তোমার যদি এই ধারণা হয়, তা'হলে অন্য লোকে কি না বল্বে? তোমার কাছে এ নীচতা আমি কখনো আশা করি নি, মা।"

বিনোদিনী যতই শিক্ষা আভিজাত্য এবং আধুনিকতার অভিনয় করুক্, আসলে সে যে এসবের কিছুই নয়, এ কথা নন্দা ভালই জানে। তবে পাহারাওয়ালাকে জমাদারসাহেব বলার মত, দায়ে পড়িয়া ভগিনীদ্বয় জননীকে উচ্চে তুলিয়া দিয়া, নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করে এবং বহুদিন হইতেই ইহা করিয়া আসিতেছে। মেয়েদের বন্ধুরাও কার্য্যোদ্ধারের জন্যে বিনোদিনীকে বড় করিয়া, খুশী রাখে। কাজেই, সকলের মুখেই আত্মপ্রশংসা শুনিয়া, বিনোদিনীর প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, সে সত্যই একজন আধুনিকা শিক্ষিতা এবং অভিজাত। পৌনঃপুনিকতায় মিথ্যাও সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়।

কন্যার কথায় বিনোদিনীর মুখোসটা আবার চাপিয়া বসিলেও, সব মুখটা ঢাকা পড়িল না: ফাঁক যে একটু হইয়া পড়িয়াছিল, সেটি রহিয়াই গেল: তাই দিয়া চিরন্তন নারীর স্বরূপ একটু প্রকাশ হইয়া পড়িল। কহিল—"টু পেজ (দু' পাতা) ইংরিজী পড়ে আর বি-এ পাশ করে, তোমাদের আর্থে (মাটিতে) আর লেগ্ (পা) পড়্চে না! মনে কর্চ, আমি এতই য়্যাস্ (গাধা)? তোমার চালাকি আমি কিছুই ডোণ্ট-আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড (বুঝি না)?"

নন্দা কহিল—"আমার কথাটাই আগে শোন, মা, তারপর তোমার যা ইচ্ছে ব'ল। এই দেখ' প্রসাদী ফুল। বাবার জন্যে আমার কি সিনেমায় মন ছিল? গেছি একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে, কি করি উঠ্তে তো পারি না! যেমনি ছবি শেষ হল, অমনি ছুট্লাম দক্ষিণেশ্বরে—"

তাড়াতাড়ি বিনোদিনী নন্দার হস্তস্থিত কলাপাতামোড়া পদার্থটির দিকে সাগ্রহে চাহিল। বাগানের ফুল ভাবিয়া, এতক্ষণ বিনোদিনী সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করে নাই। মনটা সামান্য একটু খুশী হইল, তবে সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত হইল না। কহিল—"তা নাইটে (রাত্রে) নট্ গোয়িং (না গিয়ে) ডে-টাইমে (দিনের বেলায়) গেলেই তো হত! সার্ভেণ্টরা (চাকরবাকর) কি থিঙ্ক্ কর্চে (ভাব্চে) বল্ দেখি?"

নন্দাও খানিকটা সহজ হইল। কহিল—"চাকরবাকর কি ভাব্বে, তা মনে করে', বাবার এই বিপদে আমি তো চুপ করে' বসে থাকতে পারি না! দক্ষিণেশ্বরে পূজো দিতে হলে, রাত্রেই যেতে হবে, কারণ সেখানে রাত্রেই পূজো হয়, দিনে হয় না—। ছন্দু কৈ?"

বিনোদিনীর সমস্ত রাগ এইবার ছন্দার উপর গিয়া পড়িল।

কহিল—"তিনি এখনও ফেরেন্ নি! তোমারি বোন্ তো? তিনি হয়ত এখনও রিহার্সাল দিচ্ছেন, আর নয় তো বাপের গুড়ের (মঙ্গলের) জন্যে তারকেশ্বরে মার্ডার (হত্যে) দিচ্ছেন্!"

নন্দা অপ্রস্তুত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"এ প্রসাদী ফুল কোথা রাখ্‌ব, মা? এই টেবিলের উপর রাখ্‌ব?"

বিনোদিনী কহিল—"খাবার টেবিলে কি প্রসাদী ফুল রাখে? তাছাড়া, যদি কেউ হুপ্ করে এসে পড়ে? সে দেখ্‌লে কি বল্‌বে? আমার শোবার ঘরে আল্‌মারির মাথায় রাখ্‌গে—"

নন্দা ফুল রাখিতে গিয়া বাঁচিল। যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নামে বহু লোক তরিয়াছে, আজ সেই নামে নন্দাও তরিল। কে বলে নামের শক্তি নাই? বিলাস-কক্ষের ফুলদানির ফুল নাম-মাহাত্ম্যে মহামায়ার নির্ম্মাল্য হইল।

অর্দ্ধেকভারমুক্ত হইয়া, বিনোদিনী এইবার একটু চা পান করিয়া, শরীরটাকে চাঙ্গা করিয়া লইবার জন্য বয়কে ডাকিতেই, সিঁড়িতে দেখিল—ছন্দার সঙ্গে একজন বর্ষীয়সী অপরিচিতা মহিলা উপরে উঠিতেছেন।

ছন্দার কেশ রুক্ষ; শাড়ী মলিন, স্থানে স্থানে ধূলা ও কাদায় বিবর্ণ এবং দাগে-ভরা; চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ; চেহারা জেল-ফেরতা দাগীর ন্যায় রক্তশূন্য! বিনোদিনী ছন্দাকে কি বলিতে উদ্যত হইয়া, আগন্তুকাকে দেখিয়া আর বলিতে পারিল না। ছন্দা মুখ ফিরাইয়া টলিতে টলিতে ছুটিয়া গিয়া, নিজের ঘরে ঢুকিয়া, দরজায় খিল বন্ধ করিয়া দিল।

বিনোদিনী বিস্ময়ে নির্ব্বাক্। নন্দাও তাহার কক্ষ হইতে পর্দ্দাটি

একটু ফাঁক করিয়া, ভগিনীর চেহারা দেখিয়া, বিশেষ কৌতূহলী হইয়া, বাহিরে আসিয়া ভীতভাবে মাতার পার্শ্বে দাঁড়াইল।

আগন্তুকা ইহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইহারও মুখে চোখে একটা উত্তেজনার সুস্পষ্ট ছাপ। গৃহস্বামিনী ও নন্দা উভয়েই অভিভূত : কাহারও মুখে একটি কথাও নাই!

বিনা অভ্যর্থনায় মহিলাটি যে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন তাহা তাঁহার সপ্রতিভ দৃষ্টিতেই বোঝা গেল। এই নিদারুণ পরিস্থিতিটিকে সহজ করিয়া, নন্দা সবিনয়ে একখানা চেয়ার আগাইয়া দিয়া, স্বাগত জানাইয়া, কহিল—"আসুন্—বসুন্—"

মহিলাটি বিনোদিনীরই সমবয়স্কা—কি বৎসর দুএকের বড়ও হইতে পারেন। মাথায় পাকা চুলের শরবন। মধ্যসীমন্তপথটি দুই ধারের চুল উঠিয়া গিয়া প্রশস্ততর এবং সিন্দুররাগে এয়োতির প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নির মহিমায় পবিত্র ও প্রোজ্জ্বল। শেমিজের উপর সাধারণভাবে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী পরা, পায়ে একজোড়া সস্তা স্যাণ্ডাল। হাতে আট-গাছা করিয়া ডায়মণ্ড-ছোলা চুড়ি, গলায় একগাছা মোটা হার। গায়ের রং ফর্শা, বেঁটে, একটু মোটা। নেওয়াপাতি রকমের একটু ভুঁড়িও আছে। সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, বসিয়া সুস্থ হইলেন।

মহিলাটি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি ছন্দার-মা তো? আর তুমি মা—"

একে ত বিনোদিনীর মেজাজ ভয়ানক খারাপ, তাহার উপর এই বিশেষ অপ্রিয় পরিস্থিতির মধ্যে, বলা-নাই কওয়া-নাই হঠাৎ

একেবারে উপরে উঠিয়া আসিয়া, গায়ে পড়িয়া, এই বিচিত্র সাজে সজ্জিতা অসভ্যা অভব্যা আগন্তুকার আলাপ জমাইবার চেষ্টায়, তাহার গা চিড়বিড় করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ভদ্রসমাজের কেহ আসিলেও, বিনোদিনী তাহার সহিত এ সময় হয়ত দেখাই করিত না ঃ এতো একটা সাধারণ স্ত্রীলোক! হয় ত কিছু ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছে! ইহাকে আশু বিদায় করিতে হইবে। ইহাকে দেখিবামাত্রই মেমসাহেবের খারাপ মেজাজ আরও খারাপ হইয়া উঠিল।

বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া, নিজের বাড়ীতে নিজ প্রভুত্ব প্রদর্শনমানসে, তীক্ষ্ণভাবে কহিল—"ইয়েস আই য়্যাম্, ছন্দাজ্ মাদার (হাঁ, আমিই চন্দার মা)। এ তার এল্‌ডার সিস্‌টার (দিদি)! হু ইউ (তুমি কে)?"

মহিলাটি অবাক হইয়া বিনোদিনীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

বিনোদিনী অস্থির ভাবে কহিল—"হোয়াট (কি)? হোয়াই সাইলেণ্ট্ (চুপ কেন)? হু ইউ (কে তুমি), হোয়াই কাম্ (কেন এসেছ)—বল না য়্যাশ (ছাই)! আমার টাইম নট্ (সময় নেই)—স্থন সে (শীগ্‌গীর বল)—"

আগন্তুকার হাসিও পাইল, দুঃখও হইল! গম্ভীরভাবে কহিলেন—"আপনি অমন ব্যস্ত হবেন না, বা বিরক্তও হবেন্ না। আমি আপনার কাছে কোনও সাহায্যপ্রার্থী হয়ে আসি নি—"

মহিলাটির ব্যবহার, কথা, কথা বলার ভঙ্গী প্রভৃতি দেখিয়া, বিনোদিনী দমিয়া গেল। নন্দা অবস্থাটিকে সহজ ও সহনীয় করিয়া তুলিবার জন্য ভদ্রভাবে কহিল—"আপনি ক্ষমা ক'র্‌বেন্। মা ব্লাড প্রেশারের রোগী—

কা'ল থেকে অসুখটা একটু বেড়েছে বলে, সামান্যতেই ইনি এখন উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌চেন—"

মহিলাটি কহিলেন—"ও। কাল রাত্রে তোমার বোন্—ছন্দাদেবী—কোথায় ছিলেন, কিছু জান তোমরা?"

নন্দার মুখখানা হঠাৎ কালো হইয়া ঝুলিয়া পড়িল। নতমুখ সে তুলিতেই পারিতেছিল না।

বিনোদিনী কি বলিতে উদ্যত হইলে, নন্দা পিছন হইতে মাতাকে একটু টিপিল এবং মহিলাটিও বাধা দিয়া কহিলেন—"আপনার শরীর অসুস্থ, আপনি বেশী কথা কইবেন না। আমার যা' বল্‌বার, আমি তা' আপনার এই মেয়েকেই বলে যাচ্ছি—"

শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হইয়া, নন্দা জিজ্ঞাসুভাবে আগন্তুকার মুখের দিকে চাহিল।

মহিলাটি নন্দার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"তোমরা আমায় মাপ্‌ করো, মা, অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদই দিতে এসেচি। ছন্দাদেবীকে লালবাজার পুলিশ লক্-আপ্‌ থেকে এইমাত্র খালাশ করে, তাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে এসেছি মাত্র। পৌঁছে দিলাম, এইবার যাই—"

বলিয়া উঠিতেই, বিনোদিনী খপ্‌ করিয়া আগন্তুকার হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া, কাঁদ-কাঁদ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"হোয়াট, হোয়াট (কি, কি)? আমার ডটার (মেয়ে) লালবাজার পুলিশ গারদে লক্-আপ্‌ (বন্ধ) ছিল? হোয়াই (কেন)?"

মহিলাটি কহিলেন—"সে সব কথা আপনার মেয়েকেই জিজ্ঞাসা কর্‌বেন্, সে-ই ভাল বল্‌তে পার্‌বে।"

বিনোদিনী কাঁদিয়া ফেলিল। প্রথমেই যাহাকে বিদায় দিবার জন্য রূঢ় আচরণে আহত করিয়াছিল, বিনোদিনী তাহাকে আর একটু অপেক্ষা করিয়া, সব কথা জানাইয়া যাইবার জন্য সকরুণ ভাবে মিনতি জানাইল। বিনোদিনী আগন্তুকার অভব্য সাজ ও অসভ্য ব্যবহার সব ভুলিয়া গেল। কহিল—"দোহাই আপনার, আমার রিকোষ্ট (অনুরোধ) সব ওয়ার্ড (কথা) আমায় না বললে আপনাকে ডোণ্ট লীভ গো (ছেড়ে দেব না)।"

নন্দাও মাতার সহিত যোগ দিয়া অনুরোধ করিল—"দয়া করে ব্যাপারটা আমাদের খুলে বলুন্—"

মহিলাটি পুনর্ব্বার বসিয়া, ধীরে ধীরে কহিলেন—"কাল রাত্রি দু'টোর সময় আপনার মেয়ে ছন্দাকে, আর বল্‌তে লজ্জা হয়, আমারই এক কুলাঙ্গার ছেলে কামাখ্যাকে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠে আপত্তিজনক অবস্থায় দেখে, একজন সার্জ্জেণ্ট তাদিকে ধরে নিয়ে গিয়ে লালবাজার হাজতে বন্ধ করে রাখে। তারপর আজ সকালে কামাখ্যা তার বাপের নাম বলাতে, আমার স্বামীকে পুলিশ থেকে টেলিফোন করে। সেই টেলিফোন্ পেয়ে আমরা লালবাজার যাই, আর সেখান থেকে এদিকে জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে—এই ফির্‌ছি। এখানে আসবার আমাদের মোটেই ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু বাধ্য হয়েই আস্‌তে হল: ছন্দার কাছে একটি পয়সাও ছিল না। কাজেই তার বাড়ী ফেরারও কোনো উপায় ছিল না। যতই হোক্ ভদ্রলোকের মেয়ে, ব্রাহ্মণের মেয়ে—তাই এসেছিলাম পৌঁছে দিতে। আচ্ছা, আমি তাহলে এখন আসি, নমস্কার—"

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল—"কামাখ্যা কে? চিনতে পার্‌লাম না তো! হয় তো পরিমলের সঙ্গে—"

বাধা দিয়া মহিলাটি কহিলেন—"বল্‌তে ভুলে গেছি মা! আমার ছেলে কামাখ্যাই, আপনাদের কাছে পরিমল নামে পরিচয় দিয়েছিল।"

নন্দার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"তার বাপের নাম তো রায়বাহাদুর অখিল ঘোষাল—"

আগন্তুকা কহিলেন—"না, মা, তার বাপের নাম রায়বাহাদুর অ-য়ে হ্রস্ব-ই, অন্তস্থ য়, ম-য়ে আকার, ধ ব সেনগুপ্ত, রিটায়ার্ড ডিভিশন্যাল কমিশনার এবং বর্ত্তমানে বোগাস য়্যাণ্ড ব্লাফার কোম্পানির সীনিয়র পার্টনার (প্রধান অংশীদার)—"

বিনোদিনীর তালু শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া উঠিল। কাণের মধ্যে বোঁ বোঁ একটা শব্দ হইতেছিল। কোনও রকমে তোঁৎলাইতে তোঁৎলাইতে জিজ্ঞাসা করিল—"কামাখ্যা ব্যাচিলার (অবিবাহিত) তো?"

রায়বাহাদুরজায়া কহিলেন—"আজ্ঞে না, সে সার্ জীবনকৃষ্ণ সেনের জামাই। দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ের বাপ।"

নন্দা টেবিলটির উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। বিদ্যুৎচমকের মত সুধীর মুখখানা একবার তাহার মনের আকাশে উঁকি মারিয়াই, ঘন কালো মেঘের অন্ধকারে তখনি আবার অদৃশ্য হইল।

বিনোদিনী কহিল—"কিন্তু—"

আগন্তুকা বাধা দিয়া কহিলেন—"এইবার আমায় বিদায় দিন্। বড় বিশ্রী ব্যাপার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলাপ হল! কিছু মনে কর্‌বেন না। নীচে আমার স্বামী অনেকক্ষণ একলা অপেক্ষা কর্‌চেন্। সকাল থেকে এখনো হাতে মুখে জল পড়ে নি, ইষ্টমন্ত্র স্মরণ হয় নি, নারায়ণের সেবারও কোনো জোগাড় হয় নি—"

যাইতে যাইতে মধ্যপথে থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"দেখুন্ (নতনেত্রা বিনোদিনীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া) আপনাকে বল্‌চি—আমার বেশ মনে হচ্ছে, মেয়েটি যে খারাপ হয়েছে, এ কেবল আপনারি দোষে। আপনার সাজ, পোষাক, ভাষা, ভব্যতাজ্ঞানের যে পরিচয় পেলাম, তাতে আমার মনে হয় যে, আজকালকার মেয়েদিকেই লোকে নিন্দে করে—কিন্তু মেয়ে যে খারাপ হয় মায়ের দোষে, সেটা অনেকেই বোঝেন না: কারণ, লোকের সাম্‌নে মেয়েরাই থাকে, তাদের মায়েরা তো থাকেন না। যাই হোক্, সাহেবিয়ানা, আভিজাত্য আর আধুনিকতা দেখাতে গিয়ে, এই ভয়াবহ ফিরিঙ্গিয়ানাই হয়েছে আপনাদের দলের কাল। আর এ সব তারই অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল।"

ইঁহার মুখ বন্ধ করিবার নিমিত্ত, নন্দা অধীরভাবে অথচ সকরুণ নিবেদনে কহিতে লাগিল—"মিসেস সেনগুপ্তা—মিসেস্ সেন্‌গুপ্তা, দয়া করে', দয়া করে'—"

মহিলাটি কহিলেন—"আমি মিসেস্ সেনগুপ্তা নই, মা, আমি বাঙ্গালী হিন্দুর স্ত্রী—তোমার মায়ের মত মেমসাহেবও নই: আমি শ্রীমতী স্নয়নী দেবী। মিসেস্ ভট্টাচার্য্যকে বল্‌চি, যে দিন-কাল পড়েচে, সোমত্ত মেয়ে নিয়ে—একটু সাবধানে থাক্‌বেন্। অমন যার-তার সঙ্গে যখন-তখন এক্‌লা ছেড়ে দেবেন না। যুবতী মেয়ে নিয়ে সংসার আর সসর্প গৃহে বাস, একই।" বলিতে বলিতে স্নয়নী দেবী তর্‌তর্ করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

নন্দার কাণ পর্য্যন্ত গরম হইয়া উঠিল।

লজ্জায় দুঃখে অপমানে বিনোদিনী নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

—"সত্যি বলচি, ডার্লিং, ঠিক দিন পনেরর মধ্যেই ফিরে আসব—"

—"সে কি? এই নতুন ছবি আরম্ভ হচ্ছে, রিহার্সাল্ বসবে, এখন কি অনুপস্থিত হলে চলে?"

—"এখনো তোমার কোথাও কিছু নেই। ভূদেববাবু এখনো কোয়েটা থেকে বই লিখেই ফিরল না—কি করে রিহার্সাল বসবে? এখনো তোমার আর্টিষ্টের সঙ্গে সব কণ্ট্রাক্টই হল না, আর এর মধ্যে বই আরম্ভ হবে? কি বল, সুবু?"

বেলা প্রায় বারোটা। রবিবার, ষ্টুডিও আজ বন্ধ। সুবোধ কাশীপুরে যতীন মজুমদারের সহিত কণ্ট্রাক্ট করিতে যাইবে: দুইটায় সেখানে পৌছিতে হইবে।

বিজলী সুবোধকে বলিয়াছে, তাহার পৈত্রিক ভিটায় তাহার এক পিষি থাকিত। এতদিন সে-ই বাড়ী-ঘর দেখিতেছিল। তাহার পুত্র সম্প্রতি ভাগলপুরে এক চাকরী পাইয়াছে, পিষিমাও সেখানে পুত্রের নিকট যাইবে। কাজেই বাড়ী-ঘরের ব্যবস্থা করিতে, তাহাকে দেশে একবার যাইতেই হইবে। পবিত্র পিতৃপুরুষের ভিটা, শেষের আশ্রয়—তাহার একটা বন্দোবস্ত সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বিজলীকে যাইতেই হইবে।

একটু ভাবিয়া সুবোধ কহিল—"কি মুস্কিল দেখ' দেখি! কোথাও কিছু নেই, কোত্থেকে আবার এক পিষি এসে জুটল! গত ৪।৫ বছরের

মধ্যে এর নাম গন্ধও তো কখনো শুনি নাই! হঠাৎ ইনি কোন আশমান্ থেকে ঝপ্ করে পড়লেন? ধাপ্পা দিচ্ছ না তো?"

বিজলী একটু তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর দিল—"আমি কেন ধাপ্পা দিতে যাব? সে দেবে ঘরের বৌ-ঝি! আমি তো তোমার মন্ত্রপড়া স্ত্রী নই! আমার ভয় কি? সমুদ্রে শুয়ে শিশিরবিন্দুতে আমার ভয় কিসের? ধাপ্পা বরং তুমিই আমায় দিয়ে রেখেচ—"

সুবোধ হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠিল। সেই পুরাতন অভিযোগ, সেই পুরাতন রাগিনী! সুবোধ প্রস্তুত হইয়াই, বিস্ময়ের ভাণে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি ধাপ্পা দিয়ে রেখেচি? তোমাকে?"

বিজলী অভিমানাহত সুরে কহিল—"হাঁ গো, তুমি। প্রথম মিলন দিন থেকেই তুমি বলে আসচ, আমায় তুমি বিয়ে করবে। মনে পড়চে না? আমি তোমায় মাঝে-মাঝে তাই মনে পাড়িয়ে দিই মাত্র, কিন্তু কখনও জোর করি না। তার কারণ, তোমার অন্তরের কথা সেটা নয়: আমায় হস্তগত করবার জন্যে প্রথমে যা বলেছিলে, সেগুলো নিতান্তই কথা, যেমন সবাই বলে থাকে! তা না হলে, এই দীর্ঘ চার-পাঁচ বছরের মধ্যে সে-কথা তুমি রাখতে। এ-কি আর আমি বুঝি না? তুমি ভাবচ—বড্ড চাল চেলেচ, কেউ ধরতে পারবে না—"

সুবোধ দেখিল, কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এখন ব্যাপারটাকে ভদ্রভাবে চাপা দিতে হইলে, নিজেকে একটু হেঁট হইতে হয়। যথাসম্ভব মিষ্টভাবে কহিল—"বিয়ে না করেও, তোমার কি কোনও অমর্য্যাদা করেছি, বিজু?"

বিজলী ঝাঁজের সহিত কহিল—"একে তুমি মর্য্যাদা বল ?"

স্ববোধ আমতা-আমতা করিতে লাগিল।

বিজলী কহিল—"এ অমর্য্যাদাই। আমাদের প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, মর্য্যাদা, সম্বন্ধ—যা-ই ধর না কেন, সবই অভিনয়ঃ সবই টবের গাছ, মাটিতে কারুরই শিকড় নাই। মাটিতে একটা তৃণের যে স্থায়িত্ব আছে, টবে একটা তালগাছেরও তা নেই, জান তো! আমিও একটি টবের গাছঃ তোমার গৃহের সৌষ্ঠব, বিলাসের উপাদান এবং মনের একটা অস্থায়ী সাময়িক খেয়াল। যে-কোনও মুহূর্ত্তে এ-বিলাস, এ-স্বপ্ন এ-বালির সৌধ ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু বিবাহিত পত্নীর সম্বন্ধে তো এ কথা খাটে নাঃ পত্নী অত্যজ্য, অচ্ছেদ্য—তাকে বলে ধর্ম্মপত্নী।"

স্ববোধ মনে মনে ভাবিল, কি অন্যায় কাজই সে করিয়া ফেলিয়াছে! কেন সে চুলকাইয়া এই দুষ্ট ব্রণটিকে খোঁচাইল? অমত করিয়া ভাল করে নাই। এখন এ আলোচনা বন্ধ হইলে সে বাঁচে। পনের দিন কেন, দুই মাসের ছুটি দিতেও সে প্রস্তুত! স্ববোধ গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। কোনও রকমে কহিল—"কাজ না থাকলে মানুষের মনে এমনি বহু উদ্ভট কল্পনারই ভীড় জমে—"

বিজলী শীতল কণ্ঠস্বরে কহিল—"এ গুলোকে তুমি উদ্ভট কল্পনা কি করে বলচ? এ-তো আহার-নিদ্রার মতই মানুষের সহজ স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত দরকারী চিন্তা—আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তা। তুমি সেদিন বললে না, শেঠজী যদি ষ্টুডিওটা বন্ধ করে দেয়, তা'হলে তুমি কি খাবে, কি করে খাবে এবং কোথায় দাঁড়াবে! কেন বললে? তোমার আশঙ্কার মূলেও ছিল, এই সনাতন প্রবৃত্তি, মানুষের চিরন্তন

স্বভাব—আত্মরক্ষা আর নিরাপত্তা। তোমার বেলায় সেটা দোষের নয়, দোষের শুধু আমি বললেই?"

সুবোধ ক্রমশ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিল, অথচ মুখে সামান্য একটু প্রকাশ হইয়া পড়িলেই, ধূমায়মান এই বহ্নি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে এবং সে আগুনে সে নিজেই পুড়িয়া মরিবে। শান্তভাবে সুবোধ কহিল—"দোষের তো বলি নি, তবে এ চিন্তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। সে রকম দিন যেন কখনও না আসে—"

বিজলী ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"এটা কি একটা যুক্তি হল? মানুষ ইচ্ছা করে অনেক কিছুই, কিন্তু সব ইচ্ছাই কি তার সফল হয়? ধর, কালই যদি তোমার কিছু হয়! আমার তা'হলে কি হবে? অকুল-সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া ছাড়া, আমার কি অন্য কোনও পথ থাকবে? অথচ আমরা যদি বিবাহিত হ্তাম, তা'হলে তো আমায় অকূলে ভাসতে হত না! নদীর এক কূল ভাঙ্গলেও, অন্য কূলে আশ্রয় পেতাম! বেঁচে থাকতে হলে, অবলম্বন চাই-ই একটা।"

সুবোধ একটু সুযোগ পাইল। সহাস্যে কহিল—"ওঃ! তুমি এত দূর ভেবেছ, বিজু? এতদিন বিয়ের কথাটা চেপে রেখেছিলাম তার কারণ, ঘরে আইবুড়ো মেয়ে ছিল। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল, এইবার কথাটা তলিয়ে ভাব্‌ব। ব্যস্ত হচ্ছ কেন? মন্ত্র পড়ে বিয়ে করতে যদি দেরীও হয়, বল,' আমার সব-কিছু তোমায় লিখে দিচ্ছি—যাতে তোমায় আমার অবর্ত্তমানে অকূলে না ভাস্‌তে হয়—"

বিজলী বাধা দিয়া কহিল—"সেই দেনা পাওনার কথাই এল। আমার বেলায় যে-মন্ত্র পড়াটা এড়িয়ে চল্‌তে চাইচ, সুবু, নিজের মেয়ের

বেলায় তো সেটা চাও নি? কেন? সমাজ সংসার কি কেবল তোমাদেরই একচেটে? আমরা কি কেউ নই?"

রাগে অপমানে স্নবোধের কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু ব্যাপারটা তাহার নিজের উক্তিতেই যে এমন বিশ্রী হইয়া পড়িবে, ইহা সে আগে ভাবে নাই। বিজলীও বুঝিল, স্নবোধের অন্তরে আঘাতটি ভাল করিয়াই লাগিয়াছে।

বিজলী বিষটা চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি কহিল—"বিবাহে আর অবিবাহে ঐ দুটো মন্তর ছাড়া আর কি আছে? কিন্তু ঐ মন্ত্রক'টাই দুজনের সম্বন্ধকে করে তোলে অচ্ছেদ্য, ঐ মন্ত্রবলেই জন্মে পুরুষ ও নারীর মধ্যে একটা অন্তরঙ্গতা, প্রকৃত আত্মীয়তা, এবং মর্য্যাদা: ঐ একটা ফুলই পুরুষাণুক্রমিক বংশমাল্যটিকে সম্পূর্ণ করে। ঐ মন্ত্রের গুণেই, ব্যক্তিগত আর সামাজিক জীবনে নিরূপিত হয় তাদের স্থান, তাদের পুত্র-কন্যার স্থান, তাদের বংশাবলীর মর্য্যাদা। মন্ত্রের এ শক্তি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বমানবের মধ্যেই স্বীকৃত হয়ে আসচে, আসবেও চিরকাল। আর এই মন্ত্রের অভাবেই, এ-সম্বন্ধ হয়ে পড়ে নিদারুণ হাস্যকর, অত্যন্ত লজ্জাকর, এবং নিছক ব্যবসাদারী।"

স্নবোধ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুনিতেছিল।

বিজলী কহিতে লাগিল—"টাকা, পয়সা, ধন, দৌলৎ তুমি সব দিতে পার, আমার সমস্ত অভাব মোচন করতে পার—কিন্তু সমাজে আমার ইজ্জৎ তো দিতে পারবে না! ঐশ্বর্য্য দিতে পার, কিন্তু এতটুকু মর্য্যাদা তো দিতে পারবে না, স্নবু। মানুষ সমাজ চায়, আত্মীয়-স্বজন চায়। পুরুষ যেমন স্ত্রী-পুত্র-পরিবার চায়, নারীও তেমনি স্বামী, পুত্র, পরিজন কামনা

করে সর্ব্বাগ্রে। অর্থ তার পরে। অর্থই যদি জীবনের একমাত্র কাম্য হ'ত, তা'হলে বর্ত্তমানের এই অর্থসর্ব্বস্ব-মন-ওয়ালা লোকেরা আজ কেউই বিবাহ করতো না, বা তাদের মেয়েদেরও মিছেমিছি খরচ-পত্তর করে, মন্ত্র পড়ে বিয়ে দিত না; বরং বড় হলে, বাপমা-রা মেয়েদিকে নিয়ে গিয়ে, এক-একটা বড়লোকের জিম্মা করে দিয়ে চলে আস্‌ত। পণপ্রথা, কন্যাদায়, সব একবারে উঠে যেত।"

সুবোধ কহিল—"তোমার আজ হল কি বল দেখি? তুমি ভয়ানক দার্শনিক হয়ে পড়লে হঠাৎ কি করে?"

বিজলীর কণ্ঠস্বর আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। কহিল—"দর্শনশক্তির অতি-ব্যবহারেই দার্শনিক হতে হয়েচে। পুরুষমানুষ—সখ করে,' নয় ঝোঁকে পড়ে,' কিম্বা চিত্তদৌর্ব্বল্যে, এমন কি, বিনা প্রয়োজনে অকারণে, সচ্ছল অবস্থাতেই—বেশী খারাপ হয়; স্ত্রীলোক তা হয় না। স্ত্রীলোক খারাপ হয়, অবস্থাবিপর্য্যয়ে, এবং অনেক সময় বুদ্ধির দোষেও। খারাপ পুরুষ যেমন কিছু দিনে ভাল হয়, মেয়েরাও তেমনি ভাল হ'তে চায়। পুরুষদের ভাল হয়ে, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে, সংসারে ফিরে গিয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ আছে, কিন্তু আমাদের সেইটে নেই বলেই—আমাদিকে আমরণ পড়ে থাকতে হয় এই নরককুণ্ডে। আর তোমরাও চাও—আমরা যেন এইখানেই চিরকাল থাকি এবং তোমরা এসে দু'চার দিন আমাদিকে অনুগ্রহ করে, আমাদের মাথা কেনো! আমরাও তা জানি, বন্ধু, যতই আপন কর, যতই ভালবাসা দেখাও—তোমরা মাত্র দুদিনেরই অতিথি, শরতের মেঘ, বসন্তের কোকিল। আমাদের যেদিন যায়, সেইদিনই ভাল—চোরের রাত্রিবাসই লাভ।"

সুবোধের রাগ গিয়া, সত্য সত্যই মনে একটা অনুকম্পার মৃদু স্পর্শ লাগিল। কহিল—"তুমি নিজেকে এমন করে কেন কষ্ট দিচ্ছ, বিজু? তুমি তো সাধারণ মেয়েদের মত নও—"

বিজলী ভাবাবেশে একটু বেফাঁশ বলিয়া ফেলিয়াছিল। কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া কহিল—"আর নই বা কি করে? তুমি তো আমায় তাদেরি পর্য্যায়ে রেখেচ! ঘরে আগুন একবার দিলেও যা পুড়্বে, দশবার দিলেও তাইই পুড়বে! তোমার বণিতা যখন আমি নই, তখন বারবণিতা ছাড়া আর কি? পথই আমার গতি—বা'রই আমার আশ্রয়। তুমি যত সম্মানই আমায় কর, আমি জানি, এ খদ্দের-দোকানীর পরস্পরের সম্মান-বিনিময়ের মতই। এ ছাড়া অন্য কিছু মনে করার মত বোকা আমি নই। শুধু বোকা সেজে থাকি, তোমরা খুশী থাক্‌বে বলে। ভাল দোকানী কি কখনো খদ্দেরকে চটায়? আজ যদি আমার সন্তান হয়—"

বিজলীর মনে পড়িল, তাহার খোকার মুখ। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিল! কহিল—"আজ যদি আমার কোনও সন্তান হয়, তা' হলে, হয় তাকে জন্মমাত্রেই গলা টিপে মেরে ফেল্‌তে হবে, আর নয়ত, সে হবে জারজ। জারজের জীবনের পথ হবে যাবজ্জীবন কণ্টকাকীর্ণ, অস্পৃশ্যের চেয়েও অস্পৃশ্য, ঘৃণিতের চেয়েও ঘৃণিত। মা হয়ে আমি হব সন্তানের সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারিণী, শত্রু। মার পাপের প্রায়-শ্চিত্ত করবে নিষ্পাপ নির্দ্দোষ সন্তান, আমরণ তার বুকের রক্ত দিয়ে, আর তুষানলে পুড়ে! সব বুঝি, সুবু, কিন্তু নিজের দেহের প্রতি মমতাতেই সব যায়, ঝড়ের ঘুর্ণিতে কুটোর মত উড়ে। অথচ আমাদের মন্ত্র পড়ে

যদি বিয়ে হত, তাহলে নিজেদের মর্য্যাদা তো বাড়্‌তই, সম্বন্ধটাও হত অধিকতর সত্য এবং সন্তানসন্ততিরাও পেত সমাজে একটা স্থান, একটা পরিচয়, একটা মর্য্যাদা। বিবাহ হচ্ছে—নিজের বাড়ী-ঘর, যা ফেলে পালান যায় না. যার উপর একটা অনির্ব্বচনীয় মমত্ব-বোধ থাকে। আর এ হচ্ছে, হোটেল বা ডাক-বাংলোর সাজান বাড়ীঃ বাড়ীর সব সুখ-সুবিধা পয়সা দিয়ে আদায় করা, না-পোষায় বা কাজ ফুরোয় অন্যত্র চলে যাওয়া। কোনও দায়িত্ব নাই, এর কোনও স্মৃতি পর্য্যন্ত থাকবে না! নিজের গাড়ী আর ট্যাক্সি—দুইই গাড়ী বটে, হুকুমেও চলে—কিন্তু অধিকার কি দুটির উপর এক রকম?”

সুবোধ বিজলীর যুক্তিতে অভিভূত হইয়া কহিল—“সত্যি বিজু, তুমি যেমন গুছিয়ে সব বলতে পার, আমি তেমন পারি না। তর্কে তোমায় আমি কখনও হারাতে পারি নি, আজও পারূচি না। তাই বলে—”

বিজলী বাধা দিয়া কহিল—“সত্য করে যদি কোনও বিষয় ভাব্‌তে পার, আর মনকে চোখ ঠারার অভ্যেসটা ছাড়’, তাহলে যুক্তি দিয়ে তোমার কথা সবাইকে বোঝাতেও পারূবে। তুমি চিরকাল, কি করে এ ব্যাপারটা ধামা-চাপা দিয়ে রাখ্‌বে—এই কথাটাই কেবল ভেবেচ, তাই সত্যের কাছে, যুক্তির কাছে, তুমি আজ মাথা তুল্‌তে পারচ না। আমি তো ঢের ভাল—কত লোক যে প্রকাশ্য গণিকাকেই বিবাহ করূচে—”

সুবোধ বাধা দিয়া কহিল—“তাদের কথা ছেড়ে দাও। তাদের সব মাথা খারাপ—”

বিজলী তীক্ষ্ণভাবে কহিল—“হাঁ, তাদের মাথা খারাপ, আর যত

ভাল মাথা একমাত্র তোমারই ! নিজের দিকে চেয়ে কথা বল,' সুবু। রাগ করো না, সত্য চিরদিনই সত্য : তুমি তাদের অনেকের জুতো ঝাড়বার পর্য্যন্ত যোগ্য নও। এই যে পার্ব্বতী, বেণু, মধু, সরস্বতী, যশোদা, ধীরা, শশী, লেখা, বনবালা প্রভৃতি মেয়েদিকে যারা বিয়ে করে, কুলবধুর বিশিষ্ট মর্য্যাদা দিল, তারা কি ? এদের প্রত্যেকেই শিক্ষিত, মূখ্যু কেউ নয় ; এরা যে এদিকে বিয়ে করেচে, জেনে-শুনেই করেচে, না-জেনে করে নাই বা বাংলা দেশে ভদ্রঘরের কুমারী মেয়ের অভাবেও করে নি ; সবাই সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে, রাস্তার ভিখিরী কেউ নয় ; সকলের ঘরেই খাবার আছে, পেটের দায়েও কেউ তাদিকে বিয়ে করে নি ! তবে এত ভাল মেয়ে থাক্‌তে, এদিকেই বা তারা বিয়ে করতে গেল কেন ? ভেবেচ কি ?"

সুবোধের গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিয়াছিল। অতি কষ্টে কহিল—"এ সব বিয়ের ফল কি ভাল হবে ?"

বিজলী কহিল—"আজ পর্য্যন্ত এদের সম্বন্ধে কোনও খারাপ খবর তো পাওয়া যায় নি। ভবিষ্যতে কি-হবে না-হবে, সে বিধাতা পুরুষই জানেন। ভদ্রলোকের কুমারী কন্যার সঙ্গে বিয়ের ফলও যখন খারাপ হয়, তখন এ সব বিয়ের ফল যে ভাল হবে না—কে বল্‌তে পারে ? বরং আমার মনে হয়, এই সব মেয়ে, আজ যারা নরককুণ্ড থেকে সশরীরে বৈকুণ্ঠলোকে স্থান পেল, তারা হবে অনেকের চেয়ে সুগৃহিণী এবং সুপত্নী।"

সুবোধ কি বলিবে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া কিছু বলিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। বিজলী কহিল—"কত শিক্ষয়িত্রী, লেডী

ডাক্তার, নার্সেরও যে প্রত্যহ বিয়ে হচ্ছে, তার কিছু খোঁজ রাখ? এদের জীবনযাত্রা প্রকাশ্যে যতই ভদ্র মনে হোক্, সকলেই যে ঠিক ভদ্রজীবন যাপন করে না—তার প্রমাণ চাও?”

সুবোধ অভিভূত হইয়া পড়িল। আর এক মুহূর্ত্ত এ স্থানে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়: সর্ব্বনাশ সমাসন্ন। কহিল—“দেখ’, তোমার সঙ্গে কথায় কথায় আমার কত দেরী হয়ে গেল! তিনটে বাজে। এখন গিয়ে কি সে মহাপুরুষের দর্শন পাব?”

বিজলী একটু ভাবিয়া উদাসীনভাবে কহিল—“তা পাবে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়।”

সুবোধ জামা গায়ে দিতে দিতে কহিল—“যাক্, ধান ভান্‌তে ঢের শিবের গীত হল! বাপ—তোমার সঙ্গে কথা বলাই দেখ্‌চি, আমার ঝক্‌মারি। “জনগণমনঅধিনায়ক” নামে তুমি একটা ইস্কুল কর, বিজু, ছাত্রছাত্রীর অভাব হবে না!” বলিয়া নিজের রসিকতায় সুবোধ নিজেই হাসিয়া আকুল হইল।

বিজলী কহিল—“আচ্ছা। সে ইস্কুলে তুমি ভর্ত্তি হবে ত’? বোধ করি, তুমিই হবে তার প্রথম প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ। তারপর, আসল কথার কি?”

সুবোধ বাঁচিল। কহিল—“তা যেও, তবে শীগগীর ফিরো, লক্ষ্মীটি, দেরী কর’ না। ভূষণকেও সঙ্গে নিও। একলা যাওয়াটা ঠিক নয়।”

বিজলী মুখে কিছু বলিল না, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, ভূষণকে সঙ্গে লইবে। সুবোধ তাড়াতাড়ি কাশীপুর যাইবার জন্য, বাহির হইয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

বিজলীর মনটা ভাবাবেশে সত্যই চঞ্চল হইয়া উঠিল। অভিনয় সে অনেকই করিয়াছে। কিন্তু এমন অভিনয় সে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও করে নাই। চিরকাল অন্যকে ঠকাইয়া নিজে পুলকিত হইয়াছে, জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে। কিন্তু আজিকার জয়ে সে খুসী হইল না। এ তাহার কলঙ্ক, এ তাহার পরাজয়ই। জীবনের অবিলোপ্য কলঙ্ককে চাপা দিবার একি প্রাণপণ প্রয়াস! সে আজ কি না হইতে পারিত! আজ তাহার ঘর বাড়ী সংসার স্বামী পুত্র সবই থাকিত! হতভাগিনী সে—কি কুক্ষণে সে দিদির বাড়ী আসিয়াছিল আত্মরক্ষা করিতে।

বিজলী আজ অত্যন্ত সত্য কথাই বলিয়াছে। অনেক আশা করিয়াই সে আজ স্ববোধকে তাহার অন্তরের গোপনতম ব্যথার মণিটি নিবেদন করিয়াছিল। মজ্জমান ব্যক্তি কুলে উঠিবার পরম আগ্রহে একটি তৃণের আশ্রয়ের জন্যও যেমন ব্যাকুলভাবে দুই হাত বাড়ায়, বিজলীও তেমনি স্ববোধকে ধরিতে গিয়াছিল—কিন্তু স্ববোধ চতুরের মত পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। বিজলীর আবেদন স্ববোধের পাষাণ হৃদয়ে কোনো আবেগই সঞ্চার করিল না, ক্ষীণতম একটা রেখাপাত পর্য্যন্ত করিল না: পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গে সামান্য স্পর্শানুভূতিও হইল না।

স্ববোধ চায়—এ সব কথা না উঠে, যে যেমন আছে, তেমনি থাকে: প্রজাপতির মত মধু-লুণ্ঠন করিয়াই দিন কাটিয়া যায়—প্রজাপতির বাঁধনে বন্দী হইতে সে অনিচ্ছুক। বিজলী আজ স্পষ্টই সব বুঝিল: বুঝিয়া, নিজেকেই শুধু অপমানিত মনে করিল, অপরাধীও বড় কম করিল না। কেন সে জলের আল্পনায় এমন হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল? কি মূর্খ সে? স্রোতের জলে সে চায় নৌকা বাঁধিতে?

দুঃখে সহানুভূতি না মিলিলে দুঃখ হয় না, কিন্তু দুঃখ লইয়া যে-বেদরদী উপহাস করে, তাহার মুখ দর্শন করিতেও ঘৃণা হয়। অবহেলায় বা বিদ্রূপে দুঃখের বেদনা হয়, পাকা-ফোঁড়ায় আঘাতের যন্ত্রণার মত অসহ্য, যে-অবস্থায় মানুষ চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে।

বিজলী আর ভাবিতে পারিল না। দরদর ধারে তাহার দুই চক্ষু বহিয়া দুর্নিবার বেগে তপ্ত অশ্রু বহিতে লাগিল। বিজলী সোফাটায় চিৎ হইয়া শুইয়া, ক্রমশ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল!

ভূষণ আসিয়া প্রায় পাঁচ মিনিট দিদিমণির নিকট দাঁড়াইয়া রহিল: বিজলীর হুঁস নাই। বিজলীর চক্ষে জল সে কখনও দেখে নাই। আজ সে এই প্রথম দেখিল—বিজলীও কাঁদে: কাঁদিতে জানে!

ভূষণ বিস্মিত হইল: ভূষণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ত্রস্তভাবে ডাকিল—"দিদিমণি—"

চমকিত হইয়া বিজলী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া, আঁচলে মুখ মুছিবার ছলে চোখের জল মুছিয়া কহিল—"ভূষণ?"

ভূষণ জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার শরীলটা কি ভাল নেই দিদিমণি?"

বিজলী জোর করিয়া একটু হাসিয়া কহিল—"এ শরীর কি কখনও খারাপ হয় রে, না খারাপ হলে চলে?"

—"আপনার চোখে—"

"ও কিছু নয়, ও কিছু নয়। শোন' ভূষণ—দু'এক দিনের মধ্যেই আমি এ বাড়ী ছেড়ে, ধর্ম্মতলার দিকে গিয়ে কিছুদিন থাক্‌ব। সেখানে একটা মস্ত কাজ আছে। তুমিও আমার কাছে থাক্‌বে। কিছু মোটা রকমের পাবেও—বুঝ্‌লে!"

ভূষণ বুঝুক্ আর না বুঝুক্, 'না' বলা তাহার কোষ্ঠীতে লেখে নাই। কহিল—"আজ্ঞে হাঁ, দিদিমণি। আমি নিশ্চয় থাক্‌ব। কিন্তু—"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"কিন্তু কি আবার ?"

ভূষণ হাতে হাত ঘষিতে ঘষিতে কহিল—"ওখানে থাক্‌তে থাক্‌তে অলিন্দিতা বইয়ে আমার পার্টটা আবার হাতছাড়া হয়ে যাবে না তো ?"

বিজলী আশ্বাস দিল—"না রে না! আমিও তো থাক্‌ব। আমায় ছাড়া তো ছবি হবে না, ভয় কি ? উল্টো কিছু টাকাও পাবে—"

ভূষণ নিরুদ্বিগ্ন হইল। আনন্দাতিশয্যে জিজ্ঞাসা করিল—"কিসের দরুণ, দিদিমণি ? অন্য কোথাও ছবিতে নাম্‌ব বুঝি ? তা আপনি যখন যেচেন, তখন হিরোইন তো আপনি হবেনই, আমি কি হিরো হব ?"

বিজলী হাসিয়া ফেলিল। কহিল—"ভূষণ, তোমার মাথার অনেকগুলি ইস্‌ক্রুপ হারিয়ে গেছে—"

ভূষণ সজোরে মাথাটা একবার ঝাঁকিয়া, সকরুণ ভাবে কহিল—"কৈ ? না তো দিদিমণি—"

বিজলী কহিল—"নয় ? তা বেশ, ভাল। যাক্, এবার সিনেমা নয়, এবার সত্যি সত্যি অভিনয়। হিরোই হবে, তবে তোমার সে নাটকে হিরোইন আমি হব না, টেঁপী হবে হিরোইন—"

অপ্রতিভ ভাবে লজ্জাসঙ্কুচিত হইয়া ভূষণ কহিল—"যান্—"

বিজলী কহিল—"ঠাট্টা নয়। দুএক দিনের মধ্যেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। সেদিন যতীনবাবু কেন এসেছিলেন, জানো ?"

ভূষণ কহিল—"জানি বৈকি! আমাদের অলিন্দিতা বইয়ে সে হিরোর পার্ট কর্‌তে চায়, তাই আপনাকে দিয়ে সুপারিশ করাতে—"

বিজলী ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"ঐ রকমই। যাক্, যতীনবাবু আজকালের মধ্যেই আবার আস্বেন্, সেই সময় সব ভাল করে শুনো। কিন্তু খুব সাবধান—"

দরজায় কড়ার শব্দ হইল।

বিজলী চমকিত হইয়া চাহিল। ভূষণ ছুটিয়া গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিতেই, যতীন মজুমদার ও তাহার সহিত প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বয়স্ক, মূল্যবান্ ইয়ুরোপীয় পোষাকে সজ্জিত, সুদর্শন এক ভদ্রলোক প্রবেশ করিল। নবাগতের হাতে দামী সিগারেটের একটা টিন্ঃ দাড়ি গোঁফ কামানঃ গৌরবর্ণ, পাতলা ছিপ-ছিপে, তৈলহীন ঘন কোঁক্ড়া চুলগুলি পশ্চাতে ফিরানো।

ঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়া, বিজলীকে দেখিয়া কহিল—"নমস্কার, সুদক্ষিণা দেবী।"

যতীনও নমস্কার করিল।

বিজলী উভয়কে স্বাগত জানাইয়া, সোফাটিতে বসাইয়া, নিজে সম্মুখস্থ একখানা চেয়ারে বসিল।

যতীন কহিল—"সুদক্ষিণা দেবী, আপনার মনে আছে, আমার এক বন্ধুর কথা আপনাকে সেদিন বলে গেছি—ইনিই সেই তিনি, মিঃ অজিত মল্লিক—ব্যারিষ্টার-অ্যাট-ল।"

সহাস্যে বিজলী কহিল—"মিঃ মজুমদারের নিকট আপনার কথা শুনেচি। ভারী খুসী হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। কি ড্রিঙ্ক দেব'—বলুন্—"

অজিত সসম্ভ্রমে জানাইল—"অনেক ধন্যবাদ। এখন কিছু না।

এইমাত্র চা খেয়েই আস্‌চি আমরা। এখন, যে জন্যে এসেচি—সেইটে—"

বিজলী কহিল—"যতীনবাবু সব বলেন নি, কেবল—"

যতীন্ বাধা দিয়া কহিল—"হাঁ, অজিত, আমি শুধু ভূমিকা করে গেছি।"

অজিত কহিল—"তাতে কি হয়েচে? আমি আপনাকে সব বল্‌চি, সেই জন্যেই ত' এলাম।" অজিত এদিক ওদিক চাহিল।

বিজলী অভয় দিল—"আপনি নির্ব্বিঘ্নে বল্‌তে পারেন, মিঃ মল্লিক। এখানে বাইরের লোক কেউ নেই।"

অজিত কহিতে লাগিল—"আমার এক আত্মীয়া কল্‌কাতায় পড়েন—" আকর্ণ অজিতের মুখমণ্ডল লাল হইয়া উঠিল। কাষ্ঠহাসির আবরণে প্রফুল্লতার যে অভিনয় সে করিতেছিল, হঠাৎ তাহা খসিয়া পড়িয়া, বক্তার স্বরূপ কতকটা বাহির হইয়া পড়িল।

একটু থামিয়া অজিত পুনরায় কহিতে লাগিল—"তাঁর এই—ইয়ে—অর্থাৎ—যেন মনে হচ্ছে—বোধ হয়—"

অজিতের দুরবস্থায় বিজলী হাসিয়া ফেলিল। কহিল—"বুঝিচি, বুঝিচি, মিঃ মল্লিক। ক'মাস হল?"

অজিত একটু আশ্বস্ত হইয়া কহিল—"মাস পাঁচেক হবে—কাজেই, বুঝ্‌তেই পার্‌চেন্, এই বেলা এর একটা বিহিত করা দরকার। নৈলে এঁর বাপ-মা শুন্‌লে ত—"

যতীন কহিল—"দেখ' অজিত, তুমি বৃথা ভূমিকা করে সময় নষ্ট কর' না। যা-বল্‌বার, যা-করবার চটাপট্ সেরে নাও।"

অজিত অপ্রতিভ ভাবে কহিল—"তাইতো কর্‌চি! এঁকে সব ব্যাপারটা বল্‌তে হবে ত?"

বিজলী গম্ভীরভাবে ভাবিতে লাগিল। অজিত কিঞ্চিৎ অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এই বিপদ থেকে এঁকে উদ্ধার করুতেই হবে—"

বিজলী প্রশ্ন করিল—"ইনি আপনার কে হন?"

অজিত ঢোক গিলিয়া, থামিয়া থামিয়া কহিল—"আমার একজন খুব নিকট আত্মীয়া ঃ অর্থাৎ, আমার মায়ের পিস্তুতো ভাইয়ের মাস্‌শ্বশুরের শালাজের ভাগ্নী—কিনা, আমার কাজিন্—বোন্—নাম কল্পনা।"

যতীন গম্ভীরভাবে কহিল—"ওঃ, খুবই নিকট সম্বন্ধ। তারপর?"

অজিত কহিতে লাগিল—"আমি থাকি দিল্লীতে। আমায় এ খুব ভালবাসে—ছোটবেলা হ'তে আমার এ বড্ড ন্যাওটা—বিপদে পড়ে তাই টেলিগ্রাম করে আমায় আনিয়ে, এই সব ব্যাপার বল্‌লে। কি করি বলুন? বাঁচাতেই হবে এখন! মানুষ মাত্রেই ভুল করে—"

বিজলী ও যতীন একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় করিল।

বিজলী কহিল—"তাহলে এখন এই ব্যাপারটা আমারই কোনও আত্মীয়ার বলে, শেষ করুতে হবে। কেমন?"

অজিত উৎসাহিত এবং উল্লসিত হইয়া কহিল—"বাস, বাস। খরচ পত্রের কথা আপনি মোটেই ভাববেন না। ভাল ডাক্তার, ভাল নার্স, চাকরবাকর, যা আপনার দরকার, আমায় খবর দেবেন্—সব ব্যবস্থা আমি করুব। আমার একজন সরকার আপনার কাছে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা আস্‌বে, যখন যা দরকার, তাকে বল্‌লেই, তখ্‌খুনি সে তা হাজির করুবে। আপনি শুধু আমাদিকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে' দিন—এই আমার ভিক্ষা, সুদক্ষিণা দেবী—"

বিজলী শিষ্টাচাররক্ষাকল্পে কহিল—"এত বল্‌বার কোনও দরকার নেই

মিঃ মল্লিক। যতীনবাবু আমায় যখন বলেছেন, আর আমি যখন একবার রাজীও হয়েছি, তখন যা' থাকে অদৃষ্টে, আপনার এ কাজ সুসম্পন্ন করতে চেষ্টার আমি কোনও ত্রুটিই করব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন্।"

অজিত কপালের ঘাম মুছিল। তাহার মুখে এতক্ষণে প্রকৃত প্রসন্নতার ছাপ ফুটিয়া উঠিল।

অজিত কৃতজ্ঞতা-গদগদভাবে কোটের ভিতরের পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া, সম্মুখস্থ টীপয়ে রাখিয়া কহিল—"আপনার এ ঋণ শোধ করা যাবে না, জানি, তবু আপাতত এই পাঁচশো আপনি রাখুন। বাকীটা কয়েকদিন পরে সরকারের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব।"

বিজলী নোটগুলির পানে একবার লোলুপদৃষ্টি দিয়া ঔদাসীন্যের অভিনয় করিয়া কহিল—"আমার কাছে একটি ছেলেকেও রাখ্‌ব, মনে করৃচি। একজন জানা বিশ্বাসী লোক তো আমার চাই। আমি স্ত্রীলোক—সময়-অসময় দরকার হতে পারে তো।"

"নিশ্চয়—নিশ্চয়—তাতো চাইই। তা বেশ, সে রকম লোক আপনার আছে কি?" উৎসাহিতভাবে অজিত জিজ্ঞাসা করিল।

যতীন কহিল—"আছে বৈ কি! আরে, আমাদের নটহস্তীই তো রয়েচে। সে খুব কেলেবার ছোক্‌রা অজিত, সে এইখানেই থাকে। সুদক্ষিণা দেবীর সে আবার ধর্ম্মভাই।"

অজিত আর কয়েকখানা নোট বাহির করিয়া, টীপয়ে রাখিয়া কহিল—"খুব ভাল কথা। তা'হলে তাঁকেও এই একশো টাকা দেবেন।"

ভূষণ ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল। পুলকাতিশয্যে সে ছুটিয়া গেল ইহাদের জন্য চায়ের বন্দোবস্ত করিতে।

যতীন কহিল—"আসল কথাটা তো এখনও বল্‌লে না, অজিত। ধর্ম্মতলায় একটা ভাল ফ্ল্যাটও এইমাত্র ভাড়া করে এলাম। এক-আধ মাস নয়, একেবারে ছ'মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে দেওয়া হয়েচে! এর কম তারা নাকি ভাড়াই দেয় না। আচ্ছা বাবা, গরজ বড় বালাই।"

অজিত কহিল—"সত্যি যতীন, সে কথাটা আমি ভুলেই গিছলাম। এই যে রশীদ, এটা আপনি রেখে দিন্। আপনারই দরকারে লাগ্‌তে পারে। তা'হলে, কাল কি পরশু আপনারা সেখানে চলুন্—কল্পনাকে একেবারে সেইখানেই নিয়ে গিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। এর মধ্যে ডাক্তার নার্স'ও আমরা ব্যবস্থা করে ফেল্‌চি। তাহ'লে আজ উঠ্‌লাম—"

অজিতের পিছু পিছু যতীনও আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল। ভূষণ ছুটিয়া আসিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল—"ও ঘরে চা তৈরি, সার—"

বিজলী অতিথি দুইজনকে কক্ষান্তরে যাইতে অনুরোধ করিল।

যাইতে যাইতে যতীন কহিল—"দেখ' দেখি! নটহস্তী যার নেই, তার কেউ নেই! তারপর ম্যাষ্টোর! অনিন্দিতায় তোমার কিসের পার্ট?"

ভূষণ পুলকে আত্মবিস্মৃত হইয়া নিবেদন করিল—"আজ্ঞে সার, জমিদারের পাট সার। আমার ডাইনোক্‌গুনো সার্—আপনাকে ঠিক করে দিতে হবে, সার।"

চা পান করিতে করিতে যতীন কহিল—"নিশ্চয় দেব! তোমার মত ফ্যাক্টো কেলাশ য্যাক্টারের কি কোন পার্ট আটকায় নাকি?"

যথারীতি সম্ভাষণাদি করিয়া অতিথি দুইজন বিদায় লইলে, ভূষণকে একশত টাকার নোটগুলি দিয়া বিজলী কহিল—"শুনলে তো সব?"

ভূষণ সভয়ে কহিল—"শুন্‌লাম তো দিদিমণি। কিন্তু ব্যাপারটা যে বড় সঙীন—"

বিজলী অভয় দিল—"কোনো ভয় নেই। আর শুন্‌লে তো, ছ'মাসের জন্যে ফ্ল্যাটও ভাড়া নেওয়া হয়েচে। এইবার তুমি দেশে গিয়ে টেঁপীকে নিয়ে এস—আর কি?"

আনন্দাতিশয্যে ভূষণের গণ্ড বাহিয়া পুলকাশ্রু ঝরিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার বাঙনিঃসরণই হইল না। একেবারে একশো টাকার নোট হস্তগত, আর অন্যদিকে ছয় মাসের মত ফ্ল্যাটের ভাড়াও শোধ! সাহেবরা যেখানে থাকে, সেই ধর্ম্মতলায় বাস—টেঁপীর সঙ্গে! স্বপ্ন নয় তো? ভূষণ একদিন মর্ম্মান্তিক দুঃখে এই দিকেই বাস করিবার কল্পনা করিয়াছিল।

ভূষণ ভাবিল, সে যাহাই মনে করে, তাহাই যে ফলে! এতো খুব আশ্চর্য্য! তাহা হইলে সে বড় যে-সে লোক নয়। সে কোনও সিদ্ধ পুরুষ কিম্বা স্বর্গের কোনও দেবতা, অভিশপ্ত হইয়া, ভূষণরূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয় নাই ত?

বিহ্বলভাবে ভূষণ কহিল—"কিন্তু দিদিমণি, টেঁপীকে তো একলা আনা যাবে না! টেঁপীকে আন্‌তে হ'লে, তার ভাই তিনটেকে না-ও যদি আনি, তার মা আর বোন্ দুটোকে তো আন্‌তেই হ'বে।"

বিজলী কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বোন্ দুটোর বয়স কত? দেখ্‌তে কেমন?"

ভূষণ সোৎসাহে জানাইল—"বয়েসকালে সে দুটোও টেঁপীর মতনই সোন্দর হবে, দিদিমণি। মেজোটার বয়েস বছর বারো, আর ছোট্টটা হবে বছর দশেকের।"

বিজলী গম্ভীরভাবে কহিল—"তা বেশ! তাদিকেও আনো। গাড়ী ভাড়ার টাকাটা তো জোগাড় হল, ছ'মাসের মত আপাতত আস্তানাও হল। তার পর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। আনো তো আগে। মেয়েগুলো দেখ্‌তে সত্যি ভাল তো? দেখো—নৈলে মুস্কিলে পড়্‌বে, ভূষণ।"

ভূষণ ভাবিয়াছিল, এ একশো টাকা তাহার পূরাপূরিই ডাকঘরে জমা হইবে, দিদিমণি নিজ তহবিল হইতে ইহাদের রাহা খরচটা দিবে। কিন্তু বিজলীর প্রস্তাব অন্যরূপ দেখিয়া, ভূষণের মনটা একটু ছোট হইয়া গেল। অথচ, কিছু বলিতেও পারে না। কি জানি, যদি চটিয়া উঠে? রাগিয়া এ টাকাগুলিও যদি কাড়িয়া লয়? কাজ নাই। ভূষণ না হয়, বিনা টিকিটেই যাতায়াতের একটা ফিকির ঠাওরাইবে।

ভূষণ একটু অপ্রসন্ন এবং অন্যমনস্কভাবেই উত্তর দিল—"দেখে লেবেন্‌ আপনি দিদিমণি, তারা সোন্দর কি না। তাদের গায়ের রং মেমসায়েব-দের মতন ধব্‌ধবে, আর মুখচোখও দেখ্‌বেন্—যেন মা জগদ্ধাত্রী ঠাকুরুণ হাস্‌চেন্‌।"

বিজলী কহিল—"তা হ'লে কালই ওখানে যাবার সব বন্দোবস্ত কর। ও বাড়ীতে উঠে, তুমি যাবে তোমাদের দেশে। স্থবোধবাবুকে বল্‌বে, আমার সঙ্গে তুমি আমাদের দেশে যাচ্ছ।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

মহানগরী কলিকাতা।

এখানে পীচঢালা সুপ্রশস্ত নিয়তসম্মার্জ্জিত নির্ম্মল বিদ্যুদালোকিত পুলিশপ্রহরীপরিবেষ্টিত রাজপথও যত, আইন এবং শৃঙ্খলারক্ষার প্রয়াসও তত। এখানকার রাস্তা যত নির্ম্মল, ময়লাও তত বেশী; পথে আলোও যত, অন্ধকারও তার চতুর্গুণ; পুলিশের পাহারাও যত কড়া, কুক্রিয়ার মাত্রাও তত চড়া। তবু, আত্মগোপনের নিরাপদ স্থানও এখান হইতে আর অন্য কোথাও বেশী নাই এবং বে-আইনী অনৈতিক ও অ-সামাজিক দুষ্ক্রিয়াও এখান হইতে অন্য কোথাও বেশী ঘটে না।

বিজলী নিরুপদ্রবে ধর্ম্মতলার ফ্ল্যাটে আসিয়া উঠিল। ভূষণ পরদিনই পরমোল্লাসে চৈতনপুর যাত্রা করিল। বিজলী নূতন ঠাকুর চাকর প্রভৃতি লইয়া, নূতন সংসার পাতিয়া, নবঅর্জ্জিত ভগিনীর সহিত নিরাপদে বসবাস আরম্ভ করিয়া দিল। এই দক্ষিণ-অভিযানের সঙ্গে সঙ্গেই বিজলী আর বিজলী রহিল না, সে হইল সুদক্ষিণা দেবী।

বেলা প্রায় ৪টা। গত চারিটি দিন ও রাত্রি জীবনমৃত্যুর দোলায় দুলিয়া, মাত্র গতকল্য হইতে কল্পনা জীবন-পারে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। শহরের দুইজন বড় ডাক্তার ও দুইজন নার্সের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও চেষ্টায় এবং বিজলীর অশ্রান্ত সেবায়, কল্পনা এ যাত্রা রক্ষা পাইল: বাঁচিবার কোন আশাই তাহার ছিল না। বিজলীও এই চার দিন অনভ্যস্ত অনাহারে এবং অনিদ্রায় অসুস্থপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। আজ দিনে একটু ঘুমাইয়া, কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল।

সকাল হইতে একজন নূতন নার্স আসিয়াছে। এ দিবারাত্র থাকিবে, রোগিনীর শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান, দুইই করিবে। ইহার দৈনিক বেতন ত্রিশ টাকা এবং দুই বেলা আহার চা জলখাবার ধোপা প্রভৃতি।

বিজলী রোগিনীর ঘরে একবার উঁকি মারিয়া, দেখিল—কল্পনা নিদ্রিত: অর্দ্ধশুষ্ক বিবর্ণপীতাভ এক রাশি চাঁপাফুলের মত, কল্পনার মুখখানা শুধু খোলা, সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত। অত্যন্ত দুর্ব্বল, কথা কহিতেও অপারগ। অধিকাংশ সময়ই সে চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া থাকে, মাঝে মাঝে দুই একবার চায়—একটা গভীর লজ্জা, অজ্ঞাত আশঙ্কা, অব্যক্ত সঙ্কোচ এবং অপ্রকাশ্য আত্মগ্লানিতে তাহার দুর্ব্বল ও কাতর চাহনিটি পরিপূর্ণ। সে যেন বাঁচিতে চায় না, মরিলেই সমধিক সুখী হইত। বিজলী তাহার দৃষ্টির মধ্যে তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলটি পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখিতে পায়। বিজলীর মন সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠে। খানিক পরেই তাহার উপর জমা হয় বিজাতীয় ক্রোধ এবং দুরন্ত বিদ্বেষ। একবার বিজলী চায়—কল্পনা বাঁচুক, নিরাময় হউক; কিন্তু যেমনি ভাবে, কেবল অর্থের জোরেই এ পুনরায় কুলবধূ সাজিয়া, পতিতাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে, অমনি বিজলীর মনে বিদ্রোহের লাল নিশান মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। মনে পড়ে, তাহারও এমনি সঙ্কট একদিন আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার অর্থবল না থাকাতেই, সে আজ এখানে।

নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বিজলী আবার বিছানায় শুইল। মধ্যে একটি দেওয়াল—একদিকে বিজলী, অন্য দিকে কল্পনা ও নার্স। বিজলীর মন ও-ঘরের আলোচনাতেই পরিপূর্ণ।

এই নূতন নার্সটির কথা মনে পড়িল। ইহার বয়স ২৫।২৬,

বিজলীরই সমবয়স্কা। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কিন্তু মুখটি সত্যই বড় সুন্দর: এমন নিখুঁৎ মুখ বিজলী বড় বেশী দেখে নাই। ইহার কাছে কল্পনার গৌর মুখমণ্ডলও যেন নিস্প্রভ। পরণে সরু কালা পেড়ে একখানা ধুতি, গায়ে একটা শাদা শেমিজ। দুই হাতে দুই গাছা সরু সোনার চুড়ি, গলায় একটা মফ্‌চেন, হারে একটা গোল লকেট। লকেটটা বেমানান-রকমের বড়, যেন জুঁই ফুলের মালায় একটা স্থলপদ্ম।

নার্সটির নাম নিটু। ইহার অধিক সে কোনও পরিচয় দেয় নাই। বিজলীও জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে নাই। বিজলী একটু বিস্মিত হইল, এ-ও তো ইহাদের কোনো পরিচয় চাহিল না! অদ্ভুত স্ত্রীলোক! নার্সটি অত্যন্ত স্বল্পভাষিনী, মুখমণ্ডল গম্ভীর, চোখ দুইটি রহস্যাবৃত—চাহনি সভয় ও সতর্ক, হরিণীর মত চকিত। মেয়েটি গম্ভীর, কিন্তু ব্যবহার বড় মিষ্ট এবং অমায়িক। ইহার কথাবার্ত্তা এমন একটা শালীনতা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, যাহা সচরাচর নার্সদের মধ্যে দুর্ল্লভ। ইহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠাও অক্লান্ত এবং দায়িত্বশীল। বিজলী বহু চেষ্টা করিয়াও ইহার রহস্যময় দুর্ভেদ্য আবেষ্টনীর এতটুকু অপসারণ করিতে পারিল না। যখনি দেখে, সে কিছু-না-কিছু করিতেছে। যেন সে বিজলীকে এড়াইবার জন্যই, কাজ খুঁজিয়া কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে চায়। বিজলীর কৌতূহলও ক্রমশ বাড়িতে থাকে।

চাকর চা দিয়া গেল। বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"নার্স মেম্‌সাব্‌কো চা দিয়া?"

চাকর কহিল—"উন্‌কো তো তিনে বাজে দেইনি—মা-জী!"

বিজলী রোগিনীর ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। কল্পনা চাহিয়াছিল,

বিজলীকে দেখিয়া চোখ বুজিল। বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"কৈ চা-টা খান্ নি এখনও? ভাল হয় নি বুঝি?"

নার্স কহিল—"এই যে হাতের কাজটা সেরে নি আগে—পাঁচটা বাজ্‌ল', অষুধ দেবারও সময় হল।"

বিজলী নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল: ঔষধ খাওয়াইয়া, মুখ মুছাইয়া, বিছানার চাদর ও রোগিনীর শাড়ী বদ্‌লাইয়া, মাথার চুল আঁচড়াইয়া দিয়া, ষ্টোভ জ্বালিয়া গরম জল বসাইয়া, চার্ট লিখিয়া, ঘরের মেঝেটি ঝাড়ু দিয়া, কলে হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া নিটু যখন বসিল, তখন ছয়টা।

বিজলী ভৃত্যকে ডাকিয়া, ভাল করিয়া আর এক পেয়ালা চা আনিতে বলিল। নার্স কহিল—"থাক, আর এখন চা খাব না।"

ভৃত্য আসিয়া জানাইল—"ডাংদার সাব এসিয়েছে, মাইজী।"

বিজলী দ্রুত বাহিরে আসিয়া ডাক্তার চৌধুরীকে অভ্যর্থনা করিয়া, কল্পনার ঘরে লইয়া আসিল। ডাক্তারবাবু রোগিনীকে পরীক্ষা এবং জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া মত প্রকাশ করিলেন—"খুব ভাল আছেন। কোনও ভয় নেই। তবে দেখ্‌বেন্, সুদক্ষিণা দেবী, আপনার ভগিনী যেন বেশী নড়াচড়া না করেন। এখন কেবল বলকারী পথ্য আর বিশ্রাম। আসল কথা কি জানেন, মা লক্ষ্মী, অষুধ-ফষুধ কিছুই নয়, প্রকৃতি নিজের কাজ নিজেই করে। অষুধ ঐ প্রকৃতিকেই যৎসামান্য সাহায্য করে মাত্র। আরে বাপু, অষুধে যদি রোগ ভাল হত, তাহ'লে ধন্বন্তরী চরক সুশ্রুতের আর মৃত্যু হত না।" বলিয়া ডাক্তারবাবু নিজের আনন্দে নিজেই হাসিয়া আকুল।

"প্রকৃত অষুধ হচ্ছে সুনিদ্রা, নিশ্চিন্ততা, বিশ্রাম আর পথ্য। দেখি, নিটু, তোমার চার্ট?"

নিটু চার্টখানি দিল। ডাক্তারবাবু দেখিয়া ফেরৎ দিয়া কহিলেন—"ভালই আছেন। তারপর, তোমার কোনো অসুবিধা হয়নি ত' নিটু?"

নত মুখে আস্তে করিয়া নিটু উত্তর দিল—"আজ্ঞে না, সার্—"

ডাক্তার উঠিয়া নার্সকে কহিলেন—"তা' হলে এই অষুধই চলুক্। এইটেই এখন দিন দশেক চল্‌বে। প্রেস্‌ক্রপশনটা আছে ত'?

নিটু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—আছে।

—"যদি দরকার হয়, আমায় ফোন্ কর'। দরকার হবে না—তবে বলা তো যায় না, কখন কি হয়—"

বলিতে বলিতে ডাক্তারবাবু কক্ষ হইতে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিজলীও ইঁহার অনুগমন করিয়া, নিজের কক্ষে ডাকিয়া বসাইয়া, ভৃত্যকে চা দিতে বলিয়া, কহিল—"প্রথম দিন দেড় হাজার দিয়েছি, বাকী টাকাটা তাহলে নিয়ে যান্ আজ—" বলিয়া দেওয়াল-আলমারিটি খুলিয়া, এক হাজার টাকার নোট বাহির করিয়া দিল।

ডাঃ চৌধুরী নোটগুলি গণিয়া, সযত্নে কোটের ভিতর-পকেটে রাখিয়া, নিশ্চিন্ত আরামে ঝঁাকিয়া বসিয়া কহিলেন—"বহু ধন্যবাদ। যখনি দরকার পড়্‌বে, আমায় খবর দেবেন। আমার সহকারীদের সুদ্ধ, আমার ফী এই আড়াই হাজারই—তবে যদি কেউ অসমর্থ হয়, তাহলে কি আমি দেখব না? আমি চিকিৎসক, আমার কর্ত্তব্যই এই—নিশ্চয়ই দেখ্‌ব। আমার কি কোনও আক্কেল নেই? লোকের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা না করলে কি ব্যবসা চলে? কি বলেন মা?"

ডাঃ চৌধুরীর বয়স প্রায় ৫৫।৫৬—বেশ দোহারা চেহারা, ছোট একটি ভুঁড়ি। কাঁচা-পাকা চুল ও গোঁফদাড়ি। দেখিলে অন্তরে যেমন একটা শ্রদ্ধা আসে, তেমনি মনে হয়, লোকটি ভয়ানক চালাক। কথা ইনি একটু বেশী বলেন বটে, তবে অনেক ক্ষেত্রে লোকের উপকারও করেন। গুপ্ত চিকিৎসায় ইহার হাত যশ খুব।

বিজলী কহিল—"তাতো ঠিক। তবে কল্‌কাতার ডাক্তার কব্‌রেজরা তা করেন কৈ? রোগী বাঁচুক আর মরুক্, তাঁদের পূরো ফী হলেই হল।"

ডাঃ চৌধুরী উৎসাহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন—"আপনি ঠিক বলেছেন, সুদক্ষিণা দেবী! এরা শুধু আমাদের ব্যবসারই শত্রু নয়, মানুষেরও শত্রু! এদের জন্যেই কল্‌কাতায় সাধারণ গেরস্ত ঘরে আজকাল এত বেশী লোক মরে। ঐ যে একটু-আধটু জানে, একটু নাম হয়েচে—আর কি? দাও টাকা! এদের টাকার খাঁকৃতি, রোগের চেয়েও মারাত্মক! অর্থাৎ রোগের অচিকিৎসায় বা কুচিকিৎসায় রোগী একাই মরে, কিন্তু বড় ডাক্তারের চিকিৎসায়, সপরিবারে গেরস্তরও অপমৃত্যু ঘটে! এই জন্যেই ত' সহরে দিন দিন হাতুড়ে ডাক্তার আর বাজে পেটেণ্ট অষুধের সংখ্যা এত বাড়্‌চে।"

বিজলী সমর্থনসূচক মাথা নাড়িল।

ডাঃ চৌধুরী কহিতে লাগিলেন—"সেদিন দীপিকা কাগজের সম্পাদক আমায় একজন নামকরা ডাক্তারের সম্বন্ধে যা' বল্‌লেন্, তাতে লজ্জায় আমার মাথা ঝুলে পড়্‌ল—আমি একটি কথাও বল্‌তে পার্‌লাম না।"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"কি বল্‌লেন?"

ডাক্তারবাবু কহিলেন—"তাঁর মেয়ের টন্‌সীল্‌ কাটাতে তিনি এক হাঁসপাতালে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোক দস্তুরমত বেড্‌ ভাড়া দিয়ে মেয়েকে রেখেচেন, ছোট মেয়ে। এক হপ্তা যায়-যায় ডাক্তারসাহেবের সেদিকে খেয়ালই নাই। আজ-নয়-কাল, কাল-নয়-পরশু করেন, আর আউট-ডোরের দু'চারজন রোগী দেখে বাড়ী চলে যান্‌। এদিকে মেয়েটিও অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। শুধু শুধু কি কেউ দিবারাত্র রোগীদের কাছে হাঁসপাতালে বাস কর্‌তে পারে ? এতে যে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়ে—এ কাণ্ডজ্ঞানটা সে ঈডিয়টের নেই ? আর ভদ্রলোকের অকারণ লোকসান করিয়েই বা তোর লাভ কি ? জানেন তো, হাঁসপাতালে অপারেশনের ফীও পঁচিশ টাকা দিতে হয় ? যাই হোক, তিনি বললেন, এমন অসভ্য ঐ ডাক্তারটা যে, দেখা হলেই তিনি তাঁকে নমস্কার করেন, কিন্তু ডাক্তারসাহেবের এটুকু ভব্যতাজ্ঞান নেই যে, নমস্কার করলে, তাঁকে প্রতিনমস্কার করতে হয়। হোক না অপরিচিত, একজন ভদ্রলোক ত ? অহঙ্কারে তিনি এমনি আত্মহারা যে, ভদ্রলোকটি একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলেন, ঠিক কবে তিনি তাঁর মেয়েকে দেখবেন ! আশ্চর্য্য, লোকটা তাঁকে একটা জবাব দেওয়াও প্রয়োজন মনে করল না ? দেখুন্‌ দেখি ব্যাপার—এই লোক ডাক্তার ? এরা ভুলে যায়, এদের বেতন দেন এঁরাই ! এঁদের চিকিৎসা করবার জন্যেই তাঁকে রাখা, লাটসাহেবী মেজাজ দেখাবার জন্যে নয়। কি বলব বলুন ? আমাদের দেশের লোকও যে সব কাপুরুষ ! সম্পাদক মশায়ের উচিত ছিল, সেই ঈডিয়টটার গালে তখনি ঠাস করে বিরাশী-সিক্কা ওজনের এক রাম-চড় কষে দিয়ে,

তাকে শিক্ষা দেওয়া। 'দূর হোক্ গে ছাই—কে অত ফৈজতে যায়?' বলে' লোকে যতই এগুলো গায়ে মাখে না, এই সব খুদে-লাটেরা ততই আস্কারা পায়—"

বিজলী কহিল—"এত অভদ্র এরা?"

ডাঃ চৌধুরী কহিলেন—"আজ্ঞে হাঁ। এদের জন্যেই তো এ দেশে ভদ্রলোক কেউ পারত-পক্ষে হাঁসপাতাল-মুখো হয় না! অথচ ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য সব দেশেই, অসুখ হলে লোকে তৎক্ষণাৎ হাঁস-পাতালেই যেতে চায়, যায়ও। কারণ, হাঁসপাতালে চিকিৎসা আর শুশ্রূষা, বাড়ীর চেয়ে ঢের ভাল হয়। গরীব আর বড়লোক সেখানে ভেদ নেই।"

বিজলী নিবিষ্ট মনে শুনিতেছিল।

ডাঃ চৌধুরী বলিয়া যাইতেছিলেন—"আমি কিন্তু, মা, তা পারি না। এই সেদিন আসাম থেকে একজন ষ্টেশনমাষ্টার, তার এক আইবুড়ো মেয়েকে নিয়ে এসে, আমার দুটি-পা জড়িয়ে ধরে বললে, বাঁচান ডাক্তারবাবু! অতিকষ্টে এই পাঁচ-শো টাকা এনেচি—আমি ছা-পোষা লোক—। আমি তৎক্ষণাৎ তাকে অভয় দিলাম। মেয়েটি বেশ সেরে উঠেচে। এই ক'দিন হল দেশে ফিরে গেছে।"

বিজলী প্রশংসাসূচক মৃদু হাসিয়া কহিল—"সব ডাক্তার যদি আপনার মত হত—"

ডাক্তারবাবু আর একটু ভাল করিয়া বসিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কহিতে লাগিলেন—"কি জানেন সুদক্ষিণা দেবী? ভালর কাল নেই। পুলিশের অত্যাচার বড্ড বেড়েচে। একটু সন্ধান পেলে হয়! বাস্—অমনি শ্রীঘর। আরে বাপু, এ-যে কত বড় পরোপকার আমরা করি—"

বিজলী সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া কহিল—"নিশ্চয়, পরোপকার বলে' পরোপকার? একটা মেয়ের সমস্ত জীবন, একটা পরিবারের ইজ্জৎ, সুখ, শান্তি—সব রক্ষা হয় আপনাদের দয়ায়—"

ডাঃ চৌধুরী কহিলেন—"আপনি বুদ্ধিমতী, আপনি বোঝেন। তাই আপনার সঙ্গে আলোচনা করে বড় আনন্দ পাচ্ছি! এ-সব কথা নিয়ে তো যার-তার সঙ্গে আলাপ করা যায় না! এই দেখুন, আমরা কখনও বলি না, তোমার রোগ হোক্। বরং রোগ হলে আমরা রোগ সারাই। কিন্তু দেহ থাকলে রোগ যেমন হবেই, তেমনি বেঁচে থাকতে হলে ভুল মানুষ করবেই। দোষে-গুণেই তো মানুষ—মানুষ! তা নৈলে তো আমরা এতদিন সবাই এক-একজন রামকেষ্ট পরমহংসই হয়ে উঠতাম। য়্যাঁ? কি বলেন, সুদক্ষিণা দেবী?"

বিজলী স্মিতহাস্যে কহিল—"নিশ্চয়।"

ডাঃ চৌধুরী নিজের অকারণ উচ্চহাস্য সম্বরণ করিয়া কহিলেন—"অল্পবিস্তর অন্যায় আমরা সবাই করি, প্রতিনিয়তই করছি। তাই বলে', আমি যা করিনি, আর একজন সেইটে করেচে বলে'—সে হবে মহাঅপরাধী? আর সে পাবে চরম সাজা? এ ভারী অন্যায়। ধরুন, রামের চেয়ে শ্যাম গুরুতর দোষে দোষী, কিন্তু যেহেতু শ্যামের হাতে দণ্ড দেবার ক্ষমতা আছে, সেই জন্যে শ্যাম শাস্তি দেবে রামকে? এ অসহ্য! নয় কি?"

বিজলী স্বীকার করিল—"ঠিক তো।"

ডাক্তারবাবুর মুখমণ্ডল উৎসাহে ও উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিলেন—"আমি সামাজিক এই সব পক্ষপাতিত্ব আর অবিচারের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, সমাজের মঙ্গল করতে চাই। আমি চাই—ভ্রান্ত নারী নবজীবনে বেঁচে উঠুক ; তার প্রথম ভুলের সংশোধন করে দিয়ে, তাকে সতর্ক শুদ্ধতর জীবনারম্ভের সুযোগ দিতে চাই। নবীন অভিজ্ঞতায় সে প্রলোভনকে জয় করুক, সংসারকে চিনুক। সংসারের মুখোস-খোলা আসল স্বরূপের সঙ্গে তার সত্যিকারের পরিচয় হোক্। এতে সমাজের কল্যাণ হবে। অতি-পরিচিত নিত্য-চলার পথে পথিক চলে—পথ না দেখে, আর অন্যমনস্ক হয়ে। কিন্তু অভ্যস্ত পথেও কাঁটা এসে পড়ে তো মাঝে মাঝে! তাই একবার হোঁচট খেলে, পথিক সাবধানী হয়ঃ হয়ত, পথিপার্শ্বের অন্ধকূপে পড়্তে পড়্তেও একদিন বেঁচে যেতে পারে। নয় কি ?"

বিজলী একটু অন্যমনস্কভাবে কহিল—"তাতো ঠিক।"

. হঠাৎ একটা ঘটনা মনে পড়িয়া, ডাক্তারবাবুর নিঃশেষপ্রায় উৎসাহ-স্রোত প্রবল বেগে আবার বহিতে আরম্ভ করিল। তিনি কহিলেন —"একটা ভারী মজার ঘটনা বলি শুনুন্। সেদিন আমাদেরি একটা সভায়—ডাঃ পাকৃড়াশীর নাম শুনেছেন ত ?"

বিজলী জানাইল, শুনিয়াছে।

"সেই সভায় শহরের ছোট-বড়-মাঝারী প্রায় সব ডাক্তারই উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ পাকৃড়াশী খুব উৎসাহের সঙ্গে বল্‌চেন—বর্ত্তমান যুগে আমাদের ছেলেমেয়েদের নৈতিক চরিত্রের অবনতি সম্বন্ধে। এই প্রসঙ্গে তিনি বল্‌লেন—সমাজে গুপ্ত ব্যভিচারের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেচে, কারণ, এই শহরে এমন কতকগুলি কাণ্ডজ্ঞানহীন অর্থপিশাচ ডাক্তার আছে, যারা গোপনে এই সব কুপথচারিণী মেয়েদিকে সাহায্য করে।

তিনি চান, এই সব ডাক্তারকে সরাসরি কালাপানি পাঠাতে। সকলেই তাঁকে উৎসাহ দিয়ে 'সাধু, সাধু' শব্দে সভা মাৎ করল। আমার কিন্তু সহ্য হল না। আমি তাঁর প্রতিবাদ কর্‌লাম—"

বিজলী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি বলে' প্রতিবাদ কর্‌লেন্ ডাঃ চৌধুরী?"

ডাঃ চৌধুরী বলিলেন—"আমি বললাম, এ আপনার অন্যায় কথা, ডাঃ পাক্‌ড়াশী—সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সভার লোকেরা তো আমায় মারে আর কি? আমি তাদিকে ঠাণ্ডা করে বল্‌লাম—চিকিৎসকের কাজই চিকিৎসা করা। কোনও কুমারী বা বিধবাকে অবৈধ মাতৃত্বের কলঙ্ক হ'তে রক্ষা করাও, ডাক্তারেরই কাজ। চরিত্রহীনতানিবন্ধন বহু অর্জ্জিত রোগের চিকিৎসা করা যদি অন্যায় না হয়, বা চরিত্রহীনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া বলে বিবেচিত না হয়, তা হলে চরিত্রহীনা নারীকে অনভীপ্সিত অবস্থার থেকে উদ্ধার করাও চিকিৎসকের অকর্ত্তব্য নয়! দুশ্চরিত্র পুরুষের কুৎসিত ব্যাধির চিকিৎসা দ্বারা কি প্রকারান্তরে তাকে সাহায্য করা হয় না? চরিত্রহীনতা আমি সমর্থন করি না বা কেউই করে না। কিন্তু পুরুষের বেলায় হয় চিকিৎসকদের ব্যতিক্রম। যে-চরিত্রহীনতায় পুরুষের উক্ত রোগ জন্মায়, সেই চরিত্রহীনতার জন্যেই স্ত্রীলোকের অন্য কিছু হয়। কিন্তু, শাস্তি পাবার বেলায় একমাত্র নারীই শাজা পাবে? এ ভয়ানক অন্যায়। শাজা দিতে হয়, দু'জনকেই দাও, না হয়, কাউকেই দিও না। ডাক্তার তো শাজা দেবার মালিক নয়, সে যে দেয় দিক্। ডাক্তার কেন এ সব কথা বল্‌বে? তাহলে আমি বল্‌ব—কুমারীদের সাহায্য

করায় যদি সমাজে চরিত্রহীনতা বৃদ্ধি পায়, তাহলে দূষিত ঐ সব রোগের চিকিৎসার দ্বারাও পুরুষের দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, যার জন্যে কুমারীরা হয় এমন বিপন্ন।”

বিজলী কহিল—“মাফ করবেন ডাঃ চৌধুরী, আপনার এ যুক্তি আমি মানতে পারলাম না। সমাজরক্ষায় এ যুক্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য।”

ডাক্তারবাবুর সব উৎসাহ ইলেক্‌ট্রিক্ ফিউজের মত দপ করিয়া নিভিয়া গিয়া, মুখখানা হঠাৎ অন্ধকার হইয়া গেল। একটু অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কেন?”

বিজলী কহিল—”আপনি আমার বাপের বয়সী, আপনার সঙ্গে আমার তর্ক করা সাজে না। তবে এর উত্তরে আপনাকে আমি একটি ছোট্ট প্রশ্ন করছি: খুনীকে, ডাকাতকে বা রাজবিদ্রোহীকে কি আপনি রাজার বিচারে ছেড়ে দিতে বলেন? যেহেতু এ তাদের প্রথম অপরাধ, তারা অনভিজ্ঞ বা তাদের আবার সৎভাবে জীবনযাত্রার সম্ভাবনা আছে, বা যে-কাজ করে ফেলেছে, তা আর ফিরবে না, বলে’?”

ডাক্তারবাবু আমতা আমতা করিয়া কহিলেন—“সেটা আর এটা কি এক হল, মা?”

বিজলী কহিল—“একই ডাঃ চৌধুরী। খুন ডাকাতি যেমন, ব্যভিচার ভ্রূণহত্যাও তেমনি সমাজ-শৃঙ্খলার পরিপন্থী। আমার বোনের আপনি চিকিৎসা করলেন। তবুও আমি বলব, আমার বোন্ এবং আপনি উভয়েই সমান অপরাধী। সমাজের আর রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা এবং পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্যেই দণ্ড। দশের যা অকল্যাণকর, তাইই দণ্ডার্হ। অপরাধীর ইতরবিশেষ নেই, অপরাধেরও তর-তম নেই।

এ রকম ক্ষেত্রে পুরুষ, নারী এবং চিকিৎসক তিন জনেরই সমান শাস্তি হওয়া উচিত।"

ডাঃ চৌধুরী অবাক। সবিস্ময়ে ভাবিলেন—এ স্ত্রীলোকটা তো আচ্ছা অকৃতজ্ঞ? এমন ছোটলোক—

ডাঃ চৌধুরীর সব উৎসাহ নিভিয়া গেল। এ আবার কোনও বিপদ বাধাইবে না তো? হয়ত তাহা সাহস করিবে না, কারণ তাহার ভগিনীও এ ব্যাপারে জড়িত। যাহাই হউক, ইহার সঙ্গে এ বিষয় লইয়া আর অধিক আলোচনা নিরাপদ নহে।

অত্যন্ত অপ্রসন্ন ভাবে ডাক্তারবাবু কহিলেন—"আচ্ছা নমস্কার—" বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা পর্য্যন্ত না করিয়া, হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বিজলী বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

কেবল সন্ধ্যা হইয়াছে। ঘুমে তাহার চোখ বুঁজিয়া আসিতেছিল। কোনও রকমে সকাল সকাল দুইটি খাইয়া, শুইতে পারিলে, সে বাঁচে।

ঠাকুরকে তাগিদ দিয়া, সময় কাটাইবার জন্য বিজলী কল্পনার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল।

নিটু একখানা চেয়ার আগাইয়া দিয়া কহিল—"বসুন—"

বিজলী কহিল—"বস্‌ব না ভাই, বস্‌লেই ঘুম পাবে। রান্না হওয়া অবধি কোনো রকমে কাটাতে পার্‌লে বাঁচি—"

নিটু ছোট্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে এতক্ষণ গল্প কর্‌ছিলেন বুঝি?"

বিজলী কহিল—"গল্প আর ছাই। উনি কেবল নিজের বড়াই-ই কর্‌ছিলেন। আমি শুন্‌ছিলাম, আর মাঝে মাঝে দু'একটা কথা যা না বল্‌লে নয়, তাই বল্‌ছিলাম আর কি!"

নিটু একটু হাসিয়া, কল্পনার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কল্পনা কাঁদিতেছিল।

অঞ্চলাগ্রে কল্পনার চোখ দুইটি মুছাইয়া দিতে দিতে নিটু কহিল—"কাঁদবেন না, কল্পনা দেবী—আপনার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, এখুনি মাথা ধরে উঠ্‌বে, আর সঙ্গে সঙ্গে টেম্পারেচারও বেড়ে যাবে—"

বিজলী মমতাবিগলিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, দমন

করিয়া কঠিন হইল। মনে মনে কহিল—কাঁদ, কাঁদ, খুব কাঁদ। দুইদিনও অন্তত কাঁদ। কিছুদিন পরে পুরন্ধ্রী হইয়া তো আর কাঁদিবে না, হাসিবে। এখানকার কথা তখন তোমার মনেও থাকিবে না। তাই একটু কাঁদ'—আমি দেখি, আমার ভাল লাগে, বড্ড ভাল লাগে। আমিও বহু কাঁদিয়াছি। কাঁদিয়া কাঁদিয়া এখন আমার অশ্রুর উৎস শুকাইয়া গিয়াছে। কাঁদিলে এখন আর তাই জল আসে না, আগুন বাহির হয়। অন্তরের বাড়বানলটিই শুধু আছে, সাগর কবে শুকাইয়া গিয়াছে! সাগরগর্ভের লুক্কায়িত শিলাময় গিরিপর্ব্বত আর জন্তু-দানবদের কঙ্কালগুলিই শুধু সেখানে এখন পড়িয়া আছে!

ইহারি মত তাহারও এক পুত্র হইয়াছিল। আজ তাহার মুখ পর্য্যন্ত মনে নাই। বত্রিশ নাড়ীর বন্ধনে দশ মাস বহন করিয়া, তাহাকে কোথায় ছাড়িয়া দিয়াছে! সে যত বড়ই হোক, যত সুখেই থাকুক—বাঁচিয়া থাক্, সুখে থাক্, শতায়ু হোক্—কিন্তু সে আর তাহার পুত্র নয়। নামহীন গোত্রহীন কাহার পুত্র কেউ জানে না, পুত্র নিজেও জানে না! নীহারিকাচ্যুত উল্কাপিণ্ড সে, পৃথিবীর বুকে খসিয়া পড়িয়াছে!

বিজলীর চক্ষু জলভারে সিক্ত হইয়া উঠিল। তাহার অর্থ ছিল না, সহায় ছিল না, তাই তাহাকে কশাইয়ের দোকানের ছাঁচতলায় প্রতীক্ষমান্ মাংসলোভী বিবদমান্ কুক্কুরপালের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় মাংসখণ্ডের মত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

পরম অনুগ্রহে যিনি সেই দুর্দ্দিনে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া সে যে পলাইয়াছিল, সেই পলায়নই হইয়াছে তাহার মৃত্যু-অভিযান। বিজলী তন্ময় হইয়া ভাবিতে লাগিল:

স্বর্ণমৃগের পশ্চাতে ছুটিয়াছিলাম, শরণ ছাড়িয়া স্বর্ণের লোভে; শরণ হারাইলাম, স্বর্ণও মিলিল না। অল্পদিনেই বুঝিলাম, হৈমহরিণ আসলে হরিণই নয়, নিশির ডাক্। সোনার হরিণের আলেয়ায় সীতা বাঁধা পড়িয়াছিলেন অশোক-কাননে; আর আমি পড়িয়াছি কুক্কুর-লোকের কণ্টকিত স্তোক-কাননে। সীতার ভরসা ছিল শ্রীরামচন্দ্র—আমার কি আছে? আমার শুধু নির্জ্জন নিঃসঙ্গ পথ: নিরস্তবল্লরীতরু পথ: দুস্তর মরুবালুকার তপ্ত হিল্লোলিত মরীচিকা-সঙ্কিত পথ: মরণোর্ণনাভের অন্তহীন জ্বালাময় জালাকীর্ণ মহাপথ!

এ এইবার আপন অধিকারে ফিরিয়া যাইবে। কেহই কিছুই জানিবে না। পথভ্রষ্টা রমনীকে দেখিয়া এ-ই আবার ঘৃণায় নাসিকাকুঞ্চন করিবে! ইহার জন্য কিসের সহানুভূতি? কেন সমবেদনা?

এ ঘর আর বিজলীর ভাল লাগিল না। নিজের ঘরে যাইবার অভিপ্রায়ে উঠিয়া দাঁড়াইতেই, বিজলী দেখিল—তিনজন ঝাঁকামুটে তিনটি ঝাঁকা-ভরা বহুবিধ দ্রব্যসম্ভার লইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। পিছনে দামী সিগারেটের টিন হাতে অজিত।

ভাঁড়ার-ঘরটি দেখাইয়া দিয়া, বিজলী অজিতকে নিজের কক্ষে বসাইয়া কহিল—"এইমাত্র ডাঃ চৌধুরী তাঁর ফীর বাকী হাজার টাকা নিয়ে গেলেন। উঃ—লোকটা কি বাজে বক্‌তে পারে! সেই থেকে বকর্-বকর্ করে' আমার মাথা ধরিয়ে দিয়ে গেছে, মিঃ মল্লিক।"

অজিত সহাস্যে কহিল—"লোকটা বকে একটু বেশী বটে, কিন্তু মানুষটা বড় ভাল। এ সব কাজে ওর বেশ হাতযশও আছে। তারপর? বেশ খুশী হয়ে গেছে ত'?"

বিজলী কহিল—"খুশী না হবার কি কারণ আছে? যা বলেছিল, সেই আড়াই হাজারই তো পেল। টাকাটা তো নেহাৎ কম নয়?"

পুলকলঘু মনে অজিত কহিল—"চলুন না সুদক্ষিণা দেবী, একবার ও-ঘরে দেখি, কল্পনা কেমন আছেন—"

বিজলী কহিল—"নিশ্চয়—চলুন্। সেই আপনি পৌঁছে দিয়ে গেছেন, তারপর তো একটিবারও আসেন নি। এই তো প্রথম এলেন।"

অজিত তাড়াতাড়ি কহিল—"কেন, আমার লোক তো আপনার কাছে প্রত্যহই দুবার করে এসেছে—"

বিজলী হাসিতে হাসিতে কহিল—"লোকের আসা আর আপনার আসা কি এক হল, মিঃ মল্লিক?"

—"আপনার মত মহিলার হাতে ছেড়ে দিয়েও কি আমি একটু নিশ্চিন্ত হ'তে পারি না?" বলিতে বলিতে বিজলীর অনুসরণ করিয়া অজিত রোগিনীর কক্ষে ঢুকিল। রোগিনীর বিছানায় কল্পনার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, পা ঝুলাইয়া, অজিত বসিল।

কল্পনার গৌর ললাটে ও গালে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে কোমলভাবে অজিত জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছ, রাণু?"

কল্পনা ছোট্ট করিয়া মৃদুস্বরে কহিল—"ভাল।"

অজিত কল্পনার মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া, তাহার সহিত আলাপ জমাইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া, রোগিনীর পায়ের দিকে দাঁড়াইয়া অর্থাৎ অজিতের পিছন হইতে, নিটু কহিল—"দয়া করে' ওঁকে এখন বেশী কথা বলাবেন না, বিশ্রাম করতে দিন—"

অজিত ঘুরিয়া সোজা হইয়া বসিয়া, নিটুর মুখপানে চাহিতেই

যেন কেমন হইয়া গেল! ঘাড়টি শক্ত কাঠ হইয়া উঠিল, মুখখানা মরার মুখের মত পাণ্ডুর বিবর্ণ হইল। হঠাৎ সাপ দেখিলে মানুষ যেমন নির্ব্বাক ও স্তম্ভিত হয়, নিটুও অজিতকে দেখিয়া তেমনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ন-যযৌ ন-তস্থৌ অবস্থায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নিটুর মুখখানা রক্তচাপে ফুলিয়া উঠিল। ব্যাপারটা বিজলীর এবং কল্পনার, কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না।

বিজলীর মনটা ইহার ভিতর বিশেষ একটু রহস্যের মিষ্টগন্ধ পাইয়া, পিপীলিকার মত ইহাদের চারি পাশে ঘুরিতে লাগিল। বিজলীর ধারণা, ইহারা যে সব পরিচয় দিয়াছে, তাহা সত্য নয়; কারণ, এ সব ব্যাপার এমনিই যে, সত্যের সংস্পর্শ হইতে এগুলিকে অতি-সাবধানতার সহিতই বাঁচাইয়া রাখিতে হয়।

কাজেই, ইহাদের কথা বিজলী কিছুই বিশ্বাস করে নাই। যে যাহা বলিয়াছে, সে তাহাই শুনিয়াছে। এত দিন সে পরম ধৈর্য্যসহকারে এবং নিষ্প্রয়োজনজ্ঞানে, তাহার কৌতূহল দমন করিয়া রাখিয়াছিল। সে আসিয়াছে টাকার জন্য, তাহার এত খোঁজে কাজ কি? কল্পনা সুস্থ হইয়া উঠিলেই বাসা ভাঙিবে: মেলা ভাঙিলেই দোকান তুলিয়া যে যার নিজ নিজ স্থানে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। বিজলীও চলিয়া যাইবে, জীবনে হয়ত আর কখনও ইহাদের সহিত সাক্ষাৎই হইবে না। যদি বা হয়, বিজলী চিনিলেও, বিজলীকে ইহারা কেহই চিনিবে না, চিনিলেও স্বীকার করিবে না। সুতরাং কল্পনার ব্যাপারটায় বিজলী প্রবল কৌতূহলী হইলেও, বিশেষ তেমন গা করে নাই। কিন্তু অজিতের ও নিটুর রহস্যসঙ্কিত ব্যবহারে, বিজলীর মনটা হইল,

ডাষ্টবিনের ধারে সুপ্ত ক্ষুধার্ত্ত খেঁকি-কুত্তার খাদ্যগন্ধে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া খাদ্যানুসন্ধানের মত, বিশেষ ব্যগ্র।

বিহ্বলতা দমন করিয়া চকিত ভাবে নিটু কহিল—"মিঃ ব্যানার্জ্জী?"

অজিত বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে ঢোক গিলিয়া, শুষ্ককণ্ঠে কহিল—"ভুল করচেন নার্স, আমি মিঃ ব্যানার্জ্জী নই, আমি ঘোষাল, অজিত ঘোষাল।"

বিজলী থপ্ করিয়া বলিয়া উঠিল—"ঘোষাল? তবে সেদিন যে আপনি বলেছিলেন মল্লিক? মল্লিক বলেই তো আপনাকে আমি এতদিন সম্বোধনও করে আসচি, আপনি তো কৈ কখনও প্রতিবাদ করেন নি?"

অজিতের মাথাটা কাঁধের উপর হইতে খসিয়া পড়িবার মত হইল; মুখের মধ্যে দ্বিপ্রহরের মরুবালুকা; কথা জড়াইয়া আসে, বাক্য ভুলিয়া যায়। বাংলা ভাষায় উপযুক্ত ভাবপ্রকাশক শব্দের যে এত দৈন্য, ইতিপূর্ব্বে অজিত আর কখনও এমন উপলব্ধি করে নাই।

কোনও রকমে কহিল—"হাঁ—আপনি ঠিকই বলেচেন—ঐ—কথা হচ্ছে—মানে—ঘোষালও যা', মল্লিকও তাই। এই যেমন অনেক ভট্টাচার্য্য রায় চক্রবর্ত্তী আছেন না? আসলে কিন্তু তারা চাটুজ্জে বা বাঁড়ুয্যে মুখুজ্জে—এ-ও তেমনি।"

নিটুর নাসাগ্র ফুলিয়া উঠিল। কঠিন ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি জীবানন্দ বাঁড়ুয্যে নন? বছর চারেক আগে আপনার কোনও বিশেষ বন্ধুর স্ত্রীকে কৌশলে অপহরণ করিয়ে, তাকে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের একটা বাগানবাড়ীতে তোলান নি? সেখানে কতকগুলো বদ্‌মাইস্ দিয়ে তার সর্ব্বনাশ করিয়ে, তাকে শেষে ভবানীপুরে এক ধাত্রীর বাড়ীতে আনিয়ে রাখেন নি?"

অজিত বিমূঢ়ভাবে কহিল—"কি বল্‌চেন আপনি? ভুল কর্‌চেন—"

নিটু অগ্নিশিখার মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া, কঠোর কণ্ঠে কহিল—"আমি ভুল করি নি, জীবানন্দবাবু—আপনিই চালাকী কর্‌চেন। অবিশ্যি আপনি সে মেয়ের সামনে এসেছিলেন, ঘটনার কিছু পরে—যখন তার সর্ব্বনাশটা সম্পূর্ণ হয়েছিল। কারণ আপনি তার কাছে প্রথমে মুখ দেখাতেই সাহস করেন নি। কিন্তু এ ঘটনাটা ঘটেছিল আপনারি প্ররোচনায়, আপনারি অর্থে এবং আপনারি জন্যে। আপনি সে মেয়েটির সর্ব্বনাশই করিয়েছিলেন, কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি। শুধু দাগী হয়েই রয়ে গেছেন। বেশ করে ভেবে দেখুন দেখি—ঘটনাটা মনে পড়ে কিনা?"

অজিতের মাথা ঘুরিয়া উঠিল, কর্ণ বধির হইল, পায়ের তলায় সমস্ত বাড়ীটা যেন কুম্ভকারের চাকের মত বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। কোন রকমে তোঁৎলার মত কহিল—"আপনি এ সব কি বল্‌চেন? উদোরপিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে, আপনি আচ্ছা একটা কেলেঙ্কারী পাকিয়ে তুল্‌লেন্ তো? যা-ই বলুন্—আমি থাকি দিল্লীতে, কল্‌কাতায় এসেছি মাত্র আজ এক হপ্তা। এর পূর্ব্বে গত আট বছরের মধ্যে আমি কল্‌কাতা-মুখোই হই নি। আপনি হয় ভুল কর্‌চেন্, আর নয় তো এই রকম একটা গল্প বানিয়ে, আমার এই বিপদে আরও বিপন্ন করে, আর ভয় দেখিয়ে, আমার কাছ থেকে কিছু টাকা বাগাবার মতলব কর্‌চেন। সাবধান, বিপদে পড়্‌বেন কিন্তু।"

নিটুর চক্ষু দুইটি ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত জ্বলিয়া উঠিল। রাগে সে কাঁপিতে লাগিল। স্বল্পভাষিণী মেয়েটি ক্রোধে দিগ্বিদিকজ্ঞান শূন্য হইয়া

কহিল—"ভুল যে আমি এতটুকুও করি নি তার প্রমাণ দিচ্ছি। তার আগে জানিয়ে রাখি, টাকার গরম যে দেখাচ্ছেন সে টাকাও আপনার নয়, তা আপনি জানেন। বলব, কার টাকা? সুদক্ষিণা দেবী, আপনি এই ভদ্রগুণ্ডাটাকে বলুন্ না একবার ওর বুকের বাঁ দিকটা দেখাতে! আপনারা সবাই দেখুন্, সেখানে একটা পোড়া খুন্তির ছেঁকার দাগ আছে কিনা? আর সেটা কি করে' পুড়েচে, জিজ্ঞাসা করুন ঐ দিল্লীওয়ালাকে! তাহলেই আপনারা বুঝতে পার্বেন, আমি ভুল কর্‌চি, না ওকে বিপন্ন করে' টাকার মোচড় দিচ্ছি, না, ঐ লম্পটটাই চালাকী করচে! কল্পনা দেবীও বল্‌তে পারেন, কি ভদ্রলোকের কবলেই তিনি পড়েছিলেন, যাতে করে তাঁরও আজ এই দশা।"

কল্পনার শুষ্ক দুর্ব্বল রক্তহীন চক্ষু চিত্রার্পিতের মত স্থির, নিস্পলক। বিজলীর চোখে একটা গাঢ় কৌতুকের ছায়াঃ নিদ্রাজড়িমা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

নিটু তখনও রাগে গর্‌গর করিয়া কাঁপিতেছিল্। কহিল—"কল্‌কাতায় এই সব ভদ্রগুণ্ডার প্রকোপ আজকাল এত বেড়েচে যে, আসল গুণ্ডারা এদের কাছে হার মেনে, ব্যবসা ছেড়ে পালিয়েচে। এরা এত বড় এক-একটা পশু, এত নিষ্ঠুর, এত স্বার্থপর, এমন ইতর যে, এদের কাছে আসল ছোটলোকও ঢের ভাল। ঐ যে সাহেবী পোষাক বা কোঁচান ধুতি, মুখে ইংরিজি বুক্‌নী, মোটার, বড়লোকী চাল. অতীব শান্তশিষ্ট নিরীহ প্রকৃতি, কথায় কথায় কাল্‌চার সভ্যতা আর নীতির দোহাই ঝাড়ে—এরাই হচ্ছে, এই শহরে এ যুগের নিকৃষ্টতম ক্রিমিন্যাল। এদের অসাধ্য কোনও কুকার্য্য নাই। এরা মোলায়েমভাবে

ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঢোকে, সাধুতা আর সভ্যতার ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে, তাদের সর্ব্বনাশ করে' তবে বের হয়। সাধারণ বদ্‌মাইস্‌দিকে লোকে চেনে, গেরস্ত সাবধান হতে পারেঃ কিন্তু এই অসাধারণ বদমাইস্‌রা হচ্ছে বর্ণচোরা আম। এদের মত এত বড় কুক্রিয়াসক্ত ধড়ীবাজ লোক, ডাক-সাইটে বদমাইসদের মধ্যেও বিরল। দেখ্‌লেন তো, কি সুন্দর মিথ্যা কথা বলে? কি চমৎকার নির্লজ্জতা এদের?"

কল্পনা বাধা দিয়া ক্ষীণকণ্ঠে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—"কেন তুমি মিছে কথা বলে,' কেলেঙ্কারী বাড়াচ্ছ? সত্যি, তুমি এত নীচ, এত ছোট? আপনি ঠিক ধরেছেন নিটু-দি, এ বদমাইসটার নাম জীবানন্দ বাঁড়ুয্যেই বটে, আর বুকের বাঁ দিকে মস্ত একটা পোড়া দাগও আছে, ঠিক। যাক, এ নিয়ে আর গণ্ডগোলের প্রয়োজন নেই। দয়া করে—

নিটু বাধা দিয়া কহিল—"আজও এ যখন জেলের বাইরে, তখন আমি পুলিশে খবর দিয়ে, একে যথাস্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা কর্‌চি।"

কল্পনা দুই হাত জোড় করিয়া সজল চক্ষে অনুনয় করিল। বিজলীও নিটুকে বাহুবন্ধে জড়াইয়া কহিল—"লক্ষ্মী দিদি আমার, ও কেলেঙ্কারীতে আর কাজ নেই। তাতে আমরাও বিপন্ন হব—"

অজিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভীতিম্লান মুখে অতিবিনয়ে হাতে হাত ঘষিতে ঘষিতে কহিল—"মাফ্‌ কর্‌বেন্‌। আমার দোষ হয়েছে। আমি আপনার সঙ্গে একটু রহস্য কর্‌ছিলাম। দোহাই আপনার, মিসেস্‌—"

"চোপ্‌রাও, শূয়ার কাঁহাকি? শূয়ারকো বাচ্চা, লজ্জা লাগে না? রহস্য? ঈডিয়ট—" নিটুর কণ্ঠস্বরে চাকরটা পর্য্যন্ত কি হইয়াছে ভাবিয়া ছুটিয়া আসিল। বিজলীর সঙ্কেতে সে বিস্মিত ভাবে চলিয়া গেল।

অজিত পুনরায় ছলছলনেত্রে ভীতিবিহ্বলভাবে সবিনয়ে নিবেদন করিল—"আমায় ক্ষমা করুন্, আমি অপরাধ স্বীকার করচি। সুদক্ষিণা দেবী, দয়া করে' ওঁকে আপনার ঘরে নিয়ে গিয়ে, একটু শান্ত করান্—"

কল্পনা কহিল—"তুমি ওঁর পায়ে ধরে মাফ্ চাও, জীবা-কা—"

বিজলী ও নিটু একসঙ্গে হঠাৎ বেত্রাহতের মত চমকিয়া উঠিল।

নিটু কহিল—"জীবা-কা?"

কৌতুকহাস্যে বিজলী নিটুকে সস্নেহ বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া, এক রকম টানিতে টানিতেই তাহার কক্ষে লইয়া গেল।

কল্পনা রোষকষায় কণ্ঠে কহিল—"এত নীচ তুমি? এত ছোট? আর তা না হলে, আমার এমন সর্ব্বনাশ কর্তে পার?"

জীবানন্দ নতমুখে নীরব। তাহার কোট পর্য্যন্ত ঘামে ভিজিয়া শূট্ শূট্ করিতেছিল।

কল্পনা জিজ্ঞাসা করিল—"এ কার স্ত্রীর, সর্ব্বনাশ করেচ?"

অজিত কহিল—"তুমিও কি ক্ষেপ্লে নাকি?"

কল্পনার অশ্রুবেগ বাধা মানিল না। কিঞ্চিৎ উত্তেজিত ভাবে কহিল,—"তোমার অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট আর ব্যারিষ্টারের পোড়া কপাল! আমারও ইচ্ছা হচ্ছে, তোমায় জেলে দেওয়াই। সত্যি, তোমার মত লোক জেলের বাইরে থাক্লে, সমাজের প্রভূত অকল্যাণই হবে। আমার বাবা পুত্রাধিক স্নেহে তোমার জন্যে যে এত টাকা খরচ কর্লেন, খুব তার প্রতিদান দিলে! অকৃতজ্ঞ ব্রূট্! বাবার তুমি খুড়তুতো ভাই না?"

অজিত কহিল—"এ সব আলোচনায় মন খারাপ করে আর এখন

লাভ কি, শীলা? এ সব ভুলে গিয়ে এস আমরা দু'জনেই নতুন করে আবার জীবনারম্ভ করি।"

বুঝা গেল, কল্পনার প্রকৃত নাম শীলা এবং অজিতের নাম জীবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। শীলা সম্পর্কে জীবানন্দের ভাই-ঝি।

শীলা কহিল—"তুমি নতুন করে' আরম্ভ কর্‌তে পার, কিন্তু আমার তো আরম্ভের আগেই শেষ হয়ে গেল সব! বোধনের পূর্ব্বেই তো আমার বিসর্জ্জন শেষ।" শীলা কাঁদিয়া ফেলিল।

জীবানন্দর এবার একটু ভাবান্তর ঘটিল। একটু শ্লেষের সহিত কহিল—"আমি জানি শেষ পর্য্যন্ত দোষ আমারই হবে। 'সব্বাইকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়েটাকেই ধর্।' কিন্তু সত্যি করে বল' দেখি, তুমি কি বাস্তবিকই কুমারী? কামাখ্যার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতাটা কি? মাঘ মাসে ঐ নিয়ে তোমাদের চাট্‌গাঁয়ের বাড়ীতে মস্ত এক কেলেঙ্কারী পর্য্যন্ত হয়ে গেল: তুমি মনে কর' আমি কিছুই জানি না! জানি সবই, বলি নি। এখান থেকে তোমার কে-এক মামা না কে গিয়ে, তোমাকে শিলং থেকে ধরে আনে নাই?"

শীলা সজল চক্ষে প্রতিবাদের সুরে কহিল—"ভগবান জানেন, আমি নির্দ্দোষ! কামাখ্যার সঙ্গে ট্রেনে আমার আলাপ হয়েছিল। আমি তার পূর্ব্বে তাকে চিন্‌তামই না।"

জীবানন্দ একটু হাসিয়া কহিল—"তাই দুজনে এক হোটেলে গিয়ে উঠেছিলে! আর কেন? আমার কাছে এ সব চালাকী করো না, টিঁকবে না। এ সব আমি ঢের জানি। কামাখ্যা আমায় সব বলেচে। তোমায় আমি সেই সব কথা বলাতেই তো, আমার মুখ বন্ধ করতে

তোমার এই ঘনিষ্টতার সৃষ্টি। মনে নাই? আর আজ ঐ স্ত্রীলোকটার কাছে, আমার কোনও কথা শুনে, তুমি অমনি হয়ে পড়লে, হঠাৎ একেবারে খড়দার মা-গোঁসাই!"

শীলা কহিল—"তুমি আমার আত্মীয় না?"

জীবানন্দ কহিল—"কিসের আত্মীয়? মা বাপ ভাই বোন্ কেউই আমার নাই—আত্মীয়ও আমার কেউ নেই। সম্বন্ধ সম্বন্ধ যে করচ, কি সম্বন্ধ তা' জান? শোন': তোমার পিতামহকে আমার বাবা গ্রাম-সুবাদে দাদা বল্‌তেন। তোমার বাবা ছিলেন অত্যন্ত গরীব—আমাদের বাড়ীতেই মানুষ। আমার বাবাই তোমার বাবাকে লেখাপড়া শেখান। আমার নাবালক অবস্থায়, তোমার বাবা আমার অছি ছিলেন। আমারি টাকা, তিনি আমার জন্যেই খরচ করেছেন—নিজের একটি পয়সাও তিনি খরচ করেন নি। যাক্ গে, এ নিয়ে আর বৃথা কথা কাটাকাটি করে' কি কোনও ফল হবে? আর কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে, লোক হাসিয়েই বা লাভ কি? যা' হবার তা তো চরম হল। এইবার শেষ কর। তোমার জন্যে আমি ধনে প্রাণে মরেচি। উঠলাম, আবার একদিন আস্‌ব—"

বলিয়া শীলার কোনও উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, জীবানন্দ ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইল। বিজলী বারান্দায় বাহির হইয়া পলায়মান্ জীবানন্দকে ডাকিয়া কহিল—"শুনন্, শুনুন্—কি বলে যে ডাক্‌ব' আপনাকে তাও তো বুঝ্‌তে পার্‌চি না! কি বলি বলুন্ দেখি? মিঃ মল্লিক? মিঃ ঘোষাল, না মিঃ ব্যানার্জ্জী?"

জীবানন্দ কহিল—"জীবানন্দ বাঁড়ুয্যে বলেই ডাকবেন।"

বিজলী সহাস্যে কহিল—"বেশ। মিঃ ব্যানার্জ্জী, কাল সকালে সরকারকে দিয়ে নার্সের এক হপ্তার ফী দু'শো-দশ, আর কিছু, এই আড়াই-শো টাকা আন্দাজ পাঠিয়ে দেবেন্, দয়া করে'। আর একটা কথা—কিছু মনে কর্‌বেন্ না—এ নার্স থাকতে, আপনি আর এখানে এখন আস্‌বেন না।"

জীবানন্দ কহিল—"কাল কেন? আমার কাছেই আছে, আড়াই-শো, এই নিন্" বলিয়া কোটের পকেট হইতে গণিয়া আড়াই-শো টাকার নোট বাহির করিয়া বিজলীর হাতে দিয়া, সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"নিটুর রাগটা পড়েচে ত? আপনারি ভরসা সুদক্ষিণা দেবী। দেখ্‌বেন্, ও যেন আবার কোনও কেলেঙ্কারী না বাধায়! বিশ্বাস নেই।"

বিজলী অভয় দিল—"সেই জন্যেই তো বল্‌চি, এখন আর আসবেন না। আমি ওকে শান্ত করব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন্।"

নমস্কার করিয়া জীবানন্দ বিদায় হইয়া বাঁচিল। নিটুর সঙ্গে বিজলী রোগিনীর ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। শীলা বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়াছিল। নিটু ঔষধ হাতে করিয়া ডাকিল—"শীলা, অষুধটা খাও, ওঠ, কেঁদ না—"

শীলা চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমার নাম আপনি কি করে' জান্‌লেন্, নিটুদি?"

নিটু মৃদু হাসিয়া কহিল—"আর একদিন বল্‌ব। আজ ঢের হয়েচে; আজ আর না।"

বিজলী হাঁই তুলিতে তুলিতে বাহিরের রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, সিঁড়িতে বহু লোকের পদশব্দ ও কোলাহল। বিজলী বারান্দার

বাতিটি জ্বালিয়া দিয়া, নিজের কক্ষের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। গোটা দুই রং-চটা টিনের প্যাটরা, ছেঁড়া কালো একটা কম্বল-জড়ান প্রকাণ্ড এক মোট বিছানা, ফাঁক দিয়া বিছানার ছেঁড়া বালিশ, চিট-কালো কাঁথা প্রভৃতি দেখা যাইতেছিল। একটা চটের বোরায় কতকগুলি বাসন, দুইটি ঘড়া, তিনটি ঘটি, দুইটি বাল্‌তি, গামলা, কড়াই, ডালা, কুলা, চাল্‌নী, ধামা, শীল-নোরা, দুইখানা বঁটি, দুইখানা ছেঁড়া মাদুর, আরও ছোট ছোট পাঁচ-ছয়টা পুঁটুলি সহ, একজন বিপুলদেহা নারী, পরণে দশ-হাতী ছোট আধময়লা থান ধুতি, তিনটি কন্যার সহিত, নির্ভয় পদক্ষেপে উপরে উঠিতেছেন। শ্রীমান্ ভূষণচন্দ্র দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

বিজলী ইহাদের থাকিবার ঘর দেখাইয়া দিয়া, ঠাকুরকে ইঁহাদের জন্যও রান্না করিতে আদেশ দিল।

কন্যাত্রয়সহ নিস্তারিণী ঘরে ঢুকিয়াই, জিনিষপত্র মিলাইতে বসিলেন।

টেঁপী ক্ষেন্তি ও বুঁচি বাড়ী ঢুকিয়াই বিস্মিত হইল: বিনা তৈল এবং সলিতায় কলিকাতায় পিদিম জ্বলে: আর তাহার আলো হয় এমন যে, একশোটা পিদিমেও এমন হয় না।

দ্বিতীয় বিস্ময়:—পুকুর কুঁয়া বা নদী চুলোয় যাক্, একটা খাল ডোবা পর্য্যন্ত নাই, অথচ কল টিপিলেই জল পড়ে।

তৃতীয় বিস্ময়: নর্দ্দামা নাই, অথচ জল কোথাও দাঁড়াইতেছে না। ফেলা মাত্রই শুরুৎ করিয়া কোথায় যে যাইতেছে, তাহার কোনও সন্ধানই মিলে না! ভোজবাজির মত সব বিচিত্র এবং বিস্ময়কর।

টেঁপী ক্ষেন্তি ও বুঁচি, মায় নিস্তারিণী পর্য্যন্ত, কলিকাতা আসিয়াই ত্রিতলবাড়ীতে বাসের আনন্দে, স্বইচ্ টিপিয়া বাতি জ্বালিয়া ও নিভাইয়া,

এবং কল টিপিয়া জল ফেলিয়া, জলের অন্তর্ধানে—এমন মশগুল হইয়া উঠিল যে, পথের শ্রম আর তাহাদের কাহারও মনেই রহিল না।

ভূষণ বুঝাইয়া দিল, কলিকাতায় এমনি বিনা তেলেই বাতি জ্বলে এবং তেল থাকিতে সে বাতি নিভেও ঃ কল টিপিলেই এখানে জল পড়ে, এবং বিনা নালা-নর্দ্দামায় সে জল অদৃশ্যও হয়। কলিকাতার এ বৈশিষ্ট্য।

টেঁপীরা বিজলীকে দণ্ডবৎ করিল।

বিজলী টেঁপীর হাত ধরিয়া উঠাইয়া কোলের কাছে টানিয়া লইয়া সস্নেহে কহিল—"ঐ হয়েচে, ঐ হয়েচে, সুখে থাক', ভাই, ভাল থাক'——ভাল বর হোক্—"

লজ্জায় ও পুলকে ভূষণ গদগদ হইয়া উঠিল। ব্রীড়াভারে টেঁপী মুখ নামাইল।

বিজলী কোমলভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমাদের নাম কি ভাই ?"

টেঁপী কহিল—"আমার নাম শ্রীমতী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী, ক্ষেন্তির নাম শ্রীমতী খর্পরমালিনী দেবী আর বুঁচির—"

বুঁচি বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি কহিল—"আমার নাম শ্রীমতী বৈকুণ্ঠ-বাঞ্ছিতা দেবী।"

বিজলী সকৌতুকে কহিল—"বাব্বাঃ! কি দাঁতভাঙা নাম ভাই তোমাদের! আচ্ছা, কাল সকালে লিখে নিয়ে মুখস্থ করব। এখন তোমরা খেয়ে দেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়' গে! সারাদিন গাড়ীতে এসেচ।"

টেঁপীরা চলিয়া গেল।

বিজলী মৃদুস্বরে ভূষণকে কহিল—"বেঁচে থাক' ভাই, তোমার পছন্দ আছে।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যূষে উঠিয়া টেঁপী ক্ষেন্তি ও বুঁচি, তিন জনেই তাহাদের স্বপ্নপুরী দেখিতে, রাস্তার ধারের বারান্দায় সারিসারি বসিয়া গিয়াছে।

বাইশ-কল তেইশ-কল গাড়ী আর জনস্রোতের বিরাম নাই। কলিকাতায় লোকই বা কত! এত লোক কি করে? সকাল হইতে কি কাজেই বা ইহারা আনাগোনা করিতেছে? সমস্যা বটে।

বুঁচি জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা মেজ্‌দি, কল্‌কাতায় কত লোক থাকে, ভাই? দু'তিন শো হবে?"

টেঁপী কনিষ্ঠার ভুল সংশোধন করিয়া দিয়া, মুরুব্বীয়ানাচালে কহিল—"ধেৎ, দু'তিন শো কি ব'ল্‌চিস? দু'তিন হাজার বল্‌—"

চৈতনপুরের সন্নিকট মেটিরি গ্রামে, শ্রীশ্রীরামনবমী উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর এক পক্ষ কাল স্থায়ী এক বিরাট মেলা বসে। টেঁপীরা গত বৎসর সেই মেলা দেখিতে গিয়া দোকান-পশারী হাট-বাজার নানারকমের জিনিষ এবং বিপুল জনতা দেখিয়া, অবাক্‌ হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার সমস্ত রাস্তাতেই সে মেলার চেয়ে শত গুণ বেশী দোকান আর লোক দেখিয়া, ইহারা অভিভূত হইয়া পড়িল। কি অদ্ভুত শহর এই কলিকাতা!

পথে একের পরে এক পিপীলিকার সারির মত রেলগাড়ী, ছোট মটর, বড় মটর, এবং মটরের মালগাড়ী, এমন কি, মটরের যাত্রীঠাসা রেলগাড়ী পর্য্যন্ত চলিতেছে! মানুষের চলিবার পথটুকু পর্য্যন্ত নাই!

ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুক অনুভব করিল, মানুষের গাড়ী দেখিয়া। সত্য, কি আশ্চর্য্য শহর এই কলিকাতা! গরু মহিষ এবং ঘোড়াতেই চিরকাল গাড়ী টানে, ইহাই তাহারা বরাবর দেখিয়াছে এবং শুনিয়াছে! আবহমান কাল হইতে মানুষ গাড়ীতে চড়িয়াই আসিতেছে। কিন্তু মানুষে যে গাড়ী টানে, এমন অসম্ভব ব্যাপার, না দেখিলে, ইহাদের বিশ্বাস করাই শক্ত হইত! উঃ, কি আজব শহর? কতকগুলি গরুর গাড়ী আবার গরুতে না টানিয়া, মানুষে টানিতেছে! একি?

তিন জনে বিভিন্ন গাড়ীর গণনা আরম্ভ করিল। কে কতগুলি গণিতে পারে! ক্ষেন্তি লইল রেলগাড়ী, বুঁচি মটর গাড়ী, আর টেঁপী বাছিয়া লইল মানুষ-টানা মানুষের গাড়ী!

নিস্তারিণীও স্নানাদি সারিয়া মেয়েদের কাছে আসিয়া বসিলেন।

আনন্দের আতিশয্যে টেঁপী কহিল—"দেখ্‌চ মা, এখানে মানুষে গাড়ী টান্‌চে—"

নিস্তারিণী বিজ্ঞভাবে কহিলেন—"তা টান্‌বে না? গাড়ী কেন, কলকাতায় কত কি টানে মানুষে! ঐ জন্যেই তো কলকাতাকে রাজধানী শহর বলে।"

ক্ষেন্তি জননীকে প্রশ্ন করিল—"আচ্ছা, মা, আমরা যে রেলে এলাম, তার চোঙা আছে, ধোঁয়া বেরোয়, কিন্তু এ রেলে তা নাই ক্যানে?"

নিস্তারিণীর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, ভূষণ আসিয়া উপস্থিত হইল। ভূষণ কলিকাতার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সব হাল-ওয়াকিব, কহিল—"দূর্ বোকা! একে রেল বলে না, একে বলে টেরাম্। টেরাম্ বলিস, নৈলে লোকে নিন্দে করবে।"

বুঁচি জিজ্ঞাসা করিল—"বেশ না হয়, টেরামই হল। বুঝলাম—কল্‌কাতায় রেলকে টেরাম বলে। কিন্তু ধোঁয়া কই, ঘুট্‌কে দাদা?"

ভূষণ জানিত, এ চতুষ্পাঠীতে তাহাকে আজ নয় কাল অধ্যাপকের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিতেই হইবে। কাজেই, আরাম করিয়া বসিয়া এখন হইতেই টোল খুলিয়া দিল। কহিল—"আমরা যা চড়ে এলাম, সে গাড়ী শহরের বাইরে চলে বলে' তাতে ধোঁয়া থাকে, আর সেই জন্যেই তাকে রেলগাড়ী বলে। আর এতে দেখ্‌চিস্‌ না, ধোঁয়া নাই? তাইতো একে টেরাম বলে। এ আর বুঝ্‌তে পারচিস্‌ না?"

ছাত্রীচতুষ্টয়ের মুখ দেখিয়া মনে হইল, তাহারা ঠিকই বুঝিয়াছে!

টেঁপী জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা ঘুঁটকে দাদা, কাল আস্‌বার সময় বল্‌লে, ও-গুলো বাইশ-কল আর ঐ-গুলো তেইশ-কল গাড়ী। ক্যানে?"

ভূষণ বিজ্ঞভাবে কহিল—"ও-গুলোর ঐ চাকা দু' খানা সুদ্ধ নিয়ে মোট বাইশখানা কল আছে, তাই ও-গুলোকে বলে বাইশ-কল। আর এ-গুলোতে একখানা চাকা বেশী দেখ্‌চিস না? বাইশ আর একে কত হয়? তেইশ? বাস্—তেইশ-কল।"

ক্ষেন্তি জিজ্ঞাসা করিল—"তাহলে বাইশ্-কোপ মানে কি?"

ক্ষেন্তির এই সামান্য জ্ঞানও নাই দেখিয়া, ভূষণ বিস্মিত হইল। কহিল—"তোকে নিয়ে দেখ্‌চি, মহামুস্কিলে পড়্‌ব, ক্ষেন্তি। তোর বুদ্ধি সুদ্ধি বড্ড কম। বাইশ জনের কোপ, আর বাইশটা কোপ্ খেয়ে তবে হয় বাইশ-কোপ্—"

ভূষণের ছাত্রী-চারিজন কলিকাতা দেখা ভুলিয়া গিয়া, বিস্ময়ে হাঁ করিয়া ভূষণের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

টেঁপী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"সেকি ঘুঁটে কে দাদা? ভাল করে বুঝিয়ে দাও—কোপ্ কি?"

ভূষণ মৃদু হাস্যের সহিত কহিল—"প্রথম কোপ হচ্ছে রাগ। তারপর কোপ হচ্ছে ছুরি কাঁচির। এ সব এখন ঠিক বুঝ্‌বি না। ইষ্টুডিওতে কাজ না কর্‌লে, বাইশ-কোপ বোঝা শক্ত—"

টেঁপী জিদ ধরিল—"তুমি বোঝ' আর আর আমি বুঝব না? খুব বুঝব, তুমি বলই না—"

ভূষণ বুঝাইয়া দিল—"ছিনেমার ছবিকে বাংলায় বাইশ-কোপ বলে, জানিস্ তো! এখন এই ছবি কর্‌তে—প্রথমে হয় মা-নক্ষির কোপ, তারপর মালিকের, তারপর যে টাকা দেয় তার, তারপর ডিষ্টিবিটারের, তারপর হাউসের, তারপর ডিরেক্টারের, তারপর হিরোর, হিরোইনের, ফিমেলদের, আক্টোর অর্থাৎ আমাদের, তারপর পাওনাদারদের, দর্শকদের, কাগজওলাদের, ছাপাখানাওলাদের এমনি আরও কত জনের কোপ—এমনি করে বাইশজনের কোপে তৈরি হয় বলে, একে বলে বাইশ-কোপ।"

এতক্ষণে নিস্তারিণী একটি প্রশ্ন করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"মালিকের কোপ, আর যে টাকা দেয় তার কোপ, আলাদা নেকি? মালিকেরই তো টাকা—কি বল্‌চিস্ ঘুঁটকে? বোকা বোঝাচিস্ না তো—"

ভূষণ কহিল—"এ তুমি জান না, মাসীমা। মালিকের টাকা ইষ্টুডিওতেই ফুঁকে যায়। ছবি তোলা হয় ধার করে', আর ধাপ্পা দিয়ে! তবে আর বল্‌চি কি? মালিক শুধু নামেই মালিক—তার লম্বা কোঁচা,

চড়ক ফোঁটাই সার। ছবি যা হয়, সব পরের ধনে পোদ্দারী করে'। এ সব অত্যন্ত গোলমেলে ব্যাপার, মাসীমা, এ তোমরা এখন বুঝবে না। তোমরা কেন—বাইরের কেউই, এ সহজে বুঝবে না।"

বুঁচি কহিল—"মরুক্ গে বাইশ-কোপ, আমার দায় পড়েচে বুঝতে। এখন বলে দাও এগুলোকে মটর-গাড়ী বলে ক্যানে? মটরের মত গোল তো নয়! বরং দেখতে অনেকটা তাল-শাঁসের মতন। তা'লে তালশাঁস-গাড়ী বলে না ক্যানে?"

ভূষণ দেখিল, এ টোলের টাল সাম্‌লান দায়! অথচ এ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকতাও করিতে হইবেঃ এতদিন কলিকাতায় আছে, জানে না, বলে কি করিয়া? মহামুস্কিল।

ভূষণ কিঞ্চিৎ বাগাড়ম্বর করিয়া, ভাবিয়া কহিল—"ইংরিজি না জানলে, তুই কি বুঝবি? মটর মানে ছোলা-মটর লয়! মটর ইংরিজি কথা। মটর মানে টেক্সি, আর বড় নোক! সেই জন্যে মটরকে টেক্সিও বলে। বড়লোকের ঘরের গাড়ীকে মটর বলে, আর যাদের ঘরের গাড়ী নেই, তারা টেক্সি চড়ে। এই কাল আমরা যেমন এলাম টেক্সি চড়ে। ন্যাকাপড়া শেখ্, সব বুঝবি।"

টেঁপী কহিল—"আমরা কি বা জানি, আর কি বা দেখিচি? তুমি তো সবই জান, ঘুঁটকে দাদা। আমাদিগকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে তো তোমাকেই হবে! তোমার ভরসাতেই তো এখানে আসা।"

নিস্তারিণী কন্যাকে সমর্থন করিয়া কহিলেন—"তা আর বলতে! ভাগ্যে তুমি নিয়ে এলে বাবা, তাই কলকাতা দেখে চোখ সার্থক হল! তা নৈলে, থাকতাম তো ছেরক্কাল সেই পাঁদাড়েই পড়ে। পেটের

ছেলে কি করল ? পেটেই তোমায় ধরি নাই, বাবা, কিন্তু তুমি আমার পেটের ছেলের বাড়া। বেঁচে থাক', সুখে থাক,' সোনার দোয়াত কলম হোক্, ধনে-পুত্রে লক্ষেশ্বর হও, গাঙ্গুলী মশায়ের নাম রাখ'।"

আনন্দে ও গৌরবে ভূষণ হাওয়া-ভরা ফুটবলের ব্লাডারের মত ফুলিয়া উঠিল। পুলকগদগদভাবে কহিল—"এ আর বল্‌চ কি মাসীমা ? তোমাদিকে কলকাতার হালচাল না শেখালে, আমারি তো বদ-নাম হবে।"

মেয়ে-ভর্ত্তি স্কুলের একখানা বাস দেখিয়া, নিস্তারিণী সেইদিকে ভৈঁপীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ সব কাদের বাড়ীর মেয়ে রে ঘুঁটুকে ? এই তিন-সকালে এমন দল বেঁধে যেচে কোথা ? সোমত্ত মেয়ে, মাথায় কাপড় পর্য্যন্ত নাই ! শহুরে মেয়ে কি না ? কি বেহায়া বাবা—"

ভূষণ দাঁতে জিভ কাটিয়া কহিল—"ওকি মাসীমা ? এ তোমাদের পাড়াগাঁ নয়। মাথায় কাপড় কি ঘোমটা দেওয়ার রেওয়াজ এখানে নাই। কত বড়-বড় ঘরের মেয়ে সব এরা, তা জান ? ইস্কুলে যেচে—"

বুঁচি আবদারের স্বরে কহিল—"আমাকেও ঐ ওদের ইস্কুলে ভর্ত্তি করে' দিও, ঘুঁটুকেদাদা। দেবে ?"

সদ্যস্নাতা গন্ধামোদিত দেহে বিজলী আসিয়া দাঁড়াইয়াই, সহাস্যে কহিল—"ইস্কুলে যাবে ? বেশ তো। আমি তোমাদের তিন বোনকেই ভর্ত্তি করে দেব। দু'দিন অপেক্ষা কর—"

ভগিনীত্রয় আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল। উহাদের মত অমনি চুল বাঁধিয়া, জামা গায়ে দিয়া, জুতা পরিয়া, সাজিয়া-গুজিয়া, মটরে

চড়িয়া ইস্কুলে যাইবে! কলিকাতার বড় বড় লোকের মেয়েদের সহিত মিশিবে! পথের দুইধারের পথচারিগণ তাহাদের পানে বুভুক্ষিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে! ভারি মজা হইবে।

পুলিশের নির্দ্দেশে আর একখানা মেয়ে-ভরা বাস্ বড় রাস্তার মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

ক্ষেন্তি জিজ্ঞাসা করিল—"এ কোন্ ইস্কুলের মেয়ে সব, ঘুঁট্কে দাদা?"

ভূষণ উত্তর দিল—"এ ইস্কুলের বাশ নয়, এ মোহন-ফিলিমের বাশ। ইষ্টুডিও যেচে, শূটিন্ আছে—"

টেঁপী কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এদের সব্বারি বাইশকোপে ছবি উঠবে?"

বিজলী মৃদু হাসিয়া কহিল—"নিশ্চয়।"

টেঁপী বিনীতভাবে নিবেদন জানাইল—"আমিও ছবি ওঠাব, দিদিমণি।"

"আমিও ওঠাব, দিদিমণি" "আমিও দিদিমণি" বলিয়া ক্ষেন্তি এবং বুঁচিও তাহাদের নিজ নিজ আবেদন দাখিল করিল।

"আচ্ছা, আচ্ছা" বলিয়া বিজলী সকলের দরখাস্তই মঞ্জুর করিল।

ভূষণ যে এ শহরে একজন নামী এবং সুপরিচিত ব্যক্তি, নিস্তারিণী এবং এই ত্রয়ীর নিকট তাহার প্রমাণ দিবার একটি সুযোগ মিলিল।

বাসে ভূষণের সমকর্ম্মী ও বন্ধু মোহন-ফিলিমের সহকারী ব্যবস্থাপককে রেলিংয়ে ঝুঁকিয়া ডাকিয়া, ভূষণ কহিল—"নমস্কার, তুলসীবাবু।"

তুলসী ড্রাইভারের বাম পাশে বসিয়াছিল, মুখ বাড়াইয়া বাঁ-হাতটি

মুঠা করিয়া কপালে ঠেকাইয়া, প্রতিনমস্কার করিল। কহিল—"এই যে, ভাল তো ভূষণবাবু? আপনাদের ছবি আরম্ভ হচ্ছে কবে?"

ভূষণ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বাস ছাড়িয়া দিল। বিজলী ভূষণের মুখের দিকে রোষবিষাক্ত দৃষ্টিতে চাহিতেই, ভূষণ লজ্জাবতী লতার মত হঠাৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। উৎসাহের প্রাবল্যে এবং পুলকের প্রাচুর্য্যে ভূষণ ভুলিয়াই গিয়াছিল যে, বিজলী এবং সে এখন কলিকাতাতেই নাই! এখানে তাহারা অজ্ঞাতবাস করিতেছে!

রুক্ষস্বরে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া বিজলী কহিল—"ঠাকুর চাকরের কি করলে? কোন কালে তোমায় বলেছি, আর তুমি বেশ পরমানন্দে এখানে বসে খোস-গল্প করচ? দেখচ না, সকাল থেকে ও-ব্যাটারা সব হাত গুটিয়ে বসে রয়েচে?"

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া, হাতে হাত ঘষিতে ঘষিতে ভূষণ কহিল—"জামাটা নিতে এই ঘরে ঢুকে, এ-কথা ও-কথা আর, এই-যাই এই-যাই করে, একটু দেরী হয়ে গিয়েচে। আমি এই যেচি দিদিমণি—"

ভূষণ ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিল।

নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর চাকরের কি হয়েচে, মেয়ে? কাজ করচে না ক্যানে?"

বিজলী কহিল—"এই আপনারা আসায় লোক বেড়েচে ত'? বলে—মাইনে বাড়াও। আমি তাতে রাজী নই। তাই আমাদিকে একটু বেগ দেবার জন্যে, নষ্টামি করে কাজ কর্‌বে না বলে' বসে আছে।"

নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিল—"কত মাইনে দাও, আর কত চাইচে ড্যাক্‌রারা?"

বিজলী কহিল—"ঠাকুরকে ন'টাকা, আর চাকরকে সাত টাকা; তাছাড়া খাওয়া, পরা—"

নিস্তারিণী কর গণিয়া চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন—"উ—রে বাব্বা! চার গণ্ডা টাকা মাইনে, আর দু'বেলা দু'থালা ভুট্টিনাশের ওপর, আবার কাপড়? তবু খুশী নয়? আচ্ছা, তুমি যাও মেয়ে, আমি দেখচি ভেবে। ঘাটে-পড়া, ড্যাকরারা—"

বাধা দিয়া বিজলী কহিল—"আপনি ব্যস্ত হবেন না, মাসীমা, ভূষণ সব ঠিক করে দিচ্ছে এখ্‌খুনি! ভূষণ, আটটা বাজে—রোগীর পথ্যির দেরী হবে—" বলিতে বলিতে বিজলী চলিয়া গেল।

ভূষণও তাড়াতাড়ি যাইতেছিল, বাধা দিয়া নিস্তারিণী ডাকিলেন—"ঘুঁট্‌কে—শুনে যা এই দিকে।"

ভূষণ বিরক্তভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"এঃ, তুমি আবার পেছু ডাক্‌লে, মাসীমা?"

টেঁপী জানাইয়া দিল—"আগে চেয়ে পেছু ভাল, যদি ডাকে মা-য়।"

নিস্তারিণী ভূষণের কাছে উঠিয়া আসিয়া কহিলেন—"একটা কথা মনে হচে, বাবা। ছট্‌ফট্ করিস নি, থির হয়ে শোন্—"

ভূষণ কহিল—"দেখলে না দিদিমণি, বিরক্ত হচেন। একেই তো দেরী হয়ে গিয়েচে! ঠাকুর চাকরের ব্যবস্থাটা আগে করে আসি, তারপর থির হয়ে বসে, তোমার সব কথা শুন্‌ব—"

নিস্তারিণী কহিলেন—"সেই কথাই তো বলচি, শোন্ কাণ দিয়ে। আমি বলি কি, ঠাকুর আর কি হবে? আমি তো রইচি। ঐ ন' টাকা বিজুলী আমায় দিক্, আমি খুব যত্ন করে দুবেলা রেঁধে খাওয়াব।

আর চাকরই বা ক্যানে? গতরের ঝুড়ি নিয়ে ঐ ছুঁড়ী তিন্‌টে বসে বসে করবে কি? সবাই মিলে হাতাপাতি ঐ কখানা আর মেজে ধুয়ে ঘরে তুলতে পারব না?"

ভূষণ জিজ্ঞাসা করিল—"পারবে তো শেষ পর্য্যন্ত?"

নিস্তারিণী অভয় দিলেন—"ক্যানে পারব না? ভূষণবাবুর মাসীমা হয়ে কলকাতাই না হয়ে এইচি—তাই বলে তো একেবারে নাটসায়েব হই নাই। ছেরকাল তো করচি এই সব! ছাখ্‌ না, হাতে ঘাঁটা পড়ে গিয়েচে বাসন মেজে মেজে, আর জল ঘেঁটে ঘেঁটে হাজা ছাখ্‌, থক্ থক্ করচে। ঘরে বসে কাজ, এক-পা বাড়ীর বাইরে যেতে হবে না! এ করতে লারলে, চলবে ক্যানে, বাবা? গেরস্তর কাজ, গেরস্তই করে। দেশে ঘরে আমাদের ক'টা চাকর-বামুন ছিল? অকারণ ঐ হুদো-হুদো খোট্টা মিনসে ছ'টোকে, পাথর-পাথর লুপুর-লুপুর স্থপুর-স্থপুর দুবেলা গিলিয়ে-কুটিয়ে চারগণ্ডা করে টাকা দেওয়া ক্যানে? শুনে অবুধি আমার বুকটা কড়্‌-কড়্‌ করচে। তা ছাড়া, এই সব সোমত্ত মেয়ে—দিনরাত ঘরে পুরুষ মানুষ ঘুরে বেড়াবে কি?"

ভূষণ নিস্তারিণীর যুক্তির সারবত্তাই শুধু ভাবিল না, ভবিষ্যৎও চিন্তা করিল। আজ না হয় পরের পয়সায় ফ্ল্যাট-ভাড়া খাওয়া-দাওয়া বামুন চাকর চলিতেছে! তারপর? ইহারা চলিয়া গেলে, কি উপায় হইবে? বরং গোড়া হইতেই পাকা কাজ করা ভাল। বাবুগিরির স্বাদ একবার পাইলে, আর এরা কুটোটি পর্য্যন্ত নাড়িবে না! হাতে কাজ থাকিলে বরঞ্চ মাথায় দুর্ব্বুদ্ধি গজাইবার তেমন সুযোগ হইবে না।

নিস্তারিণীর প্রস্তাব অতীব সমীচীন বিবেচনা করিয়া, ভূষণও সায়

দিল। কহিল—"ঠিক বলেচ, মাসীমা। ঘরে গিন্নী না থাক্‌লে এমনি করেই টাকা পয়সা অপচো হয়। বরং মাসে মাসে চারগণ্ডা করে টাকা আপনার হাতেই জমুক, আমরা গরীব নোক! এতগুনো টাকা বাইরের নোকে ক্যানে নিয়ে যায়? ঠিক বলেচেন—আমি বল্‌চি দিদিমণিকে—"

বিজলী শুনিয়া সকৌতুকে একটু হাসিয়া রাজী হইল। ঠাকুর ও চাকর নিজ নিজ বেতন লইয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াই বিদায় গ্রহণ করিল। নিস্তারিণী সংসারের সমস্ত ভার লইয়া গৃহকর্ত্রী সাজিলেন। তবুও বিজলী, মাসে চার টাকা বেতনে একটা ঠিকা ঝি রাখিয়া দিল। ব্রাহ্মণ-কন্যাকে দিয়া ঝি-চাকরের করণীয় সব কাজ করাইতে, তাহার মন সরিল না। ভাবিতেই তাহার গা কাঁটা দিয়া উঠিল।

নিস্তারিণী ইহা অনুমোদন করিলেন না। এ আবার কেন? অকারণ এই দুইখানা বাসন মাজিয়া, মাসের মাস চার টাকা? বৎসরে বারো গণ্ডা টাকা গালে চড় মারিয়া লইয়া যাইবে?

নিস্তারিণী টেঁপীকে অনেক বলিলেন—"যা' না, দিদিমণিকে বলে' ঝিটাকে তাড়িয়ে, ঐ টাকাটা তোর নাম করে' নেগা না? ঐ বারো গণ্ডা টাকা থাক্‌লে, তোর একগাছা সোনার চন্দ্রহার হবে।"

টেঁপীর ভয়ানক লজ্জা হইল। সে বলিতে পারিবে না বলিয়া সাফ জবাব দিল। এমন সহজলভ্য চন্দ্রহারের প্রলোভনও সে জয় করিল, তবু বিজলীকে বলিতে পারিল না।

নিস্তারিণী আফশোশ করিয়া জানাইলেন—"তবে মর্‌গা। হত এ চৈতনপুর, কেমন করে গতরখাগী ঝিটা ছুলুবুলু কাজ করে', অমনি

তেলপারা হাত পেতে, মাসের মাস চারটে করে' টাকা লিয়ে যেত—একবার দেখে লিতাম না?"

বেলা একটায় রোগিনীর পথ্য তৈরি হইল। কিন্তু রান্না যাহা হইল, রোগিনী তো দূরের কথা, ভোগিনীরও তাহা দুষ্পাচ্য। নিটু বিজলীকে জানাইল, কাল হইতে ষ্টোভে নিটুই পথ্য রাঁধিবে।

নিস্তারিণী শুনিয়া চটিয়াই লাল। আপন মনে গজ্-গজ্ করিতে লাগিলেন—"রুগীর পথ্যি আমি যেন কখনও রাঁধি নাই! ভারী আমার রাঁধুনী! আমাকে এয়েচেন উনি রান্না শেখাতে! বলে, কত বড় বড় ভোজ-যজ্ঞি রেঁধে এলাম—এ তো কি! হাতী ঘোড়া গেল তল, ব্যাং বলে কত জল! বিটির ঢং দেখে গা জ্বলে যায়! এইচিস্ তো আমাদের বাড়ী ধাইগিরি করুতে, খেটে খেতে—তা' অত মোড়লী কিসের?"

বিজলী শুনিতে পাইয়া, রান্নাঘরে আসিয়া নিস্তারিণীকে মৃদু ভৎর্সনা করিয়া গেল। নিস্তারিণী মুখে চুপ করিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে তাঁহার আগ্নেয়গিরি ধুমায়িত হইয়া উঠিল।

টেঁপীকে ডাকিয়া নিস্তারিণী কহিলেন—"ছাখ্ টেঁপী, আমার মনে হচে, ঘুঁটুকে আমাদিকে ভোগা দিয়ে এখানে এনেচে। এ বাড়ী ওর লয়! এ ঐ ঠশকের। দেখ্‌চিস্ না, ছুঁড়ীর কি অংখার? এত বড় আস্পর্দ্ধা ওর, আমাকে আসে কি না চোখ রাঙাতে? আমাকে এখনো চিন্‌তে লারুচে! হত' আমাদের চৈতনপুর, ঝেঁটিয়ে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে বুঝিয়ে দিতাম! কি করব বল্? এ কল্‌কাতা! নিস্তারিণী বামনি এমন মেয়েই লয়—"

টেঁপী জননীকে অনেক বুঝাইল: বাড়ী যাহারই হউক্ না কেন,

তাহাদের যখন নয়, তখন রাগ করিলে চলিবে কেন? তাহারা আসিয়াছে, নিজেদের কাজ গুছাইতে। সুতরাং সামান্য একটু-আধটু অসুবিধা সহ্য করিতেই হইবে। চটাচটি করিলে তো তাহাদেরই সমূহ ক্ষতি। ইহাদের কি?

মাতাপুত্রীর গরম গরম কথা শুনিয়া, ভূষণও রান্নাঘরে ঢুকিয়া, নিস্তারিণীকে চুপ করিতে বলিল। এখানে পাড়াগাঁয়ের মত কথায় কথায় ঝগড়া-বিবাদ করিলে লোকে নিন্দা করিবে। নিস্তারিণী যখন এ সংসারে একমাত্র কর্ত্রী, তখন তাঁহাকে তো সব সহ্য করিতেই হইবে। কর্ত্তা হওয়া কি সোজা কথা?

আরও চারিদিন কাটিল। নিস্তারিণী টেঁপী ও ভূষণ নিয়ত পরামর্শ করে, কত কল্পনা করে, আশার মালা গাঁথে। ক্রমশ টেঁপী ও নিস্তারিণী বুঝিল—যাহাদের কোন ক্ষমতা নাই, বুদ্ধি নাই, সহায় নাই, তাহাদের সকলের মন জোগাইয়া চলাই, একমাত্র পন্থা। এই পন্থাতেই ঘুঁটকের পশার-প্রতিপত্তি হইয়াছে। চালাকী করিয়া কাজ গোছাইতে হইবে। পয়সাই সংসারে সব। পয়সাই বল, পয়সাই বুদ্ধি, পয়সাতেই মান-সম্ভ্রম। যাহার পয়সা নাই, তাহার সব থাকিলেও, কিছুই নাই। পয়সা রোজগার করিতে হইবে। কাঠফাটা রৌদ্রে পুড়িয়া, অঝোর বর্ষায় ভিজিয়া, কন্‌কনে শীতে বুকে পিঠে খিল্ লাগাইয়া, কত কষ্টে আর পরিশ্রমে চাষ করিতে হয়—তবে ত ফসল মিলে!

নিস্তারিণীর মনের মধ্যে উঁকি মারিয়া যায়—অতুল সৌভাগ্য! তাহার পটভূমি রচনা করে চৈতনপুরের বাড়ীঘর ও নিত্য অভাব-অনটনের ভয়াবহ সংসার। নিস্তারিণীর সুবুদ্ধি জন্মিল, অনেক পরিবর্ত্তনও হইল।

টেঁপী জাগিয়া স্বপ্ন দেখে, ইন্দ্রধনু লইয়া খেলা করে, কলিকাতার জনাকীর্ণ রাজপথে ঘর্ঘরনির্ঘোষে কপিধ্বজ রথ চালায়!

শীলা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে, তবে বড় দুর্ব্বল। নিটু আজ বিদায় লইল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, বিজলীর সঙ্গে শীঘ্রই সে একদিন দেখা করিবে। নিটু কোনও পরিচয় দেয় নাই, তবু তাহার প্রতি বিজলী অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে নিজেও জানে না, কেন।

দ্বিপ্রহর। ক্ষেন্তি ও বুঁচি বারান্দায় বসিয়া লোক-চলাচল দেখিতেছিল। ঘরে নিস্তারিণী ও টেঁপী পাশাপশি শুইয়া চাপা গলায় আলাপ করিতেছিল।

নিস্তারিণী কহিলেন—"কি জানি, মা, আমার তো কিছুই মনে হচে না। আমি কিছু ঠাওর কর্‌তে লার্‌চি—"

টেঁপী কহিল—"প্রথমটা আমিও পারি নাই, মা। আচ্ছা, ছোটবাবু সেদিন একখানা ছবি আমাদিকে দেখ্‌তে দিয়েছিল মনে পড়ে?"

নিস্তারিণী একটা হদিশ পাইয়া কহিলেন—"দাঁড়া, দাঁড়া—"

টেঁপী কহিল—"দেখ দেখি মা, বেশ করে ভেবে। শীলাদি ঠিক সেই ছবির-মেয়েটার মত লয়?"

নিস্তারিণী ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিয়া, অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে কহিলেন—"ঠিক বলেচিস্‌ টেঁপী। একেবারে হুবাহু সেই: সেই ধুমশো চেহারা, সেই গুগ্‌লির মত চোখ, সেই মুড়ো খ্যাংড়ার মত চুল—তুই ঠিক ধরেছিস্‌, টেঁপী: এ সেই—আর কেউ লয়। কিন্তু এখানে এ এল কি করে? কি হয়েছে ওর? অসুখ কি?"

টেঁপীও উঠিয়া বসিল। টেঁপীর চোখে একটা হিংস্র কৌতূহল, মুখে

অস্বাভাবিক দীপ্তি। কহিল—"দিদিমণিকে স্থধুই, দিদিমণি বলে, ও কিছু লয়। নিটুদিকে স্থধুই, সে-ও হেসে বলে, তুমি ছেলেমানুষ, তোমার এ শুনে কাজ নাই।"

নিস্তারিণী হাঁ করিয়া টেঁপীর মুখের দিকে কিয়ৎকাল চাহিয়া ভাবিয়া, মাথা দোলাইয়া ও চোখ ঘুরাইয়া, সন্দিগ্ধভাবে কহিলেন—"নিশ্চয় এ তাহলে কোনো খারাপ অসুখ! নৈলে, কি অসুখ তা কেউ বলে না ক্যানে?…উঁহু…আমার এ ভাল মনে হচে না।…ও ধাইটা কি বলে?…বল্‌তে চায় না?…আচ্ছা, ডাক্তার না এসে ধাই এল ক্যানে? ধাই তো একটা কাজের জন্যেই আসে—"

টেঁপী কহিল—"ধাই লয়, একে বলে ধাত্রী, নার্স।"

নিস্তারিণী কহিলেন—"রেখে দে তোর ইংরিজি-ফিংরিজি! ধাত্রী হচে সমশ্‌কৃত, আমরা বলি, ধাই—ও একই কথা! উঁহুঃ ঘুঁট্‌কেকে ডাক্‌, স্থধুই ভাল করে—"

টেঁপী কহিল—"না মা, আর কাউকে এখন কোন কথা জিজ্ঞাসা কর'না। দিদিমণিকে কাল আমি আবার স্থধিয়েছিলাম, তাতে তিনি রাগ করলেনঃ বল্‌লেন, এ কথা নিয়ে ফের যেন আমি আর উশ্‌চুবাশ্‌চু না করি। দিদিমণি যখন বললে না, তখন ঘুঁটকেদাদা কি বল্‌বে? বরং চেপে-চুপে থাক'—আমি ঠিক খবর বের করবই।"

নিস্তারিণী কন্যার পারদর্শিতায় সম্পূর্ণ আস্থা রাখেন। এ বিষয়ে কোনও কৌতূহল প্রদর্শন করিবেন না, স্বীকার করিয়া, কহিলেন—"মনে আছে, সে ঘাটে-পড়া আমাদিকে সেদিন কি অপমানটাই না করেছিল?"

টেঁপী কহিল—"সে অপমান মরে গেলেও ভুল্‌ব না, মা।"

নিস্তারিণী কহিলেন—"তাই ত বল্‌চি। জমিদারীর অংখারেই মর্‌চেন! এমন সরস্বতী-ঠাক্‌রুণের মত মেয়ে ওঁর মনে ধর্‌ল না!"

টেঁপীর চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। কহিল—"আর সে কথায় কাজ কি মা? আমরা গরীব, আমরা মুখ্যশুখ্যু—আমরা কি জমিদারের ঘরের বৌ হতে পারি? আমার বাপ তো জজ ছিল না—"

নিস্তারিণী কি বলিতে যাইয়া প্রবল উচ্ছ্বাসের মুখেই, হঠাৎ স্তব্ধ হইলেন। বিজলী ধীরে ধীরে আসিয়া টেঁপীর পাশে বসিল। কহিল—"একলা ভাল্ লাগ্‌ল না। তাই মাসীমার কাছে এলাম্—"

নিস্তারিণী বড় বড় দাঁতগুলি মায় মাড়িটি পর্য্যন্ত বাহির করিয়া, বিশেষ আপ্যায়িত করিয়া, কহিলেন—"সে কি মা, তুমি আস্‌বে আমার কাছে, এ তো ভাগ্যের কথা, মেয়ে। তোমারি তো খেচি মা—"

বিজলী বাধা দিয়া কহিল—"বাঃ রে! আচ্ছা মাসীমা তো আপনি? মা মেয়ের খায় না তো, কার খায়?"

টেঁপী জিজ্ঞাসা করিল—"শীলাদি কি কর্‌চে?"

বিজলী কহিল—"কি জানি, ভাই, যাই নি ও-ঘরে।"

নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"শীলা তোমার কেমন বোন্ হয়, মা?"

বিজলী কহিল—"আমার এক বন্ধুর বোন্। আমার বোন ঠিক নয়।"

—"তা এখানে? তোমার কাছে? কি অসুখ, কি?" অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিজলী মৃদু হাসিয়া কহিল—"সে অনেক কথা মাসীমা, আপনার সে সব শুনে কাজ নেই। আর আমিও আপনাকে তা বল্‌তে পার্‌ব না।"

টেঁপী জিজ্ঞাসা করিল—"শীলার বিয়ে হয়েচে?"

বিজলী কহিল—"না। এর সম্বন্ধে তোমার এত কৌতূহল কেন বলতো, টেঁপুদিদি? ক'দিন ধরে, কেবলি শীলার কথা জিজ্ঞাসা করুচ, ব্যাপার কি?"

টেঁপী সলজ্জভাবে কহিল—"ব্যাপার আর কি! এমনি—"

নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওর বাপ কি জজ?"

বিজলী প্রশ্নবাণে অস্থির হইয়া উপলব্ধি করিল, শীলার সম্বন্ধে ইহাদের কৌতূহলের নিশ্চয় কোনও নিগূঢ় কারণ আছে। এটি নিতান্ত অলস ঔৎসুক্য বলিয়া বিজলী আর উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করিল না। ইহাদের কৌতূহলের কারণটা জানা উচিত। হয়ত, অবহেলিত উপেক্ষিত এই পল্লীবাসিনীরা এই রহস্যে সত্যই কোনও সন্ধানী আলো ফেলিয়া, ব্যাপারটাকে আরও স্পষ্ট এবং সরল করিয়া দিতে পারে। তাহা নহিলে, এত লোকের মধ্যে শীলাই বা কেন ইহাদের এত মনোযোগ আকর্ষণ করিল

বিজলী সৌজন্য রক্ষা করিয়া কহিল—"তাও জানি না, মাসীমা! কাজ কি পরের কথায় অত? ছেড়ে দিন্ ও সব, মরুক্‌গে! টেঁপুদিদি, চল, আজ একটু মাঠ দিয়ে বেড়িয়ে আসি। ক'দিন ঘরে বন্ধ থেকে, শরীরটা ভারী খারাপ বোধ হচ্ছে।"

টেঁপী আহ্লাদে আটখানা হইল। মোটারে চড়িয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইবে।

বিজলী পুনরায় নিজের ঘরে আসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, সে-ও এক শীলার নাম জানে। সে জজের কন্যা, সুবোধের ভাগিনেয়ী ইহারাও জিজ্ঞাসা করিল, ইহার পিতা কি জজ? তাহা হইলে দুই শীলাই কি একই ব্যক্তি? রহস্যটি যে ক্রমশ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে

হউক্—আজ সন্ধ্যাতেই সে ইহাদের কৌতূহলের কারণটি অবগত হইবেই ঃ তাইত টে঳পীকে লইয়া বিজলী মাঠে বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব করিল। বিজলীর বিশ্বাস, টেঁপীর পেটের কথা বাহির করিতে তাহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

ভূষণ দুইখানি চিঠি লইয়া আসিয়া বিজলীকে কহিল—"দশটা পয়সা দেন তো দিদিমণি, শীলা-দির এই চিঠি দু'খানা ডাকে দিতে হবে।"

লুকাইয়া অন্যের আলাপ শোনা এবং অপরের চিঠি পড়ার অভ্যাস স্ত্রীলোকদের মজ্জাগত। বন্ধ চিঠিতে ভিতরের কথা কিছুই জানা যাইবে না, তবু শিরোনামাটি পড়িয়াও তৃপ্তি! খাবার না মিলুক্, এঁটো পাতা চাটিয়াও সুখ। নারীর এই অজ্ঞেয় মনোবৃত্তি অপরিবর্ত্তনীয়।

ভূষণের হাত হইতে চিঠি দুইখানি লইয়া, শিরোনাম পড়িয়াই বিজলী বিদ্যুৎপৃষ্টের মত চমকিয়া উঠিল। ক্রমশ তাহার মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব পুলকপ্রাচুর্য্যে ও কৌতুকদীপ্তিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

বিজলী কহিল—"আচ্ছা, এ-চিঠি দুখানা এখন আমার কাছে থাক—ভাঙ্গানো পয়সা এখন নেই। একটু পরে তোমায় পয়সা দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি কি? বিকেলে ডাক বাক্সে ফেলে দিও! হাঁ, শীলা জিজ্ঞাসা করলে বল'— চিঠি ডাকে দিয়েছ। বুঝলে?"

ভূষণ সানন্দে সম্মত হইল। সারা দুপুরটা তাহার ফাইফরমাস খাটিতেই অপব্যয় হইয়াছে! টেঁপীর নিকট বসিয়া একটু বিশ্রম্ভালাপ করিবার সুযোগ পাইয়া, সে অত্যন্ত পুলকিত হইল। পাছে আবার নূতন কোনও আদেশ হয়, সে আর এক মুহূর্ত্তও সেস্থানে দাঁড়াইল না।

বিজলীও দুয়ারে খিল আঁটিয়া দিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

চিঠি দুইখানার শিরোনাম ছিল এইরূপ :—একখানি—শ্রীচুণীলাল চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ, চট্টগ্রাম। অন্যখানি —শ্রীঅসীমকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এ, জমিদার, চৈতনপুর, পোঃ কুসুমপুর জেলা মুর্শিদাবাদ।

বিজলী প্রথমেই অসীমের চিঠিখানি জল দিয়া ভিজাইয়া, খুলিল। শীলা লিখিতেছে :—

নার্সিংহোম

কলিকাতা বৃহস্পতিবার।

প্রিয়তমেষু—

আমার ঠিকানা দেখিয়াই বুঝিতেছ, আমি কোথায়। মরিতেই বসিয়াছিলাম, তবে মরি নাই। ভয়ানক রক্ত-আমাশয়ে ভুগিলাম। একদিন তো হার্টফেল করিতে-করিতে বাঁচিয়া গিয়াছি। ভাগ্যে জীবা-কা ছিল! জীবা-কাকে মনে পড়ে? বাবার এক খুড়তুতো ভাই, জীবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার। তাঁহাকে টেলিফোন্ করি, তিনি আসিয়া, আমায় এই হোমে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এখানকার সুচিকিৎসায় আবার নবজীবনে বাঁচিয়া উঠিলাম। মরিলাম না: মরিব-মরিব করিয়াও মরিলাম না: তোমা হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব? এইজন্যই বোধ করি, মরা হইল না।

রোগশয্যায় কেবল তোমারি মুখ মনে পড়িয়াছে। তোমার চিন্তাতেই, এ দুঃসহ যন্ত্রণা ভুলিয়াছি: তোমাকে পাইব বলিয়াই আবার

বাঁচিয়াছি। সেকালে সতীরা কি করিয়া জলন্ত চিতায় সহমরণে যাইত, রোগশয্যায় তোমার ধ্যানে, তাহার কতকটা বুঝিয়াছি। যদিও এখনও শাস্ত্রমতে আমরা বিবাহিতই নই।

আচ্ছা, আমি মরিলে তুমি আবার বিবাহ করিতে তো? পুরুষ এমনি অবিশ্বাসীই বটে! কিন্তু নারী তাহা পারে না।

শীঘ্রই আমি এখান হইতে হোষ্টেলে যাইব। সেখানে গিয়া পত্র দিলে তুমি যেন একবার নিশ্চয় আসিও। তোমায় দেখিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত উতলা হইয়াছে।

পড়াশোনা বোধ হয় এই শেষ। কারণ, শরীরের যে অবস্থা এখন, তাহাতে ছয়মাস কাল আর কোনো কাজ করিতে পারিব না। অথচ অসুখটা হইল, সারা রাত জাগিয়া, মাসাধিক কাল পড়াশোনা করিয়াই। যাহাই হউক, লেকচার শেষ করা রহিল, পরে না হয়, আর একবার চেষ্টা করা যাইবে। কি বল?

বাবাকে লিখিও, আমাদের বিবাহটা যাহাতে আগামী অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যেই হয়। আর বিলম্বে কি হইবে? পড়াশোনা যখন ছাড়িলাম, তখন পতি-সেবা আর সংসার-ধর্ম্মই করা যাউক্। বি-এ পাশের জন্য, বিয়েটা আর কেন দেরী হয়?

তোমার মোকদ্দমার কি হইল? শ্যামাকান্তবাবু হিসাব দিলেন?

আমার আন্তরিক প্রীতি-ভালবাসা ও প্রণাম লও। ইতি

একান্ত তোমারি—শীলা।

রুদ্ধঘরে একাকিনী বিজলী পত্রখানি পড়িয়া, ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল। হাসিটি ঘৃণার কি পুলকের, তাহা ঠিক বুঝা গেল না।

সে ভাবিতে লাগিল—এমন শিক্ষিতা মেয়ে আর কত গুলি আছে? কোথায় আছে? স্বামীসেবা ও সংসার ধর্ম্ম পালন কেমন করিতেছে তাহারা? বাংলা দেশের সব কুমারীই কি এমনি?

শীলা কি সুন্দর লিখিয়াছে! অশিক্ষিতা মেয়েরা এমন মনোহর ও প্রাঞ্জল করিয়া মিথ্যা বলিতে পারে? বোধ হয়, পারে না: তাই তাহারা পথে বসে। সত্য কথা বলাটা নিছক দুর্ব্বলতা, একটা কুসংস্কার মাত্র! শুধু অর্থবল আর লোকবল থাকিলেই হয় না, মিথ্যা কথা বলিবার মনোবল থাকাও বিশেষ দরকার! বিজলীর এই ত্রিবিধ বলের একটিও ছিল না—তাই তাহার ঘটিয়াছে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর!

বিজলী শিহরিয়া উঠিল। ছিঃ। যে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া যদি প্রতিশোধ লইতে চাও, লইতে পার; কিন্তু যে তোমার কোনও অনিষ্ট করা দূরে থাক্, পরম সম্মানে তোমায় কুলবধূ করিয়া রাজমর্য্যাদা দিয়া, গৃহলক্ষ্মীরূপে বরণ করিতে চায়, তাহাকে কেন প্রতারিত করিবে? স্বামীর কাছে কেন বিশ্বাসঘাতিকা হইবে? না, না, বিবাহকে অপবিত্র, স্বামীকে অমর্য্যাদা ও বংশাবলীর রক্তকে দূষিত করিতে, সে কিছুতেই পারে না। খদ্দেরকে ঠকাইতে হয়ত পার, কিন্তু মহাজনকে ঠকাইতে গেলে চিরকালের মত অভাজন হইয়াই থাকিতে হইবে।

শীলা অগ্রহায়ণ মাসেই বিবাহ করিতে চায়! ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি যাহাতে চাপা পড়ে, এই উদ্দেশ্য আর কি? অনুস্থত বিপদকে এড়াইবার জন্য, ছুটিয়া বাড়ী ঢুকিয়া সদর দরজায় খিল আঁটিয়া দিয়া, নিরাপদ হওয়ার মতই এই অতি-ব্যগ্রতা!

স্বামী জানিবে, তাহার বধূ শিক্ষিতা কুমারী। বিনা-অনুতাপে অনুশোচনায় ও লজ্জায়, এমন কি বিনা-অনুরাগেও, এ হইবে বধূ, গৃহলক্ষ্মী এবং অনাগত বংশাবলীর জননী। লোকে জানিবে, সতী। অসতীকে এ করিবে ঘৃণা। এ অসহ্য!

শীলা যখন পতিগৃহে গিয়া সতীর অভিনয় করিতে থাকিবে, তখন ইহার মনে কি পূর্ব্বস্মৃতির কোনো বৃশ্চিকদংশন হইবে না? এত বড় সত্যকে সে লুকাইয়া রাখিতে পারিবে? তাহা হইলে, স্বীকার করিতে হইবে—রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের অপেক্ষাও এই সব শিক্ষিতা ভদ্র-কুমারীরা ঢের বড় অভিনেত্রী! এত বড় কথা যে ভুলিতে পারে, সে সব পারে।

বিজলী অন্য পত্রখানাও পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা খুলিয়া, পড়িতে লাগিল :

নার্সিংহোম

কলিকাতা, বৃহস্পতিবার।

শ্রীচরণেষু—

বাবা, ঠিকানা দেখেই বুঝ্‌তে পারুচ, আমি কোথায়। মা ও তুমি চিন্তা কর' না, আমি সেরে উঠেছি, শীগ্‌গীরই হোষ্টেলে ফিরে যাচ্ছি। বোধ হয়, দু'তিন দিনের মধ্যেই এ হোম ছেড়ে দেব।

পরীক্ষার পড়ার জন্যে মাস-দুই থেকে খুব বেশী পরিশ্রম করে, প্রথমটা শরীর খুব খারাপ হয়; পরে হল রক্ত আমাশয়। সেদিন তো হার্টফেল্ করেছিল আর কি? ভাগ্যিস জীবা-কা সেদিন হোষ্টেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তাই রক্ষে। জীবা-কা তখ্‌খুনি আমায় এই হোমে নিয়ে এসে রেখে দেয়।

অসুখ সেরে গেছে। শরীর বড় দুর্ব্বল। এত পরিশ্রম করে তৈরী করলাম, পরীক্ষা আর দেওয়া হল না! ডাক্তারেরা বলচেন, এখন ছ'মাস কাল লেখাপড়া দূরের কথা, বেশী চলা-ফেরা বা ওঠা-নামা পর্য্যন্ত আমি করতে পারব না। এ জন্যে মনটা বড্ড খারাপ।

এই দুবছরে, তোমার অনেকগুলো টাকা খরচ করে দিলাম, বাবা। কি করব? অদৃষ্টের দোষ।

একটা চেঞ্জে যেতে বলচে সবাই। তুমি যা ঠিক কর', জানিও।

তুমি ও মা আমার শতকোটি প্রণাম নিও। অসীমের চিঠি পেয়েছি। সে তার মোকদ্দমা নিয়ে ব্যস্ত আছে।

হোষ্টেলের ঠিকানাতেই চিঠি দিও। ইতি—

তোমাদের স্নেহের শীলা।

বিজলী কিয়ৎকাল ভাবিয়া, পত্র দুইখানি পার্শ্বস্থ দেওয়াল-আলমারির মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া, চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

বিজলী শীলার পরিচয় জানিতে চাহিয়াছিল, জানিল। জানিয়া সে খুশী হইল কি কি-হইল, তাহা ঠিক বোঝা গেল না। তবে পুলকের পরিবর্ত্তে সে যেন সমধিক চিন্তিতই হইয়া পড়িল।

বিজলী ভাবিতে লাগিল: বাপ-মা মেয়েকে, কলিকাতায় রাখিয়াছেন লেখাপড়া শিখাইবার জন্য; তাহার অভাব-অভিযোগ শোনেন, যথা-প্রয়োজন অকাতরে অর্থ সাহায্যও করেন। তাঁহাদের ধারণা—মেয়ে সৎভাবে আছে এবং লেখাপড়াই শিখিতেছে। মেয়ের উপর অগাধ বিশ্বাস! মেয়ে কি-করে না-করে, এ খোঁজও তাঁহারা করেন না, কারণ মেয়ে যে কোনও খারাপ কার্য্য করিতে পারে, এমন

সন্দেহই তাঁহাদের হয় না। তাঁহারা মনে করেন, পৃথিবীটা এখনও সেই পঞ্চাশ বৎসর আগের মতই চলিতেছে। তাঁহাদের ছাত্রজীবন এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যার ছাত্রজীবনের যুগে যে একটা মস্ত যুগান্তর ঘটিয়া গিয়াছে, এটি তাঁহারা মানিতে চান না বা ভাবেন না এবং অনুভবও করেন না: ঘড়ি না চলিলেও, সময় ঠিকই চলে। পিতা থাকেন দিবারাত্র বৈষয়িক ব্যাপারে নিমগ্ন, আর মাতা থাকেন উদয়াস্ত সাংসারিক ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত ব্যস্ত—পুত্র-কন্যার দিকে নজর দিবেন কখন? প্রয়োজনই বা কি? পত্র-বিনিময় করিয়া ও টাকা পাঠাইয়াই তাঁহারা খালাশ।

পুত্র-কন্যারা অগত্যা আপনাআপনিই বাড়ে। কাণ্ডারীবিহীন তরী স্রোতের জলে ভাসিয়া যে যে-কূলে গিয়া লাগে! বাঁধা-গরু শহরের খোলা ময়দানে আসিয়া একবার প্রাণ খুলিয়া ছুটিতে চায়। কাজেই স্কুল-কলেজের বিদ্যার অভ্যাস স্থগিত রাখিয়া, বিদ্যাসুন্দরের চর্চ্চাতেই তাহারা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে বেশী। যে ভাল হয়, সে সুযোগের অভাবেই ভাল হয়—যে খারাপ হয়, সে অত্যন্ত সহজেই খারাপ হয়। খারাপ-হওয়া বা ভাল-হওয়া, দুইই দৈবাৎ। ছেলেমেয়েদের ভাল-মন্দে বাপ মার কোনও হাতই নাই: কারণ, তাঁহারা হাত বাড়ান না, গুটাইয়াই থাকেন। শিক্ষার নামে বাপমা-রা ছেলেমেয়েদিগকে ছাড়িয়া দেন, নিষিদ্ধ ফলের বাগানে। পঁচানব্বুই জন ফলাহারে মাতিয়া উঠে, পাঁচ জন হয়ত অভুক্ত ফিরে। শেষোক্ত পাঁচের মধ্যেও দেখিবে—একজন হয়, ভয়ে খায় না, নয়, গাছে উঠিতে সাহস করে না। বাকী চারিজন না খাইতে পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তেই বাড়ী ফিরে। এ যুগের নারীপ্রগতি ভদ্রনারীনৃত্য সহশিক্ষা সিনেমা এবং বাংলা ভাষায়

পশ্চিমাদের অনুকরণে যৌনতত্ত্বপ্রধান ছাগ-সাহিত্যের সস্তা মুড়িঘণ্ট খাইয়া, অকালে ছেলেমেয়েদের মনে যে একএকটি বাৎসায়ন বাসা বাঁধে, সেটি পিতামাতারা সাধারণত ভাবিতেই চাহেন না। তাই বাধিয়াছে এই গোল। পিতামাতাদের অদূরদর্শিতা ঔদাসীন্য এবং অতিবিশ্বাসই সামাজিক এই পরিস্থিতির এবং তরুণ-তরুণীর মনোবিকারের প্রধান কারণ। শীলার এই ব্যাপারে তাহার দোষ অপেক্ষা, বিজলী ঠিক করিল, তাহার পিতামাতার দোষই সমধিক।

বিজলীর অভিভাবক আনন্দ গুপ্ত যাহা করিয়াছিল, শীলার স্থানীয় অভিভাবক জীবানন্দও তাহাই করিয়াছে। এ-ও একটা সমস্যা!

"চুলোয় যাক্, আর সমস্যা ভাব্‌তে পারি না—" বলিয়া বিজলী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া, তাহার ভাবপ্রবণ মনটিকে চিন্তামুক্ত করিতে চেষ্টা করিলঃ আমি কে? আমি মানুষেরও কেউ নই, সমাজেরও কেউ নই, জাতিরও কেউ নই। আমার এত মাথা ব্যথা কেন, বল তো? সমস্যা যাদের, তাদের। যার বিয়ে তার মনে নাই—পাড়া-পড়শীর ঘুম নাই! যাদের সমস্যা, তারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমুবে, আর তাদের সমস্যার যত ভাবনা আমার? এ কি বদ্‌স্বভাব? শীলার বিয়ে হোক্ বা না-হোক্, আমার কি? আমিও তো এক শীলা! কে কার খোঁজ রাখে? যারা ধরা পড়ে, তারাই হয় কুলটা। হাজার হাজার শীলা রয়েচে গোপনে।

অন্যমনস্ক হইবার জন্য বিজলী শীলার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—শীলা ও জীবানন্দ আস্তে আস্তে কি আলোচনা করিতেছিল। বিজলী হঠাৎ আসিয়া পড়ায়, জীবানন্দ যেমন অপ্রতিভ হইয়া সরিয়া বসিল,

শীলাও তেমনি একটু লজ্জিত হইল। বিজলীও অপ্রস্তুত হইল কম না। জিজ্ঞাসা করিল—"এই যে জীবানন্দবাবু, কতক্ষণ?"

জীবানন্দ কহিল—"এই মিনিট পাঁচেক! আপনি ঘুমুচ্ছিলেন বলে' আপনাকে আর বিরক্ত করি নি।"

বিজলী কহিল—"হাঁ, মাথাটা বড় ধরেছিল, তাই একটু চুপ করে শুয়েছিলাম।"

শীলা সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কেমন, সুদক্ষিণা-দি?"

বিজলী কহিল—"অনেকটা কম। ভূষণ সেই কোন্ কালে গেছে ডাকঘরে চিঠি ফেল্‌তে, এখনো ফির্‌ল না। আচ্ছা কুঁড়ে যা'হোক্! সব মাটি মাড়িয়ে চল্‌তে গেলে কি কাজ চলে? দেখি সে কোথায় গেল। আপনি বসুন্, জীবানন্দবাবু।"

বিজলী বাহিরে আসিয়া বাঁচিল। নিস্তারিণীর ঘরে ঢুকিয়া দেখে, ভূষণ অনিন্দিতা ছবিতে জমিদার সাজিয়া কেমন করিয়া জমিদার অসীমকেও হার মানাইবে, এই কথাটি সোচ্ছ্বাসে ও সবাহুল্যে টেঁপীদিগকে শোনাইতেছিল। ইহারা ভূষণের বাগাড়ম্বরে তন্ময়।

টেঁপী বিজলীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"গড়ের মাঠে কখন বেড়াতে যাবেন দিদিমণি?"

বিজলী কহিল—"সন্ধ্যা হোক্।"

ক্ষেন্তি ও বুঁচিও যাইবার জন্য উস্‌খুশ্ করিতেছিল, অথচ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছিল না। বিজলী তাহা বুঝিয়া, কহিল—"তোমাদিকে আর একদিন নিয়ে যাব', কেমন? ভূষণচন্দ্র কি ষ্টুডিওর কথা বলছিলে? বল', থাম্‌লে কেন? আমিও একটুও শুনি।"

ভূষণ গদগদভাবে কহিল—"দিদিমণির সব তাতেই ঠাট্টা !"

বিজলী কহিল—"টেঁপীর মুখ চোখ চেহারা ঠিক সিনেমা আর্টিষ্টেরই মত। সিনেমায় ঢুকলে, এ খুব অল্প দিনেই নাম করতে পারে।"

ভূষণ সোৎসাহে কহিল—"ঠিক বলেছেন দিদিমণি। মাইনেও এক্ষুনি কম্-সে-কম একশো টাকা তো হয়ই—"

নিস্তারিণী সচকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"একশো টাকা? এক—শো? টেঁপীর মাইনে?"

বিজলী টেঁপীর ও তাহার মাতার উদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া কহিল—"গোড়ায় এই একশো, তারপর তো পাঁচশো-ও হতে পারে।"

নিস্তারিণী অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিলেন—"মেয়ে, এমন করে তুমি বল্লে মা, আমি তো মনে করলাম, সত্যিই বা!"

টেঁপী সলজ্জভাবে মুখ নামাইল।

বিজলী নিস্তারিণীকে বহু দৃষ্টান্ত দিয়া, বুঝাইয়া দিল যে, সিনেমা-অভিনেত্রীদের বেতন এই ভারতবর্ষেই এখন ৪।৫ হাজার পর্য্যন্ত আছে। পাঁচশো-তে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

নিস্তারিণী সাগ্রহে এবং বিশেষ মিনতি সহকারে নিবেদন জানাইলেন—"তা হলে মা বিজুলী, টেঁপীকে একটা ছিনেমাতেই ঢুকিয়ে দাও। ও ইস্কুল-ফিশ্‌কুলে আর কাজ নেই। গেরস্ত ঘরের মেয়ের ন্যাকা-পড়া শিখে কি হবে? জজও হবে না দারোগাও হবে না। তার চেয়ে বরং ছিনেমা করুক্, দুঃখু ঘুচুক্।"

টেঁপী অপূর্ব্ব হর্ষশিহরণে অভিভূত হইয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল—"আমি পার্‌ব, দিদিমণি? কখনো তো করি নাই?"

ভূষণ বিজ্ঞভাবে কহিল—"ক্যানে পার্‌বি না? আমি একেবারেই পেরেচি নেকি? কতবার মনিষ্টার, আর কতবার এন-জি-করে, তবে একটা ছট্‌ ও-কে হয়। জানিস?"

সিনেমায় প্রবেশপ্রার্থিনীগণ কি বুঝিল জানা গেল না, তবে পারা যে অসম্ভব নয়, কারণ ঘুঁট্‌কে পারে, এটি তাহারা বুঝিল—বোঝা গেল।

বিজলী ভরসা দিল—"কিচ্ছু শক্ত নয়, ভাই। সবাই কর্‌চে। দু' একদিন ষ্টুডিও গিয়ে শূটিং দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

বুঁচি জিজ্ঞাসা করিল—"মেজদি আর আমি বুঝি লারব? তা হবে না—আমরাও ছিনেমা কর্‌ব।"

বিজলী কহিল—"আর একটু বড় হও, তখন সে কথা হবে।"

নিস্তারিণী কন্যাদ্বয়কে বিরক্ত করিতে নিষেধ করিয়া, কহিলেন—"নোকে শুন্‌লে নিন্দে কর্‌বে না তো মা? আমাদের গুষ্টিতে কেউ কখনও ছিনেমায় আক্টো করে নাই। হাঁ রে, ঘুঁট্‌কে কি বলিস্‌?"

ভূষণ কহিল—"একি চৈতনপুর পেয়েচ, মাসীমা? এ কল্‌কাতা—এখানে কেউ কারো নিন্দে করে না। এত সব ভাল-ভাল বড়-বড় ঘরের মেয়ে, বি-এ পাশ মেয়ে যে ছিনেমায় আক্টো করচে, কেউ নিন্দে করচে তাদের? চৈতনপুরের কথা এখানে ভেব না, মাসীমা! আর তারা জানবেই বা কি করে?"

টেঁপী সদর্পে কহিল—"জানলেই বা! ক্ষেতি কি? বরং যদি তারা না জানে তো, আমি জানিয়ে দেব। দেখি, কে এসে আমার মাথাটা কেটে নিয়ে যায়? আমরা কারু খাই, না পরি? কি বল, মা?"

নিস্তারিণী কন্যাকে সমর্থন করিয়া কহিলেন—"এক-শো-বার।

বলে, ভাত দেবার কর্ত্তা নয়, কিল মারবার গোঁসাই! নিস্তারিণী বামনী কারু চোখরাঙানীতে ডরাবার নোক নয়। মা বিজ্লী, টেঁপীকে ছিনেমাতেই ঢুকিয়ে দাও। কারু কথা তুমি শুনো না, আমিও শুনব না।"

বিজলী গম্ভীরভাবে কহিল—"আচ্ছা, দেখি, কোথায় কারা নেবে—খোঁজ করি। যাও, টেঁপু, কাপড় বদলে এস। এইবার বেরুনো যাক্।"

টেঁপী প্রসাধন করিতে গেল।

নিস্তারিণী আর আত্মসংযম করিতে পারিলেন না। অত্যন্ত লোভাতুর হইয়া, বিজলীর নিকট সরিয়া গিয়া, বিনীত ভাবে কহিলেন—"আমাকেও দাও না, মা, একটা ছিনেমায় ঢুকিয়ে! যা পাই! ভাবচ কি? পারব? তা ভেবো না। আমি খুব ভাল আক্টো করতে পারি। এ আর শক্ত কি? বেশী না হয়, মাসে দশ-পনর টাকাও দেবে ত'? তা'হলেই আমার হবে। তারপর তো মাইনে বাড়বে। কি বল?"

বিজলী অতিকষ্টে হাস্যসম্বরণ করিয়া কহিল—"আচ্ছা মাসীমা। আপনার কথাও বলব তাদিকে।"

টেঁপী আধময়লা একখানা ডুরে-শাড়ী পরিয়া, তাড়াতাড়ি মাথায় খানিকটা নারিকেল তেল ঢালিয়া, চুলগুলি একটু আঁচড়াইয়া, বিজলীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিজলী আপাদমস্তক টেঁপীকে এক নজর দেখিয়া লইয়া ভাবিল, পাখী উড়ি-উড়ি করিতেছে, কিন্তু এখনও পাখায় উড়িবার শক্তি হয় নাই! এই নিঃসজ্জাতেই টেঁপী কি সুন্দরী! যেন ভস্মাচ্ছাদিত প্রলয়-বহ্নি। এ যখন জ্বলিবে, তখন এ শুধু নিজেই জ্বলিবে না, আশপাশের অনেক কিছুই

জ্বালাইবে ঃ এ অগ্নিশিখায় গৃহদীপের স্নিগ্ধতা নাই, দেবারতির পবিত্রতা নাই, আছে অগ্নিদেবের কল্পান্তপ্রলয়ের রুদ্ররূপ।

বিজলী কহিল—"ভূষণ, ট্যাক্সি ডাক, চৌরঙ্গীতে একটা ফটো-গ্রাফারের দোকানে একটু কাজ সেরে, মাঠে গিয়ে বসব। তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে। টাকায় চার আনা ছাড়্ করিয়ে ভাড়া ক'র।"

ভূষণ ট্যাক্সি আনিতে ছুটিল। বিজলী বেশ পরিবর্ত্তনে গেল।

চৌরঙ্গীতে বড় এক ফটোগ্রাফারের দোকানে বিজলী একা গিয়া কি একটা কাজ সারিয়া, জি-পি-ওর সম্মুখে গাড়ী দাঁড় করাইয়া, ভূষণকে শীলার চিঠি দুইখানি ডাকে ছাড়িবার জন্য দিল।

চিঠির কথা ভূষণ ভুলিয়াই গিয়াছিল। পুলকিত হইয়া কহিল—"ওঃ আপনি কোনো কথা ভোলেন না, দিদিমণি!"

বিজলী কহিল—"ভুল্‌তে তো চাই অনেক কথাই, কিন্তু পারি কৈ?"

ময়দানের জনবিরল এক প্রান্তে ট্যাক্সি দাঁড় করাইয়া, বিজলী ও টেঁপী ঘাসের উপর নির্জ্জন একটা জায়গায় আসিয়া বসিল। ভূষণ ট্যাক্সিতেই রহিল! স্থানটি আলো-আঁধারিতে মনোরম। ঝির্ ঝির্ করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল, নীচে প্রশস্ত গঙ্গাবক্ষ, গঙ্গার অপর তীরে বিদ্যুৎ-বাতির পর্য্যাপ্তপুষ্পসম্ভার কদম্বতরুতলে উজ্জ্বল তিলকাঙ্কিত যন্ত্রপুরী।

টেঁপী মনের আনন্দে প্রশ্ন করিয়া চলিয়াছে, বিজলীও সংক্ষেপে তাহার জবাব দিতেছিল। বিজলীর মনটা উৎসুক।

বিজলী বিশেষ স্নেহের ও দরদের ভূমিকা করিয়া, সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করিল—"শীলার সম্বন্ধে তুমি অনেকবার আমায় অনেক প্রশ্ন করেচ, ভাই। কিন্তু কেন বল' দেখি? তুমি কি শীলাকে চেন?"

টেঁপী বিপুল উচ্ছ্বাসে ও বিশদ বর্ণনাসহ জানাইল যে, সে অসীমের নিকট ইহার ছবি দেখিয়াছে এবং শুনিয়াছে যে এ-ই অসীমের বাগ্‌দত্তা স্ত্রী। বিজলীর প্রশ্নে, টেঁপী আস্তে আস্তে আরও অনেক কথাই বলিল। তাহার পিতৃশ্রাদ্ধে অসীমের অর্থসাহায্য হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামে ইহাদের বিবাহ লইয়া ঘোঁট, এবং অবশেষে ইহাদিগকে অপমান করিয়া বাড়ী হইতে ছোটবাবুর তাড়াইয়া দেওয়ার কাণ্ডটা পর্য্যন্ত, টেঁপী কিছুই গোপন করিল না, অকপটে সবই বলিয়া ফেলিল।

শীলার পত্রে বিজলী আজ তাহার যে পরিচয় পাইয়াছে, টেঁপী তাহারই সমর্থন করিল। এই সঙ্গে ইহাও তাহার অজ্ঞাত রহিল না যে, এই শীলাই সুবোধের ভাগিনেয়ী, জজের কন্যা শীলা।

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা ভাই টেঁপু, ছোটবাবুকে তোমার খুব পছন্দ হয়েছিল, না?"

টেঁপী ব্রীড়ানত হইয়া কহিল—"যান্. দিদিমণি—"

বিজলী কহিল—"এতে আর লজ্জা কি ভাই? এখানে তো আর কেউ নেই, তুমি আর আমি। আর এ কিছু অন্যায় কথাও নয়—"

টেঁপী কহিল—"তা আর হয় না? অমন বর পছন্দ হয় না কার? কত ভাগ্যে অমন পতি মেলে! আপনি যদি তাকে দেখতেন, দিদিমণি, তাহলে আপনারও তাকে পছন্দ হত।"

বিজলী নিজের মনের ভাঁড়ারঘরটি খুঁজিয়া দেখিল—অসীমের স্মৃতির কয়েকটি গুঁড়া এখনও সেখানে পড়িয়া আছে: টেঁপী মিথ্যা বলে নাই। জিজ্ঞাসা করিল—"এখনো যদি সে রাজী হয়, তাহলে তুমি তাকে বিয়ে কর'?"

টেঁপী কহিল—"না, আর করব না, কিছুতেই করব না।" বলিতে বলিতে টেঁপী উত্তেজিত হইয়া পড়িল। তাহার আয়ত চক্ষু দুইটি সজল হইয়া উঠিল।

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ভাই? করবে না কেন?"

টেঁপীর কণ্ঠ ভারী হইয়া আসিল। কহিল—"ক্যানে কি আবার? করব না। এম্‌নিই—"

বিজলী বুঝিল, মেঘবন্দিনী বিদ্যুৎবালার মেঘের হাত হইতে ছুটিয়া পলাইবার ভাণে, মেঘের বুকেই ঝাঁপাইয়া পড়ার অব্যক্ত পুলকের মত, টেঁপীরও এই ছলনা।

টেঁপী কহিল—"যখন একমণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচ্‌বে না, তখন আর সে কথায় কাজ কি? যা' হবার লয়, তা লিয়ে মন খারাপ করে আর কি করব? তবে কি জানেন—"

বিজলী কহিল—"থাম্‌লে কেন? বল!"

টেঁপীর চক্ষুতে শ্রাবণের কালো ছায়াটি গাঢ়তর হইয়া উঠিল। কহিল—"বিয়ে হল না, হল না। দশ জায়গায় কথা হয়, এক জায়গায় বিয়ে হয়। এ হয়েই থাকে। তার জন্যে আমার ততটা দুঃখ লয়, যতটা দুঃখু আমার ছোটবাবুর ব্যবহারে হয়েচে! আমাদের বিয়ে হবেই, এ কথা গাঁয়ের ইতরভদ্র সবাই জান্‌ত। কৈ, তিনি তো জানান্ নাই যে, আমাকে তিনি বিয়ে কর্‌বেন না! আমাকে আশা দিয়ে রাখবার তাঁর কি দরকার ছিল? আমি যে তাঁর আশা করেই বসে-ছিলাম, দিদিমণি! তারপর যেদিন কথা ভাঙল, সেদিন ভাল করে' ভদ্রলোকের মতন বল্‌লেই তো হত! তা লয়, আমি মুখ্যু, আমি

দেখতে বিচ্ছিরি, আমরা গরীব, আমার বাপ জজ ছিল না—এত সব খোঁটা দেবারই বা কি দরকার ছিল ?”

বিজলী সস্নেহে টেঁপীর চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল—“তা’ সত্যি !”

টেঁপী কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া কহিল—“তাইত বল্‌চি, দিদিমণি, আর সে কথায় কাজ নাই। আমার মন ভেঙে গিয়েচে, আর সে সাধ্‌লেও আমি তাকে বিয়ে কর্‌চি না।”

বিজলী টেঁপীর মনের আরও একটু খবর চায়। কহিল—“তাহলে অবিশ্যি আর তাকে বিয়ে করা উচিতও নয়। তবে এইবার ভূষণের সঙ্গেই হয়ে যাক্ সাতপাকটা, আমরা দু’খানা লুচি খাই—”

টেঁপী চমকিত হইয়া কহিল—“সে কি কথা, দিদিমণি! ঘুঁটুকে দাদাকে বিয়ে কর্‌ব কি ? ওকেই যদি বিয়ে কর্‌ব, তবে কল্‌কাতায় এলাম ক্যানে ?”

বিজলী আকাশ হইতে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল—“কেন, ভূষণের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা কিছু হয় নি ?”

টেঁপী তাচ্ছিল্যভরে কহিল—“কোথা ? কোনো কথা নাই। মা বরং এক-আধবার আমাকে বলেছিল, কিন্তু আমি রাজী লই। ঘুঁটুকেকে বিয়ে কর্‌ব কি ? ও কি আমার যুগ্যি ? ওকে বিয়ে করার চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে, গঙ্গার জলে ডুবে মরাও ঢের ভাল। ছি ছি—ও কি একটা মানুষ, দিদিমণি ? সাতজন্ম বিয়ে না হয়, সে-ও ভাল।”

বিজলী কহিল—“বেশ, ভূষণকে না হোক্—বিয়ে তো একটা কাউকে কর্‌তে হবে—”

টেঁপী কহিল—"কেন, ঘুঁটুকে যে বলেছিল, বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গে কল্‌কাতায় আমাদের বিয়ে দিয়ে দেবে ?"

বিজলী কহিল—"কৈ ? তাতো জানি না, ভাই।"

টেঁপী কহিল—"মরুক্ গে, সে পরে হবে। ঘুঁটুকে আর এ কি করবে, এ আমি নিজেই ঠিক করে লোবো। রাজধানী শহরে যখন এইচি, তখন আর ভাবনা কি ? আমি এখন চাই, ঐ ছোটবাবুকে জব্দ করে, আমার অপমানের বদ্‌লা নিতে! কি করে' সেটা হয় বলুন্ তো ?"

বিজলী কহিল—"এ কি করে হবে ভাই ? সে থাকে কোথা, আর তুমি আছ কোথা! সে হল জমিদার, পয়সাওয়ালা—তুমি হলে গরীব প্রজা। সে পুরুষমানুষ, তুমি মেয়েমানুষ। তুমি তার কি করবে ভাই ? মিছেমিছি, এ সব উদ্ভট কথা ভেবে মনকে উত্তেজিত কর' না। আমার কথা শোন, মন থেকে এ সব পাগলামী আর ছেলেমানুষী ঝেড়ে ফেলে দাও।"

গম্ভীরভাবে অপ্রসন্ন মনে টেঁপী কহিল—"থাক্, বুঝিচি—এ আপনার কাজ লয়। যার কাজ তারে সাজে, অপরকে লাঠি বাজে।"

বিজলী দেখিল, টেঁপীর মনের মৈনাক সাগরগর্ভ হইতে কূলে উঠিবার পথ খুঁজিতেছে।

টেঁপী জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, শীলার কি অসুখ তাতো বললেন না, দিদিমণি—? এ কথাটা আপনারা আমায় এত লুকুচেন ক্যানে বলুন তো ? নিশ্চয় কোনো খারাপ ব্যামো—লয় ?"

বিজলী কি উত্তর দিবে, চট্ করিয়া ভাবিয়া না পাইয়া, কহিল—"পরে বলব, ভাই—"

টেঁপী কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া কহিল—"এখনো আপনি আমায় ভোগা দিয়ে লুকুতে চাইচেন্? কিন্তু আমি সব জান্‌তে পেরেচি।"

বিজলী বিরক্ত হইয়া কহিল—"জান? কি জান?"

টেঁপী সগর্ব্ব হাস্যে কহিল—"আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে আপনি এড়িয়ে যান, নিটু ধাইকে সুধুলে, সে মুচকি হাসে। আমি বুঝলাম, নিশ্চয় এর মধ্যে তাহলে কোনও ঘটনা আছে! তক্কে তক্কে রইলাম। তারপর, কাল ওর গা দেখে বুঝতে পারলাম—আসল ব্যাপার! ধর্ম্মের কল বাতাসে ঘোরে। ইনি জজের মেয়ে—আমাদের দেশের জমিদারের ন্যাকাপড়া-জানা হবু বৌ! জমিদারের বিয়েতে আমাদিকে সেলামী দিতে যেতে হবে যে—"

বিজলী স্তম্ভিত হইয়া, টেঁপীর মুখের দিকে চাহিল। টেঁপী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মাথার উপর অন্ধকার বৃক্ষশাখায় একটা কাক আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া পাখা ঝাপ্‌টাইল: অদূরে একটা পেচক ডাকিতে ডাকিতে ইহাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। এ হাসির শব্দ বিজলীর কাণে প্রেতের অট্টহাস্যের মত ধ্বনিত হইয়া, তাহার মনে অজ্ঞাত একটা ভয়ের আবেশ সঞ্চার করিয়া দিল! টেঁপীর চোখ দুইটা অন্ধকারে বাঘের চোখের মত জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

সত্যসত্যই বিজলীর মাথাটা এতক্ষণে ধরিয়া উঠিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

বর্ষণক্লান্ত শ্রাবণশেষের আকাশে পীড়াপাণ্ডুর মুখের মত ফ্যাকাশে মেঘগুলি দুর্ব্বলভাবে এদিক-ওদিক চলাফেরা করিতেছে: তন্দ্রাহত সূর্য্যদেবতা আকাশ-সভায় একাকী বসিয়া ঢুলিতেছিলেন: কয়েকদিন দিবারাত্র জলযুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া শাখাপত্রের স্নিগ্ধশ্যামল পটমণ্ডপে পবনদেব বিশ্রামসুখে নিমগ্ন: সদ্যক্ষান্ত সমরাঙ্গনে হতাহত সৈনিকগণের মত আবর্জ্জনা-বহুল পথ: ধরণীর স্নেহাতুর বক্ষ ভেদ করিয়া সকাতর দীর্ঘশ্বাসের উষ্ণতায় নরনারী চঞ্চল।

বিজলী দুয়ার-জানালা-বন্ধ অন্ধকার কক্ষকুট্টিমে ভূমিশয্যায় বিনিদ্র ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। মাথার উপর বিদ্যুৎ-বীজনী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বিজলীর দেহে-মনে শৈত্যের স্পর্শ জাগাইতে পারিতেছে না। কক্ষান্তরে স্বপ্নলোকযাত্রায় নিস্তারিণীর দিবানিদ্রার জয়রথ ঘর্ঘর নির্ঘোষে অব্যাহত চলিয়াছে। নির্জ্জনসুলভ নৈঃশব্দে সেই নাসিকানিনাদ বাড়ীখানিতে তবু জীবনাধিবাসের সঙ্কেত ঘোষণা করিতেছিল।

টেঁপী ক্ষেন্তি ও বুঁচি ইস্কুলে গিয়াছে। প্রায় এক সপ্তাহ হইল নিকটস্থ "প্রগতি বালিকা বিদ্যালয়ে" ভর্ত্তি হইয়া, ইহারা বিদ্যার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বুধ, শনি ও রবিবারে "সঙ্গীত-ভারতী"তে সঙ্গীত ও নৃত্যশিক্ষা করে। দুইটী বিদ্যালয়েই ভূষণ ইহাদিগকে বিনা বেতনেই ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে। ইহার জন্য ভূষণ কত দিন ঘুরিয়া, কত লোকের দ্বারস্থ হইয়া, তবে এই সুপারিশ দুইটী জোগাড় করিয়াছে।

ভূষণ অন্য ঘরে গভীর মনোযোগসহকারে বই খাতা ও দোয়াতকলম লইয়া, বিজলীর অতি-মনোযোগী ছাত্ররূপে গোপনে লেখাপড়া শিখিতেছে। পাছে টেঁপীরা জানিতে পারে—ভূষণ লেখাপড়া জানে না, তাই সাধারণত টেঁপীরা ইস্কুলে গেলে, দ্বিপ্রহরে সে মা-সরস্বতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করে। তাহার মনে অত্যন্ত ধিক্কার জন্মিয়াছে: সামান্য একখানা চিঠিও সে পড়িতে পারে না! এখন হইতে ছিনেমায় তাহার ডাইনোক থাকিবে, পড়িতে না জানিলে, কি করিয়া সে তাহা মুখস্থ করিবে? অলিন্দিতা ছবিতে সে জমিদার, মস্ত পাট—মুখস্থ করিতে হইবে ত? অতএব লেখাপড়া জানা বিশেষ প্রয়োজন।

অতিকষ্টে সে নিজের নামটি পর্য্যন্ত সহি করিতে পারে! কেশব চক্রবর্ত্তীর কন্যা টেঁপী যেটুকু বাংলা লিখিতে ও পড়িতে পারে, সেটুকুও সে জানে না! এ কথা রাষ্ট্র হইলে, ইহাদের কাছে তাহার আর মুখ দেখাইবার পর্য্যন্ত জো থাকিবে না! আর তাহা হইলে, এমন মূর্খকে টেঁপী বিবাহ করিতেও রাজী না হইতে পারে। কাজেই, টেঁপীরা ইস্কুল গেলেই সে বই-খাতা লইয়া বসে এবং প্রাণপণে অ, আ, ক, খ লিখে, আর অচল-অধম মুখস্থ করে। উহারা বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বেই মা-সরস্বতীকে গোপন করিয়া, ভূষণ মা-ভগবতীদের সেবায় নিযুক্ত হয়।

গত কল্য শীলা সুস্থ হইয়া বিদায় লইয়া গিয়াছে। বিজলী একা শুইয়া কেবল শীলার কথাই ভাবিতেছিল। বিজলী সরলতার অভিনয় করিয়া, শীলার নিজের মুখে অনেক কথাই জানিয়া লইয়াছে।

শীলাকে প্রথম হইতেই বিজলী বড় সুনজরে দেখে নাই: শীলাকে সে হিংসা করিত: শীলার সমাগতপ্রায় সৌভাগ্যে সে ঈর্ষিত হইয়া

ছিল: এক যাত্রায় পৃথক ফল ফলে—বিজলী তাহা চায় না। তাহার যাহা হইয়াছে, শীলারও তাহাই হউক। বিজলী বরাবর মতলব আঁটিতেছিল, কি করিয়া এই গুপ্ত কাহিনী প্রকাশ করিয়া দিয়া, তাহাকেও দলে টানে। সে কাঁদিবে, মাথা কুটিয়া রক্তাক্ত হইবে, আর্ত্তনাদ করিবে, আছড়াইয়া পড়িবে, আত্মহত্যা করিতে যাইবে—বিজলী দূর হইতে দেখিবে, আর উপভোগ করিবে! সমাজ রক্ষার জন্য নীতির ও পবিত্র কৌমার্য্যের দোহাই দিয়া, যাহারা শীলাকে সমাজচ্যুত করিবে, তাহাদেরি কেহ কেহ অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া শীলার দুয়ারে আসিয়া তাহার প্রসাদ ভিক্ষা করিবে—শীলা অগত্যা তাহাদের সেবা করিতে প্রস্তুত হইবে! বিজলী দেখিবে আর হাসিবে!

সেই জন্য শীলার মৃত্যুবাণও বিজলী তৈরি করাইয়া রাখিয়াছে। ইচ্ছা করিলেই, বিজলী শীলাকে সবংশে বধ করিতে পারে: শীলার চিঠি দুইখানির ফটোগ্রাফ করাইয়া সে সযত্নে রাখিয়া দিয়াছে। এই ফটো দুইখানিই হইবে তাহার প্রধান প্রমাণ। আর চাই কি? ইহা ছাড়া টেঁপী আছে, টেঁপীর মা আছে।

নিজের অজ্ঞাতসারেই বিজলী হাসিয়া ফেলিল; নিজের হাসির শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। ধড়মড় করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া, বিজলী উচ্চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিল; কিয়ৎক্ষণ কাণ পাতিয়া রহিল: কেহ শুনিয়া ফেলিল না ত?

তাহার মনে হইল—যাহার জন্য সে এমন নাগপাশরচনা ও জাল বিস্তার করিতেছে, সেই শীলা তো ইহাকে এতটুকুও অবিশ্বাস করে নাই। শীলাকে সে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, শীলা তাহার সত্য উত্তর দিয়াছে।

শীলা যে সত্য কথাই বলিয়াছে, বিজলী তাহা জানে ঃ না জানিলে ভাবিত, শীলা মিথ্যাই বলিতেছে ঃ এক্ষেত্রে সত্য কথা কি কেউ কখনো বলে?

সজল চোখে শীলা বলিয়াছে—তাহার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সবই যখন তাহার হাতে, তখন বিজলীকে সে কোন কথাই লুকাইবে না। পরম গোপনীয় পাপকাহিনীই যখন বিজলী জানে, তখন অন্য পরিচয়ই বা সে কেন গোপন করিতে যাইবে? বরং পরিচয় না দিলেই, তাহার আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ হইবে না।

শীলা স্বীকার করিয়াছে—প্রথমটা সে বিজলীকে লজ্জা করিত, তাহার পর ভয় করিতে আরম্ভ করিল; পরে বুঝিল, যাহার হাতে তাহার জীবন-মৃত্যু, তাহাকে আবার লজ্জা ভয় কিসের? যাহার জন্য সে নবজীবন লাভ করিল, যাহার দায়িত্বে এবং সেবায়, সে আবার স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে চলিয়াছে, তাহার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মদান না করিলে, অকৃতজ্ঞতা হইবে। এই তিন সপ্তাহকাল যে নিজেকে বিপন্ন করিয়া, অম্লানবদনে দিদির গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে, সে সত্যই দিদি! প্রাণ যে দেয়, প্রাণ রক্ষা করিবার শক্তিও সে-ই দেয়। বিজলীর ব্যবহারে শীলা এমনি মুগ্ধ, যে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে—যদি এই ব্যাপার লইয়া কেউ কখনো তাহাকে বিপন্ন করিতে প্রয়াস পায় তো, একমাত্র বিজলীই তাহাকে রক্ষা করিবে!

বিজলী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"কেন? আমার উপর তোমার এ-ধারণার হেতু?"

শিশুর মত সরলভাবে শীলা বলিয়াছিল—"তা জানি না, দিদি, তবে আমার মন তাই বলচে। মন কখনো মিছে কথা বলে না।"

বিজলী শীলার কথায় প্রথম হইতেই সন্দেহ করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, তাহাকে খুশী করিবার জন্যই হয়তো সে ঐরূপ বলিতেছে। কিন্তু পরে অনুভব করিল—একটি বর্ণও সে মিথ্যা বলে নাই। তাহার বচন, বাচন এবং লোচনে মিথ্যার এতটুকু চিহ্ন ছিল না। মিথ্যা কথা বলা আফিমের মত নেশা, যাহা সহজে ছাড়া যায় না, এবং যাহার মাত্রা সরিষা হইতে কাবুলী-মটরের আকারে ক্রমশই বাড়ে। নেশাখোরের কথায়, ভঙ্গীতে, ব্যবহারে এবং চেহারায় নেশা আত্মপ্রকাশ করেই। শীলার মধ্যে বহু চেষ্টা করিয়াও, বিজলী সেরূপ কোনো প্রমাণ খুঁজিয়া পায় নাই। বিজলীর নিকট শীলা বরাবর নিঃসঙ্কোচে আত্মনিবেদন করিয়া, সরল আন্তরিকতারই পরিচয় দিয়াছে।

বিজলীর অন্তর গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল। ঘুমন্ত এই শিশুর বুকে সে ছুরি মারিবার কল্পনা করিতেছে? সে তো কম অমানুষ নয়? এ তাহার কি অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি? শীলা তাহার তো কোনও অনিষ্ট করে নাই। বরং তাহার সেবা করিয়া, এই তিন সপ্তাহ কালের মধ্যে সে পাঁচ শত টাকা উপার্জ্জন করিল! কি শিক্ষা ও সভ্যতার অভিমান সে করে? এই তাহার বিবেচনা? এই তাহার স্নেহ? এই তাহার বিশ্বাস-রক্ষা? বিশ্বাসঘাতকতা করিতে যদি সে এতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তবে একথা তখন সে তাহাকে জানায় নাই কেন?

বিজলী আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল: বিশ্বাসঘাতকতা করিতে সে যে ওস্তাদ! মনে নাই? যতীন্‌কে সে ঠকাইয়াছিল! ঠকাইয়াছিল বটে, কিন্তু তদ্বারা নিজেই এমন ঠকিয়াছে, যে গৃহহারা সর্ব্বস্বান্ত পর্য্যন্ত হইয়াছে। তবু বিশ্বাসঘাতকতার প্রবৃত্তি তাহার

গেল না? শীলাকে জব্দ করিবে! শীলাকে জব্দ করিয়া লাভ? শীলা শরণাগত, কৌশলে তাহার জীয়ন-কাঠি মরণ-কাঠি হস্তগত করিয়া, তাহার সরলতার সুযোগ লইয়া, তাহাকে করতলগত করিয়া, তাহাকে জব্দ করিবে! বাঃ—কি বীরত্ব! বীরত্ব দেখাইতে হয়তো যাও না, আনন্দ গুপ্তর কাছে? কেন? যে তাহার এত বড় সর্ব্বনাশ করিল, যাহার জন্য সে আজ জীবন্ত প্রেত—তাহাকে জব্দ করিবার তো কখনও ইচ্ছা হয় না? সাহস হয় না। সে শক্ত—আর এ দুর্ব্বল, এই জন্য, না? অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে একফোঁটা মেয়ে ঐ টেঁপীও গ্রামের জমিদারের উপর প্রতিহিংসা লইতে মরণপণ করিতে পারে, আর সে দুর্ব্বলকে নির্দ্দোষীকে শরণাগতকে হত্যা করিবার জন্য পৈশাচিক উল্লাসে উন্মত্ত!! কে যেন তাহাকে বজ্রগম্ভীর ভাষায় বলিল—বিজলী, সত্যই তুই মহাপাতকী।

বিজলী শিশুর মত হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অনেক-ক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল: কাঁদিয়া এমন আরাম বিজলী আর কখনও অনুভব করে নাই। আত্মগ্লানিতে তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনের বিষ চোখের জলে কতকটা ধুইয়া গিয়া, বিজলী দেখিল—তাহার মনের বেতসলতায় শীলা একটি ফুলের মত ফুটিয়া, মৃদু বাতাভিঘাতে নিশ্চিন্ত পুলকে দুলিতেছিল।

শীলা বিজলীকে চিনে না, তাই সে বলিয়া গিয়াছে, বিজলীকে সে তাহার গৃহে লইয়া যাইবেই। পাছে তাহার মুখোস্ খুলিয়া পড়ে তাই বিজলী যাইতে রাজী হয় নাই। বিজলী যাইবে না শুনিয়া, শীলার ডাগর চক্ষু দুইটি বর্ষার কাজলদীঘির মত টলটল করিয়া

উঠিয়াছিল। এত স্নেহ তাহাকে কেউ করে নাই। আর সে প্রতিদানে—

বিজলী আর ভাবিতে পারিল না। প্রতিজ্ঞা করিল, শীলার যাহাতে একগাছি কেশও কেহ স্পর্শ করিতে না পারে, তাহার জন্য সে যথাসাধ্য করিবে। বিজলী আর বিশ্বাসভঙ্গ করিবে না। এতদিন তাহার পাপে সে নিজেই দগ্ধ হইয়াছে, এখন হয়ত তাহার পাপ তাহার পুত্রকে গিয়া লাগিবে। পুত্রের অমঙ্গল হইতে পারে। পুত্র না জানুক্, জগৎ না জানুক্, সে তো জানে—আর জানেন অন্তর্যামী! এ পথটা সে তো ভাল করিয়াই দেখিল। আর কেন? এইবার ছেলের কল্যাণের জন্য, তাহাকে ভাল হইতেই হইবে!

রাখে হরি তো মারে কে? মারে হরি তো রাখে কে? এমনি অবস্থায় হরি তাহাকে রাখেন নাই, মানুষ বহু চেষ্টা করিয়াছিল তাহাকে রাখিতে, কিন্তু পারে নাই সে মরিয়াছে। শীলাকে যদি হরি রাখেন? তাহার মত লক্ষ লক্ষ বিজলী আর টেঁপী, হাজার হাজার ফটো লইয়া চেষ্টা করিলেও, শীলাকে কেহ মারিতে পারিবে না। এ চিন্তা করা বৃথা।

তাহার নিজের বেলায় সে যেমন দায়ী নয়, শীলাও তাই। সে-ও প্রবঞ্চিতা। সরলা অনূঢ়া যুবতী সে—অদূরদর্শিনী, অল্পবুদ্ধি পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে! দেহমনের সরসীতে যেদিন তাহার মনোজ প্রথম শতদল মেলিল, সেই দিনই সে হইল পঙ্কিল। শুধু নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই। সে ভুল করিয়াছে! ভুলের মাশুলও সে পূরাই দিয়াছে! গুরুতর শাস্তি পাইয়াছে! সে বুঝিয়াছে, কোন্‌টা পথ কোন্‌টা বিপথ! একবার বিপথে পা দিলে আর কি সে পথে উঠিতে পারিবে না? যাহার সে সুযোগ ও সুবিধা আছে, নিশ্চয়ই সে আসিবে। আসা উচিত।

গোপনে কত কি যে নিত্য ঘটিতেছে, কে তাহার সন্ধান রাখে? শীলার এই ইতিহাস যদি অজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলেই তো তাহার জিত। কেন অজ্ঞাত থাকিবে না? কেনই বা শীলা কালরাত্রির এই দুর্ঘটনাটি গোপন করিবে না? পথভ্রষ্ট হইয়া বিপথের কাঁটার পরিচয় সে ভাল করিয়াই পাইয়াছে, সে এইবার সতর্ক হইতে পারিবে। বসন্তরোগের বিষ শরীরে ঢুকাইয়া, বসন্তের আক্রমণ প্রতিরোধ করার রীতি চিকিৎসাশাস্ত্রানুমোদিত! শীলা দেহে কলঙ্কের বিষ লইয়া স্খলনকে প্রতিরোধ করুক, সতীত্বের রাজটীকায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হউক। বিজলী নিশ্চয়ই শীলাকে সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করিবে।

কেন করিবে না? দুশ্চরিত্র পুরুষের যদি সাধ্বী রমণীর স্বামী হইবার স্পর্দ্ধা থাকে, তাহা হইলে ধর্ষিতারই বা সচ্চরিত্র স্বামীর স্ত্রী হইবার অধিকার থাকিবে না কেন? স্ত্রীলোক কি কাচের বাসন যে পড়িলেই ঠুক করিয়া ভাঙিয়া যাইবে? যে হিন্দুসমাজ চুল চিরিয়া বিচার করিয়াছে—ক্ষণভঙ্গুর দেহ কিছুই নয়, আত্মা অবিনাশী! তাহার একি অধঃপতন? দেহের এই অতিপ্রাধান্য আর দেহসর্ব্বস্বতা কি ধর্ম্মবিরুদ্ধ নয়? স্ত্রীলোকের যেন আত্মা নাই, দেহটাই তাহার সব! কোনও কারণে দেহের অপবিত্রতা ঘটিলে, তাহার আত্মাকে পর্য্যন্ত নরকস্থ করিতে না পারিলে—হিন্দুধর্ম্ম যেন জাহান্নামে যাইবে! দেহের কলঙ্ককে এমন অকারণ বড় করিয়া আর কোনও সমাজে প্রদর্শিত হয় নাই! খৃষ্টান্ বা মুসলমান্ সমাজে নারীকে এমন কাচের বাসন করিয়া রাখে নাই বলিয়া কি, তাহাদের কোনও ক্ষতি হইয়াছে? বরং আজ পৃথিবীতে হিন্দু অপেক্ষা তাহাদের সংখ্যাই সমধিক।

নারীর দেহের উপর শক্তিমান্ পুরুষের একাধিপত্যের মনোবৃত্তি শুধু বর্ব্বর যুগেই ছিল না, বর্ত্তমান সভ্য যুগেও তাহার পূরা জের চলিয়া আসিয়াছে। প্রভেদ এই, যে তখন অপহারকের সঙ্গে পতির দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইত, এখন সে সাহস নাই বলিয়া, পুরুষকে ছাড়িয়া দুর্ব্বলা নারীকে পথে বসাইয়াই প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয়। সে ছিল পৌরুষের যুগ, এ হইয়াছে নির্ব্বীর্য্য কাপুরুষের অত্যাচার। বিজলী এ অত্যাচারের প্রশ্রয় দিবে না।

বিজলীর মনে পড়িল—অনেক যুবক আজকাল সাধারণ গণিকাকে পর্য্যন্ত বিবাহ করিতেছে। ইহারা যদি কুলগৌরব পায়, তো শীলা কেন পাইবে না? শীলার মন ত পতিত হয় নাই, দেহই অপবিত্র হইয়াছে। বিজলী ভাবিতে লাগিল: যাহাদের দেহ আজও পত্যন্তর কর্ত্তৃক কলঙ্কিত হয় নাই, তাহাদের দেহের মত মনেও কি কখনও কোন কালে কোনও অভীপ্সা জাগে নাই? দেহ পাথর, তাহাকে লুকাইয়া বা তালা বন্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু মন তো কাহারও কোনও শাসন মানে না! এ অনিরুদ্ধকে রোধ করে, এত বড় শক্তিমতী নারী কি এতই সুলভ? ঘরে ঘরে? বিজলীর মনপ্রাণ এক সঙ্গে তাহাকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। মন বলিল—মিথ্যা কথা! ষড়রিপুর অধীন মন এত বড় পরমহংস নয়। মন ঠিকই চায়, মুখে তাহারা স্বীকার করে না—ক্ষতির ভয়ে, শাস্তির বিভীষিকায় এবং সাহসের অভাবে। সংসারে সেই সতী—যে মুখে মনের কথা প্রকাশ করে না: অপরাজেয়কে জয় করিবার জন্য দিবারাত্রি সংসারে ডুবিয়া থাকে: সামাজিক মর্য্যাদা হারাইতে এবং দুঃখকষ্টকে বরণ করিতে ভয় পায়।

মন যদি অপবিত্র হয়, তাহা হইলে দেহের অপবিত্রতা অপেক্ষা সে যে ঢের বেশী ক্ষতিকর। শীলার দেহ হয়ত অপবিত্র হইয়াছে, কিন্তু মন হয় নাই! দেহের ময়লা ঝাড়িলে যায়, মনের কালি মরিলেও উঠে না।

হঠাৎ বিজলীর দুয়ারে মৃদু করাঘাত হইল। বিজলীর চিন্তা সূত্রগুলি মধ্য পথে ছিঁড়িয়া গেল। চমকিয়া উঠিয়া কহিল—"কে?"

নিরুত্তর। আবার করাঘাত!

বিজলী তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিতেই দেখে, আরক্ত মুখে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া নিটু উপস্থিত। বিজলী অবাক্। অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া, জিজ্ঞাসা করিল—"এই দুরন্ত গরমে, বেলা দু'টোর সময়, হঠাৎ আপনি যে?"

নিটু ধীরে ধীরে পাথার নীচে বসিয়া কহিল—"আপনার কাছে একদিন আসব বলেই তো গিয়েছিলাম, সুদক্ষিণা দেবী—"

বিজলীর মনটা এখন অন্য সুরে বাঁধা। কহিল—"আমার আসল নাম সুদক্ষিণা নয়, ভাই। যত দিন সুদক্ষিণা সাজবার প্রয়োজন ছিল, ততদিন তাই ছিলাম, এখন আর কেন? আমি চিত্রাভিনেত্রী বিজলী।"

নিটু পুলকিত হইয়া বিজলীর মুখের দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদু হাস্যের সহিত কহিল—"আমি সেটা জান্‌তাম, বিজলীদি।"

বিজলী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"জান্‌তেন্? কি করে?"

নিটু কহিল—"আপনাকে সুবোধ রায়ের সঙ্গে একদিন প্ল্যাজা সিনেমায় দেখেছিলাম।"

বিজলী আকাশ হইতে পড়িল। হঠাৎ তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তিই হইল না।

নিটু কহিল—"আমি আপনার কাছে এসেচি, দিদি, আমার একটি উপকার কর্‌তে হবে আপনাকে—"

বিজলী অভয় দিয়া কহিল—"বলুন্, আমার সাধ্যে যদি কুলোয়, নিশ্চয় করব। ব্যাপার কি?"

নিটুর চোখের কৌতুক-বসন্ত কাটিয়া গিয়া, সেখানে শ্রাবণ-দিনের জলভরা মেঘোদয় হইল। কহিল—"জীবানন্দ বাঁড়ুয্যেকে আমি একটা শিক্ষা দিতে চাই, আপনাকে আমার সহায় হতে হবে, যদি আপনার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ ক্ষুণ্ণ বা অসুবিধা না হয়।"

নিটুর কথার শেষের ইঙ্গিতটি বুঝিয়া, বিজলী সলজ্জভাবে কহিল—"ও পাষণ্ডের সঙ্গে আমার কোনো স্বার্থই জড়িত নাই। ওকে আমি এর আগে কখন দেখিও নি। আমার এক বন্ধু এই শীলার ব্যাপার নিয়েই, ওর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেয়। সে কাজ হয়ে গেছে, তার সঙ্গে আমার আর কোনও সম্বন্ধই নাই।"

নিটু গম্ভীরভাবে কহিল—"আমি তাই আন্দাজ করেছিলাম, তবু সন্দেহভঞ্জন করে নিলাম। আলাপ করে দিল কে? ভট্‌চাজ সাহেব?"

বিজলীর বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। অভিভূতের মত বিজলী কহিল—"প্রকাশ ভট্‌চাজের কথা বল্‌চেন?"

নিটু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

বিজলী কহিল—"না, তিনি নন্। তাঁকেও জানেন দেখ্‌চি—"

নিটু ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"হাঁ, একটু একটু জানি বৈকি?"

বিজলী কহিল—"আপনার তো কোনো পরিচয়ই দিলেন না! এইবার আপনার কথা বলুন্। আমি যে বিস্ময়ে ফেটে মরে' যাচ্ছি।"

নিটু জিজ্ঞাসা করিল—"তাঁকে কতদিন থেকে জানেন, বিজলী-দি?"

বিজলী আবদারের সুরে জানাইল—"আমি আর এতটুকু মুখ খুল্‌ব

না, যতক্ষণ আপনি আপনার আসল পরিচয়টি আমায় না দিচ্ছেন—”

নিটু প্রসন্নভাবে স্বীকৃত হইয়া কহিল—“বেশ, আপনি যা’ জান্‌তে চান্, আমায় জিজ্ঞাসা করুন্। আমি বল্‌চি!”

বিজলী সপ্রতিভ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—“ঠিক বল্‌বেন তো?”

নিটু একটু আহত স্বরে কহিল—“মিছেই যদি বলি, তাহ’লে বলার এ অভিনয় না কর্‌লেও তো চল্‌ত। মিছে কথা বলি না বলেই, আমি লোককে এড়িয়ে চলি। আপনি অত চেষ্টা করেও, পনের দিনের মধ্যে আমার একটা কথাও কি জান্‌তে পেরেছিলেন?”

বিজলী বুঝিল। নিটু যাহা বলিল তাহার সারার্থ এইরূপ: সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সে মেয়ে। তাহারা পাঁচ ভগিনী। নিটুই কনিষ্ঠা। পাঁচটি মেয়েকে পড়াইতে, ভরণপোষণ করিতে এবং চারটির বিবাহ দিতে, পিতা সর্ব্বস্বান্ত হন। দুশ্চিন্তায় তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কিছুদিন ভুগিয়া তিনি মারা যান। বসত-বাড়ীটিও দেনার দায়ে মহাজন ডিক্রি করিয়া লয়। নিটু সেবার আই-এ পাশ করে। নিটুর মা নিটুকে লইয়া বিপন্ন হন্, এমন সময় প্রকাশ ভট্টাচার্য্য বিনাপণে, এমন কি তাঁহার জননীকে নগদ কিছু টাকা পর্য্যন্ত ঘুঁষ দিয়া, নিটুকে বিবাহ করিল। মা ও মেয়ে দুইজনেই হাতে স্বর্গ পাইল।

প্রকাশ নিটুকে বিবাহ করিয়া তবে জানাইয়াছিল যে, সে বিবাহিত-পূর্ব্ব। পূর্ব্বস্ত্রীও তখন বর্ত্তমান। নিটু মুষড়াইয়া পড়িল। কন্যার দুঃখে তাহার জননীও শয্যা লইলেন এবং সেই শয্যাই হইল তাঁহারও শেষশয্যা! নিটুকে অগত্যা প্রকাশ বাড়ী লইয়া গেল।

নিটু বাড়ী ঢুকিতেই সংসারে মরাকান্না পড়িল। প্রকাশের প্রথমা পত্নী

উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিল। শ্বাশুড়ীর বাপের বাড়ীর সম্পর্কে সে বৌ ছিল তাঁহার আত্মীয়া, কাজেই নিটুর উপর আরম্ভ হইল শ্বাশুড়ীর অত্যাচার। স্বামী কিন্তু সত্যই তখন ভালবাসিত, যদিও মুখে মায়ের অন্যায়ের কোনও প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইত না। এ সাহস-অভাবের কারণ এ নয় যে, প্রকাশ অত্যন্ত মাতৃভক্ত পুত্র। আসল কারণ, মায়ের হাতে ছিল সমস্ত নগদ টাকা—বহু লক্ষ! পাছে মা সেই টাকার ভাগ না দেয়, প্রকাশ তাই সব বিষয়েই মায়ের মন জোগাইয়া চলিত। মা ছিল রায়বাঘিনী।

নিটুর উপরে, প্রেম ঠিক বলা যায় না, প্রকাশের একটা গভীর আকর্ষণ ছিল। ইহা লইয়া সংসারে সদাসর্ব্বদা একটা-না-একটা খিটিমিটি লাগিয়াই থাকিত। নিটু নীরবে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিত।

স্বামীর বাড়ীতে জীবন দুর্ব্বিষহ ঘটিলে, যমের বাড়ীই লোকের কাম্য হয়ঃ যেমন তাহার সপত্নীর হইয়াছিল। পথও সে জানিত, কিন্তু বটতলা ছাড়িয়া, নিমতলার পথে যাইতে তাহার পা উঠিল না।

ক্রমশ ইহাদের দুইজনেরই জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। প্রকাশ ঠিক করিল, ধার করিয়াও ছোট একটা বাড়ী সে কিনিবে এবং সেইখানে স্বামী-স্ত্রীতে বসবাস করিবে। পৈতৃক সম্পত্তির প্রাপ্য অংশ বিক্রি করিয়া যাহা হয় মোটা কিছু পাইবে ত? মা যদি নগদ টাকা না দেয়, নাই দিবে! স্বামী তাহার তত সত্যই তেমন খারাপ ছিল না।

এই সময় প্রকাশের এক পরম বন্ধু জুটিল জীবানন্দ। ব্যারিষ্টার-বন্ধু সংপরামর্শ দিল—তুচ্ছ স্ত্রীর জন্য জননীর বিষ-নজরে পড়িয়া নগদ চার-পাঁচ লক্ষ টাকার হিস্যা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত অসমীচীন এবং জননীর মনে কষ্ট দেওয়াও বিশেষ গর্হিত। শেষোক্ত কার্য্যটি নাকি মহা

পাপও। নির্দ্দোষ স্ত্রীর উপর তখন যে অকথ্য অত্যাচার হইতেছিল, সেটা বিশেষ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য হইল না!

প্রকাশ জীবানন্দকে একটি মহাপুরুষ জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিত। কারণ, বহু অভিজাত ঘরের কন্যার ও বধূর সে সর্ব্বনাশ করিয়াছে। নিটুর উপরও তাহার দৃষ্টি ছিল: কিন্তু এখানে সোজা পথে সুবিধা করিতে না পারিয়া, তাহাকে বিপন্ন করিয়া হস্তগত করিবার সে এক মতলব করিল। নিটুকে শুনাইয়া সে প্রকাশকে উক্ত সৎপরামর্শ দিত। ভাবিয়াছিল, গরীবের মেয়ে নিটু ঘুঁষ দিবার অভিপ্রায়েও যদি জীবানন্দকে আত্মনিবেদন করে! প্রকাশ কুশ্রী, বয়সও একটু বেশী, জীবানন্দ সুশ্রী, তাহার ধারণা সে তরুণ কন্দর্প, — সুতরাং নিটুর প্রেমে না পড়াটাই যেন এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। অথচ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার যখন সত্য-সত্যই ঘটিল, তখন জীবানন্দও মরীয়া হইয়া উঠিল। অল্পে অল্পে প্রকাশকে সে এমন সম্মোহিত করিয়া ফেলিল যে, প্রকাশ বন্ধুর কথাতেই উঠিতে বসিতে পর্য্যন্ত আরম্ভ করিল।

স্বামীর ফিরিতে প্রায়ই রাত্রি হইতে লাগিল। খবর পাওয়া গেল, পতি-দেবতা বন্ধু জীবানন্দ ও নিত্য নূতন বান্ধবীর সহিত খানাপিনা করিতেছেন: ছন্দা নাম্নী একজন অভিজাত বংশীয়া তরুণীর প্রতি স্বামী বিশেষ আকৃষ্ট—জীবানন্দ তাহার ঘটক।

নিটু স্বামীকে নানা ছলে, সন্ধ্যায় ঘরে আটকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত, কোন-কোন দিন সফল হইত, অধিকাংশ দিনই হইত না।

একদিন তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে প্যারামাউণ্ট সিনেমায় ছবি দেখিতে গেল। সিনেমায় ঢুকিতেই জীবানন্দর সহিত দেখা। জীবানন্দ

কয়েকজন বান্ধবীসহ একটা বক্সে ছিল। স্বামী অধিকাংশ সময় জীবানন্দের বক্সেই কাটাইয়া দিলেন। নিটু প্রায় একাই ছবি দেখিল। সিনেমা ভাঙিলে, স্বামী নিটুকে তাঁহার জানা এক ট্যাক্সিতে চড়াইয়া দিয়া, বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন উহাদের সঙ্গে নিমন্ত্রণে। ট্যাক্সি এ-গলি ও-গলি করিয়া ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে আসিয়া পড়িল। নিটু ভীত হইয়া চিৎকার করিবার উপক্রম করিবামাত্র, ড্রাইভারের পার্শ্বোপবিষ্ট লোকটা নিটুর মুখ বাঁধিয়া ফেলিল! নিটু অজ্ঞান হইয়া পড়িল। যখন জ্ঞান হইল, তখন সে একটা বাগান বাড়ীতে বন্দিনী। সেখানে কতকগুলি মোসাহেবশ্রেণীর লোক অশ্লীল গান ও ইতর বাক্যালাপের সহিত মদ্য পান করিতেছিল! তাহার অজ্ঞানাবস্থায় সেইখানে তাহার সর্ব্বনাশ হয়। পাঁচ সাত দিন পর ভবানীপুরে একটা নার্সের বাড়ীতে, সেই লোকগুলি তাহাকে আনিয়া ফেলে। নার্সটি প্রথমে এত বুঝে নাই, স্থান দিয়াছিল। তারপর নিটুর মুখে সব শুনিয়া, নিটুকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিল এবং সেই বদমাইস্‌দিগকে আর বাড়ী ঢুকিতেও দিত না।

নিটুকে লইয়া সেই নার্সটি বহু বার আসিয়াছিল তাহাকে তাহার শ্বশুরালয়ে পৌঁছাইয়া দিতে। কিন্তু বাড়ীর ফটক হইতেই দারোয়ান্‌ তাহাদিগকে খেদাইয়া দিয়াছে, বাড়ী পর্য্যন্ত ঢুকিতে দেয় নাই। দোতলার বারান্দা হইতে শ্বাশুড়ী এবং অন্যান্য পুরনারীগণ একবাক্যে ভদ্র এবং সাধু ভাষায় এমন সব বিশেষণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, যে-গুলি বস্তিবাসিনীরাও সহজে মুখে আনে না। অগত্যা সে উক্ত নার্সের নিকটই রহিয়া গেল। মায়ের মত সেই নার্সটি নিটুকে স্নেহ করিত।

স্বামীকে নিটু অনেকগুলি চিঠিও লিখিয়াছিল, কিন্তু স্বামী-দেবতা কোনও উত্তর না দিয়া, দুই বন্ধুতে সেগুলি উপভোগ করিতে লাগিলেন। নিটু ভরসা ছাড়িয়া দিল। নার্স টি নিজ ব্যয়ে তাহাকে নার্স করিয়া দিল—যাহাতে ভদ্রভাবে সে বাঁচিতে পারে।

এই সময় জীবানন্দ প্রথম দেখা দিল। স্বামীকে লিখিত তাহার চিঠিগুলি আনিয়া, তাহাকে শোনাইয়া, জীবানন্দ বীভৎস উল্লাসে লম্ফ-ঝম্প করিত। একদিন মাতাল হইয়া আসিয়া, তাহার হাত চাপিয়া ধরে, সে তখন রাঁধিতেছিল। নিকটে একখানা খুন্তী ছিল, সেখানা পোড়াইয়া, ছেঁকা দিয়া, অতি কষ্টে সেদিন সে আত্মরক্ষা করিয়াছিল।

সেই রাত্রিতেই সে বাসা বদল করিয়া, চৌরঙ্গী অঞ্চলে চলিয়া আসে। তাহার পর দুই জনের আর কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। এত দিন পরে, সেদিন এখানে সেই প্রথম দেখা।

নিটুর নাম নীহার বালা : ডাকনাম ছিল টুনি। এখন সব ওলট-পালট হইয়া যাওয়ায়, নামটিও উল্টাইয়া হইয়াছে নিটু।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে এই কাহিনী শুনিতে শুনিতে বিজলীর চক্ষে যে ধারা বহিতেছিল, এতক্ষণ সে তাহা জানিতে পারে নাই। সজাগ হইয়া তাড়াতাড়ি চোখমুখ মুছিয়া, সমবেদনায় অভিভূত হইয়া, বিজলী নীহারকে বাহুবন্ধনে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"ভাই নীহার—"

নীহারও চোখ মুছিয়া কহিল—"বিজলীদি, তুমি এইবার সহায় হও, আমি ওকে শিক্ষা দিই—"

বিজলী মিনতিভরা কণ্ঠে জানাইল—"এ ব্যাপারটা ছেড়ে, অন্য যে-কোনও রকমে বল, ভাই, আমি তোমায় যথাসাধ্য সাহায্য করব—"

টুনি বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"এটায় নয় কেন?"

বিজলী পরিস্কার কণ্ঠে কহিল—"এটায় আমার আপত্তি আছে, শীলার জন্যে। শীলার কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—শীলার যাতে কোনো অনিষ্ট হয়, এমন কাজ আমি করব না। আমায় মাপ্ করো ভাই।"

টুনি ভাবিতে লাগিল।

বিজলী কহিল—"সেও তোমারি মত ভাগ্যবিড়ম্বিতা। তাকে রক্ষা করবার ভার আমি নিয়েছি। আশা করি, নারী হয়ে, নারীর এ সর্ব্বনাশ তুমি নিজেও করবে না, বা আর কাউকেও করতে বল্‌বে না।"

টুনি কহিল—"না, তা করব না, এবং আপনাকেও কর্‌তে বল্‌ব না। শীলা আমার দু'-তিন ক্লাশ নীচে পড়ত। ও আমায় চিন্‌তে না পার্‌লেও, আমি ওকে ঠিকই চিনেছিলাম।"

বিজলীর মাথার মধ্যে কথাগুলি কেবলি ঘুর্‌পাক্ খাইতে লাগিল। কহিল—"তাছাড়া, এতে তোমার স্বামীরও তো একটা গভীর লজ্জা আছে। আমি বলি, বরং অন্য কোনও উপায়ে ওকে জব্দ করা যাক্।"

নীহার জিজ্ঞাসা করিল—"আর কি উপায়?"

বিজলী ভরসা দিয়া কহিল—"দেখি ভেবে। ভাল করতে গেলেই নানা রকম ভাবতে হয়। অনিষ্ট কর্‌ব ঠিক কর্‌লে, কি আর উপায়ের অসম্ভাব হয়, দিদি?"

বারান্দায় টেঁপী, ক্ষেন্তি ও বুঁচির নূতন জুতা পায়ে দিয়া, ইচ্ছাকৃত সজোর শব্দে, জুতা-পরার আনন্দসঙ্গীত শ্রুত হইল।

নীহার বিদায় গ্রহণ করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ঝাড়া দুই ঘণ্টা ধরিয়া দুইজনে এত কি গোপন কথা? কেহই তাহাকে কিছুই বলে না কেন? ভূষণও কিছু অনুমান করিতে পারে না। সন্ধ্যা হইতে ভূষণের মনটা খুবই ধুকপুক করিতেছিল। বিজলীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। পরদিন প্রাতে টেঁপীকে ভূষণ জিজ্ঞাসা করিল—"কাল রাত দশটা পর্য্যন্ত কি সব অত ফুশ্-ফুশ্, গুজ্-গুজ্ হচ্ছিল তোদের রে টেঁপী?"

টেঁপী ফোঁশ করিয়া উঠিয়া কহিল—"সে খোঁজে তোমার কাজ কি?"

ভূষণ তাহাদের অভিভাবক! এ খোঁজে কাহারও যদি কোনো কাজ থাকে ত, তাহারই আছে। উষ্ণ হইয়া ভূষণ কহিল—"আমি তোদের অভিভাবক, এটা ভুলে যাস না, টেঁপী—"

টেঁপীও দমিবার মেয়ে নয়। অনেক কথাই তাহার মনে আসিল এবং তদ্দণ্ডেই সে ভূষণকে বুঝাইয়াও দিতে পারিত যে তাহার উপর ভবিষ্যতে কোনও দিন কোনও কর্ত্তৃত্ব ফলাইতে যেন সে না আসে, কিন্তু বর্ত্তমান নিরাশ্রয় ও অশক্ত অবস্থা স্মরণ করিয়া, বাক্য সম্বরণ করিয়া, কহিল—"এতো বড় মুস্কিল বাপু! আমাদের মেয়েছেলেদের মধ্যে মেয়েলী কথা কি হল, তা পুরুষ-মানুষ তুমি, তোমার শুনে কি হবে? আর তা তোমাকে বলতেই বা গেলাম ক্যানে?"

ভূষণ পুরুষ মানুষ ঠিকই, কিন্তু সে যে টেঁপীর ভবিষ্যৎ পতিদেবতা! কাজেই তাহার অধিকার যে অন্যান্য সাধারণ পুরুষের অপেক্ষা ঢের বেশী—

এ কথাটা ভূষণ কি করিয়া টেঁপীকে বুঝায়? মনে মনে সে টেঁপীর স্বামিভক্তির অল্পতায় বিলক্ষণ চটিল: একটু দুঃখও যে তাহার না হইল, তাহাও নয়: অভিমানও সামান্য হইল। ভাবী স্বামীকে এই অবহেলা এবং ঔদ্ধত্য-প্রদর্শনের জন্য টেঁপী ক্ষমা চাহিয়া সাধাসাধি না করিলে, সে আজ নিশ্চয় ভাতই খাইত না! কিন্তু বিজলী থাকাতেই, লজ্জায় ভূষণ আর সে কাণ্ডটি করিতে সাহসী হইল না। টেঁপীও ক্ষমাপ্রার্থনার হীনতা হইতে এ যাত্রা কোনও রকমে বাঁচিয়া গেল।

মাঠে যখন ইহাদের কথা হইতেছিল, টেঁপীর মুখে ভূষণ তখন অসীমের নাম অনেকবার শুনিয়াছে: তাহা ছাড়া—বিয়ে, বর, সাতপাক, সাত জন্ম বিয়ে না হওয়া, শীলার বাবা জজ, জমিদার, স্বন্দ প্রভৃতি বহু শব্দ ও বাক্যাংশ স্রোতে ভাসিয়া-আসা ছেঁড়া চিঠির টুকরার মত তাহার কাণের কূলে আসিয়া লাগিয়াছিল। তাই ইহাদের আলোচনার সবিশেষ সংবাদের জন্য ভূষণের এত কৌতূহল। টেঁপী কিছুই বলিতে চাহে না দেখিয়া, ভূষণের জানিবার ইচ্ছাও দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

ভূষণ ভাবিল: টেঁপী না হয় কিছু বলিল না, বিজলী কিছু ভাঙে না কেন? অথচ তিন দিন কাটিয়া আজ চতুর্থ দিনে পড়িল। এত কথা বলে, এত পরামর্শ করে, আর তাহার ভাবী স্ত্রীর সহিত, অসীমের এবং তাহার নাম করিয়া দুই ঘণ্টাব্যাপী যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহার কোন আভাষই বিজলী কেন দিল না? এ খুবই বিচিত্র। এক্ষেত্রে ভূষণের মন খারাপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং তাহার মনে একটা খট্‌কা লাগাও অন্যায় নয়। তাহার বিরুদ্ধে ইহারা কোনও ষড়যন্ত্র করিতেছে না তো? কে জানে।

রবিবার, বেলা প্রায় নয়টা। ভূষণ বিজলীর কক্ষে ঢুকিয়াই দেখিল, জিনিষপত্র সব বাঁধা: দুয়ারে ঝি, গোয়ালা, রজক, মুদী প্রভৃতি লোকেরা নিজ নিজ প্রাপ্য লইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছে।

বিজলী কহিল—"এই যে ভূষণ কোথায় ছিলে এত ক্ষণ? তোমার যা আছে গুছিয়ে নিয়ে, তাড়াতাড়ি একখানা ট্যাক্সি ডাক—ও-বাড়ী যেতে হবে এখুনি।"

ভূষণ সভয়ে প্রশ্ন করিল—"এত তাড়াতাড়ি?"

বিজলী গম্ভীরভাবে কহিল—"পনের দিনের ছুটি নিয়ে এসে কত দিন হল, খেয়াল আছে? এতেই কি হয়, দেখ' একবার!"

ভূষণ ব্যাপারটি বুঝিয়া কহিল—"এরা? এরাও যাবে ত?"

বিজলী বিরক্তভাবে কহিল—"এরা কি? এদিকেও আমার ওখানে নিয়ে যেতে চাও নাকি? তোমার মাথা খারাপ—"

ভূষণের মাথা খারাপ মোটেই নয়, বরং অনেকের চেয়ে ভালই। কহিল—"কি খাবে? এরা এখানে একলা থাকবে, কে দেখবে?"

বিজলী কহিল—"কেন তুমি! ছ'মাসের ফ্ল্যাটভাড়া তো দেওয়াই আছে, বাড়ীভাড়া লাগ্‌বে না। মাত্র দু'টি খাওয়া আর পরা, এ তুমি চালাতে পারবে না?"

ভূষণ কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল—"আমার কি ক্ষ্যামতা দিদিমণি? তিরিশ টাকায় কি এই বৃহৎ সংসার চলে?"

বিজলী আশ্বাস দিল—"আপাতত মাসখানেকের মত, চাল ডাল নুন তেল কয়লা সব আনিয়ে দিয়েচি। তুমি শুধু কাঁচা বাজারটা করে দেবে। এর মধ্যে আমি তোমার মাইনেও বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করব।"

পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইতেই ভূষণ অভ্যস্ত ঃ ইহাতে কাঁঠালের মিষ্টত্বও বাড়ে। বিজলীর ব্যয়ে ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবার নিশ্চিত কল্পনায়, ভূষণ এতদিন পরমানন্দে ছিল। একি? সব ওলোট-পালট? ভূষণের মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

কহিল—"সে মাইনে বেড়ে আর আমার লাভ কি হল? বেনো জল ঢু'কে সাবেক জল পর্য্যন্ত তো বেরিয়েই যেচে! যা পাব, সব পেটে খেয়ে আর খাইয়ে যদি ফতুরই হই, তাহ'লে কল্‌কাতায় থাকি কি করে, দিদিমণি?"

বিজলী ক্লান্ত হইয়া চেয়ারে বসিয়াছিল, কহিল—"তাহলে যা করবে, ঠিক করে ফেল' চট্ করে—বেলা বারটার মধ্যে ও-বাড়ী পৌছন চাই। সাড়ে এগারটায় আমাদের দেশের গাড়ী আসে।"

ভূষণ জিজ্ঞাসা করিল—"মাসীমা জানেন? তাঁকে বলেচেন?"

বিজলী কহিল—"নিশ্চয়। তাঁর এতে আপত্তি করবার আছেই বা কি? আর করলেই বা শুনচে কে?"

ভূষণের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেদিন ময়দানে ইহাদের কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, ভূষণ সেইটি জানিতে আসিয়াছিল। সে কথা সে ভুলিয়াই গেল। সভয়ে কহিল—"ছ' মাসের এক মাস তো হয়েই গেল, বাকী পাঁচ মাস। তারপর?"

বিজলী ক্রুদ্ধ ভাবে কহিল—"তারপর তুমি জান'। এর মধ্যে দাওগে না কোনও ষ্টুডিওতে ঢুকিয়ে। ভাবনা কিসের? আমার ভরসা করেই কি তুমি এদের এনেছ? আমি যদি আজ মারা যাই?"

ভূষণ কাঁপিয়া উঠিল। বিজলী চটিয়াছে। সাপের রোজা সর্পাঘাতেই মরে। ভূষণ এই সাপ খেলাইয়াই বাঁচিয়া আছে, ইহার ছোবলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। ভূষণ সাবধান হইল। সবিনয়ে কহিল—"আমাদের বাড়ীতেই যদি এদিকে নিয়ে যাওয়া হয়—তাই বল্‌ছিলাম—"

ভ্রুকুটিকুটিল দৃষ্টিতে বিজলী কহিল—"তুমি কি ক্ষেপেছ, ভূষণ? আমার বাড়ীতে এই জঞ্জাল জুটিয়ে নিয়ে গিয়ে, এই ঝামেলা আমি দিন-রাত্তির সইব? তোমার আশা তো বড় কম নয়? তোমায় আশ্রয় দিয়েচি বলে', এদের ভারও কি আমায় নিতে হবে?"

টেঁপীর সঙ্গে সুবোধের সাক্ষাৎ ভাবিতেই, বিজলীর পিঠে যেন সজোরে কশাঘাত হইল। সুবোধ লোক তত সুবিধার নয়, টেঁপীর চালচলনও বিশেষ নির্ভরযোগ্য মনে হয় না।

সকাল হইতেই বিজলীর মনটা বড় খারাপ। আবার সেই মিথ্যার ব্যভিচারের আর হৃদয়হীনতার পিঞ্জরে! বেশ ছিল এই মাসখানেক সে এখানে। বিজলীর মন আর সেই জীবন্ত-কবরে ঢুকিতে কিছুতেই রাজী নয়, অথচ না গেলেও নয়। আত্মহত্যা করিয়া, এ আত্মরক্ষা করিতে তাহার আর মন সরিতেছিল না। দেহ-মনের উচ্চতম মূল্যে যে বিলাস আরাম ও সুখ ক্রয় করিতে হয়, সে সুখ সে আর চায় না। সে জীবনে তাহার অবসাদ আসিয়াছে, ঘৃণা ধরিয়া গিয়াছে। গত একমাস কাল এখানে থাকিয়া, বাতায়ন-ফাঁকে নিষ্কৃতির পথ সে দেখিতে পাইয়াছে, কিন্তু দরজা খুঁজিয়া পাইতেছে না। এ তাসের ঘর ভাঙিয়া, সে একটা কুটীরে থাকিয়া, এক বেলা খাইয়াও সুখী হইতে পারে: তাহার খোকার গৃহে একটা ঝি-গিরি করিয়াও সে

যে-স্বর্গসুখ পাইবে, সে-সুখ তাহার এই গণিকালোকের অলকাতে নাই! তবু সেইখানেই তাহাকে আবার যাইতে হইতেছে! বহ্নিতে ঝম্পোন্মুখ পতঙ্গের মত, নিয়তির অদৃশ্য হস্ত তাহাকে সেই বহ্নিমণ্ডলের মধ্যেই টানিতেছে! অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

ভূষণের আশাতেই শুধু ছাই পড়িল না, মস্ত এক দুর্ভাবনাও জুটিল—এই পরিবারের সমস্ত ভার! ভাগ্যিস্ সেদিন ঠাকুর-চাকরকে তাড়ান হইয়াছিল! ভূষণ ঠিক করিয়াছিল, ইহারা অন্যের অর্থে প্রতিপালিত হইবে, সে থাকিবে ইহাদের অভিভাবক এবং যতদিন বিবাহ না হয়, ততদিন ভাবী জ্যেষ্ঠ জামাতারূপে! বিবাহটি একবার হইয়া গেলে, সে তাহার স্ত্রীকে লইয়া অন্যত্র গিয়া বাস করিবে এবং ইহাদিগকে দেশে পাঠাইয়া দিবে। না যায়, নিজের ব্যবস্থা উহারা নিজেই করিয়া লইবে। কিন্তু বিজলীকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া, তাহার সমস্ত কল্পনা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। লেবু এইবার তিক্ত হইয়াছে। ক্ষীরোদসাগরমন্থনে এতদিন অমৃত উঠিয়াছে, এইবার হলাহল উঠিবার সম্ভাবনা।

ভূষণের সন্দেহ হইল, নিস্তারিণীর সহিত কোনও বচসা হয় নাই তো? বিচিত্র কি? হয়ত কর্ত্রীত্বের মোহে, নির্ব্বোধ কলহপরায়ণা ঐ গ্রাম্য স্ত্রীলোকটা বিজলীকে এমন কোনও কথা বলিয়াছে, যাহাতে হঠাৎ সে এ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। বিজলী বুদ্ধিমতী, একটা বিশ্রী কলহের ভয়ে কিছু ভাঙিতেছে না। আর সেইজন্যই হয়ত ইহার মনটাও এমন খিট্‌খিটে হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণত বিজলী তো এমন বদমেজাজী নয়! যাহাই হউক্, সে যে পায়ের দড়ি গলায় তুলিয়া এমন বিপদে পড়িল, তাহার কি?

এ-বাড়ী আসিয়া বিজলী শুনিল, সুবোধ আজ সপ্তাহ খানেক বাড়ীই আসে নাই। ষ্টুডিওতে বিশেষ কার্য্যে আটক পড়িয়াছে। কথাটা শুনিয়া, বিজলীর মনটা যেমন স্বস্তি অনুভব করিল, তেমনি একটু খারাপও হইল। সুবোধের অনুপস্থিতির কারণ বিজলী বিশ্বাস না করিলেও, মুখে তাহা প্রকাশ করিল না।

ইহা শুনিয়া, ভূষণের আবার এক নূতন দুশ্চিন্তা জুটিল: নূতন ছবির কার্য্যারম্ভ তাহা হইলে হইয়া গিয়াছে: তাহার জমিদারের পার্টটি নিশ্চয় হাত-ছাড়া হইয়াছে! কত ভাগ্যে ডাইনোক্‌ওয়ালা পার্ট যদি একটা মিলিল তো, এমনি বিনা দোষে হাত-ছাড়াও হইয়া গেল!

বিজলীর উপর ভূষণের এইবার রাগ হইল। এ সন্দেহ তাহার প্রথমেই হইয়াছিল, কিন্তু বিজলী তখন তাহাকে অভয় দিয়াছিল। এইবার? কোথায় রহিল এখন তাহার হিরোইন্ হওয়া? এ পার্ট যদি তাহার সত্যসত্যই হাত-ছাড়া হয়, তাহা হইলে সে আর ইহার কোনও খাতির রাখিবে না: দেখাইয়া দিবে এই বদ্‌মাইস স্ত্রীলোকটাকে একবার, ভূষণ কি চীজ! ভূষণ রাগে না, কিন্তু রাগিলে কি অনর্থ যে করে—রাগিয়া সে এইবার দেখাইবে!

কথায় কথায় কেবল ভূষণকে ভোগা? তাহার চাকরীই যদি চলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে মাইনে বাড়াইবে কি? কি করিয়া তবে সে অত বড় সংসারের খরচ চালাইবে? সে তো ফিমেল্ আর্টিষ্ট নয়, যে ইচ্ছা করিলেই যে-কোনও ষ্টুডিওতে গিয়া চাকরী পাইবে? সে যে পুরুষ-আর্টিষ্ট! ষ্টুডিওতে কি তাহাদের কোনও কদর আছে? একজন ফিমেল-একষ্ট্রারও যেটুকু খাতির, সেটুকুও

তাহাদের নাই! ক্রমশ ভূষণের মাথা খারাপ হইয়া উঠিবার উপক্রম হইল। বিজলীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হওয়া বিশেষ দরকার। বিজলীর কি? সে জানে, তাহার জন্য মোটা বেতনে সব ষ্টুডিওর দুয়ারই খোলা—তাই সে এমন নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে পারিতেছে!

দুই-তিন বার বিজলীর ঘরে আসিয়া, ভূষণ উঁকি মারিয়া দেখিল, পাখা খুলিয়া দিয়া বিজলী অকাতরে দিবানিদ্রা দিতেছে। এতটুকু ভাবনা নাই, আশঙ্কা নাই, উদ্বেগ নাই—নির্ব্বিকার! মনে দুর্ভাবনা থাকিলে কি অমন ঘুম হয়?

ঘুম চুলায় যাউক্, ভূষণ স্থির হইয়া একটু বসিতে পর্য্যন্ত পারিতেছিল না। একবার ছাদে তাহার ঘরে গিয়া কিছুক্ষণ বসে, আবার বিজলী উঠিল কিনা দেখিতে, দ্বিতলে নামিয়া আসে। সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। যতই দেখে বিজলী নিদ্রিত, ততই তাহার রাগ হয়। অকারণ উপর নীচে করিয়া, শেষ-পর্য্যন্ত ক্লান্ত হইয়া, ভূষণ নীচেই বসিয়া রহিল।

শ্রাবণের শেষ। পাঁচটা বাজিল। ভূষণ আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, বিজলীর পিঠে তাহার ছেঁড়া চটি দুইপাটি দিয়া আচ্ছা করিয়া জুতাইয়া, তাহার গায়ের রাগ মারে। কিন্তু দরিদ্রের মনোরথের মত, ভূষণের ইচ্ছা মনে উঠিয়া মনেই বিলীন হইয়া গেল। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিজলীকে উঠাইবার সে এক ফিকির বাহির করিল।

এক পেয়ালা চা করিয়া লইয়া আসিয়া, ডাকিল—"দিদিমণি—"

বিজলী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া, ঘড়ির পানে চাহিয়া কহিল—"উঃ পাঁচটা? এত ঘুমিয়েচি? একটু আগে উঠিয়ে দিতে

হয়, ভাই? এ ঘুমের প্রতিফল পাব রাত্রে। পাঁচটা পর্য্যন্ত ঘুমুলে কি আর রাত্রে ঘুম হয়?"

ভূষণের জল্পনা-কল্পনা আবার সব ওলোট-পালট হইয়া গেল। ভূষণ যেন আর সে মানুষই নয়! দ্বিধাবিজড়িত কম্পিত স্বরে কহিল—"দাদাবাবুর কাছে ইষ্টুডিওতে একবার যাব নেকি? তিনি তো জানেন না যে আমরা দেশ থেকে ফিরেচি। তাঁকে জানান একটু দরকার না?"

বিজলী চা পান করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল। ভূষণ কহিল—"না জানালে, তিনি আবার রাগ করতে পারেন তো! বলবেন, তোমরা এয়েছ তো জানাও নাই ক্যানে? বোধ করি, আমরা না থাকাতেই তিনি বাড়ী আস্‌চেন্ না।"

বিজলী উদাসীন ভাবে কহিল—"সম্ভব!"

ভূষণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"তাহলে যাই?"

বিজলী কহিল—"মিছেমিছি কেন কষ্ট করে যাবে, ভাই? তিনি ষ্টুডিওতে নেই। আজ রবিবার, ষ্টুডিও বন্ধ—জান না?"

ভূষণ কহিতে গেল—"কিন্তু—"

বিজলী বাধা দিয়া কহিল—"যাবার দরকার নেই। তুমি বস। তোমায় আবার সকাল সকাল খেয়ে—ও-বাড়ী যেতে হবে, মনে থাকে যেন। এখন কিছুদিন ওঁদের একলা থাক্‌তে ভয় লাগ্‌তে পারে। আমি বলে এসেচি, রাত্রে তুমি সেখানে শুতে যাবে।"

ভূষণের এখন আর 'ওদের' কথা ভাল লাগিতেছিল না। তাহার প্রবল ইচ্ছা, সে একবার ষ্টুডিওতে যায় এবং স্বচক্ষে সব দেখিয়া এবং স্বকর্ণে সব শুনিয়া আসে। প্রয়োজন হয়তো, সে বলিবে যে—এ-বিলম্বের জন্য সে

বিন্দুমাত্র দায়ী নয়। চাকৃরী আগে না, বিজলী আগে? আগে চাকৃরী তারপর প্রেম! প্রেমে তো আর পেট ভরিবে না! বরং ওদের পেট ভরাইতে না পারিলে, প্রেম করা দূরে থাক্, ও-বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙাইতে পর্য্যন্ত সে পারিবে না। তাহার ভাবী শ্বাশুড়ীটি লোক বড় সোজা নহেন: হিসাবে তিনি মাড়োয়ারী, বাঙমাধুর্য্যে পুলিশ এবং স্নেহমমতায় কশাই!

উহাদের বিষয়ে ভূষণ তো এখন এক রকম নিশ্চিন্তই। কলিকাতায় আনিয়া যখন একবার ফেলিয়াছে, তখন তো ইহারা তাহার মুঠার মধ্যেই। যাইবে কোথায়? ভূষণ ছাড়া ইহাদের আর গত্যন্তর নাই। তবু এতদিন বিজলী সেখানে ছিল, তাহার পরামর্শ বা সাহচর্য্য পাইতেছিল। কিন্তু এখন? এখন হইতে ভূষণই তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব। একটা পয়সার জন্যও তাহারি নিকট হাত পাতিতে হইবে। এখন চাকরিটি বজায় থাকিলে হয়! এ কলিকাতা সহর: মুখে সবাই অত্যন্ত সৌজন্য দেখাইবে: বিপদে পড়িয়া যাও দেখি কাহারও কাছে? সামান্য, অতি সাধারণ একটা সাহায্য কি অনুগ্রহ চাও দেখি কোনও পরমাত্মীয়ের নিকট? সাহায্য তো মিলিবেই না, উল্টা শুনিবে, চাকর আসিয়া বলিবে: বাবু বলিলেন—বল্‌গে, বাবু বাড়ী নাই। কিম্বা, বাবু ভয়ানক ব্যস্ত, এখন সাক্ষাৎ হইবে না!

ভূষণ এতদিন কলিকাতায় আছে, সে সব জানে। একদিকে এ বরং ভালই হইল যে বিজলী ও-বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছে। ইহারা সম্পূর্ণরূপে এইবার ভূষণেরই করতলগত হইল। কেবল ঐ খরচের ভাবনাটাই ভূষণকে এমন কাবু করিয়া ফেলিয়াছে! চাকৃরীটি এখন থাকিলে হয় এবং জমিদারের পার্টটি না হাত-ছাড়া হইয়া যায়!

সিঁড়ির দরজা খোলা ছিল! হঠাৎ ভূদেব মহাপাত্র ডিরেক্টার, ষ্টুডিওর দুই জন কুলিসহ আসিয়া দাঁড়াইল। দুইপক্ষই বিস্মিত হইল।

বিস্ময়ের প্রথম আঘাত কাটিয়া গেলে বিজলী কহিল—"নমস্কার ভূদেববাবু। আসুন, ভেতরে আসুন—অমন অবাক হয়ে দাঁড়ালেন যে?"

ভূষণ ভারী খুসী: ষ্টুডিও যাইতে হইল না, ঘরে বসিয়া এখনি সব খবর মিলিবে। ভূষণও নমস্কার করিল।

ভূদেব সন্দিগ্ধভাবে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিয়া, কুণ্ঠিতভাবে একখানা চেয়ারে বসিয়া কহিল—"এই তো আপনি রয়েচেন, তবে যে সুবোধদা বল্লে, আপনি নেই?"

বিজলী ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"ঠিকই বলেছেন, আমি ছিলাম না, আজ দুপুরেই ফিরেছি—"

ভূদেব জিজ্ঞাসা করিল—"দোরের চাবি বুঝি আপনার কাছেও ছিল?"

বিজলী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

ভূদেব কহিল—"তবে আর এ চাবি কি হবে?—"

বিজলী কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি?"

ভূদেব কহিল—"সুবোধদা বল্লেন—দোর খুলে তাঁর জিনিষপত্র কাপড় জামা জুতো যা কিছু আছে, সব নিয়ে যেতে।"

বিজলী চমকিয়া উঠিল। শুষ্কস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তার মানে?"

ভূদেব কহিল—"তাতো জানি না, বিজলী দেবী! তবে তিনি ঐ পাড়াতেই একটা বাড়ী নিয়েছেন শুন্‌লাম, আজ হপ্তাখানেক।"

ভূষণের মুখ শুকাইয়া উঠিল। বিজলী কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া, গাঢ় স্বরে কহিল—"তাহলে তাঁর জিনিষপত্তর সব গুছিয়ে দিই?"

ভূদেব কহিল—"আজ্ঞে হাঁ, আমার ওপর হুকুম তো তাই, বিজলী দেবী।"

"ভূষণ, ভূদেববাবুকে ততক্ষণ একটু চা, খাবার দাও, সিগারেট এনে দাও—আমি সুবোধবাবুর জিনিষপত্তরগুলো গুছিয়ে দিই।" বলিয়া বিজলী কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

ভূষণ বাঁকিয়া-চুরিয়া দাঁড়াইয়া, সর্ব্বাঙ্গ চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার পার্ট্‌টা সার, ঠিক আছে তো সার্?"

ভূদেব কহিল—"নিশ্চয়। তুমি হলে আমাদের নটহস্তী! তোমার পার্ট করে, এমন লোক কোথা? রিহার্স্যাল আরম্ভ হয়ে গেছে, এস ষ্টুডিওতে কাল থেকে।"

ভূষণের মনটা শান্ত হইল। ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। দশ মিনিটের মধ্যেই শিঙারা, সন্দেশ, চা, সিগারেট, পান, দিয়াশলাই প্রভৃতি এক সঙ্গে লইয়া, ভূষণ পুনর্ব্বার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইল।

খাইতে খাইতে ভূদেব জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি যে বলেছিলে, হিরোইনের বোনের জন্যে ১৩।১৪ বছরের একটি মেয়ে তোমার জানা আছে। আছে ত ঠিক?"

ভূষণ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, বিজলী আসিয়া কহিল—"ভূষণ, কুলিদের ডাক—জিনিষগুলো নিয়ে গাড়ীতে তুলুক ততক্ষণ!"

কুলিরা বারান্দাতেই বসিয়াছিল, মাল তুলিতে আরম্ভ করিল।

বিজলী কহিল—"যা নজরে এল, আর মনে পড়্‌ল, সবইতো দিলাম। যদি আর কিছু পড়ে' থাকে, আমায় জানাবেন্, আমি তথ্‌খুনি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব।"

ভূদেব ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা!

ভূদেবের গোড়া হইতেই কেমন একটা সন্দেহ হইতেছিল। স্পষ্ট করিয়া কিছু জিজ্ঞাসাও করিতে পারে না, অথচ মনটাও অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া পড়িল।

ভূদেবের ধারণা, ইহাদের পরস্পর মনোমালিন্য ঘটিয়াছে এবং তাহার ফলে, সাধারণত যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছে। এতদিন দুইজনে একত্রে ছিল, এইবার বিভিন্ন হইল ঃ স্রোতের জলে দুইটি নরকঙ্কাল কিছু ক্ষণ একত্রে ভাসিয়া, স্রোতের টানে আবার তাহারা ছাড়াছাড়ি হইল!

বিজলী উদাসীন ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাদের অনিন্দিতার রিহার্সাল শুরু হয়ে গেছে, ভূদেববাবু?"

ভূদেব কুণ্ঠিতভাবে কহিল—"আজ্ঞে হাঁ, আরম্ভ তো হয়েচে, তবে—" ভূদেব ভাবিতেছিল, এ অপ্রীতিকর সংবাদটা না দিয়াই সে পলাইবে, কিন্তু বিজলীও কম চতুর নয়।

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"বলুন্ না, ভূদেববাবু, 'কিন্তু' কর্‌চেন্ কেন?"

ভূদেব কহিল—"কি যে বলি, তাই ভাব্‌চি। যতীনবাবু কন্‌ট্রাক্টই করেছেন, তবে রিহার্সাল জমে নাই বলে, তিনি আসেন না। হিরোইন; সুবোধদা ঠিক করেচেন, বি-এ-পড়া এক ভদ্রমহিলাকে, যিনি ইতিপূর্ব্বে ষ্টুডিও কি, কখনো চোখেও দেখেন্ নি—"

বিজলী হঠাৎ কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ ভদ্রমহিলার নাম কি? বাড়ী কোথায়?"

ভূদেব কহিল—"আসল কি নকল জানি না, শুন্‌লাম নাম—ছন্দা দেবী। ইনি কলেজ ছেড়ে এই সবে ফিলিমে ঢুক্‌লেন। বাড়ী ঐ বালীগঞ্জ অঞ্চলেই

কোথায় যেন। খুব বড়লোকের মেয়েও নাকি। ফিলিমের জন্যে বাপ মা সমাজ সংসার সব পরিত্যাগ করে, তিনি এসেছেন ফিলিমের উন্নতি করতে! আর স্নবোধদাকে জানেন ত, তিনি উঠলেন ক্ষেপে। বলুন তো, হিরোইন সে কি করবে?”

ছন্দার নাম বিজলীর শোনা। তাই সে একটু বিস্মিত হইল। মনে মনে কহিল—সমাজের আরও একটি দীপ নিভিল!

ভূদেব এতক্ষণে খানিকটা সহজ হইল। কহিল—“হাজার বার বল্‌লাম স্নবোধদাকে, হিরোইন বিজলী দেবীকে দিয়ে, একে বরং হিরোইনের বোনের পার্টটা দিন। তিনি কিছুতেই তা শুন্‌লেন না। তিনি বললেন —অভিনয় বোঝে কে? শিক্ষিতা সুন্দরী ভদ্রমহিলার নামে আর চেহারাতেই ছবি চল্‌বে! অভিনয় না-ই বা হোল। কি করি এখন বলুন দেখি? আমিও কিন্তু সাফ্‌ বলে দিয়েচি—এ ছবি নিশ্চিত ফ্ল্যাট: চল্‌তে পারে না!”

বিজলী নীরবে শুনিল, কিছু বলিল না।

ভূষণ জিজ্ঞাসা করিল—“আমি তাহলে কাল থেকেই যাব, সার্‌?”

ভূদেব কহিল—“হাঁ, তুমি যেও! আর পার’ তো, সেই মেয়েটিরও সব খবর নিয়ে যেও। স্নবোধদার যদি মত হয়, তাহলে তাকে নেওয়া যাবে। আচ্ছা, আজ তা’লে উঠি, বিজলীদেবী? নমস্কার।”

অস্তদিগন্তে পথিক-সূর্য্যের ক্লান্তিজনিত আরক্তিমার শেষরেখাটি পর্য্যন্ত কোন্‌ কালে মুছিয়া গিয়াছে। পরিশ্রান্ত দিবাকর সাগরতলের শীতলশয্যায় কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। একাকিনী বিজলী অন্ধকার ঘরে গভীর চিন্তায় তন্ময়।

ভূষণ গলার শব্দ করিয়া বাহির হইতে ডাকিল—"দিদিমণি—"

বিজলী সচকিত হইয়া কহিল—"এস, ভূষণ। খাওয়া হয়েছে?"

ভূষণ বাতি জ্বালিয়া দিয়া কহিল—"আজ্ঞে হাঁ, দিদিমণি—"

বিজলী কহিল—"তাহ'লে এইবার, ও-বাড়ী যাও। দু'বেলা এইখানেই খাবে, আর রাত্রে ওখানে গিয়ে শোবে। ষ্টুডিওর কাজ থাকে যাবে, না থাকে দিনটা ও-বাড়ীতে আর এ-বাড়ীতে কাটিও।"

ভূষণ সানন্দে চলিয়া গেল। বিজলী কলঘরে ঢুকিল।

রাত্রি প্রায় নয়টা। বিজলী আহারে বসিল, কিন্তু কিছুই খাইল না।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিল—"কিছুই যে খেলেন না মা, রান্না ভাল হয় নি, বুঝি? তা' হতে পারে, ভূষণবাবুর জন্যে বড্ড তাড়াতাড়ি করতে হল কিনা?"

বিজলী কহিল—"না, না, রান্না তো খারাপ হয় নি! বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে, আমার শরীরটাই ভাল নেই! তোমরাও খেয়ে নাও গে—"

এত রাত্রে আবার কাহার পদশব্দ?

বিজলী দুয়ারে দাঁড়াইয়া দেখিল, অস্থির পদক্ষেপে সুবোধ আসিতেছে!

বিজলীকে দেখিয়াই অতিরিক্ত প্রফুল্লতার সহিত, কিঞ্চিৎ জড়িতকণ্ঠে কহিল—"এই যে, নমস্কার সুদক্ষিণা দেবী! পৈতৃক ভিটের ব্যবস্থা সব ঠিক হল?"

বিজলীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। হঠাৎ তাহার বাক্য-স্ফুর্ত্তিই হইল না।

সুবোধ ঘরে আসিয়া সোফাটায় ধপ্ করিয়া বসিয়া কহিল—"জিনিষপত্র সব ঠিকঠাক্ পেয়েছি, ধন্যবাদ! এখন তোমার সেই ভগ্নীটির সঙ্গে

আলাপ করতে এলাম। ভয় নেই, এক্ষুনি চলে যাব। মল্লিক-সাহেব আসবার আগেই যাব। কই, কল্পনাদেবী কোথায় গেলে?"

বিজলী কহিল—"মাতলামি কর্‌বার কি আর জায়গা পেলেন না?"

সুবোধ প্রতিবাদের অভিনয় করিয়া কহিল—"রাগ কর্‌চ? বেশ, কুন্তী দেবীর সঙ্গে আলাপ না হয়, নাই কর্‌লাম। তারপর মাদ্রী দেবী? মল্লিক-সাহেব কি তাহ'লে এখন পাণ্ডুরাজা হলেন? বেশ হল—ডাইনে কুন্তী, বাঁয়ে মাদ্রী! কেয়াবাৎ—"

বিজলী তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া গম্ভীরভাবে কহিল—"আচ্ছা, এখন তবে আসুন, আমি শুতে যাব।"

সুবোধ হাত-পা ছুঁড়িয়া, টলিয়া টলিয়া কহিল—"বেশ তো, শুয়ো এখন, অত ব্যস্ত কেন?"

কঠিন মুখমণ্ডলে বিজলী গম্ভীরভাবে কহিল—"আপনি যেখানে যাচ্ছেন, সেইখানে যান—দয়া করে' আমায় একটু বিশ্রাম কর্‌তে দিন্, আমায় রেহাই দিন—দোহাই আপনার।"

সুবোধ উচ্চহাস্য করিয়া কহিল—"আচ্ছা, আমার উপর একটুও রাগ কর্‌চ না তো? ভূদেব বল্‌লে, অত্যন্ত খুশী হয়ে, নিজেই তুমি নাকি আমার জিনিষপত্তর সব বের করে দিয়েচ। একটা কথাও বলনি, একটা নালিশও করনি—তাই জান্‌তে এলাম, ব্যাপার কি? খুব বড় লোক পাক্‌ড়েচ বুঝি এবার?"

বর্ষণপূর্ব্ব কাদম্বিনীর মত গম্ভীরভাবে বিজলী কহিল—"আজ্ঞে হাঁ। এইবার তাহ'লে উঠুন্—"

সুবোধ কহিল—"আমি ঠিক তাই ভেবেছিলাম। বেশ, তোমার সেই

ভগ্নীটিকে একবার দেখাও না, বাবা! শুধু একবার চোখের দেখা দেখেই চলে যাব। সে তো রসগোল্লা নয়, যে টপ করে' মুখে ফেলে দেব—"

বিজলীর মুখ আরও কঠিন হইয়া উঠিল। কহিল—"আজ আর দেখান' সম্ভব নয়।"

সুবোধ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন? এখানে নেই বুঝি? কোথায় আছে? ঠিকানাটা বলে' দাও—আমি নিজেই যাচ্ছি সেখানে।"

বিজলী কহিল—"যদি এলেনই, তো এত দেরীতে এলেন কেন? সেদিন যখন ধর্ম্মতলার বাড়ীতে গেছলেন, তখনই একবার খোঁজ করলেন না কেন? তাহলে ত সেই দিনইদেখিয়ে-শুনিয়ে পরস্পর আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিতে পারতাম—"

সুবোধ বিষণ্ণভাবে কহিল—"ঠিক বলেছ' বিজলী, সেটা বড় ভুল হয়ে গেছে। সেই দিন বল্‌লেই ভাল হত। কিন্তু তুমি কি করে' জানলে যে আমি সেখানে গিছলাম? আমায় দেখ্‌তে পেয়েছিলে বুঝি?"

বিজলী আন্দাজে ঢিল ছুঁড়িয়াছিল, ঠিক লাগিয়াছে দেখিয়া, কহিল—"সে খোঁজে আর কাজ কি? সঙ্গের সেই মেয়েটির নাম বুঝি ছন্দা?"

সুবোধ আসিয়াছিল বিজলীকে বিস্মিত করিতে এবং আঘাত করিতে: কিন্তু ক্রমশ তাহার পুঁজি শেষ হইয়া আসিতে লাগিল এবং সেও বড় কম আশ্চর্য্য হইল না। কহিল—"হাঁ, তার নাম ছন্দা। তাকে বুঝি চেন?"

বিজলী কোনও উত্তর দিল না।

সুবোধ কহিল—"আমি গিয়েছিলাম ওখানে ঐ ছন্দাদেবীর জন্যেই

একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করতে, গিয়ে ভূষণকে দেখে তো আমি অবাক! দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে কতক জান্‌লাম, তারপর খবর পেলাম ঐ ডাঃ চৌধুরী-বুড়োর কাছে। ওকে আমি বহুদিন থেকেই জানি কিনা!"

বিজলী কহিল—"আচ্ছা, তাহলে এইবার উঠুন।"

সুবোধ কহিল—"উঠ্‌চি, উঠ্‌চি, ব্যস্ত কেন অত? থাক্‌তে আসি নি। শুধু জানিয়ে দিতে এসেচি, যে তুমি বেড়াও ডালে-ডালে, আমি বেড়াই পাতায়-পাতায়! আমায় ধাপ্পা দেওয়া অত সোজা নয়, এখন বুঝ্‌তে পারচ? শোনো, কোথা থেকে আসল খবর পেলাম! মোহন-ফিল্মের তুলসী আছে না? সে আমায় বল্‌লে, ভূষণকে ধর্ম্মতলায় এক বাড়ীতে সে দেখেছে। সেই আমায় ঐ বাড়ীটা দেখিয়ে দিয়েছিল। তার কথামতই আমি ঐ বাড়ীতে ফ্ল্যাট ভাড়া করতে আসি।"

সুবোধ প্রথমে ভাবিয়াছিল—বিজলী সহজে তাহার জিনিষপত্র ছাড়িয়া দিবে না, কাঁদিয়া কাটিয়া, বহু মিথ্যাকথা বলিয়া, এক অনর্থ বাধাইবে: সুবোধকে কিছুতেই যাইতে দিবে না। তাই সে ভূদেবকে পাঠাইয়াছিল, নিজে যাইতে সাহস করে নাই। কি জানি, নিজে গেলে যদি বিজলী তাহাকে ছাড়িয়া না দেয়!

ভূদেব গিয়া যাহা বলিল, তাহাতে সুবোধ হতাশ অপেক্ষা কুপিতই হইল বেশী। এত অহঙ্কার? এত তেজ? একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা করিল না? ইঙ্গিতেও সে জানাইল না, যে সে ছাড়িতে চায় না? এ তেজ অসহ্য! তাই সুবোধ তৈরি হইয়া আসিয়াছে, এতদিনের সমস্ত অপমানের প্রতিশোধ লইতে!

সুবোধ বিরক্ত হইয়া কহিল—"তোমার অনেক অপমান আমি

নীরবে সয়েছি। আর না। ভাবচ 'ওঠ ওঠ' করলেই, আমি তোমায় সাধব, মান ভাঙাব, না? সে ছেলে সুবোধ রায় নয়।"

বিজলী কঠোরতর মুখভঙ্গীতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"অকারণ মিছেমিছি কথা বাড়াচ্ছেন, সুবোধবাবু। এখনও যদি আপনি মুখ আর ব্যবহার সংযত না করেন, আমার ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে, জানবেন।"

সুবোধও উঠিয়া দাঁড়াইয়া, হিংস্র শ্বাপদসুলভ মুখের এক ভঙ্গী করিয়া কহিল—"তোমায় ছেড়ে আমি বেঁচেছি। ছন্দার তুমি বাঁদী হবারও যোগ্য নও। সেই সুখবরটা দিতেই এসেচি।"

বিজলী কোনও প্রতিবাদ করিল না।

বিজলীর অক্রোধে ধৈর্য্যে ও অবিচলিত মনোভাবে, সুবোধ ক্রমশ প্রশ্রিত হইতে লাগিল। সে আঘাত করিতেই আসিয়াছে, সুতরাং তাহার সুবিধাই হইল। জড়িত বচনে কহিল—"এখনো ভেবে দেখ' বিজলী, তোমার সেই বোনটির ঠিকানা যদি দাও, তাহ'লে তার পুরস্কারস্বরূপ, আমার এই বইয়ে যা-হয় একটা পার্ট দিয়ে, আমি তোমায় কিছু পাইয়ে দিই! বলি, দেখলে তো? সুবোধ রায়কে ধাপ্পা দেওয়ার মজাটা?"

বিজলী দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—"আপনি আমার বাড়ী ছেড়ে যাবেন কিনা? বহুক্ষণ থেকে অনুনয় করচি। এইবার তাহ'লে অন্য ব্যবস্থা করতে বাধ্য হব—"

সুবোধ হতাশার রোষে কহিল—"বলবি নি তোর বোনের ঠিকানা? তুই বলবি নি তো, তোর বাপ বলবে—আমি সুবোধ রায়।" এই প্রসঙ্গে সুবোধ এমন আরও কতকগুলি চলতি

ভাষার বিশেষণ প্রয়োগ করিল, যেগুলি অভিধান-বহির্ভূত বলিয়া সেগুলি আর লিপিবদ্ধ করা হইল না।

হঠাৎ মোটরের টায়ার-ফাটার মত একটা বিকট শব্দ হইল। শব্দ শুনিয়া ভৃত্যও ছুটিয়া আসিল। দেখা গেল, বিজলীর পায়ের বোম্বাই চর্ম্ম-চটীর একপাটি, স্নবোধের মুখমণ্ডলে ঘর্ম্মধারার মত রক্তধারা ছুটাইয়া দিয়া, তাহারি পদতলে ক্লান্ত হইয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে।

বিজলী রাগে ফুলিতেছিল।

কোঁচা দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে, বিহ্বলভাবে স্নবোধ কহিল—"মার্‌লে? আমায় মারলে বিজলী?"

বিজলী ভৃত্যকে কহিল—"মাধব, একে ঘাড় ধরে' বাড়ীর বের করে' দিয়ে, সদর দরজায় খিল দিয়ে আয়।"

মাধব অগ্রসর হইতেই, স্নবোধ কহিল—"থাক্ থাক্, মাধবের আর আস্‌তে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি।"

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে, স্নবোধ উচ্চৈঃস্বরে কহিল—"মনে থাকে যেন, তোর এ তেজ আমি যদি না ভাঙি তো, আমার নামই স্নবোধ রায় নয়।"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

ওকালতী না করিলেও শ্যামাকান্ত উকীল তো? ওকালতী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারিলেও, অর্থোপার্জ্জনের জন্য এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সহজ বিদ্যাটি আইনসঙ্গত ভাবেই সে আয়ত্ব করিয়াছিল। আর সেই বিদ্যাকে কাজে লাগাইয়া, আইনের ফাঁক ও ফাঁকি-তত্ত্বে, নিজেকে অপরাজেয় মনে করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রশ্নের উত্তরে শ্যামাকান্ত কহিল—সে নিজের স্বার্থহানি করিয়া বন্ধুপুত্রের কল্যাণের জন্য যে ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত প্রতিদানই মিলিয়াছে! এই বারো-চৌদ্দ বৎসরে সে যাহা পাইয়াছে ও খরচ করিয়াছে, তাহার সহি-করা আয়-ব্যয়ের ফিরিস্তিতে পাই-পয়সার হিসাব পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে, সে প্রতি-সপ্তাহে এবং প্রতি মাসে, সেরেস্তায় দাখিল করিয়াছে। নায়েব জানকী মল্লিক সব জানে। অভাবিতভাবে তাহাকে পরিণামে এরূপ বিপন্ন হইতে হইবে জানিলে, সে রীতিমত সহি-রশীদ লইয়াই, কাগজপত্র ছাড়িত এবং নিজেও তাহার নকল রাখিত। সরল বিশ্বাসেই সে এই পরোপকার করিয়া আসিয়াছে। এখন যে উহারা তাহা অস্বীকার করিতেছে এবং সেই সব কাগজপত্র ইচ্ছা করিয়াই গোপন করিতেছে, তাহাতেই ধর্ম্মাবতার উহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন। শ্যামাকান্ত হুজুরের আরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল: অথচ এই দীর্ঘকালের মধ্যে কি-অসীম কি-নায়েব কেহই কোনও উচ্যবাচ্য করিল না! অসীম অনভিজ্ঞ হইতে পারে, কিন্তু যাঠ বৎসর বয়স্ক পুরাতন নায়েব মহাশয় কি কুম্ভকর্ণ?

ম্যাজিষ্ট্রেট বুঝিলেন—এ কঠিন ঠাঁই। অসীমকে হাইকোর্টে দেওয়ানী মামলা দায়ের করিতে বলিয়া, তিনি নিস্কৃতি লাভ করিলেন।

জানকীকে সঙ্গে লইয়া অসীম কলিকাতায় রয়্যাল বেঙ্গল হোটেলে আসিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া, অসীম শীলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে তাহার হোষ্টেলে আসিল। এখানে আসিয়া শুনিল যে, তাহার মাতা মৃত্যুশয্যায় টেলিগ্রাম পাইয়া, শীলা দিন-দশেক হইল চট্টগ্রাম গিয়াছে।

হোষ্টেলের লেডি-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অসীমকে চিনিতেন। চুণীবাবু শীলাকে এখানে রাখিবার সময় জীবানন্দকে ভ্রাতা এবং অসীমকে ভাবী জামাতা বলিয়া পরিচিত করিয়া দিয়া, কলিকাতায় শীলার অভিভাবক রূপে এই দুইজনেরই নাম লিখাইয়া দিয়াছিলেন। চুণীবাবু কলিকাতা আসিলে কন্যার সহিত যখন দেখা করিতে আসিতেন, তখন হয় দুইজনই, কিম্বা এই দুইয়ের অন্তত একজনও তাঁহার সঙ্গে থাকিতই। কাজেই, লেডি-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অসীমের প্রতীতির জন্য শীলার মূল দরখাস্ত খানি পর্য্যন্ত বাহির করিয়া আনিয়া অসীমকে দেখাইয়া দিলেন।

সৌজন্যরক্ষাকল্পে, ভাবী শ্বাশুড়ীর বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ, অনুসন্ধান করিয়া, অসীম তৎক্ষণাৎ চুণীবাবুকে একখানি জরুরী টেলিগ্রাম করিয়া দিল। রাত্রে চুণীবাবুকে ও শীলাকে দুইখানি পত্রও লিখিল।

অপরাহ্ণে টেলিগ্রামের উত্তর আসিল। চুণীবাবু ধন্যবাদ দিয়া জানাইয়াছেন যে, তাঁহার স্ত্রী ও পরিবারস্থ সকলে সম্পূর্ণ সুস্থ। ভাবী শ্বশ্রূর সুস্থতা সংবাদে অসীমও সুস্থ হইল এবং নিশ্চিন্ত মনে উকীল-ব্যারিষ্টারকে মোকদ্দমা বুঝাইয়া দিবার ব্যাপারে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

শ্রাবণের বর্ষণমুখর সন্ধ্যা। সংস্কৃত-কাব্যে ও পদাবলী-সাহিত্যে বর্ষার যে স্বরূপ মিলে, এমন কি উক্ত বর্ষার অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বর্ষা, তাহার শতাংশও কলিকাতায় দৃষ্ট হয় না! কলিকাতায় টিপিটিপি বৃষ্টি এবং অভদ্র রকমের গরম!

হোটেলে অসীম তাহার কক্ষের বাহিরে ছোট্ট বারান্দাটিতে একখানা ডেক-চেয়ারে বসিয়া, অলসভাবে এলোমেলো কত-কি ভাবিতেছে আর দেখিতেছে—রাস্তায় স্থানে স্থানে জল জমিয়া গ্যাসের আলোয় চিক্‌চিক করিতেছেঃ সুদূরপ্রসারী আলোকমালা পুষ্করিণীতীরে সিক্তপক্ষ হংস-বকাবলীর মত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াঃ বাসে ট্রামে লোকের ভীড়। রিকশাওয়ালারা জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাইয়া পথিমধ্যে ছুটাছুটি করিয়া আরোহী সংগ্রহ করিতেছে! চলন্ত ট্যাক্সি-মোটরের উৎক্ষিপ্ত ময়লা জলে পথিকের কাপড় জামা কর্দ্দমাক্ত হইতেছেঃ তাহারা নিরুপায়ভাবে কেহ কাষ্ঠহাসি হাসে, কেহ বা বাংলার অতি-প্রচলিত কথ্যভাষায় দুই চারিটি কাল্পনিক সম্বন্ধীয় মন্তব্য প্রকাশ করে। মুস্‌লীম-লীগ-সুলভ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে কেহ বা সমর্থন করিতেছে, কেহ কেহ কংগ্রেসের মত অপক্ষপাত প্রদর্শন করিয়া সলজ্জভাবে চলিয়া যাইতেছে!

হোটেলের সম্মুখেই অর্থাৎ রাস্তার অপর পার্শ্বে পার্ক। তাহার বিশ্রামস্থানগুলিতে তিল-ধারণের স্থান নাই। শাদা মোজা-পরিহিত প্যানেলা জুতা-পায়ে, কমফর্টার-জড়ান, কাশ্মীরী গরম ছিটের এক কোট তদুপরি একখানা আলোয়ান চাপাইয়া, লাঠি হাতে, সরকারী পেন্‌শন্‌ভূক্‌ মহামানবগণ জটলা করিতেছেনঃ কেহ ষাঠ বৎসর পূর্ব্বেকার কলিকাতার

তদানীন্তন ইতিহাস বলিতেছেন, কেহ আফিসের বর্ত্তমান ও ভূতপূর্ব্ব বড়সাহেবদের তুলনামূলক সমালোচনা করিতেছেন, কেহ গীতোক্ত কর্ম্মযোগের ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় ব্যস্ত। ছোক্‌রার দল চলচ্চিত্র শেষ করিয়া, চলচ্চিত্র-অভিনেত্রীদিগের মুখরোচক ব্যক্তিগত আলোচনায় তুমুল তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে।

হোটেলের নীচে "দেহিপল্লবমুদারম্" নামক এক জুতার দোকানে রেডিওতে নাটক অভিনয় হইতেছিল। তাহা শুনিবার জন্য হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া, খালি পায়ে, ছাতা মাথায় শ্রোতার দল জলে ভিজিয়াও ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তার বিপরীত দিকে "কুম্ভীর"—একটি হাঁড়িকলসীর দোকান: সাইন্‌বোর্ডে আছে—কুম্ভীর—প্রোপ্রাইটার কুম্ভশিল্পী শ্রীসচ্চিদানন্দ পাল: কোঁচার টেপ্-গায়ে দোকানী একাকী বসিয়া বিড়ি টানিতেছে! তাহার পাশে "অন্নসত্র"—একটি ভাতের হোটেল: সাইনবোর্ডে আছে—"অন্নসত্র"—গায়ত্রী-জানা, ত্রিসন্ধ্যা-আহ্নিককারী, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-সূপশিল্পী কর্ত্তৃক পরিচালিত এবং হিন্দুমহাসভা কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত: প্রযোজক—সূপবিদ্যাবারিধি শ্রীশরৎ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য; অনবরত লোক ঢুকিতেছে আর বাহির হইতেছে। তাহার পাশে—"পান্থপাদপ"—বিজ্ঞানসম্মত একমাত্র পানশালা! এখানে এক বালতি জলে সব পেয়ালা প্লেট ধৌত করা হয় না এবং আসাম ও দার্জ্জিলিংয়ের চা ছাড়া, অন্য কোনও প্রকারের সস্তা চা ব্যবহৃত হয় না: ভেজাল প্রমাণে ৫০০৲ টাকা পুরস্কারের ব্যবস্থাও আছে; ডিরেক্‌শান—আসাম-দার্জ্জিলিং-নির্য্যাস-সমবায়। ছোট ঘরের স্বল্প পরিসর স্থানটুকু চেয়ার টেবিল এবং রান্নাঘরের সরঞ্জামেই অর্দ্ধেকটা ভরিয়া গিয়াছে, বাকী অর্দ্ধেকটা খান চৌদ্দ

ভেনেষ্টা-চেয়ারে জোড়া, সব কয়টিই ভর্ত্তি : এক এক পেয়ালা চা লইয়া কেহ বাংলা দৈনিক পড়িতেছে, কেহ বাগাটেল্ খেলিতেছে, কেহ উৎসুকভাবে সম্মুখস্থ বাড়ীর আলোকিত জানালা পানে চাহিয়া সর্ব্বাঙ্গ চুল্‌কাইতেছে, কেহ হতাশভাবে বর্ষণ-ক্ষান্তি কামনা করিতেছে!

তাহার ধারে বিদ্যুদালোকিত "চুলোচুলি"—ক্ষৌরশিল্পী শ্রীমহাদেব প্রামাণিক : অতি উত্তমরূপে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চুল ছাঁটাই। দুয়ার বন্ধ, ভিতরের কিছু দেখা যাইতেছিল না। তাহার পাশে "বর্ণশিল্পাশ্রম" একটি রঙের দোকান : লম্বাবোর্ডে লেখা—বর্ণশিল্পাশ্রম "সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে—রবীন্দ্রনাথ।" তাহার ধারে "কল্পলোক"—একটি মনোহারী দোকান। তাহার পর "বাঙালী পাঁঠার দোকান"—পাঁঠা-শিল্পী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামী : সব পাঁঠাই ৺মাতার নিকট বলি হয়—দোকানে কালী মূর্ত্তি আছে : এ দোকানটি বৃথা-মাংস-ভক্ষণ-নিবারিণী সভার অনুমোদিত। ইহার পর "ঈষ্ট বেঙ্গল লজ্জানিকেতন"—সকল রকম তাঁতের ও মিলের কাপড় বাজার হইতে সুলভ দরে পাওয়া যায়! দুই চারি জন নির্ল্লজ্জ ব্যক্তি লজ্জারক্ষার ব্যবস্থা করিতেছিল। তাহার পাশে "পর্ণগ্রাফী"—বাঙালীর পানের দোকান। আশে-পাশে এমনি আরও কত : "ড্রেস্ সার্কেল"—পোষাকের দোকান। "চৈনিক প্রাসাদ"—খাবারের দোকান। ইহাদের বোর্ডে লেখা আছে—"কাজে কর্ম্মে আমাদের খাবারই একমাত্র বিখ্যাত। নামমাত্র ব্যয়ে অল্প জিনিষে বহু লোক খাওয়ান চলে। বসিয়া খাইবার ব্যবস্থা নাই।" অসীম ইহার অর্থটি ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। পাশেই "দধিচি"—উৎকৃষ্ট গো-দুগ্ধের দই ক্ষীর রাবড়ী প্রভৃতির দোকান। ইঁহারা বলেন—

আমাদের ঘুঁটে পর্য্যন্ত খাঁটি গব্য : ভেজাল্ নাই। "মসোলিয়ম"—সকল প্রকার মশলার দোকান।

মনে পড়িল, দক্ষিণ কলিকাতায় অসীম দেখিয়াছে—একটি নলের দোকানের নাম—"নালন্দা"। "বিরিঞ্চি" নামে একটি বিড়ির দোকানদারকে তাহার দোকানের নামের অর্থ জিজ্ঞাসা করায় দোকানী বলিয়াছিল—যে খাতা লেখে তাহাকে যেমন খাতাঞ্চি বলে, ১৭ জনের বসিবার আসন বলিয়া বড় আসনকে যেমন সতরঞ্চি বলে, যে খাজনা অর্থাৎ টাকা-পয়সা রাখে, তাহাকে যেমন খাজাঞ্চি বলে, তেমনি যে বিড়ি তৈরী করে, তাহাকে বিরিঞ্চি বলিলে, কি ভুল হয়? একটি শাড়ীর দোকান সে জানে, যাহার নাম "সারিগম"।

অসীমের হাসি পাইল : এমনি নামে প্রলুব্ধ হইয়া একদিন সে ভবানীপুরে "দ্রৌপদী রেঁস্তরায়" গিয়া কিছু খাইয়াছিল এবং বাড়ী ফিরিয়া সাতদিন আর কিছুই খায় নাই! বেকারবর্দ্ধিষ্ণুতার দিনে এ প্রকার ভোজনালয়ের বিশেষ উপকারিতা আছে, সন্দেহ নাই! বিকালে বাসায় ফিরিবার সময় সে দেখিয়াছিল, এক চাউলের আড়তের নাম—"চালিয়াৎ"। একটি মনোহারী দোকানের নাম, "বৈকুণ্ঠ"—অর্থাৎ এ দোকানে আসিলে সব কুণ্ঠা চলিয়া যায়। সম্মুখস্থ ফুলের দোকানটির নাম অসীমের অত্যন্ত ভাল লাগিল—"ফুল্‌স প্যারাডাইস" (Fools' Paradise)। অসীম বিস্মিত হইল, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিভাষা-সমিতিতে এখনও ইহাদিগকে বিশিষ্ট সভ্য করিয়া লওয়া হয় নাই কেন?

এই সব নামকরণ দেখিয়া অসীম ভাবিল—এ যুগে কি সবই এমনি

নাম-সর্ব্বস্ব? নামের মোহই শহরটিকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। নামেই ইহাদের পরিচয় এবং শুধু নামেই যেন ইহারা বিকায়! হয়ত নাম বাদ দিলে, আর ইহাদের কোন অস্তিত্বই থাকে না! বোর্ডে, পোষ্টারে, হোর্ডিংয়ে, কালিতে, সাইনবোর্ডে, আলোকে, নিয়ন্-সাইনে, বিজ্ঞাপনে—কেবল নাম! বহু বিচিত্র নামের নামাবলী-জড়ান এই বিপুল শহর!

বিজ্ঞাপনেরই যুগ: পথে ঘাটে যেমন কেবল বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি, তেমনি সকল কাজেই বিজ্ঞাপনের হুড়াহুড়ি: পিতৃশ্রাদ্ধ মাতৃশ্রাদ্ধ বিবাহ পূজার্চ্চনা দান-ধ্যান সবই কাগজে বিজ্ঞাপিত হওয়া চাই: বিজ্ঞাপন ছাপিতে না পারিলে যেন কোন কাজই সম্পূর্ণ হয় না! পুরুষের বিজ্ঞাপন—নামের শেষে উপাধির অক্ষর-বাহুল্যে: অবিবাহিত মেয়েদের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়—নামের পূর্ব্বে 'কুমারী' শব্দের ব্যবহারে এবং সেই নাম বিজ্ঞাপিত করিয়া সাধারণ্যে তাহাদিগকে নাচাইয়া-গাওয়াইয়া! মেয়েকে অভিনেত্রী করিয়া বাপ-মা মুখে দেখান খুব পৌরুষ, কিন্তু তাঁহাদের মনে থাকে—সস্তায় মেয়ে-পার করিবার প্রচ্ছন্ন ব্যাকুল প্রয়াস।

পার্শ্বস্থ সিনেমা হইতে হুড়মুড় করিয়া প্রায় পাঁচশতাধিক নরনারী বাহির হইয়া, জলে ভিজিতে ভিজিতে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে প্রায় চৌদ্দ-আনা তরুণ-তরুণী!

অসীম ক্রমশ দার্শনিক হইয়া উঠিল: শহরে ও মফঃস্বলে প্রত্যহ সিনেমার দর্শক দেখিয়া, বেকার দুঃখ বা অভাবের কথা তো অলীক বলিয়াই মনে হয়! সিনেমার জনপ্রিয়তাও বড় কম নয়। বাংলা ছবির

নামে ইতিমধ্যেই বহু শাড়ী ব্লাউস ও মেয়েদের গহনার ফ্যাশানও বেশ চলিয়া গিয়াছে। পরীস্থান-শাড়ী, প্রেমকণ্টক-শাড়ী, পাণ্ডবের-অজ্ঞাতবাস-ব্লাউস, রামবনবাস-শেমিজ, কীচকবধ-ব্লাউস্, ছায়া-শায়া, রাঁধুনী-বাম্নীর-কাঁদুনী-মেয়ে-শাড়ী, সিক্তা-শাড়ী, রথচক্র-শাড়ী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সিনেমা-অভিনেত্রীর নাম অলঙ্কারের বিশেষণ রূপেও ব্যবহৃত হই-তেছেঃ বনবালা-দুল্, ইন্দুমতী-কঙ্কন, ময়নামতী-ব্রেস্লেট্, হরিসুন্দরী কাণ, নৃসিংহমোহিনী-আর্মলেট্, চারুবালা-চুট্কী, বুলা-রুলি প্রভৃতি।

অসীম মনে মনে খুব কৌতুক অনুভব করিল। এতদিন সে বাস করিল, অথচ থিয়েটার-সিনেমায় তাহার এতটুকু আকর্ষণ জন্মিল না! যে কয়বার সে থিয়েটারে এবং সিনেমায় গিয়াছে, নিতান্ত অনিচ্ছায়। শুধু বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধেই সে গিয়াছিল। নিজে ইচ্ছা করিয়া কখনও যে সে কোনও প্রমোদাগারে গিয়াছে, তাহা তাহার মনেই পড়ে না। বিশেষ কোনও জনহিতকর সৎকার্য্যের জন্য অনেক সময় অসীম স্বেচ্ছায় টিকিট কিনিয়াছে, কিন্তু নিজে যায় নাই, কোনও বন্ধুবান্ধবকে সে টিকিট দান করিয়া দিয়াছে। সে যে আমোদপ্রমোদ ভালবাসে না বা ব্যয়কুণ্ঠ, তাহা নহে। জিজ্ঞাসা করিলে, অসীম বলে, তাহার ভাল লাগে না। তাহার ভাল লাগে না বলিয়া, সে যে এ সবের বিরোধী, তাহাও নয়।

অসীম কেবল বই কিনে এবং পড়িতে ভালবাসে। না পড়িলে বাড়ীতে বসিয়া গল্পগুজব করিতেও সে পছন্দ করে। বাহিরে যাইতে সে সহজে চায় না। অসীমের স্বভাবই এমনি একটু কুনো। অথচ কথা-বার্ত্তায় আলাপে পরিচয়ে অসীম অতীব ভদ্র এবং সংবাদে জ্ঞানে সে

অত্যন্ত আধুনিক। অসীম হোটেলেও খায়, কালীঘাটে এবং দক্ষিণেশ্বরেও যায়; অসীম মেয়েদের পর্দ্দা চায় না, কিন্তু তাই বলিয়া নির্ল্লজ্জভাবে তাহাদের পথে ঘাটে এমন অবাধে ঘুরিয়া বেড়ানও সে পছন্দ করে না। অসীমের চালচলনে ব্যবহারে কথাবার্ত্তায় ও রুচিতে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ও শালীনতার ছাপ দৃষ্ট হয়, যাহা তাহার সাধারণ বন্ধুমহলে তাহাকে একটু অসাধারণ করিয়াই রাখিয়াছে। এই জন্য কলিকাতায় তাহার বন্ধুর সংখ্যাও বিশেষ কম।

অসীমের বন্ধুরা তাহাকে দাদামশায় বলিয়া বিদ্রূপ করেঃ অসীম তাহাদের সহিত হাসে, কিন্তু এ টিটকারীতে সে কোনও দিনই নাতি হইতে ইচ্ছা করে নাই! কাজেই, অধিকাংশ বন্ধুই অসীমকে একরূপ এড়াইয়া চলিত। কোনও বিশেষ ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রণোদিত না হইয়া বা ধারের নামে টাকা লইয়া উপুড়-হস্ত না-করার সদভিপ্রায় ছাড়া, অসীমের নিকট কেহ কখনও বড়-একটা আসে না। প্রদত্ত টাকা অসীম কখনও কাহাকেও ফিরিয়া চায় না, তবু তাহারা অসীমকে এড়াইয়া চলেঃ দেখা হইলে, কুণ্ঠিতভাবে গা-ঢাকা দেয়। অসীম ব্যথিত হইয়া ভাবে—ইহারা এমন করে কেন?

হোটেলে একটা পেটা-ঘড়ি আছে। রাত্রি নয়টায় খাবার দিবার সময়, তাহা ঘোষণা করিবার জন্য ঘড়িতে নয়টা বাজায়। ঘড়ির শব্দে অসীম ঘরে আসিয়া, বাতি জ্বালিয়া, খাবার টেবিলে বসিল।

আহারান্তে দুয়ারে খিল দিয়া, জামা কাপড় বদ্‌লাইয়া শয়ন করিবার উদ্যোগ করিতে গিয়া, ড্রেসিং টেবিলের উপর দুইখানি চিঠি দেখিয়া, তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালাইয়া সে পড়িতে বসিল।

অসীম জানে না, কোন সময়ে ভৃত্য আসিয়া চিঠি দুইখানি রাখিয়া গিয়াছে। ভাগ্যিস নজরে পড়িল? না হইলে, সে তো জানিতেই পারিত না! অসীম স্থির করিল, প্রভাতেই সে ম্যানেজারকে বলিয়া দিবে, তাহার চিঠি যেন ভবিষ্যতে তাহার হাতে দেওয়া হয়।

উজ্জ্বল বিদ্যুদালোকে দেখিল, একখানা চুণীবাবুর লিখিত, অন্যখানি শীলার চিঠি, চৈতন্পুর ঘুরিয়া এখানে আসিয়াছে। প্রথমে চুণীবাবুর চিঠিখানা খুলিল। চুণীবাবু বিশেষ বিস্মিত হইয়া জানিতে চাহিয়াছেন, অসীম কাহার কাছে শুনিল যে তাঁহার স্ত্রী মরণাপন্ন কাহিল? কলিকাতায় শীলা ও জীবানন্দ আছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই তো তাহাকে এমন অকারণ চিন্তিত হইতে হইত না! শীলাকেও তিনি পত্র লিখিলেন, সে যেন অসীমের সহিত হোটেলে সাক্ষাৎ করে।

অসীমের মাথার মধ্যে সব গোলমাল হইয়া গেল! সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? এ কি রহস্য? হোষ্টেলে লেডী-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, অসীমকে শীলার স্বহস্তে-লেখা দরখাস্তখানাই যে দেখাইয়াছেন! অসীম নিজে পড়িয়াছে—তাহার মাতা মরণাপন্ন কাহিল। সবাই জানে, সে চট্টগ্রাম গিয়াছে। অথচ, চট্টগ্রাম হইতে তাহার পিতা লিখিতেছেন, তাঁহার স্ত্রী মোটেই অসুস্থ নহেন, শীলাও চট্টগ্রামে নাই, কলিকাতাতেই আছে। অথচ সে তাহার হোষ্টেলেও নাই! ব্যাপারটা অসীমের রহস্যাবৃত মনে হইতে লাগিল।

অসীমের মনটা অকস্মাৎ খারাপ হইয়া গেল। শীলার চিঠিখানা খুলিতে অজ্ঞাতে হঠাৎ তাহার হাতটা একটু কাঁপিয়া উঠিল। কি জানি, ইহার মধ্যে আবার কি আছে? হয়ত এখন যাহা অদ্ভুত ঠেকিতেছে, এই চিঠিতে তাহার সমাধান পাওয়া যাইবে! মনকে প্রবোধ দিয়া অসীম

শীলার চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। শীলা লিখিতেছে নার্সিং হোম হইতে। কোথায় যে এ নার্সিং হোম তাহার কোনও ঠিকানা নাই। শীলা লিখিতেছে, সে রক্তআমাশয়ে শয্যাগত। এমন কি, মর'-মর'। শীলার অসুখের সংবাদও তাহার পিতা জানেন বলিয়া বোধ হয় না।

তাহার কাকা জীবানন্দ! এই লোকটাকে অসীম দুই চক্ষে দেখিতে পারে না। এ লোকটার সম্বন্ধে অসীম অনেক কথাই শুনিয়াছে: তাহার চালচলনে কথায় বার্ত্তায় আচারে ব্যবহারে অসীম তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়াই মনে করে না—যদিও প্রকাশ্যে কিছুই বলে না। অসীম সর্ব্বদাই জীবানন্দকে ভদ্রভাবে এড়াইয়া চলে। তাহাকে পছন্দ করে না বলিয়া, তাহার সহিত কখনও সে রূঢ় ব্যবহারও করে নাই।

শীলার এই রহস্যময় নিরুদ্দেশের সহিত জীবানন্দর নাম জড়িত থাকায়, অসীমের মাথায় টগবগ্ করিয়া রক্ত ফুটিতে লাগিল। অথচ, হঠকারিতাবশে চট্ করিয়া খারাপ একটা কিছু ভাবিতেও, তাহার সাহস হয় না! এ কি? হঠাৎ এমন কি-ঘটনা ঘটিল যে, কেহই কাহারও কোন কথাই জানে না? বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, চুণীবাবু কিছুই জানেন না। হোষ্টেলের কর্ত্তৃপক্ষ শীলার দরখাস্ত অনুযায়ী তাহাকে ছুটি দিয়াছেন, এবং সে যাহা বলিয়াছে, তাহাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিশ্বাস না করিয়া যেমন উপায় নাই, তেমনি অবিশ্বাস করিবারই বা হেতু কি? শীলা তবে মিথ্যা করিয়া, মাতা মরণাপন্ন অসুস্থ বলিয়া, ছুটি লইল কেন? ছুটিই যদি লইল তো, গেল কোথায়? কাহার সঙ্গে গেল? কেন গেল? অসীম হিসাব

করিয়া দেখিল, যে-তারিখে শীলা হোষ্টেল ছাড়িয়াছে, তাহার দশ দিন পরেই অসীমকে নার্সিং হোম হইতে এই পত্র লিখিয়াছে। এই দশ দিন ধরিয়া সে কোথায় অজ্ঞাতবাস করিতেছে? কাহার কাছে আছে? কেন আছে? অন্যত্রই গেল যদি, তো তাহার বাবাকে পর্য্যন্ত জানাইল না কেন? এ মিথ্যাচারের মধ্যে পরিস্কার দেখা যাইতেছে—মিথ্যা অজুহাতে হোষ্টেল হইতে পলায়ন এবং পলাইয়া আত্মগোপনের চেষ্টা। অথচ এটি করা হইয়াছে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার সহিত। ইহার মধ্যে কোনও অসাধারণ অভিসন্ধিও, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই আছে!

সে স্বেচ্ছাতেই ছুটি লইয়াছে এবং একাই হোষ্টেল হইতে গিয়াছে। সে এইবার বি-এ দিবে, বয়সও প্রায় ২০।২১ বৎসর। সুতরাং তাহার অমতে নিশ্চয় এ কাজ হয় নাই। অসীম চিন্তা করিতে করিতে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। শীলার উদ্দেশ্য বিশেষ ভাল মনে হইল না। ভাল যদি হইত, তাহা হইলে এত মিথ্যার আশ্রয় কেন লইবে? অথচ সে আবার ইহাও লিখিতেছে যে, অগ্রহায়ণ মাসেই যাহাতে তাহাদের বিবাহ হয়, চুণীবাবুকে লিখিয়া, তাহার ব্যবস্থাও করিতে! ব্যাপারটা ক্রমশ বড়ই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

অসীম হোটেলের আফিস হইতে টেলিফোন ডিরেক্টরীটি আনিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া, কোথাও এ প্রকার নাম পাইল না। টেলিফোনের ক্লার্ক-ইন্-চার্জ্জকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সেও বলিতে পারিল না। অসীম ভাবিল, নার্সিং হোম বলিয়া কথা, সেখানে টেলিফোন নাই? ইহা কি সম্ভব?

চিন্তায় অসীমের মাথা যেন ফাটিয়া চৌচির হইবার উপক্রম হইল। অসীম কাপড়-জামা বদলাইয়া একখানি ট্যাক্সি করিয়া বাহির হইল।

তখন সবে বর্ষা একটু থামিয়াছে। আকাশে স্তরে স্তরে মেঘের পুঞ্জ—এলোমেলো ঠাণ্ডা বাতাসে দক্ষিণ হইতে উত্তরে আসিয়া মেঘেরা আবার জমা হইতেছিল। রাত্রি প্রায় বারটা।

ডাক্তার পাকড়াশীর বাড়ীতে আসিয়া দেখে, তিনি তখন নীচেকার ঘরে বসিয়া চিকিৎসাবিষয়ক একখানি বিলাতী মাসিকপত্র পড়িতেছিলেন। ডাক্তার পাকড়াশী শহরের সর্ব্বজনবিদিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। বয়স প্রায় ৫৫।৫৬ হইলেও, দেখিতে অনেক কম দেখায়। অসীম যখন কলিকাতায় থাকিত, ডাঃ পাকৃড়াশী অসীমের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন।

অসীমের ট্যাক্সি গাড়ীবারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই উচ্চকিত হইয়া, তিনি দরজার দিকে চাহিলেন। অসীম পর্দ্দা ঠেলিয়া প্রবেশ করিতেই, ডাঃ পাকৃড়াশী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি? অসীম যে? কবে এলে? এ সময়ে? বস, বস—তোমায় খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে?"

অসীম অন্তরের উত্তেজনা যতই গোপন করিতে চাহিতেছিল, ততই সেটা প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। তাড়াতাড়ি ডাঃ পাকড়াশীর প্রশ্নের উত্তর দিয়া কহিল—"ডাক্তার পাকড়াশী, শুধ্ধু একটা খবরের জন্যে আমি এসেচি। আপনাকে এই দুপুর রাত্রে বিরক্ত কর্‌চি, ক্ষমা কর্‌বেন। মনে করুন, আমি একজন রোগী—এই আপনার ফী"—বলিয়া অসীম বত্রিশটি টাকা ডাক্তারবাবুর সম্মুখে রাখিল।

ডাক্তারবাবু টাকা কয়টির পানে সাগ্রহলোলুপ দৃষ্টি দিতে দিতে, অতি মৃদু আপত্তি জানাইয়া, সেগুলি ড্রয়ারস্থ করিলেন।

অসীম জিজ্ঞাসা করিল—"কল্‌কাতায় নার্সিং হোম কোথায় ?"

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"নার্সিং হোম তো কটাই আছে। কেন বল' দেখি ?"

অসীম অতি কষ্টে মনোভাব চাপিয়া কহিল—"আমার এক আত্মীয়া এমনি একটা হোমে আজ দিন দশেক হল ভর্ত্তি হয়েছেন। তাঁর ঠিকানাটা আমি চাই, বিশেষ জরুরী।"

ডাক্তারবাবু এক ধার হইতে জানা, আধা-জানা, অজানা, শোনা, যতগুলি এই জাতীয় হোম কলিকাতা ও শহরতলীতে আছে, তিনি টেলিফোন করিলেন এবং সব স্থান হইতেই উত্তর পাইলেন—রক্ত আমাশয়ের কোনও রোগিনী সে হোমে নাই বা গত ছয় মাসের মধ্যে কেহ আসে নাই।

রাত্রি আড়াইটা পর্য্যন্ত প্রায় শতাধিক টেলিফোন হইল, কিন্তু নার্সিংহোমের বা রোগিনীর কোনও সন্ধানই মিলিল না।

উত্তেজনায় ও অনিদ্রায় মাথায় রক্ত উঠিয়া, অসীমের চোখ দুইটি হইয়াছিল টক্‌টকে লাল, তাহার পা টলিতেছিল। এত রাত্রে আর কি-ই বা করা যায়? রাত্রি প্রভাত হউক, এ ব্যাপারের একটা হেস্তনেস্ত করিতেই হইবে।

পথে বাহির হইয়া, অসীম কি ভাবিয়া দক্ষিণাভিমুখে ট্যাক্সি চালাইল। জীবানন্দর বাড়ীতে আসিয়া শুনিল, জীবানন্দ তখনও বাড়ী ফিরে নাই। অসীম জানে, কাজেই অপেক্ষা করিতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না। অগত্যা হোটেলের দিকেই ফিরিল।

নীরব নির্জ্জন পথ। পথটি বড় রাস্তা হইতে নূতন বাহির হইয়াছে। অসীমের ট্যাক্সি যেমনি সরু রাস্তা ছাড়িয়া বড় রাস্তায়

উঠিয়া উত্তর দিকে যাইবার জন্য মোড় লইল, অমনি বিপরীত দিক হইতে সবেগে একখানি মোটর আসিয়া ভীষণ জোরে ট্যাক্সিতে ধাক্কা মারিল। সংঘর্ষের বিকট শব্দে পথিপার্শ্বস্থ বাড়ীগুলির জানালায় সুপ্তিজড়িত শত শত কৌতূহলী মুখ এক সঙ্গে ঝুঁকিয়া পড়িল। শিখ ট্যাক্সি-ড্রাইভার কতকটা সাম্‌লাইয়া লইয়াছিল, কিন্তু ও-গাড়ীর মোটরচালকটি অন্যমনস্কভাবে গাড়ী চালাইতেছিল বলিয়া, তাহার গাড়ীখানি সশব্দে ছিটকাইয়া গিয়া পড়িল একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িতে। গাড়ীখানিতে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। গাড়ীর হুড্ খোলা থাকায়, দুইজন দুইদিকে ঠিক্‌রিয়া পড়িল। গাড়ীতে আরোহী ছিল মাত্র দুইজন। সাহেবীপোষাকে সুসজ্জিত একজন ভদ্রলোক এবং তাঁহার পাশে একজন তরুণী। পুরুষটিই গাড়ী চালাইতেছিলেন।

অসীম গাড়ীর মধ্যে হুম্‌ড়ি খাইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। মাথায় গুরুতর আঘাত লাগিয়া অসীম জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া রহিল। ট্যাক্সি-ড্রাইভার কোনও প্রকারে টাল সামলাইয়া লইয়া, পূর্ণ বেগে ট্যাক্সি চালাইয়া দিল। কয়েকজন লোক "পাকড়ো, পাকড়ো" করিতে করিতে কিয়ৎদূর পর্য্যন্ত গাড়ীর পিছু পিছু ছুটিয়া আসিল—চক্ষের নিমেষে গাড়ী হাওয়ার মত অদৃশ্য হইয়া পড়িল। এক ছুটে একেবারে হোটেলের খোলা ফটকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া, ট্যাক্সিখানা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

পূর্ব্বদিক রক্তবর্ণ: কয়েক মিনিট পূর্ব্বেকার অগ্নিকাণ্ড ও রক্তারক্তি ব্যাপারের ছায়া যেন আকাশে প্রতিফলিত হইল! রুদ্ধদ্বার এক দোকানঘরের ঘড়িতে পাঁচটা বাজার চাপা শব্দ শোনা গেল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ড্রাইভার ও হোটেলের নেপালী দারোয়ান অজ্ঞান অসীমকে ধরাধরি করিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া, একেবারে তাহার কক্ষে তুলিয়া, বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া আসিল। ভৃত্য জামা কাপড় ছাড়াইয়া দিল।

গত রাত্রে দশটায় অসীমের জন্য দারোয়ান ট্যাক্সি আনিয়া দিয়াছিল, তাই সে ভাবিল—বাবু এখনও বিশেষ অসুস্থ !

এই হোটেলের স্বত্বাধিকারীর পুত্র বৃন্দাবন অসীমের বন্ধু ও সহাধ্যায়ী। সেই জন্য কলিকাতায় আসিলে অসীম এইখানেই উঠে, অসীমকেও সকলেই এখানে চিনে। স্বত্বাধিকারীর আদেশে, অসীমের জন্য হোটেলে থাওয়া ও থাকার বিশেষ ব্যবস্থাও আছে।

বেয়ারা সকালে চা দিতে আসিয়া অসীমকে তখনও গাঢ় নিদ্রিত দেখিয়া, বিস্মিত হইল: বহুদিন হইতে অসীম এখানে আসা-যাওয়া করিতেছে, এত বেলা পর্য্যন্ত কখনও সে তাহাকে ঘুমাইতে দেখে নাই। বেয়ারা ডাকিল, সাড়া পাইল না; গায়ে হাত দিয়া দেখিল, গা আগুনের মত গরম, চক্ষু নিমীলিত। কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল—জ্ঞান নাই।

ভীত হইয়া বেয়ারা তাড়াতাড়ি ম্যানেজারকে গিয়া খবর দিল। ম্যানেজার অসীমকে দেখিয়া, স্বত্বাধিকারীকে টেলিফোন করিল এবং নীচেকার ডিস্পেন্সারি হইতে এক ডাক্তারকেও সংবাদ দিয়া আনাইল।

ডাক্তার অনেক রকম পরীক্ষা ও গবেষণা করিয়া স্থির করিল, হঠাৎ প্রবল জ্বরে অসীম এরূপ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে; বুকে কিছু ঠাণ্ডাও লাগিয়াছে; শরীরে হয়ত ম্যালেরিয়ার বিষ আছে; রোগীর এক্স-রে এবং

মল মূত্র ও রক্ত পরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ; আবশ্যক হইলে, ছয় সপ্তাহে ১২টি ইন্‌জেক্‌শন্‌ও দিতে হইতে পারে ; সম্ভবত অটো-ভ্যাক্সিনেরও দরকার হইবে—ইত্যাদি অনেক বড় বড় কথা বলিয়া, লম্বা এক ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিয়া, তাহার দর্শনী লইয়া ডাক্তার পলাইয়া বাঁচিল। ডাক্তারটি এই বৎসরই পাশ করিয়াছে, শ্বশুর ডিস্পেন্‌সারি করিয়া দিয়াছেন।

ম্যানেজার বাবুটি চতুর। ডাক্তারের মুখ দেখিয়াই ধরিয়া ফেলিল—ডাক্তারবাবু কতকগুলি বড় বড় বুলিই ঝাড়িয়া গেল, রোগ যে কি তাহা সে কিছুই ধরিতে পারে নাই! সে জানে, নূতন ডাক্তারেরা রোগ দেখিলেই এমনি অনেক কথাই বলে। তাহারা মনে করে, জানি না বা পারিলাম না বলিলে, পশারের হানি হয়। ফলে, প্রথম হইতেই কুচিকিৎসায় রোগীর আরোগ্য হওয়ার পথ বিষম কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠে।

ম্যানেজারের মনে পড়িল, তাহার স্ত্রী বহুদিন স্ত্রীরোগে ভুগিতেছিলেন ঃ ডাক্তারেরা অম্ল, অজীর্ণ, বায়ু, বাত, হৃদ্‌রোগ, শিরঃপীড়া প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার কথা বলিয়া, বহুদিন যাবৎ তাঁহার চিকিৎসায় প্রচুর অর্থ পকেটস্থ করিয়া, রোগিনীর অবস্থা দস্তুরমত শঙ্কটজনক করিয়া তুলিয়াছিল। পরে ডাক্তার চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে নীরোগ করেন। ডাক্তার চক্রবর্ত্তী প্রথম দিন দেখিয়াই যাহা বলিয়াছিলেন, ম্যানেজারবাবুর সেই কথাটি মনে পড়িল। ডাঃ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছিলেন—ইহার স্ত্রীরোগ, অথচ আসল রোগে কেহই হাত দেয় নাই, সকলেই রোগের উপসর্গ লইয়াই পণ্ডশ্রম করিয়াছে এবং অর্থের অপব্যয় করাইয়াছে। ইহার দ্বারা প্রকৃত চিকিৎসা হইল এবং আপনাআপনি সমস্ত উপসর্গও চলিয়া গেল। এই প্রসঙ্গে ডাঃ চক্রবর্ত্তী আরও বলিয়াছিলেন—কু-চিকিৎসা হইতে

অ-চিকিৎসাও ঢের ভাল। রোগীকে প্রথম হইতেই ভাল চিকিৎসকের হাতে ছাড়িয়া দিতে, তিনি ইঁহাকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন।

ম্যানেজার সেই উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া, ব্যবস্থাপত্র খানি চাপিয়া রাখিয়া, ডাঃ পাকড়াশীকে টেলিফোন করিল।

বহুক্ষণ পরীক্ষা করিয়া ডাঃ পাকৃড়াশী অসীমের মাথায় একটা আঘাতের চিহ্ন আবিষ্কার করিলেন, কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না—কি করিয়া অসীম আহত হইল। দারোয়ান বলিল—ট্যাক্সির ভিতর হুম্‌ড়ি-খাওয়া অজ্ঞান অবস্থায় অসীম ভোর পাঁচটায় বাসায় ফিরিয়াছে এবং অতি কষ্টে সে অসীমকে উপরে তুলিয়া শোয়াইয়া দিয়া গিয়াছে।

ডাঃ পাকড়াশী আসিয়া সত্যই রোগ-নির্দ্দেশ করিলেন অন্য, এবং ব্যবস্থাও করিলেন বিভিন্ন। গত রাত্রে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ এবং টেলিফোন্ করার বিষয় ডাঃ পাকৃড়াশী ম্যানেজারকে সব বলিতেছিলেন, ইতিমধ্যে হোটেলের স্বত্বাধিকারী দীনবন্ধুবাবুও আসিয়া পৌঁছিলেন।

দীনবন্ধু অসীমকে খুব ভালরূপেই চিনিতেন। অসীমের ম্যানেজার জানকীবাবুকে তৎক্ষণাৎ একখানা পত্র লিখিয়া দিয়া, তিনি অসীমের সেবাশুশ্রূষার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

পঞ্চম দিনে সকাল বেলায় অসীম অনেকটা সুস্থ হইল। সম্মুখে ডাঃ পাকৃড়াশী উপবিষ্ট, আশে-পাশে দীনবন্ধুবাবু, জানকী মল্লিক, ম্যানেজার, কার্ত্তিক প্রভৃতি সকলে দণ্ডায়মান।

চক্ষু মেলিয়াই জানকী কার্ত্তিক এবং এতগুলি লোককে চতুঃপার্শ্বে দেখিয়া, অসীম প্রথমটা বিস্মিত হইয়া, তখনি আবার চক্ষু বুঁজিল। ডাঃ পাকৃড়াশীর প্রশ্নে, ক্লান্তভাবে অনেক ভাবিয়া অসীম বলিল যে, সে তাঁহার নিকট হইতে

সেই রাত্রেই বালিগঞ্জ যায়। যাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল, তাহাকে বাড়ীতে না পাইয়া, অসীম তখনই হোটেলে ফিরিবার জন্য ট্যাক্সিচালককে হুকুম দেয়। কিয়দ্দূর আসিয়া গাড়ী বোধ হয় কিসে ধাক্কা লাগে। তাহার পর আর তাহার কিছুই মনে পড়ে না।

রোগীর যাহাতে উত্তেজনা হয়, এমন কোনও রকম প্রশ্ন বা এমন কোনও কাজ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়া, ডাঃ পাকৃড়াশী বিদায় লইলেন। বৃদ্ধ জানকী মল্লিক ছুটিল কালীঘাটে কালীমাতার পূজা দিতে।

কার্ত্তিক চোখের জল মুছিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে অসীমের সেবায় মন দিল। অসীমের অসুখে কার্ত্তিকই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উতলা হইয়া পড়িয়াছিল। অসীমের মুখে কথা শুনিয়া, পুলকাশ্রুতে তাহার স্নেহপ্রবণ তরুণ মুখমণ্ডলে স্বস্তির এক রঙীন ইন্দ্রধনু ফুটিয়া উঠিল।

দশ দিন কাটিল। অসীম এক রকম সুস্থই, তবে মাঝে মাঝে মাথায় এক অসহ্য যন্ত্রণা হয়। ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন, ইহা ক্রমশ যাইবে। জানকী মল্লিক গত কল্য চৈতনপুর ফিরিয়া গিয়াছে; অসীমের সেবার নিমিত্ত কার্ত্তিক রহিয়া গেল।

অপরাহ্ন, বেলা প্রায় চারিটা। অসীম ঘরের বাহিরে ঝোলা-বারান্দায় একখানা ডেক্‌-চেয়ারে অর্দ্ধশয়িত হইয়া আকাশে মেঘের চলাফেরা দেখিতেছিল। রৌদ্রকে কুক্ষিগত করিয়া মেঘেরা ধারা-যন্ত্রে ধরণীতে নামিবার উপক্রম করিতেছিল। ঠাণ্ডা হাওয়ায়, বিদ্যুৎলীলায় আর মেঘহুঙ্কারে সমাসন্ন জলধারার আগমনী-গীতি রচিত হইতেছিল।

কক্ষের দুয়ারে মৃদু করাঘাত শুনিয়া, কার্ত্তিক দুয়ার খুলিয়া দিল। ডাঃ পাকৃড়াশী চুণীবাবু ও শীলা দুয়ারে উপস্থিত।

অসীম যুগপৎ বিস্মিত ও বিব্রত হইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিবার উপক্রম করায়, ডাঃ পাকৃড়াশী তাড়াতাড়ি নিষেধ করিয়া কহিলেন—"তুমি উঠ না, তুমি উঠ না—তুমি বস—তুমি বস।"

অসীম আর উঠিল না। সম্মুখ হইয়া ফিরিয়া বসিল। কার্ত্তিক কয়েকখানা চেয়ার আনিয়া দিল। সকলে অসীমের সন্নিকটে উপবেশন করিল।

ডাঃ পাকৃড়াশী সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি অবাক্ হয়ে দেখ্‌চ কি অসীম? ভাব্‌চ, এঁদের সঙ্গে আমি জুট্‌লাম কি করে?"

দুর্ব্বলভাবে অসীম একটু ম্লান হাসি হাসিল।

চুণীবাবু কহিলেন—"বিপ্রদাস যে আমার সহপাঠী। প্রেসিডেন্সি কলেজে বিপ্রদাস আর আমি চার বৎসর শুধু এক সঙ্গে পড়িই নাই, এক ঘরে পর্য্যন্ত থেকেচি! তুমি কি তা জান্‌তে না, অসীম?"

অসীম মৃদুকণ্ঠে কহিল—"না, এ ত আমি জান্‌তাম না।"

ডাক্তার পাকড়াশীর পুরা নাম বিপ্রদাস পাকড়াশী। সেই রাত্রে ডাঃ পাকড়াশীর সঙ্গে কথোপকথন এবং তাঁহার দ্বারা অত গুলি টেলিফোন্ করাইয়া, জনৈকা আত্মীয়ার খোঁজ করানোর কথা স্মরণ করিয়া, অসীম একটু অপ্রতিভ এবং অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল।

ডাক্তারবাবু কহিলেন—"বল্‌লাম না? সেদিন রাত আড়াইটা পর্য্যন্ত অসীম আমার কাছেই ছিল। একটি মেয়ের খোঁজ করা হল সমস্ত নার্সিং হোমে। তখন পর্য্যন্ত আমি জানতামই না যে, অসীমের সঙ্গে আমার বুড়ীমার বিয়ের সব ঠিক। অথচ অসীমকে আমি দেখাশোনা কর্‌চি আজ দশ-বারো বৎসর। কি আশ্চর্য্য! কুসংস্কারগ্রস্ত লোকেরা এই সব ব্যাপার নিয়েই এক একটা আধ্যাত্মিক গল্প রচনা করে থাকে।"

সবার অলক্ষ্যে শীলার মুখখানা অকস্মাৎ ভস্মাভ হইয়া উঠিল।

চুণীবাবু সহাস্যে কহিলেন—"সত্যি বিপ্রদাস, এ বড় আশ্চর্য্যই বটে। ভাগ্যিস্ তোমার বাসায় এসে উঠলাম! কাল রাত্রে, গাড়ীতে হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়্ল। ভাব্লাম্, অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা নাই, দেখা সাক্ষাৎ হবে, তোমার বাসাতেই উঠ্ব! আমার টেলিগ্রাম পেয়ে তুমি খুব অবাক্ হয়েছিলে নিশ্চয়—"

বিপ্রদাস কহিলেন—"এতটুকু না! তবে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্যে মুখটা নিস্পিস্ করছে। এটাকেও কুসংস্কার বল্তে পার।"

চুণীবাবু কহিলেন—"তা আসামী যখন নিজে হতেই ধরা দিয়েছে, তখন দোহাই ধর্ম্মাবতার, দয়া করে এ যাত্রা রেহাই দাও—"

উভয়ে একসঙ্গে খুব খানিকটা হাসিয়া লইলেন।

কার্ত্তিক হোটেলের বেয়ারাসহ চা ও খাবার লইয়া ঘরে ঢুকিল। শীলা বাতি জ্বালিয়া, সকলের চায়ের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

অসীমের "সূপ" আসিল। বাহিরে মুষলধারায় বৃষ্টি নামিয়াছিল।

চা-পানান্তে বিপ্রদাস প্রস্তাব করিলেন—"তাহ'লে চুণী, তুমি এস আমার সঙ্গে। গোটা-চারেক ডাক আছে, সেগুলো সেরে ফেলে, দু'জনে বহুকাল পরে বর্ষামুখর এমন মধুর সন্ধ্যায় দাবা-ঝালটা নিয়ে একবার বসা যাক্‌গে—বহুকাল দাবা খেলিনি। বুড়ী বরং এখানেই একটু থাক্, ফির্বার সময়, আমরা ওকে উঠিয়ে নিয়ে যাব। আমাদের সঙ্গে ও আর কোথা এই বাদলায় ঘুরে বেড়াবে? কি বল?"

এ প্রস্তাবের মধ্যে যে ইঙ্গিতটি প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। চুণীবাবু সানন্দে কহিলেন—"চমৎকার! তা'হলে

বুড়ী, তুই একটু এখানে বস, মা। অসীমের সঙ্গে ততক্ষণ একটু কথা-বার্ত্তা ক'—বুড়োদের সঙ্গে মুখ বুঁজে ঘুরে আর কি করবি? ঠাণ্ডা লাগ্‌তে পারে! আমরা চট্ করে আসচি। খেল্‌তে বস্‌তে হবে—"

শীলার ডাক-নাম বুড়ী। সে নতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিপ্রদাস ও চুণীবাবু চলিয়া গেলেন।

কার্ত্তিক অসীমের ডেক্‌চেয়ারের আরও নিকটে একখানা চেয়ার রাখিয়া, দুয়ারের পর্দ্দাটি ভাল করিয়া ফেলিয়া দিয়া, বাহিরে গিয়া বসিল। শীলাকে পূর্ব্ব হইতেই কার্ত্তিক চিনিত এবং জানিত যে, ইনিই চৈতনপুরের ভাবী গৃহলক্ষ্মী।

শীলা কুণ্ঠিত চরণে আস্তে আস্তে আসিয়া অসীমের পাশে বসিল। মুখে সে জোর করিয়া যতই প্রফুল্লতার রং চড়াইতে চেষ্টা করিতেছে, ততই সে রঙ্‌টা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, মুখখানাকে বেশী-বেশী কালোই করিয়া তুলিতে লাগিল। শীলার মানসিক প্রয়াস মুখের উপর রূপপরিগ্রহ করিয়া যেন কায়েমী হইয়া বসিল! এতক্ষণ তবুও এক রকমে বসিয়াছিল, কিন্তু এবার একেলা হইয়া সে রীতিমত ভীত হইয়া পড়িল। এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করিতে লাগিল। সে যেন ছাদের কার্ণিশের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এখনি বুঝি অগাধ নীচে পড়িয়া গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে! জোর করিয়া সে কিছু করিতে বা বলিতে চায়, কিন্তু তাহার শক্তি যেন কি এক মন্ত্রবলে হঠাৎ অপহৃত হইয়া গেল। খোলা দুয়ার দিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া আসিতেছিল, মাথার উপর বৈদ্যুতিক পাখা চলিতেছিল, তবু তাহার মনে হইল—অসহ্য গরম! শীলা ঘামিতে আরম্ভ করিল।

একে একে অসীমের অনেক কথাই মনে পড়িল, কিন্তু ঘরে এই অতিথিগুলিকে পাইয়া, সে রোষের উত্তাপ আর রহিল না। সেদিন সন্দেহের আগুনে তাহার মনের কিয়দংশ যে পুড়িয়া গিয়াছিল, সে ক্ষতও শুকাইতে আরম্ভ করিল, দগ্ধ-ক্ষতের কালো দাগটি পর্য্যন্ত যেন মিলাইয়া যাইবার মত হইল!

চেয়ারখানি ঘুরাইয়া, শীলার মুখোমুখি বসিয়া, মৃদু হাসির সহিত অসীম কহিল—"তোমার ব্যাপারটা কি বলত?"

শীলা কথা কহিয়া বাঁচিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কি ব্যাপার?"

অসীম জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি ছিলে কোথা এদ্দিন?"

শীলা অম্লানবদনে হাসিয়া উত্তর দিল—"সত্যি, এ একটা ব্যাপারই হয়ে দাঁড়িয়েচে। আমারি বোকামিতে অবিশ্যি এ ঘটেচে। আমি লাউডন ষ্ট্রীটের ব্রাবোর্ণ নার্সিং হোমে ছিলাম। আমার চিঠিতে আমি লিখেছিলাম, শুধু নার্সিং হোম—ঠিকানা দিই নি। এই না ব্যাপারের কারণ?"

অসীম হাসিয়া কহিল—"তা ছাড়া আরও আছে—"

শীলা বাধা দিয়া কহিল—"হোষ্টেলের দরখাস্ত?"

অসীম বিস্মিত হইয়াও, তেমনি প্রসন্নভাবেই কহিল—"ভেবে দেখ দেখি? এই দু'টো মিলিয়ে দেখ্‌লে কি মনে হয়—"

শীলা ক্রমশ সহজ হইয়া আসিতেছিল। সম্মোহিনী সরলতার অভিনয় করিয়া কহিল—"বাবাও ঠিক ঐ কথাই বল্‌ছিলেন। ব্যাপারটা যে এমন বিশ্রী হবে, তা আমি মোটেই বুঝ্‌তে পারি নি।"

অসীম মুগ্ধ হইল। কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"খোলাশা করে তা হ'লে আমাকেও সব বল, আমিও শুনি।"

শীলা কহিতে লাগিল—"নার্সিং হোমের কথাটাই আগে সেরে নি। চিঠি যখন লিখি, সত্যি কথা বলতে কি, তখনও পর্য্যন্ত সে হোমের প্রকৃত নাম বা ঠিকানা কি, তা আমি কিছুই জানতাম না। জীবাকা নিয়ে এসে ভর্ত্তি করিয়ে দিল : আমি ত মর-মর—কিছুই জানতাম না বা খোঁজও করি নি : আর তার প্রয়োজন ও হয় নি। আমার ধারণা, নার্সিং হোম কলকাতায় একটাই আছে, আর তার ঠিকানাও তুমি বা বাবা সবাই জান। নার্সিং হোম না নার্সিং হোম! এ-ও যে দশ-বিশটা আছে, তা-কি আমি জানি? তা ছাড়া, ২।১ দিনের মধ্যে ত সেখান থেকে চলেই আস্‌চি, কাজেই, ঠিকানা-ফিকানার জন্যে, সত্যি, অত মাথাও ঘামাই নি। এর জন্যে যে আবার এ রকম কেলেঙ্কারী হবে, তা কে জান্‌তে বল?"

কিছুদিন আগে কুসুমপুরের বহুদর্শী দারোগা অসীমকে কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিল—আমাদের দেশের মেয়েরা শিক্ষিতাই হোক, আর অশিক্ষিতাই হোক, এক-এক সময় তারা নিতান্ত নির্ব্বোধের মতই কাজ করে ফেলে। অসীমের সেইটা মনে পড়িল। শীলার কথা সে বিশ্বাস করিল। কহিল—"একটু ভেবে চিঠিখানা লিখ্‌লে, আর এ কেলেঙ্কারীটা হত না! আচ্ছা, তারপর? হোষ্টেলে ও-রকম যা-তা লিখ্‌তে গেলে কেন?"

শীলা কহিল—"তুমি জান না, অসি, আমাদের হোষ্টেলে অসুখবিসুখ হলে কি রকম উৎপাত করে! তারা যদি জানতে পারত যে, আমার খুব খারাপ রকমের রক্ত-আমাশয়, তাহলে আমার আর কষ্টের সীমা থাকত না। কাজেই, অসুখের কথা হোষ্টেলে না বলে, মায়ের অসুখ হয়েছে বলে পালিয়ে আসি। হোষ্টেলে থাক্‌লে এদ্দিন আমায় দেখ্‌তেই পেতে না।"

অসীম সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"সেকি? এ ত বড় অদ্ভুত! হোষ্টেলে মেয়েরা থাক্‌বে, আর অসুখ হ'লে যাবে কোথা? সবারি ত তোমার মত এমন জীবাকা নেই, বা জজ-বাপও নেই: বা এমন টাকার জোরও নেই। তাদের অসুখ হ'লে তারা কি করে?"

শীলা কহিল—"অসুখ হ'লেই, তাকে একতলার একটা এঁদো-ঘরে সরিয়ে, আলাদা করে' রেখে দেওয়া হয়, পাছে অন্য সব মেয়েদের ছোঁয়াচ লাগে। যাদের উপায় নেই, তারা অগত্যা সেই খানেই থাকে—কি আর ক'রবে? সত্যি কথা বল্‌তে গেলে, রক্ত-আমাশয় রোগটা ত ছোঁয়াচে! কাজেই আমি গোড়া থেকেই সাবধান হয়েছিলাম—"

অসীম হাসিয়া উঠিয়া কহিল—"তোমার বুদ্ধি ত বড় কম নয়? কিন্তু এত বুদ্ধি আর সাবধানতাসত্ত্বেও ব্যাপারটা যা করে তুলেছিলে, এখন তা ভাব্‌তে, সত্যিই বড় লজ্জা হচ্ছে।"

শীলা কহিল—"আমারি কি কম লজ্জা হচ্ছে? বাবা যখন জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, আমি ত তখন মরেই গিছলাম আর কি? সব শুনে, বাবা হেসেই আকুল। ডাক্তারবাবুও বাবাকে বল্‌লেন, আজকাল ইউনিভার্সিটি মেয়েদের হোষ্টেল নিয়ে ভারী কড়াক্কড়ি করে। অবিশ্যি একদিক দিয়ে এ ভালই, কেন না, একজনের অসুখে আর দশ জন কেন ভোগে?"

অসীমের মনের মেঘ কাটিয়া গেল। কহিল—"যাক্‌, ভালই হল! তোমার বাবাও এসেছেন, এইবার যা কর্‌তে হয়, কর' তোমরা। তোমার শরীরটাও বড্ড খারাপ হয়ে গেছে দেখ্‌চি। পড়া যখন হলই না, তখন এবার বাড়ী গিয়ে, শরীরটা যাতে সারে, তার দিকে মন দাওগে—"

শীলা বাধা দিয়া কহিল—" তোমার কি ? তুমিও চল না আমাদের সঙ্গে—তোমার শরীরও ত খুব খারাপ।"

অসীম কহিল—"আমার অসুখের জন্যে দায়ী ত তুমিই—"

শীলা শিশুর মত খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া কহিল—"শুনেচি। ডাক্তারবাবুর কাছে সব শুনেচি। বেশ! আমি দায় গ্রহণ করুচি—চল' তবে আমার সঙ্গে, আমি তোমার শরীর সারিয়ে দেব—"

অসীম কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সে কথাও শুনেচ ? ঘোঁট তা'লে বেশ ভাল করেই হয়েচে বল ?"

শীলা মৃদুস্বরে কহিল—"তা একটু হয়েচে বৈকি! আমি করেচি বোকামী, আর তুমি করেচ ক্যাপামী!"

অসীম একটু লজ্জা অনুভব করিল। জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা ডাক্তারবাবু ত বহু :হোমে ফোন্ করুলেন্, তা তোমার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না কেন কোথাও থেকে ?"

শীলা তেমনি মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল—"সন্ধান না পাওয়ার কারণ, প্রথমত এ হোমে ফোনই নেই। হোমটি নতুন্। দ্বিতীয়ত, জীবাকা সেখানে আমার নাম লিখিয়ে দিয়েছিল, ললিতা দেবী!"

অসীম হঠাৎ আবার রুক্ষ হইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এখানে নাম গোপনের উদ্দেশ্য ?"

শীলা কহিল—"তা জানি না। কেন যে আমার আসল নাম লেখায় নি, সে জীবাকাই জানে।"

জীবাকা! জীবাকা! এই লোকটা জড়িত থাকাতেই, বোধ হয় ব্যাপারটা এমন বিশ্রী আকার ধারণ করিয়াছে! এই চিন্তাই

অসীমের মনকে কেবলি পীড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল ! এই ঘটনাটির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে জীবানন্দই সব ! অসীমের মনের মেঘ কাটিলেও, আকাশখানা তখনও রৌদ্রোজ্জ্বল হয় নাই। আবার সেই জীবাকা ! অসীমের মনের নির্ব্বাণপ্রায় বহ্নি পুনরায় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

অসীম কহিল—"অসুখ ত ওই ! গেছ নার্সিং হোমে চিকিৎসা করাতে। তা সেখানেও অত লুকোলুকি ছাপাছাপি কেন ? কি দরকার ছিল এ সবের ? যাই হোক্, ডাঃ পাকড়াশী এবং তোমার বাবার মত দু' জন বিশিষ্ট ব্যক্তি তোমার কৈফিয়তে যখন সন্তুষ্ট হয়েছেন, তখন আমিও হচ্ছি। কিন্তু কাণ্ডটা আগাগোড়াই কেমন দুর্গন্ধ-পঙ্কিল মনে হচ্ছে— আর তা মনে করা, আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে একেবারেই অসঙ্গত নয়।" অসীমের স্বরে একটা তিক্তরস ঝরিয়া পড়িল।

শীলা দোষ-স্বীকৃতির সহজ নম্রতায়, অসীমের কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া, জানাইল—"সত্যি, কাজগুলো নিতান্ত বোকার মত হয়েচে। খুবই অন্যায় হয়েচে, সন্দেহ নাই। তুমি আমায় ক্ষমা কর'—জীবনে আর কখন আমি এমন মিথ্যাচার করব না।" বলিয়া শীলা অসীমের হাত দুইখানি গভীর ভাবাবেগে চাপিয়া ধরিল।

বিদ্যুৎশক্তি ফিউজ্ হইয়া গিয়া, হঠাৎ ঘরখানি অন্ধকার হইয়া গেল। অসীম শীলার কম্পিত করপল্লব আপনার দুর্ব্বল মুষ্ঠি মধ্যে ধারণ করিয়া, অনুতপ্ত হইয়া গাঢ় স্বরে কহিল—"আমার রূঢ়তার কথাও তুমি ভুলে যাও, শীলা। সত্যি আমি তোমার উপর অবিচার করেচি। হয়ত সেটা বয়সের ঔদ্ধত্য কিম্বা বিবেচনার অভাব—"

শীলা অসীমের বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

শীলা সত্যই কাঁদিতেছিল। এ সে কি করিল? বিচারক পিতা অকুণ্ঠিত ভাবে তাহার কথা বিশ্বাস করিয়া, শীলাকে নির্দ্দোষী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—সে খুশী হইয়াছে: পিতৃবন্ধুও শীলার কথাগুলিকে সাধারণ ভাবে কথার মূল্য দিয়াই, তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন—এ বিষয়েও সে নিশ্চিন্ত ছিল। এ দুইটি হয়ত তেমন বিশেষ গর্হিতও হয় নাই। কিন্তু অসীমও যে এত সহজে তাহার উদার ভদ্র ও কৃষ্টিশীল মনে এই মিথ্যাকে সরল সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে, ইহাই বাজিল শীলার অন্তরে নিদারুণ শেলাঘাত। এত বড় একটা মিথ্যাকে গোপন করিয়া সে হইতে চলিয়াছে, এই দেবতুল্য ব্যক্তির স্ত্রী—কুলবধূ, ধর্ম্মপত্নী? অনুশোচনায় তাহার সমস্ত অন্তর সঙ্কুচিত হইয়া এত ছোট হইয়া গেল যে, সে আত্মবিস্মৃত হইয়া ভাবিতে লাগিল—কেন সে মিথ্যা বলিয়া, ইহাদিগকে, বিশেষ করিয়া অসীমকে, এমন প্রতারিত করিল? এখন সে সফল হইল বটে, কিন্তু সাফল্যের এ নিদারুণ যন্ত্রণা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল! চিরদিন এই মিথ্যাচারকে বুকে পুষিয়া, কি করিয়া ছদ্মবেশে সে অসীমের ঘর করিবে? যদি কখনও তাহার এ মুখোস্ খসিয়া পড়ে? শীলা শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে! সর্ব্বনাশের আশঙ্কায়! নিজের জন্য নয়: অসীম কি সে আঘাত সহ্য করিতে পারিবে? এত প্রীতি, এত বিশ্বাস, এত ভালবাসার—এই প্রতিদান? লোকলজ্জা, স্বার্থ, মর্য্যাদা, দুর্ব্বলতা—সবলে তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া মাথার উপর খড়্গ তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে! সত্য কথা বলিতে তাহার সাহস হইতেছে না। এ রকম সঙ্কটময় পরিস্থিতি যে হইবে, শীলা ইতিপূর্ব্বে তাহা ভাবে নাই!

জীবানন্দই বা এমন সময় কোথায় গেল? সে কোথায় নিরুদ্দেশ হইল? এত খোঁজ করিয়াও শীলা তাহার সন্ধান পাইল না। শীলা ত এই কথা বলিল! পরে সে যদি হঠাৎ উদয় হইয়া অন্য কথা বলে? তাহাকে যে এইজন্য বিশেষ প্রয়োজন! কে জানে, কি আছে তাহার ভাগ্যে। সম্মুখে শুধু নীরন্ধ্র অন্ধকার! অকূল ঊর্মিসঙ্কুল হাঙ্গরমকরবহুল দুস্তর পারাবার! শীলা নিঃসহায়ভাবে ভবিষ্যতের হাতে আত্মসমর্পণ করিল। চোখের জল তাহার বাধা মানিতেছিল না।

অসীম তাহার পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিল। শীলার তপ্ত অশ্রুপাতে অসীমের বুকের পঙ্কে সহস্রদল পদ্ম বিকশিত হইয়া উঠিল। তাহার আঁখিপল্লবও শুষ্ক রহিল না।

অসীম ভাবিতে লাগিল: শীলা এখনও অপরিণতবুদ্ধি তরুণী, ধনী পিতার একমাত্র আদরিণী কন্যা, অদ্যাপি ছাত্রী। সত্যসত্যই, অত বুঝিবার মত কূটবুদ্ধি তাহার এখনও হয় নাই। অসীমের জেরার উত্তরে যাহা যেমন ঘটিয়াছে, ঠিক তেমনি সরলভাবেই সে সব বলিয়া গেল। তাহার যদি কোনও অসৎ অভিপ্রায় থাকিত, তাহা হইলে এমন অকপটে সে তাহা বলিতে, বা তাহার সম্মুখে মাথা তুলিয়া কথা কহিতে পারিত কি? আর তাহার পিতা এবং ডাঃ পাক্ড়াশীও তাহা হইলে সে কথা এমন আল্গা ভাবে কখনই গ্রহণ করিতেন না। চুণীবাবু ত যে-সে লোক নন্, একজন দায়রা জজ—লোকের ফাঁসির হুকুম দিয়া থাকেন। তাঁহার বিচারশীল মনকে ফাঁকি দেওয়া এত সোজা নয়।

জীবানন্দ লোকটা পাজী, সন্দেহ নাই! কিন্তু এক্ষেত্রে সে করিবেই

বা কি? তাহার মনের অজ্ঞেয় খেয়ালে সে যাহা মনে করিয়াছে, তাহাই করিয়াছে। শীলাকে নার্সিংহোমে যখন ভর্তি করাইতে লইয়া গিয়াছিল, হয়ত তখন জীবানন্দ আসলে প্রকৃতিস্থই ছিল না! কে জানে? অবশ্য সে লোকটা সে সময়ে আসিয়া না দাঁড়াইলে, শীলা সত্যসত্যই রক্তআমাশয়ে মারা পড়িত! আশ্চর্য্য নয়।

শীলাকে অসীম ভালবাসে। শীলা তাহার ভাবী বধূ। তাহার প্রিয়তমার যখন সে সেবা করিয়াছে, হউক্ সে যতই দুর্জ্জন, এ ক্ষেত্রে অসীম তখন তাহার উপর কৃতজ্ঞ না হইয়া পারে না। শীলাকে সে কঠিন ব্যাধিমুক্ত করিয়া দিয়াছে। সত্যসত্যই শীলা এবার খুব ভুগিয়াছে—অস্বীকার করা যায় না। শীলার অমন চেহারা কি বিশ্রীই না হইয়াছে!

বর্ষণধৌত নির্ম্মল নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছিল। বাক্যহারা অনুতপ্ত এই প্রণয়ীযুগলের দেহে তরল কৌমুদী তখন সুস্নিগ্ধ শ্বেতচন্দন প্রলেপে সান্ত্বনার পত্র-রচনা করিতেছিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

ভূষণের কক্ষে, একাকী চিন্তামগ্ন ভূষণ।

ডাইনোকওয়ালা জমিদারের ভূমিকায় রিহার্সাল দিতে দিতে ভূষণ যে অপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিতেছিল, দুঃখের বিষয়, সেটি সে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতে পারিতেছিল না। দিবারাত্রি সে গভীর দুশ্চিন্তায় জর্জ্জর। যতদিন যায়, ততই তাহার চিন্তাও বাড়ে। এ-বাড়ী বা ও-বাড়ী কোনখানেই তাহার স্বস্তি হয় না, শান্তি নাই, সুখ নাই। ভূষণ আবিষ্কার করিল —এতদিন কলিকাতা শহরটি বেশ মনোরম ছিল! কি হইল এই কয়েকমাস হইতে, কেবলি ঝঞ্চাট আর ঝামেলাঃ কোথাও এতটুকু আলো নাই, কেবলি অন্ধকার। ঝরাফুলের প্রাচুর্য্যে যে-পথ এতদিন ছিল সুকোমল, সে-পথ আজকাল হইয়া উঠিয়াছে ভীষণ কণ্টকসঙ্কুল।

ও-বাড়ী হইতে আসিয়া বিজলীর যে কি হইল, ভূষণ ত কিছুই ভাবিয়া পায় না! সারাদিন গম্ভীর, তাহার সম্মুখে যাইতেও সাহস হয় না! বিজলী নিজে পড়ে, অবসরমত ভূষণকে পড়ায়, আর খায়-দায়, শোয় এবং চুপচাপ বসিয়া থাকে।

এ তবু কোনও রকম সহ্য হয়, কিন্তু এক নূতন উপসর্গ যে তাহার জুটিয়াছে, তাহাতেই ভূষণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দুশ্চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। সময় সময় ভূষণের এত হাসি পায় যে, তাহা চাপিয়া রাখা শক্ত হইয়া উঠে!

বুড়া-বয়সে বিজলীকে খুকী-রোগে ধরিয়াছে! এই বয়সে নূতন

করিয়া বিজলী সত্যিকার পুতুল-খেলা আরম্ভ করিয়াছে! আর কি তাহার পুতুল খেলিবার বয়স আছে? বল দেখি, এ-কি কাণ্ডকারখানা? অথচ সে কিছু বলিতে পারে না। সেদিন বেড়াইতে গিয়া, টাকা বিশ-পঁচিশ খরচ করিয়া, মস্ত বড় একটা চীনেমাটির পুতুল কিনিয়া আনিয়া, তাহাকে লইয়াই এখন সে সদাসর্ব্বদা ব্যস্ত। পুতুলের বিছানা, বালিশ, খাট, জামা, জুতা, কাপড়, তোয়ালে, স্থট্‌কেস প্রভৃতি নানা রকমের দামী দামী সব জিনিষপত্র আসিয়াছে। জামা, কাপড়, কাঁথা প্রত্যহ কাচা হয়, শুকান হয়, কোঁচান হয়, স্থট্‌কেসে রাখা হয়, বাহির করা হয়ঃ পুতুলটাকে সাজান হয়, খাওয়ান হয়, শোওয়ান হয়—এইরকম কত কি যে সারাদিন হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এই সব লইয়া বিজলীর এখন মোটেই সময় নাই! পুতুলটির শুইবার স্থানও হইয়াছে তাহারি বিছানার পাশে। চব্বিশ ঘণ্টাই পুতুল-খেলা চলিয়াছে।

মাথা খারাপ হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ ভাবিয়া, ভূষণ অনেক সময় বিজলীকে সতর্ক করিয়া দিতে মনস্থ করেঃ বিজলীর শিং ভাঙিয়া বাছুর সাজায়, ভূষণের রাগও হয়, হাসিও পায়। অকারণ এই টাকাগুলি সে বাজে খরচ করিতেছে! তাহাকে দিলে, সে টেঁপীদের সংসারে খরচ করিতে পারিতঃ এই টাকায় অনায়াসে টেঁপীর ভাল একজোড়া দেশী শাড়ী হইতে পারিত!

ভূষণ যে এখানে পড়িয়া আছে, কিসের জন্য? এতদিন বিজলী স্থবোধের স্থনজরে ছিল, ভূষণের একটা ভরসা ছিল। ইহার দুর্ম্মুখের ও দুর্ব্ব্যবহারের জন্য স্থবোধ ইহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এত

বড় একখানা ভাল ছবি হইতেছে, যাহাতে ভূষণও একটা বড় জমিদারের পার্ট করিতেছে, তাহাতে একটা একষ্ট্রার পার্টও সে পাইল না! কে ঠকিল? সেই তো! অমন একজন বড় লোকের আশ্রয়ে ছিল, প্রত্যেক ছবিতেই মোটা মাইনেয় হিরোইন হইতেছিল—বুদ্ধির দোষে, সব হারাইয়া পথে বসিতে হইল ত? আহা বেচারা!

সুবোধ সেদিন ভূষণের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছে যে, তাহাকে ধাপ্পা দিয়া যে সে গিয়াছিল, তাহাতেই সুবোধ চটিয়াছে। ভূষণ বিজলীর অজ্ঞাতে, বিজলীর মঙ্গলের জন্যই তাহাকে ক্ষমা করিতে বহু অনুনয় বিনয় করিয়াছিল। সুবোধ বলিয়াছে, সে শুধু ভূষণের কথা রাখিবার জন্যই একদিন বিজলীর গৃহে গিয়াছিল, তাহাকে ক্ষমা করিতে; কিন্তু বিজলী তাহাকে দুয়ার হইতেই তাড়াইয়া দিয়াছিল, উপরে পর্য্যন্ত উঠিতে দেয় নাই। অতএব সুবোধ তাহার জীবন থাকিতে আর বিজলীর মুখদর্শন করিবে না। সুবোধকে বিজলী সেদিন এমন ধাক্কা মারিয়াছিল যে, সুবোধ সেই রাত্রে রাস্তায় মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গিয়া, ক্ষতবিক্ষত পর্য্যন্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল। সুবোধ এত ভদ্র যে সে একটি কথা পর্য্যন্ত বলে নাই: কিল খাইয়া বুদ্ধিমানের মত কিল চুরি করিয়া নীরবে সে পলাইয়া আসিয়াছে। একটা সাধারণ গণিকার সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়াইয়া ত সে ঝগড়া করিতে পারে না!

ভূষণ সায় দিয়াছিল—ঠিক্! এ দিদিমণির ভারী অন্যায়।

ভূষণের বিশ্বাস—তাহাকে সুবোধ খুবই ভালবাসে, বরাবরই ভালবাসে। সম্প্রতি ভূষণের মনে হইতেছে, বিজলীকে ছাড়িয়া অবধি সুবোধ যেন ভূষণকে বেশী করিয়া ভালবাসিতে আরম্ভ

করিয়াছে! ভূষণের মাসীমার ও মাস্তুতো ভগিনীদের প্রায়ই সুবোধ খোঁজ-খবর করে, তাহাদের সহিত আলাপ করিতেও চায়, কিন্তু ভূষণই এটা-ওটা ওজর করিয়া সেটি এড়ায়। টেঁপীর সহিত আলাপ করিয়া দিতে ভূষণ ঠিক রাজী হয় না। ও-বাড়ীর সমস্ত ভার তাহাকে বহন করিতে হয় শুনিয়া, সুবোধ ভূষণের বেতনও করিয়া দিয়াছে একেবারে মাসিক পঁচাত্তর টাকা! ভূষণ ভারী খুসী। যাক, দেড়শোর অর্দ্ধেক ত হইল! বাকীটা ক্রমশ হইবে: সে আশা ছাড়িল না।

ভূদেব বলিয়াছে, সুবোধও বলে—ভূষণ জমিদারের পার্ট এত ভাল করিতেছে যে এ ছবি চলিবে, একমাত্র ভূষণের পার্টের জোরেই। সেদিন "চিত্রশূল" নামক সাপ্তাহিক পত্রে ভূষণকে আর একটি নূতন উপাধি দিয়াছে—"নটরাক্ষস"। সম্পাদক লিখিয়াছেন—নটরাক্ষস উপাধিটি নট-হস্তীরও উপরে, যেমন রায়বাহাদুর রায়সাহেবের উর্দ্ধতর। ভূষণের অভিনয়, অন্য সকলের অভিনয়কে একেবারে গিলিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া, ভূষণকে নটরাক্ষস করা হইল!! সুবোধ বলিয়াছে, কাগজে যাহার এত সুখ্যাতি, তাহার বেতন না বাড়াইয়া দিলে শোভন হইবে না। ভূষণ যদি রাগ করিয়া, অন্য ষ্টুডিওতে চলিয়া যায়?

ভূষণ যে একজন কেউ-কেটা নয়, এ ধারণা তাহার বরাবরই আছে। সম্প্রতি উক্ত দুই ব্যাপারে সেটি আরও বদ্ধমূল হইয়াছে।

ষ্টুডিওর ব্যাপার সব ঠিক মনোমত ভাবেই চলিতেছে, কিন্তু বাড়ীতে শান্তি কি করিয়া মিলে? আগে বিজলীর নিকট বহু বড় লোক আসিত, যাইবার সময় তাহারা খুসী হইয়া ভূষণকে প্রায়ই দুই-চারি টাকা বখশীস দিয়া যাইত। মাঝে মাঝে হুইস্কিটা-আশ্‌টাও প্রসাদ পাইত, চুরি করিয়া

সিগারেটটা চলিত, হোটেলেও মাঝে মাঝে খাওয়াদাওয়া হইত, বাড়ীতেও পোলাও-কালিয়া লাগিয়াই থাকিত। এখন সে সবের নামগন্ধও নাই। কত বড় বড় লোক, লোক পাঠাইল, নিজে আসিল, বিজলী তাহাদের সহিত দেখাও করিল না, দুয়ার হইতেই সকলকে ফিরাইয়া দিল। হুইস্কি চুলায় যাউক, বাড়ীতে মাংস পর্য্যন্ত আর আসে না। সিগারেট খাওয়াও সে ছাড়িয়া দিয়াছে। বেঙ্গল-টকীজ মোহন-ফিলিম, ফাঁকি-পিকচার্স, ঝণ্টু-ফিল্ম-কর্পোরেশন প্রভৃতি ষ্টুডিও হইতে দিনে দশবার করিয়া লোক আসিয়া, কত সাধাসাধি করিল, কিন্তু বিজলীর এক গোঁ—সে কোথাও কাজ করিবে না। সত্যই করিল না। বিজলী কাজ না করিলে, তাহাদের ত বড় বয়িয়াই গেল! তুমি তবে মর'—হাতের টাকা ভাঙাও, আর বসিয়া বসিয়া খাও! একে স্ত্রীলোক, তার উপর মূর্খ! ইহার আর কি বুদ্ধি হইবে!

এ বাড়ীটা হইয়াছে পতিত-বাড়ীর মত বীভৎস, ভয়ানক—এক দণ্ডও ভূষণের এখানে আর মন টিঁকে না! এ বাড়ীর লক্ষ্মী ছাড়িয়া গিয়াছে। এমন লক্ষ্মীছাড়া বাড়ীতে কখন থাকা যায়?

যতীন মজুমদার কেন মাঝে মাঝে আসে? এক-আধ ঘণ্টা দুইজনে অত কি ফুশ্-ফুশ্ গুজ্-গুজ্ করে? ভূষণ কিছুই বুঝিতে পারে না। এ দুইজনের মধ্যে আবার কিছু জমিয়া উঠিতেছে না ত? শ্রাবণ মাসে ও-বাড়ী ছাড়িয়া ইহারা আসিয়াছে, আর এই কার্ত্তিক মাস —গোটা চারি মাস কাল একলা ত আছেও বেশ! কিছু বলেও না, কিছু করেও না—করিতে চায়ও না! ব্যাপার কি? ভূষণ ত এভাবে আর একটা দিনও থাকিতে পারে না।

সত্যই কি বিজলীর মাথা খারাপ হইল? বিজলীর হয় হউক, উহার সহিত তাহার কেন হয়? আগে ভূষণের সঙ্গে বিজলী কত কথা কহিত,—এখন দিনান্তে একটা কথাও হয় না। উন্মাদের এ পূর্ব্ব লক্ষণ! ভূষণ আর কিছুদিন দেখিবে, তেমন যদি বাড়াবাড়ি হয়,তাহা হইলে, সে তাহার জিনিষপত্র সব লইয়া একদিন সরিয়া পড়িবে! পাগলের সঙ্গে কি বাস করা চলে? হয় কোন্ দিন কামড়াইয়া দিবে, নয়, সে শুইয়া আছে, মারিবে মাথায় এক লাঠি! পাগলের কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে?

আহারের জন্য ভৃত্য ডাক দিতেই ভূষণের চিন্তাসূত্র ছিঁড়িয়া গেল।

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"আজ তোমার ষ্টুডিও নেই, ভূষণ?"

ভূষণ বিজলীর সঙ্গে কথা কহিতে পাইয়া খুশী হইল। কহিল—"আছে, দিদিমণি, আজ আমাদের চারটেয় শূটিন্—"

"ও—" বলিয়া বিজলী নীরবে আহার করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"ও বাড়ীর সব ভাল তো?"

এক কথায় ভূষণ ইহার উত্তর কি দিবে? পূরা কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডটি বর্ণনা করিতে হয়, কিন্তু তাহার এ সময় নয় বলিয়া, সংক্ষেপে উত্তর দিল—"সবাই ভাল আছে। টেঁপী প্রায়ই আপনার নাম করে—"

বিজলী কহিল—"তারা পড়বার ইস্কুলে, গানের ইস্কুলে যাচ্ছে ত?"

ভূষণ কহিল—"খুব যেচে। নাচে গানে ওরা খুব ভাল হয়েচে, দিদিমণি! অনেক জায়গা থেকে ওদের আজকাল ডাক-ডোকও হচে—"

বিজলী উদাসীনভাবে—"বেশ, বেশ" বলিতে বলিতে উঠিয়া গেল।

ভূষণও হাতমুখ ধুইয়া, বিজলীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। কথা কহিয়া সে বুঝিতে চায়, সম্পূর্ণ উন্মাদ হইতে বিজলীর আর কতটুকু ও

কত দিন বাকী! কিন্তু বিজলী সে সুযোগ দিল না। কহিল—"এইবার তুমি একটু বিশ্রাম করে নাও গে ভাই, একটু পরেই আবার ছুটতে হবে ত সেই ধাপ-ধাড়া গোবিন্দপুর! ফির্‌তে কত রাত্রি হবে, কে জানে?"

অপ্রসন্নভাবেই ভূষণ বিশ্রাম করিতে গেল। বিজলী সোফাটার উপর অলসভাবে হাত পা ছড়াইয়া দিয়া, আরাম করিয়া বসিল। এই নির্ব্বোধ ছেলেটির জন্য বিজলীর মনে করুণার সাগর উদ্বেল হইয়া উঠিল: ও-বাড়ীতে থাকিতেই বিজলীর মনের এক দিগন্তে সামান্য একটু মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল; আজ সেই মেঘের টুক্‌রাটি সমস্ত আকাশখানিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

ভূষণের মুখে শুনিয়াই, বিজলী টেঁপীদিগকে কলিকাতায় আনাইয়াছে। সে ভূষণের ভালই করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহার ভাল যে কতটুকু এবং কি হইবে, তাহা ভাবিয়াই বিজলী ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কেবলি বিজলীর মনে হয়, কেন সে টেঁপীদিগকে আনাইল? আশানুরূপ সুফল না ফলিলে, ভূষণ তাহাকে ত দূষিবেই, টেঁপীরাও তাহার পিতৃপুরুষান্ত করিবে।

ভূষণ বিজলীকে টেঁপীর সম্বন্ধে, বহু প্রশ্ন করিয়াছে, কিন্তু বিজলী সেগুলি হয় এড়াইয়া গিয়াছে, নয়, ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়াছে। সে কি বলিবে? ভাল বলিতে পারে না—সেটা শুধু মিথ্যাই হইবে না, উপরন্তু যে-বিপদের আশঙ্কা সে করিতেছে, সেইটিকেই আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া দেওয়া হইবে: আবার মন্দও বলিতে পারে না—কেন সে উহাদের সকলের মনে ব্যথা দিবে? উহাদের ইতিহাস সে কিছুই জানে না বলিয়া, সে-ই হয় ত ইহাদিগকে সঠিক বুঝিতে পারে নাই!

তাহার ধারণাই যে ঠিক—তাহারই বা প্রমাণ কি? ভূষণ

ইহাদিগকে এতদিন ধরিয়া জানে, তাহার পরিচয় ত মাত্র দিন দশ-বারোর! ইহার মধ্যে সে ইহাদিগকে কি চিনিবে? মানুষ চেনা এত সহজ নয়। ভূষণ ত জানিয়া শুনিয়াই ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেছে! ভূষণ যদি বিজলীর কথামত তাহার এতদিনকার পোষিত মত পরিবর্ত্তন করে, তাহা হইলে টেঁপীদের মর্ম্মভেদী অভিশাপ কি তাহাকে স্পর্শ করিবে না? এমনও ত হইতে পারে—বিজলীর কথা ভূষণ মানিতে না-ও পারে! টেঁপীর উপর ভূষণের যখন এত আকর্ষণ, তখন ভূষণ তাহার কথা বিশ্বাস না করিয়া, ক্রুদ্ধ হইতেও ত পারে! বরং তাহার কথা শুনিয়া, ইহারা বিজলীর উপর যদি কোনও গূঢ় দুরভিসন্ধি আরোপ করে? ইহাদের দুই পক্ষের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটাইয়া দেওয়ায়, বিজলীর কোনও স্বার্থ আছে, যদি মনে করে? উভয় পক্ষই অশিক্ষিত এবং অভদ্রমনোবৃত্তিসম্পন্ন নির্ব্বোধ। ইহারা সব পারে! তখন সেই লজ্জাস্পদ অসম্মানজনক পরিস্থিতির অগ্নিকুণ্ডে মিছামিছি সে নিজের কৃতকর্ম্মে নিজেই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে! বিজলী তাই বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারে না। তাহার স্নেহদৌর্ব্বল্যের সুযোগ লইয়া, ভূষণ যদি কোনও প্রশ্ন করে? তাই সে ভূষণের নিকট গাম্ভীর্য্যের এমন একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা করিয়া রাখিয়াছে, যাহা ভেদ করা ভূষণের অসাধ্য। এটা বিজলী করিয়াছে নিছক আত্মরক্ষার এবং ভূষণকে নিজে সব বুঝিবার সুযোগ দিবার জন্যই। কিন্তু ভূষণ যে উল্টা বুঝিয়াছে সে প্রমাণও বিজলী অহরহই পাইতেছে, তবুও সে কিছু বলে না। ভাবে—টেঁপীদিগকে সরল ভাবিয়াই, এ খুশী থাকুক।

এই অল্পদিনের পরিচয়ে বিজলী ইহাদিগকে স্বচ্ছ কাচের মত

অত্যন্ত পরিষ্কাররূপেই চিনিয়াছে : ইহারাও ইহাদের মনোভাব গোপন করে নাই! নিস্তারিণী চায়—অর্থ ও কর্তৃত্ব, সুনীতি-দুর্নীতি বলিয়া তাহার কোনও বালাই নাই। অশিক্ষা, অবিবেচনা ও অদূরদর্শিতার জন্য আশুলাভেই সে সন্তুষ্ট। স্বার্থসিদ্ধিতে মান-অপমানের নিরিখ তাহার নাই। অপরিচয়ের দুর্গমধ্যে বাস করিয়া, নিস্তারিণী সব করিতে পারে এবং হয়ত করিবেও সে। এই করিতে-পারার একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র, তাহার তিনটি কন্যা। নিস্তারিণীর বিশ্বাস—যতক্ষণ সব গোপন থাকে, ততক্ষণ সবই করা যায়—প্রকাশ হইলেই যত মুস্কিল। স্বার্থের তরুশীর্ষে উঠিতে ভূষণ এখন ইহাদের মই—গন্তব্যস্থানে পৌছিলেই, যে কোন মূহূর্তে পদাঘাত করিয়া, ইহারা মইখানিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে পারে এবং খুব সম্ভব দিবেও। এইটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধিও যে ভূষণের নাই—ইহাই বিজলীর আশঙ্কার কারণ।

বিজলী টেঁপীকেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয় করে। টেঁপী অসাধারণ, টেঁপী বুদ্ধিমতী : টেঁপীর কল্পনা আছে, উচ্চাশা আছে। সে পথ দেখিয়া পথ চলে, সে অল্পে তুষ্ট নয়, সে জানে তাহার শক্তি আছে। টেঁপী সিকান্দার শাহ নয়, তৈমূর লং নয়, গজনীর মামুদও নয়—টেঁপী বাবর শাহ। টেঁপী জয়ও চায়, সিংহাসনও চায় : তাহাকে প্রতিরোধ করিতে শক্তি চাই। টেঁপী তাহার নিশ্চিত জয়ে বিশ্বাসবতী—সে সেই দিনেরই প্রতীক্ষা করিতেছে। সে সজাগ, সচেতন, চক্ষুষ্মতী! সে দুর্দ্দম, দুর্ম্মদ, দুর্ব্বার। বিজলী দেখিয়াছে—টেঁপীর চোখের নীলে কালিদহ : জিহ্বার অগ্রে বাসুকির সহস্রশীর্ষ ফণা : টেঁপীর বচনে দূরাগত মরণের সম্মোহন বেণুরব : তাহার উচ্চাশায় ধরণীর ধ্বংসতাণ্ডব!

বিজলী হয়ত প্রমাণ করিতে পারিবে না, কিন্তু তাহার দৃঢ় ধারণা— টেঁপী বটবৃক্ষের বীজ, এখন সে সামান্য একটু মাটি চায়, তাহার পর আপনিই সে বাড়িবে, সে জানে। টেঁপী প্রথমটা একটু সাহায্য চায়, তাহাকে একবার চালু করিয়া দিতে হইবে, তাহার পর সে নিজেই চলিতে পারিবে। সে এঞ্জিন, সে বোমা, সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ! একবার চলিলে, সে আর থামিবে না এবং কাহাকেও গ্রাহ্য করিবে না! ভূষণ তো কোন্ ছার, কত বিদ্যাভূষণ আর অর্থভূষণ যে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে গিয়া, ঘূর্ণাবর্ত্তে ক্ষুদ্র তৃণের মত নিমেষ মধ্যে নিশ্চিহ্ন নিরুদ্দেশে ভাসিয়া যাইবে, তাহার কি কোনও সংখ্যা থাকিবে? তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবেই: যে না দিবে—টেঁপীর জয়রথ তাহাকে পিষিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়া যাইবে! টেঁপীর সম্বন্ধে এ ধারণা ভূষণকে বুঝান শক্ত, একরূপ অসম্ভবই। ভূষণ বুঝিবে না: হয়ত উল্টা অর্থ করিয়া, একটা অনর্থ বাধাইবে। তদপেক্ষা ভূষণ নিজেই বুঝুক্ বলিয়া, বিজলী ইহাদের সম্বন্ধে বাধ্য হইয়াই মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছে।

ও-বাসায় থাকিতে, শেষাশেষি বিজলী টেঁপীকে এড়াইয়া চলিত। টেঁপীর নিকট নগরের রহস্যমঞ্জুষা সে গোপন করিয়াই রাখিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। টেঁপী চাহিতে জানে, লইতেও পারে: টেঁপী খাইতে পারে, খাইয়া হজম করিবার শক্তিও রাখে।

বিজলী টেঁপীকে ঘৃণা করিতে চায়, পারে না: তাহাকে ভালবাসিতে চায়, তাহাও পারে না। টেঁপী বিচিত্র, অজ্ঞেয়! মফঃস্বল হইতে ভাগ্যান্বেষণে এই পথে আগতা অনেক মেয়েকেই সে দেখিয়াছে, কিন্তু এমনটি সে আর কখনও দেখে নাই।

এক একবার বিজলী মনে করে, সে হয়ত টেঁপীর সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা পোষণ করে! সে কি ইহার নবোদ্ভিন্ন যৌবন-সমৃদ্ধ তনুশ্রীতে ঈর্ষিত? সে কি টেঁপীর মধ্যে তাহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বিনীর সন্ধান পাইয়াছে?

বিজলী হাসিয়া ফেলে! এ কি অবিশ্বাস্য অশ্রদ্ধেয় উন্মাদ কল্পনা? সে কি ভুলিয়া গেল যে, সে বিজলী দেবী! মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই কি সিংহীর ঈদৃশ শৃগালত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে? তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী? কি হাস্যকর! বিজলী আপন মনেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। হাসির শব্দে চমকিয়া উঠিয়া, বিজলী হঠাৎ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেল! একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, বিমর্ষ হইয়া, ভাবিল—দেহ আজ যাহার জয়ডঙ্কা বাজাইতেছে, মন তাহার শঙ্কা ত এখনও ছাড়িতে পারে নাই! কি আশ্চর্য্য! অতি-ব্যবহৃত ব্লটিং কাগজের মত কালি শুধু দুই পিঠে লাগিয়াই শেষ হয় নাই—কাগজের মেদমজ্জা, এমন কি অণুপরমাণুতে পর্য্যন্ত কালি ঢুকিয়াছে। এ কালির দাগ কি এত সহজে উঠে?

হঠাৎ বিজলীর মনটা যেমন একটু লঘু হইল, অমনি আবার সন্দেহ জাগিল—এ যদি শীলার সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হয়? বিজলীর মনটা আবার শঙ্কাকুল হইল। শীলাকে সে বাঁচাইতে চায়। শীলার গায়ে কোনও আঁচড় লাগে, এ কল্পনাও সে করিতে পারে না। টেঁপী যদি এমন কিছু করে যাহাতে শীলার অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে বিজলী তাহাকে কখনই মার্জ্জনা করিবে না। সে-ও তাহা হইলে তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া, তৃণের মত টেঁপীকে ভস্ম করিতে এতটুকু পশ্চাৎপদ হইবে না।

বিজলীর পূর্ব্বস্মৃতি ঘুমন্ত দৈত্যের মত পাশ ফিরিয়া শুইল। সে জানে টেঁপীর মত নগণ্য এক নবাগতা তরুণীকে নখাগ্রে হত্যা করিতে বিজলীর এতটুকু সময় লাগিবে না। ইচ্ছা করিলে, টেঁপীর স্বপ্নপুরীর ও-জয়রথ বিজলী নিমেষে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারে! কিন্তু সে যাহাকে অতিকষ্টে ঘুম পাড়াইয়াছে, তাহাকে আর জাগাইতে চায় না। টেঁপীর যাহা ইচ্ছা করুক্ : বিজলী যেমন তাহাকে কোনও সাহায্য করিবে না, তেমনি তাহার প্রতিবন্ধকও সে হইবে না! তাহাকে সাহায্য করিয়া—সে তাহাকে রসাতলের দিকে ঠেলিয়া দিবে না! বিজলী তাহাকে সাহায্য করিয়া যেমন নিমিত্তমাত্র হইতে চায় না, তেমনি বাধা দিয়া অকারণ অপমানিত হইতেও অনিচ্ছুক। হাউই এখন উঠিতেছে, উঠুক্—যথা সময়ে সে আপনিই ছাই হইয়া, এই মাটিতেই মুখ থুব্‌ড়াইয়া পড়িবে।

যেমন লক্ষ লক্ষ লোক আসিতেছে, ইহারাও তেমনি। ইহারা কলিকাতায় আসিয়াছে, কি করিতেছে বা কি করিবে—এ সব লইয়া তাহার এত মাথাব্যথা কেন? কেন তাহার এই অনধিকারচর্চ্চা? ভূষণের মঙ্গলের জন্য? ভূষণ কচি খোকাটি নয়! সে যদি তাহার নিজের মঙ্গলামঙ্গল না বোঝে, সে ঠকিবে। বিজলী কেন গায়ে পড়িয়া এই সব ঝামেলায় ঝাঁপ দিতে এমন ব্যস্ত হইয়া পড়িল?

অসীমের উপর বিজলীর যে একটা ক্রোধ ছিল, সেটিও এখন আর নাই! মনের মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল, কোন্ দিন সে অপমানের কল্পনা তাহার অজ্ঞাতে চিরবিদায় লইয়া গিয়াছে : তাহার স্থানে রাখিয়া গিয়াছে এক রাশ চাঁপা ফুল। অসীম চরিত্রবান্, সে শ্রদ্ধার পাত্র।

বিজলীকে সাপমানে প্রত্যাখ্যান করিয়া, সে তাহার মনুষ্যত্বই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যদি সে কোনও অন্যায় কার্য্য করিত, তাহা হইলে বরং তাহার উপর হিংসার কারণ থাকিলেও থাকিতে পারিত, কিন্তু অসীম ত সেরূপ কোনও কুকার্য্য করে নাই! তাহার উপর কিসের হিংসা? বরং সে যখন শীলার প্রেমাস্পদ, তখন তাহারও সে স্নেহের পাত্র। শীলা বলিয়া গিয়াছে, বিবাহে সে বিজলীকে নিমন্ত্রণ করিবে, বিজলী যেন যায়। এ বিশ্বাস কি কখনও ভঙ্গ করা যায়? শীলা তাহার ভগিনীরও বেশী।

বিজলীর ভয় কেবল টেঁপীকে: টেঁপী শীলাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। শীলার সব ব্যাপারও সে জানে। অসীমের উপর প্রতিশোধ লইতে গিয়া সে শীলারও সর্ব্বনাশ করিবে। সে আগুনে সেই নির্দ্দোষ সুদর্শন ছেলেটির সঙ্গে শীলাও হইবে জীবন্তে দগ্ধ। এ কথা ভাবিতেই বিজলীর বুকে ছুরিকাঘাতের মত একটা বেদনা টন্ টন্ করিয়া উঠিল।

টেঁপী যদি কেবল তাহার অপমানের প্রতিশোধ লইতেই চাহিত, তাহা হইলে হয়ত ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হইত। বিজলী চেষ্টা করিলে বোধ করি টেঁপীকে এ প্রতিহিংসা হইতে নিবৃত্ত করিতেও পারিত। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিজলীর কোনও সাধ্য নাই। টেঁপী অসীমকে এখনও ভালবাসে। পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত কিশোরীর এ প্রথম প্রণয়, জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত এ বিনষ্ট হইবে না। প্রথম প্রেম কচুরীপানার মত, একবার জন্মিলে নির্ম্মূল করা শক্ত। প্রেমিকা নিজে না পাইলেও অপরের হাতে প্রেমাস্পদকে তুলিয়া দিতে পারে না: অন্যে পাইবে, ইহাও সাধারণত কেহ সহ্য করিতে পারে না।

টেঁপীও পারিবে না, অন্তত করিবে না। সুতরাং তাহাকে এ বিষয়ে কিছু বলিলে, ভাল না হইয়া, খারাপ হইবার সম্ভাবনাই সমধিক।

আস্তে আস্তে লঘু পদক্ষেপে ক্লান্তভাবে যতীন আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইল। বিজলী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—"এখনও শুয়ে যে? পাঁচটা বেজে গেছে—"

বিজলী কহিল—"এমনি! কাজ কর্ম্ম তো কিছু নেই! কি করি?"

যতীন কহিল—"সত্যি তুমি একটা কিছু কর—তা নৈলে তোমার মস্ত এক অসুখ হয়ে পড়্‌তে পারে। কাজকর্ম্ম কর্‌লে, তবু এটা-সেটায় অন্যমনস্ক থাকবে, একরকমে দিন কেটে যাবে—"

বিজলী কহিল—"থিয়েটার-বায়স্কোপের কাজ তো জান! অকাজে রাজী না হলে, কাজ থাকে কই? ভগবানের দয়ায় কেমন সুশৃঙ্খলায় অব্যাহতি পেলাম, বল দেখি? তিনি যেন অভাগিনীর আকুল প্রার্থনা স্বকর্ণে শুনেছেন! রাত্রের কুকাজ দিনের আলোয় ভাবলে, মানুষ শিউরে ওঠে! আমার রাত্রি প্রভাত হয়েছে—বল, যতু, সুপ্রভাত!"

যতীনও ভাবাবিষ্টভাবে কহিল—"আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বল্‌চি, বিজু, সুপ্রভাত: নবীন সূর্য্যোদয়ে তোমার সব তমসা কেটে যাক্—"

বিজলী পুলকপ্রদীপ্ত মুখে কহিল—"তবে? এত কষ্টে যা ছাড়্‌চি, তুমি আবার তাতেই জড়াতে বলচ?"

যতীন দ্বিধাভরে কহিল—"জড়াতে ঠিক বলচি না। তবে যা বলেচ—না জড়ালেও চলে না। সেটাও ঠিক। আচ্ছা, একটা কাজ কর্‌বে?"

বিজলী কহিল—"লক্ষি, যতু, আর আমায় কোনও কাজ কর্‌তে

'বল' না। কাজ আমি ঢের করেচি। কাজের যশ চাইতে, অকাজের গ্লানিই আমার আজ সব চেয়ে বেশী অসহ্য হয়েচে!"

সহানুভূতির কোমলস্বরে যতীন কহিল—"দিন রাত বসে বসে ভাবলে সহনীয়ও যে অসহনীয় হয়ে উঠবে, বিজলী! এখন সইতে হবে—ভেঙে পড়লে চলবে কেন?"

সজলচোখে বিজলী কহিল—"আমি শুধু দিন গুন্‌চি আর অপেক্ষা কর্‌চি—কবে তুমি আমার খোকাকে একবার দেখাবে! তুমি বলেচ, তাই আমি ধৈর্য্য ধরে বসে আছি। এখনও কি সে সময় হয় নি?"

যতীনের কণ্ঠস্বরও মমতাভরা। কহিল—"এখনও হয়নি বিজলী। সময় হলেই আমি একেবারে তোমায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেব।"

একসঙ্গে বিজলীর চোখে জল আর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কবে সময় হবে, যতু? আমি যে আর স্থির হয়ে থাক্‌তে পার্‌চি না! খোকা কত বড় হল? দেখ্‌তে সে কেমন হয়েছে? যে রাজা তাকে পুষ্যিপুত্তুর নিয়েচেন, তাঁর রাণী খোকাকে খুব ভালবাসেন, না? খুব আদর করেন? খোকা স্কুলে যায়, না বাড়ীতে পড়ে? কি নাম হয়েছে তার?"

যতীন গাঢ়ভাবে কহিল—"তুমি ব্যস্ত হয়ো না। ব্যস্ত হলে চল্‌বে না। সময় হলেই সব জান্‌তে পার্‌বে। আমি সেই সুযোগের প্রতীক্ষাতেই আছি। আমি তো ঘনঘন সেখানে যাই না! আর যাবই বা কি জন্যে? সেই বাড়ীর একজন লোককে আমি চিনি। তার কাছে যখন যা খবর পাই, আমি তখনই তোমায় তাই বলে যাই।"

বিজলী সকাতরে কহিল—"কদিন থেকে খোকার জন্যে আমার মনটা ভারী খারাপ হয়েচে। তার কোনো অসুখ-বিসুখ হয়নি তো?"

যতীন হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া, একটু থতমত খাইয়া জোর করিয়া হাসিয়া কহিল—"কি পাগলামি করচ, কালী? ও—তোমার নাম যে বিজলী, ভুলেই গিয়েছিলাম। কৈ, আমায় মনে পাড়িয়ে দাও নি ত আজ?"

বিজলী কহিল—"আর আমার নামের মোহ নেই, কাজেই আর ও-মুখোসেরও প্রয়োজন হয় না। তোমার যা মুখে আসে, তাই বলে তুমি আমায় ডেকো। তবে রোজ একবার করে এসো। আসবে? সেই কবে এসেছিলে, তারপর আর দিন-পনের দেখাই নেই! বেশীক্ষণ দাঁড়াতে না পার, শুধু খোকার খবরটা দিয়েই চলে যেও। একটিবার দেখিয়ে দাও খোকাকে, শীগ্গীর করে। খোকাকে দেখেই, আমি কল্‌কাতা ছেড়ে, কাশী চলে যাব। কাশীতেই থাক্‌ব মনে করেচি। এখানে থাক্‌লেই উৎপাত! আর আমার কিছু ভাল লাগচে না।"

যতীন কহিল—"যাতে ভাল লাগে, তার ব্যবস্থাই ত কর্‌চি। কর্‌বে একটা কাজ? আহা—শোনই ছাই আগে। না শুনেই ঘাড় নাড়চ কেন? এ কাজ তোমার থিয়েটার বায়োস্কোপের নয়। এ হচ্ছে একজন বুড়ো ভদ্রলোকের বাড়ীতে গভর্নের্স্ হয়ে, তাঁর মাতৃহীন ছেলেটিকে দেখাশোনা করা। পার্‌বে?"

বিজলীর মুখে প্রসন্নতার আলো পড়িল। উদাসীনভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কার বাড়ী? কত বড় ছেলে?"

যতীন কহিল—"সে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ী, বাইরের

এক জমিদার তিনি। তাঁর আর কেউ নেই। লোকটি মহাশয়, অতি ভদ্র। তোমার কোনো কষ্ট হবে না। বেশ ইজ্জতের সঙ্গেই সেখানে থাকবে।"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"ছেলেটি কত বড় ?"

যতীন কহিল—"তা বেশ বড়-সড়ই মনে হল—৭।৮ বছরের হবে—"

বিজলী একটু ভাবিয়া কহিল—"তা এ বরং মন্দের ভাল। দিন রাত ছেলেটিকে নিয়ে, ভালই কাটবে। কি বল ? নিজের ছেলে পরকে বিলিয়ে দিয়ে, পরের ছেলেই এখন মানুষ করি ! আর কি ? ভাগ্যই যখন আমার এমনি—তখন আর কি করা যায় ? বলে না—নিজের পুঁথি পরকে দিয়ে, দৈবজ্ঞ বেড়ায় বুক চাপ্‌ড়িয়ে। আমার পুতুলটির চেয়ে তো সে ভাল ! তুমি যেতে বল্‌চ ত ? ঠিক মন খুলে বলচ? না, আমায় একটা কোনো কাজে ঢুকিয়ে দেবার জন্যে বল্‌চ !"

যতীন কহিল—"মন খুলেই বলচি বিজলী। মাটির পুতুলের মা হওয়ার চেয়ে, একটা মাতৃহীন জ্যান্ত ছেলের মা হওয়া কি হাজার গুণে ভাল নয় ? পুতুল তো ডাকবে না—সে তোমায় 'মা' বলে ডাকবে—"

বিজলী উচ্ছ্বসিত পুলকে কহিল—"যাব, যাব। কবে নিয়ে যাবে ?"

যতীন কহিল—"তাঁদিকে জিজ্ঞাসা করি। ঠিকঠাক করে, তোমায় আবার খবর দেব। কেমন ?"

বিজলী কহিল—"খুব শীগগীর ঠিক করে ফেল তাহলে—আমি যাব—"

যতীন কহিল—"যত শীগগীর হয় করচি।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিকের শেষাশেষি। বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। সন্ধ্যা প্রায় ৭টা। জনবিরল পল্লী—মনে হইতেছে, যেন কতই রাত্রি হইয়াছে।

পীতাভ বিদ্যুৎছটা পড়িয়া, পথতরুগুলির শীর্ষে শ্যামল ঘনপত্রপল্লব-দলগুলি শীতার্ত্ত সুন্দর মুখে মৃত্যুপূর্ব্ব পাণ্ডুরতার মত মনে হইতেছিল: পত্রান্তরালে জোনাকিগুলি শেষহৃৎস্পন্দনের মত সজোরে দিপ্-দিপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল: মহাযাত্রার পূর্ব্বক্ষণে ক্রমবর্দ্ধমান শ্রবণশক্তি-হীনতায়, কাণের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন অস্পষ্ট শব্দের মত, ঝিঁঝিঁগুলি অশ্রান্ত ডাকিতেছিল: নীলিমার নির্ম্মল নিটোল বক্ষে ছুরিকাঘাতচিহ্নের মত তৃতীয়ার চাঁদ, বাঁকা চোখে শ্যামাকান্তর দিকে চাহিয়াছিল।

শ্যামাকান্ত ট্যাক্সিতে বাড়ী ফিরিল। তাহার উস্কখুস্ক চুল, তেলে ঘামে ও ধূলায় সর্ব্বাঙ্গ ক্লিন্ন ও মলিন, পরণের জামাকাপড় ময়লা যেন চীট, অক্ষৌরিত মুখমণ্ডল, গোল গোল চক্ষু দুইটি পাকা পীচের মত লাল, চৈতী হাওয়ার মত উদাসীন চাহনি—চেহারা বিভীষিকাজনক।

মেম-সাহেব গোসল্খানায় শুনিয়া শ্যামাকান্ত নিশ্চিন্তভাবে নীচেকার অন্ধকার হলঘরের এক কোণে চুপ করিয়া গিয়া বসিল।

বেয়ারা তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিতে গেল: হাঁ হাঁ করিয়া শ্যামাকান্ত নিষেধ করিল। বেয়ারা বিমূঢ়ভাবে স্বইচ-বোর্ডের নিকট হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দারোয়ান, বাবুর্চ্চি, বেয়ারা, মালী, বয়, আয়া যে যেখানে আছে, শ্যামাকান্ত তৎক্ষণাৎ সকলকে ডাকিল:

হাতের কাজ ফেলিয়া, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সকলে উপস্থিত হইল।

পকেট হইতে একটা টর্চ্চ বাহির করিয়া, শ্যামাকান্ত প্রত্যেককে তাহাদের প্রাপ্য ও এক-এক মাসের বেতন বখশীশ্ দিয়া কহিল—এই মুহূর্ত্তেই যেন তাহারা কোনও রূপ শব্দ না করিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, নিজ নিজ জিনিষপত্র লইয়া—এ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়। এক মিনিটও দেরি না হয়।

পাচক জানাইল, রান্নার আর অল্পই বাকী।

শ্যামাকান্ত আদেশ দিল—থাকুক্, সে জন্য কোনও চিন্তা নাই।

আর কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিল না।

কেহ কেহ বিস্মিত হইল, কেহ কেহ রুষ্ট হইল, কেহ কেহ ক্ষুণ্ণও হইল। অত্যন্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় এইরূপ আদেশ পাইয়া, প্রথমে ইহাদের মনে বিস্ময়ের যে গোলকধাঁধাঁর সৃষ্টি হইয়াছিল, ক্রমশ সেটি কাটিয়া গেল। এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া, ইহারা তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। নিজ নিজ জিনিষপত্র বগলে ও টিনের এক-একটি বাক্স মাথায় করিয়া, চাকর-বাকরেরা ফটকের বাহিরে খোলা জায়গাটায় আসিয়া দাঁড়াইয়া,আলোয় পরস্পরের মুখ দেখিয়া, দুই একটা কথা কহিতে পাইয়া—বাঁচিল। বাত্যানিপাতিত বৃক্ষশাখা হইতে নানা দিক্‌দেশাগত পক্ষীগণ, হঠাৎ নীড়ভ্রষ্ট হইয়া আবার নানা দিক্‌দেশে ছড়াইয়া পড়িল।

সকলেই ভাবিল—ব্যাপার কি ?

চিত্রার্পিতের ন্যায় অন্ধকার বারান্দায় একাকী দাঁড়াইয়া, শ্যামাকান্ত দেখিতে লাগিল—ভৃত্যেরা বাহির হইল, যাইতেছে, ফটক পার হইল, বাড়ীর বাহিরে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইল, তাহার পর বড় রাস্তায় নামিল। একটু

পরেই, দলটি দুইভাগ হইল—দুই দল দুই দিকে পথ ধরিল। ক্রমশ তাহারা পথের অন্ধকারে এবং ধোঁয়ায় মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কালো অজগর সাপের মত পীচ-ঢালা পথটা লোকগুলিকে নিমেষে গ্রাস করিয়া ফেলিল। নির্ব্বিকার পথ—তাহার এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না। ইহাদের একটা পদচিহ্নও সেখানে রহিল না।

বাড়ীখানি একটা ভয়াল স্তব্ধতায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। একটা কালো বিড়াল, কি যেন মুখে করিয়া লইয়া, প্রাচীর-গাত্র-সংলগ্ন মেহেদী গাছের অন্ধকার তলে ছুটিয়া ঢুকিয়া পড়িল। ঝাউয়ের ঝোঁপে একটা পেচক কেবলি চিৎকার করিতেছিল।

যে-ফটক সর্ব্বদা বন্ধ থাকিত, সেটি অভিভূতের হাঁ-করিয়া থাকার মত, খোলাই পড়িয়া রহিল। সে যেন বলিতেছে—তোমরাও এস, আমি বন্ধ হইব। তোমাদিগকে বাহির না করিয়া, আমি বন্ধ হইব না।

একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, শ্যামাকান্ত উপরে উঠিতে গেল। সিঁড়ির কাছে গিয়া তাহার গা-টা কাঁটা দিয়া উঠিল: মনে হইল, পথ অবরোধ করিয়া অন্ধকারে যেন কাহারা বসিয়া আছে! তাহাদের গরম নিঃশ্বাস গায়ে লাগিতেছে, তাহাদের বক্ষ-স্পন্দন পর্য্যন্ত শোনা যাইতেছে: তাহাদের জ্বলৎরক্তচক্ষুগুলি আগুনের গোলার মত তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে: তাহাদের হাতের ছোরাগুলি অন্ধকারে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে: পলকপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে। শ্যামাকান্ত ভয় পাইল।

ফিরিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালিতেই, শ্যামাকান্ত দেখিল—তাহার সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে—যে দিকেই চায়, সেই দিক হইতেই

তাহারা বিকট চিৎকার করিয়া সরিয়া যায়ঃ ইহাদের মুখ দেখা না গেলেও, শ্যামাকান্ত তাহাদের বিলীয়মান হাত পা ও পিঠ স্পষ্টই দেখিতে পায়। আলোয় তাহার আরও বেশী ভয় করিতে লাগিল।

শ্যামাকান্ত বাতি নিভাইয়া দিল। অন্ধকারে তাহারা তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিল। কাহারা এরা? এতদিন ইহারা কোথায় ছিল? আজই বা ইহারা এমন হঠাৎ আসিল কেন? ঐ! ঐ তাহাদের অট্টহাস্য! শ্যামাকান্ত পুনরায় বাতি জ্বালিল ঃ একটা টিক্‌-টিকি একটা গাংফড়িংকে ধরিবার জন্য প্রাচীরগাত্র হইতে মেঝেয় লাফাইয়া পড়িল। অশরীরীর দলও দেওয়ালের ভিতর আত্মগোপন করিল। বাতি জ্বালিয়া বিহ্বলভাবে শ্যামাকান্ত কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিল, কিন্তু আলোয় তাহারা বাহির হইল না। ওটা কি?··· ও!···ছায়া! নিজেরই ছায়া।

শ্যামাকান্ত ঘামিয়া উঠিল। বিভীষিকাকণ্টকিত দেহে শ্যামাকান্ত উপরে উঠিতে লাগিল। কে তাহার পিছু লইয়াছে! শ্যামাকান্তর সঙ্গে সঙ্গে সে-ও উঠিতেছে। শ্যামাকান্ত দাঁড়াইলে, সে-ও দাঁড়ায়। শ্যামাকান্ত বারে বারে পিছন ফিরিয়া চায়, কাহাকেও দেখিতে পায় না। তবে সে যে লুকাইতেছে, সেটি শ্যামাকান্তর দৃষ্টি এড়ায় না। আশ্চর্য্য! ইহার গতিও শ্যামাকান্তর গতির সহিত একেবারে এক! শ্যামাকান্ত দ্রুত চলিলে এ-ও জোরে চলে, শ্যামাকান্ত আস্তে চলিলে এ-ও গতি শ্লথ করে! অজ্ঞাত আশঙ্কায় মুহুর্মুহু শ্যামাকান্তর গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। টপাটপ সিঁড়ি ভাঙিয়া, এক রকম ছুটিয়াই, শ্যামাকান্ত একেবারে দিবালোকের মত উজ্জ্বল দ্বিতলের হলে ঢুকিয়া

কতকটা আশ্বস্ত হইলেও, অনুসরণকারীকে এড়াইতে না পারিয়া নিরাপদ অনুভব করিতে পারিল না। অ-দৃষ্ট ঠিক পিছনেই দাঁড়াইয়া রহিল!

অন্ধকারের ভয় আলোতে কতকটা কাটিল, কিন্তু এত আলোতেও শ্যামাকান্ত একেবারে ভয়মুক্ত হইতে পারিল না। আবার এক নূতন ভয় আসিয়া জুটিল। অন্ধকারেই ভয় লাগে বেশী, কিন্তু আলোও যে এমন ভীতিপ্রদ হইতে পারে, শ্যামাকান্ত ইহার পূর্ব্বে তাহা কখনও অনুভব করে নাই। এত আলো সে সহ্য করিতে পারিল না। আলোয় তাহার চক্ষু বুজিয়া আসে, দৃষ্টি অন্ধ হয়। সে কত-কি সব দেখিতে লাগিল: হলের বিস্তৃত পরিসরে বহু বিচিত্র জীব ঘোরাফেরা করিতেছে, কত রং-বেরংঙের ঢেউ উঠিতেছে, কত বড় বড় সাপ সরীসৃপ কিল্‌বিল্‌ করিয়া বেড়াইতেছে, আলোর মত উজ্জ্বল কত অশরীরী ছায়ামূর্ত্তি শ্যামকান্তর পথ রোধ করিয়া, তাহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহার কাণের কাছে ইহারা এমন প্রচণ্ড কোলাহল করিতেছে, যে তাহার কাণ বধির হইবার উপক্রম হইল।

শ্যামাকান্ত একটু নিরিবিলি চায়, একটু গোপনতা চায়। কিন্তু একি? আলো যে সব প্রকাশ করিয়া দেয়! আলো যেন খোলা-ফটক, সকলকে বিনা-বাধায় অনায়াসে প্রবেশাধিকার দিতেছে! আলো আদালতের মত নিষ্করুণ, নির্দ্দয়! সে সব কথার ও কাজের বিচার করে! জনসাধারণকে জড় করিয়া দেখাইয়া দেয়, শুনাইয়া দেয়, জানাইয়া দেয়! সে আলো চায় না! আলো তীক্ষ্ন ছুরির মত সর্ব্বাঙ্গে বিঁধে, লজ্জাকে অসহনীয় করিয়া তোলে। আলো যেন খবরের কাগজ —আলো বিশ্বাসঘাতক। একটা লোমকূপকেও সে গোপন করিতে জানে না! আলো অপেক্ষা অন্ধকার ঢের ভাল: অন্ধকারে নিজের

কাছেও নিজেকে গোপন করা যায়। অন্ধকার ঢের নিরাপদ। অন্ধকারের ছিদ্র নাই, শঠতা নাই—সে গভীর, সে সহৃদয়। এ-বাড়ীর আলো যেমন অট্টহাস্য করে, অন্ধকারও তেমনি ভয় দেখায়!

খটাখট শব্দে দুয়ার খুলিয়া, হলের মধ্যে স্বামীকে চোরের মত একাকী, ভিক্ষুকের মত সজ্জিত এবং খুনীর মত উত্তেজিত অবস্থায়, চুপ করিয়া বিভ্রান্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, বিনোদিনীও চমকিয়া উঠিয়া, ঘরের দুয়ার ধরিয়া আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি? ওখানে অমন করে ষ্টাণ্ডিং (দাঁড়িয়ে) যে?"

শ্যামাকান্তর ধড়ে প্রাণ আসিল। এক-ছুটে পত্নীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া, গভীর স্বস্তিসহকারে হাঁফাইতে হাঁফাইতে শ্যামাকান্ত কহিল—"হাঁ বিনোদ, আমি! আমি এসেচি। চল, ঘরে বসি—"

বলিতে বলিতে শ্যামাকান্ত পত্নীর শয়নকক্ষে ঢুকিয়া, তাড়াতাড়ি দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া, ধপ্ করিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িল।

অপরিষ্কার কাপড়ে বিছানায় বসায়, বিনোদিনী বিরক্ত হইয়া কহিল—"চেয়ারে সিট্ ডাউন্ না করে' (না বসে), ডার্টি ক্লথস্-এ (ময়লা কাপড়ে) বেড্-এ (বিছানায়) বসলে কেন?"

করুণ মিনতিভরাকণ্ঠে ও অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে শ্যামাকান্ত পত্নীর নিকট নিবেদন করিল—"তা হোক্, তা হোক্—বিনোদ, কিছু মনে করো না! এক গ্লাস জল দিতে পার? বড্ড তেষ্টা পেয়েচে—"

এই দুরন্ত শীতে শ্যামাকান্ত ঘামিয়া শট্-শট্ করিতেছে: তাহার কাপড় জামা পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিয়াছে। শ্যামাকান্ত সাধারণত স্বল্পভাষী এবং গম্ভীর প্রকৃতির। এ-রকম অস্বাভাবিক মূর্ত্তি ও কণ্ঠস্বর,

বিনোদিনী তাহার চল্লিশ বৎসরের বিবাহিত জীবনে আর কখনও দেখে নাই। বিনোদিনী সত্যই বিস্মিত হইল।

ডাকিল—"ব্যায়রা, ব্যায়রা—" ডাকের ঢাক আকাশের নক্ষত্রসভা পর্য্যন্ত পৌঁছিল, কিন্তু বেয়ারার শ্রুতিগোচর হইল না।

—"গেল কোথা, ইষ্টুপিটেরা?" বলিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে ঘরের কুঁজা হইতে এক গ্ল্যাস জল গড়াইতে গড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমাকে সিক্ (অসুস্থ) মাইণ্ডে (মনে) হচ্ছে? বডিটা (শরীরটা) কি গুড্ (ভাল) নেই?"

শ্যামাকান্ত জলপান করিয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল। কহিল—"অসুস্থ? কৈ? না ত! খুব ভাল আছি। ভয়ানক ভাল আছি। দেখ', বিনোদ, আজ আমার বেশ প্রত্যয় হয়েচে, এ বাড়ীতে ভূত আছে—"

বিনোদিনীর ভূতের ভয় চিরদিনকার। ভৌতিক বিভীষিকায় স্বামীর গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া সভয়ে কহিল—"ডোণ্ট্ সে, ডোণ্ট্ (বল' না, বল' না) ও কাউ (ও গো)। মাই ফিয়ার গেট্ (আমার ভয় পায়)। তাহলে উপায়?"

শ্যামাকান্ত অন্যমনস্ক ভাবে কহিল—"আছে। একমাত্র উপায়, এ-বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়া। যাবে, বিনোদ? দেশে যাবে একবার? দেশে যে অমন বাড়ী হল, একদিন বাস করা দূরের কথা, একবার চোখেও তা দেখ্‌লে না। চল' না, একবার বাড়ীই যাই। কাল ভোরের ট্রেনেই যাওয়া যাক্—কি বল?"

পল্লীবাসের বিভীষিকার নিকট ভূতভীতিও ম্লান হইয়া পড়িল। বিনোদিনী স্বামীর নিকট হইতে সরিয়া গিয়া, অদূরস্থ চেয়ারে ধপ্

করিয়া বসিয়া পড়িয়া, ঝাঁজের সহিত কহিল—"সত্যি তোমার হেড্ ব্যাড্ (মাথা খারাপ) হয়েচে! তুমি ম্যাস্কুলিন্ জেণ্ডার (পুরুষ মানুষ) তোমার এমন ঘোষ্ট ফিয়ার (ভূতের ভয়)? আর তাইতে হোম লীভিং (বাড়ী ছেড়ে) পালাতে হবে? আর গোয়িং (যাব) কোথা? না, যত অসভ্য অভব্য লোফার লোক্লাস্ (ইতর ছোট লোকদের) দেশে। ভিলেজ-এ (পাড়াগাঁয়ে) কি কোনও জেণ্টল্‌ম্যান (ভদ্রলোক) যায়, না, থাকে? মাই গড্ (হে ঈশ্বর)! আমার হাজব্যাণ্ড্‌কে (স্বামীকে) গুড্ মাইণ্ড্ (সুমতি) দাও, হে কুক্ (হে ঠাকুর)। পাড়াগাঁয়ের নামেই আমার বডি (গা) ঘিন্ ঘিন্ করে, মনে হয় ম্যালেরিয়া হল, নয়, স্নেক্ বাইট্ হল (সাপে কাম্‌ড়াল)।"

শ্যামাকান্তর মাথাটা মাতালের মত ঘাড়ের উপর ঠিক খাড়া থাকিতে ছিল না, কেবলি ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। জড়িত কণ্ঠে কহিল—"ও, গা ঘিন ঘিন করে! তা বেশ। তবে তুমি থাক, আমায় যেতেই হবে। আমায় ডাক্‌চে—এখানে আর এক মিনিটও আমার থাকা চল্‌বে না।"

স্বামীর ঈদৃশ রহস্যপূর্ণ কথাবার্ত্তায় বিনোদিনীর বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িয়াই উঠিতেছিল। বিস্ময়ের সঙ্গে অজ্ঞাত এক আশঙ্কায়, তাঁহার কেমন ভয়-ভয়ও করিতে লাগিল। প্রসঙ্গটি বদলাইবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিল—"আজকের কেসের (মোকদ্দমার) হোয়াট নিউজ (কি খবর)? আর কতদিন ওয়াক্ করবে (চল্‌বে)?"

উচ্চহাস্যে শ্যামাকান্ত কহিল—"মোকদ্দমার খবর খুব ভাল। শেষ হয়ে এসেচে! আর বিশেষ দেরী নেই—ধরে নাও এক রকম শেষই—" শ্যামাকান্তর হাসিটিই সর্ব্বাপেক্ষা ভীতিজনক।

বিনোদিনী অপ্রসন্ন ভাবে কহিল—"রাইট (ঠিক) করে' অল্ টেল্ (সব বল')। একৃষ্ট্রা ওয়ার্ডে (বাজে কথায়) টাইম ওয়েষ্ট (সময় নষ্ট) করো না—ডিনারের (ভোজনের) টাইম্ (সময়) হল—"

শ্যামকান্ত হিংস্র শ্বাপদের মত বিকট মুখভঙ্গীতে, পত্নীর পানে বজ্রগর্ভ চাহনিতে কিয়ৎকাল চাহিয়া, কহিল—"দেখ, এই বিপদের সময়ে তুমি অমন ইংরিজি বলে' আমায় আর বিপন্ন করো না। এই ক' বছরে অনেক ইংরিজিই তো বল্‌লে। আর কেন? এইবার ক্ষান্ত দাও। শুধু ইংরিজি বলাটা ছাড়। আমি জোড়হাতে তোমায় মিনতি কর্‌চি। ঐ তেলের কুপোর মতন দেহে সাজপোষাক বাহার, মেছেতা-পড়া মুখে রুজ-পাউডার, বুড়ো বয়সে ধেড়ে সেজে শিং ভেঙে বাছুরের দলে মেশা—মুখ বুঁজে সব সহ্য করেচি এতদিন—আর সহ্য হচ্ছে না! দোহাই তোমার—"

বিনোদিনী জিদের ভাবে কহিল—"ইংলিশ টেলিং মাই প্রাক্‌টিস্ (ইংরিজি বলা আমার অভ্যাস) হয়ে গেছে। ইংরিজি উইদাউট (ছাড়া) আমার ফেসে (মুখে) ওয়ার্ডই (কথাই) ডোণ্ট কাম (আসে না)।"

শ্যামাকান্ত হতাশভাবে কহিল—"তা বুঝিচি! তা নৈলে এমন সর্ব্বনাশ হয়?" শ্যামাকান্ত কাঁদিয়া ফেলিল।

বিনোদিনী ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"অল্ ডেড্ (সর্ব্বনাশ)? হোয়াট সে (কি বল্‌চ)? হোয়াট ইজ (কি হল)?"

শ্যামাকান্ত জোর করিয়া প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা করিতেছিল।

মৃদু হাস্যে কহিল—"নাঃ এমন কিছু হয় নাই। সব ঠিক আছে!" কিয়ৎকাল একদৃষ্টে একটি আরশুলার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে করিতে উচ্চহাস্য করিয়া শ্যামাকান্ত বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা

বিনোদ, অনেক দিন উপোস করে, একদিন যদি কেউ খুব খানিকটা কালিয়া-পোলাও খায়, তাহলে তার কি হয়, জান?"

বিনোদিনী বিহ্বলভাবে কহিল—"ডিস্‌পেপ্‌শিয়া (বদ্‌হজম)—"

শ্যামকান্ত খুব একচোট হাসিয়া কহিল—"ঠিক বলেচ, বদ্‌হজম হয়। আমাদেরও বদ্‌হজম হয়েচে। কিছুই যখন ছিল না, তখন দেখ্‌চি, ভালই ছিলাম। হল যদি, ত এমন হল—যা রাজা মহারাজারও হয় না। কাজেই হজম হল না: অতিলোভে তাঁতী ডুব্‌ল! তাই ত এ কাজে তখন সহজে হাত দিতে চাই নি। কিন্তু তুমি আমার হাত ছাড়লে না। ক্রমাগত তাতিয়ে তাতিয়ে আমার হাতে সিঁধকাঠিটি তুলে দিয়ে, ছেড়ে দিলে পুকুরচুরি করতে। মদ-আফিংয়ের মত চুরিও একটা নেশা যে। অল্পদিনেই আমার বেশ মৌতাত জমে উঠ্‌ল! বাস—সাবাস আমি—কেমন হাত-সাফাই—" বলিতে বলিতে উত্তেজিতভাবে শ্যামাকান্ত শয্যাসন হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। তাহার চক্ষু দুইটি ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইবার মত হইল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি হাত ধরিয়া শ্যামকান্তকে পুনরায় পূর্ব্বস্থানে বসাইয়া, কহিল—"কি হয়েচে বল' দেখি, তোমার আজ? তোমার কথাবার্ত্তা শুনে আর চালচলন দেখে, আমার সত্যি বড় ভয় করচে! যাও, কলঘরে যাও—হাতমুখ ধুয়ে, খেয়েদেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়'। একটু ঘুমুলেই শরীরটা ভাল হবে। আমি খাবার দিতে বলি—"

বিনোদিনী বাহিরে যাইতেছিল, শ্যামাকান্ত পত্নীর হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া, বসাইয়া, কহিল—"এই ত বেশ মাতৃভাষা বল্‌লে! সব ছেড়েচ, সবই গেছে—মাতৃভাষাটা আর ছেড় না ভয়ানক পস্তাবে।"

ছি ছি, সে একি করিল? বিনোদিনী সত্যই লজ্জিত হইল। সবটাই বাংলা বলিল? একটাও ইংরিজি বলিল না?

শ্যামাকান্ত পূর্ব্বের মত রুক্ষস্বরে কহিতে লাগিল—"তোমার মত প্রবলা আত্মসর্ব্বস্ব হৃদয়হীন অভব্য বিলাসী স্ত্রীর মনস্তুষ্টি করতে, কুবেরের ভাণ্ডারও শূন্য হয়ে যায়। আমি আর এমন কি করেচি? চৈতনপুরের জমিদারীটা হাতে না এলে, তোমার জন্যে সত্যি সত্যি হয়ত এত দিনে, সিঁধকাঠি নিয়েই আমায় বেরুতে হত! কিছুই ছিল না। কিছুর জন্যে করতে গেলাম এক, হল আর এক। অল্পে যে নেশা হয় না! ব্যাপারটাকে চাপা দেবার জন্যে তাই বলেছিলাম, নন্দার সঙ্গে অসীমের বিয়ে দিয়ে দাও। তোমার তখন তা মনঃপুত হল না। বললে—পাড়াগেঁয়ে উজবুকের সঙ্গে লরেটোতে-পড়া মেয়ের বিয়ে? তার বাড়ীতে জনমানব নেই, দুশো বছরের পুরোনো ফাট-ধরা সাবেকী এক ভুতুড়ে বাড়ী! মেয়ে নাকি সেখানে হাঁপিয়েই মরে যাবে! কিম্বা যাবামাত্রই হার্টফেল করবে, আর নয় ত, আতঙ্কে তার একটা শক্ত ব্যারামই হয়ে পড়বে। মনে পড়ে? অথচ সে বিয়েটা হলে, নন্দাও ঘরে থাকত, আর ব্যাপারটাও হয়ত আজ এমন না হতেও পারত।"

বিনোদিনী সাভিমানে কহিল—"তা তুমি আমার ওয়ার্ড (কথা) হিয়ার করলে (শুনলে) কেন? আমি ফেমিনিন্ জেণ্ডার (স্ত্রীলোক), টুয়েলভ্ হ্যাণ্ড্ (বারো হাত) ক্লথে (কাপড়ে) কাছা নট্ (নেই)—"

শ্যামাকান্ত কহিল—"শোনো, শোনো! উঃ মাথাটায় ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে—ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে—"

বিনোদিনী কহিল—"তুমি লাই ডাউন কর' (শোও)—আমি হেড-এ (মাথায়) হ্যাণ্ড ব্রাশ করে'(হাত বুলিয়ে) দিই—"

শ্যামাকান্ত বাধা দিয়া কহিল—"আর হেডে হ্যাণ্ড-ব্রাশ করে কাজ নেই, এক্ষুনি সেরে যাবে। আমি কেন জোর করলাম না জান? তুমি যে বলেছিলে, কত আই-সি-এস, আই-এম-এস, রাজা মহারাজা, অন্তত ব্যারিষ্টার জজ, নেহাৎপক্ষে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটও জুটবে পালে পালে। আর এই সব রুই কাৎলা ধর্‌তে, তুমি সুদ্ধু ছুক্‌রী সেজে, ছুকরীদিকে পর্য্যন্ত হার মানাতে লেগে গেলে! চেনা নেই, জানা নেই, যে যা বলচে তাই বিশ্বাস করে, আমায় লুকিয়ে, আমারি বাড়ীতে, এমন একটা নাইট-ক্লাব খুলে দিলে, যা ভাবতে ঘৃণায় আর লজ্জায় গা শিউরে ওঠে, উঁচু মাথা হেঁট হয়! ভাবলে, মেয়েরা ইংরিজি পড়েচে, আধুনিক ফ্যাশানে শাড়ী-ব্লাউস পরতে শিখেচে, হঠাৎ খুব পয়সা পেয়েচ—আর কি? সব ভুলে গিয়ে, ধরাখানাকে সরাখানা ভেবে—অমনি রাতারাতি সভ্য আর অভিজাত হয়ে উঠতে গেলে! সাহেবীয়ানায় বাড়ীর নর্দ্দামাটা পর্য্যন্ত উৎকট হয়ে উঠল। বংশপরম্পরা শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা যে সভ্যতা আর আভিজাত্য অর্জ্জন কর্‌তে হয়, তুমি তা লাফিয়ে আয়ত্ব কর্‌তে গিয়ে, মেয়ে দুটোর পর্য্যন্ত মাথা দিলে বিগ্‌ড়ে। আমার বাড়ী হল চোর, জোচ্চোর, লম্পট, আর ভদ্রবেশী বদ্‌মাইস, ছোটলোকদের একটা আড্ডা! ফলে, মেয়ে দুটির কর্‌লে সর্ব্বনাশ! বেনো জল ঢুকে, সাবেক জল পর্য্যন্ত গেল বেরিয়ে। দেখলে ত? যা হোক্, তবু মেয়ে দু'টো ছিল! সে দুটোও গেল! আর কি রইল?" অস্বাভাবিক কণ্ঠে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া, হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া, শ্যামাকান্ত বিছানায় পড়িয়া গেল।

বিনোদিনী স্বামীর মুখপানে চাহিতে পারিল না। সে যেন পলাইতে পারিলে বাঁচে।

শ্যামাকান্তর ঈদৃশ পরিবর্ত্তনের কোনও কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া, বিনোদিনী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। স্বামীর মুখে এমন তীব্র হতাশার বাণী বা রূঢ় তিরস্কার সে কখনও শোনে নাই। নিতান্ত দুরবস্থার দিনেও শ্যামাকান্তর মুখের হাসিটি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ম্লান হয় নাই। অভাব অভিযোগ দুঃখকে কোনও দিনই শ্যামাকান্ত গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নাই। চরম দুর্দ্দশার দিনেও আশাবাদী শ্যামাকান্ত বলিত—চিরকাল কাহারও অমারাত্রি থাকে না: দুঃখের পরে সুখ আসেই। শ্যামাকান্ত কখনও নিরুৎসাহ হয় নাই। সেই শ্যামাকান্ত আজ এমন হইল কি করিয়া? বিনোদিনীর কান্না পাইল।

অতিকষ্টে টলিতে টলিতে শ্যামাকান্ত উঠিয়া বসিল। তাহার চোখ দুইটি খুনীর চোখের মত জ্বলিয়া উঠিল। সশ্লেষে জিজ্ঞাসা করিল—"কি? দেশে তাহলে যাবে না? পাড়াগাঁ পছন্দ নয়? কলকাতা শহরটা খুব ভাল লেগেচে, না? ঠিক কথা! সেখানে ত এমন মজা হবে না, তাই মন সর্‌চে না—"

কাঁদিতে কাঁদিতে বিনোদিনী কহিল—"তা কেন বল্‌চ?"

শ্যামাকান্ত উচ্চহাস্য করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল—"কাঁদচ? কাঁদ, কাঁদ। আমি কাঁদতেও পার্‌চি না! তোমার জন্যেই আজ সর্ব্বনাশটি এমন সম্পূর্ণ হল! অর্থ ই হয়েছিল এ পরিবারের কাল। বলি নি? অসদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থের ফল কখনও শুভ হয় না। দুধে জীবন রক্ষা হয় বটে, কিন্তু বিষ-মেশান দুধে জীবন রক্ষা হয় না, নষ্টই হয়। মৃত্যু-

শয্যায় শুয়ে এই জ্ঞানটি লাভ করলে ত? এ-বাড়ীতে টাকাকড়ি ধন-দৌলৎ আর ঐশ্বর্য্য এসেছিল প্রচুর, না বিনোদিনী দেবী? অর্থই এসেছিল, কিন্তু লক্ষ্মী আসেন নি। তাই যে-অর্থে সবার সব হয়, সেই অর্থে আমাদের সব গেল, সর্ব্বনাশ হল। সভ্যতা আর আভিজাত্যের নামে—কায়মনোবাক্যে নির্লজ্জ আধুনিকতা আর সর্ব্বনাশী ফিরিঙ্গিয়ানার প্রতিষ্ঠা করে, ঈশ্বরকে অপমান করে, চোখের জলে বিদায় করেচ। ঈশ্বর না থাকলে ঐশ্বর্য্যও থাকে না, লক্ষ্মীও লাভ হয় না। হলোও না! সব ছাড়লে কিছু থাকেই, কিন্তু ঈশ্বরকে ছাড়লে আর কিছুই থাকে না! এখন সেটা বুঝতে পারচ?"

প্রসাধন-টেবিলে মুখ গুঁজিয়া, বিনোদিনী ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিনোদিনীর বুঝিতে বাকী রহিল না, একটা বিশেষ অসাধারণ কিছু ঘটিয়াছে। শ্যামাকান্তর মস্তিষ্কও যে সুস্থ নয়, তাহাও বিনোদিনীর বুঝিতে আর বাকী রহিল না।

শ্যামাকান্ত গভীরস্বরে কহিতে লাগিল—"ঈশ্বরহীন এ সংসারে লক্ষ্মী তাই বাসা বাঁধলেন না। গৃহের কল্যাণ স্ত্রীর হাতে ব'লে, স্ত্রীকে বলে গৃহলক্ষ্মী। এ পরিবারে গৃহলক্ষ্মী ছিলেন না, ছিল স্ত্রী! তাই লক্ষ্মী এখানে দাঁড়াতে পারলেন না। আর এখন কেঁদে করবে কি মেমসাহেব? ঘরের মটকায় আগুন ধরেচে, শীগগীর এই বেলা বেরিয়ে না পড়লে, দাঁড়িয়ে পুড়ে মরবে কিন্তু—"

শ্যামাকান্ত আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। কহিল—"শোন' শোন' মেমসাহেব, আর একটা মজার খবর—খু-ব মজার—ভা-রি মজার—"

বিনোদিনী মুখ তুলিয়া সজল নয়নে স্বামীর মুখের পানে চাহিল।

শ্যামাকান্ত কহিতে লাগিল—"তোমার হবু বড় জামাইয়ের সন্ধান পেয়েচি। চন্দনার জমিদার হরগোবিন্দ রায় চৌধুরীর সুধীন্দ্রনাথ নামে কোনও পুত্র নাই, তিনি অপুত্রক। বছর পাঁচেক হল, তিনি একটি ছেলেকে পুষ্যি নিয়েছেন, এখন তার বয়েস এই বছর আষ্টেক।"

উচ্চহাস্য করিয়া কহিতে লাগিল—"কায়স্থের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়েছিলে না? হল না! হলে খুব ভালই হত। না? তাই ত নন্দা পালিয়েচে! লরেটোতে পড়া মেয়ে! বি-এ পাশ! এমন মা! কার সঙ্গে গেল জান? জান না? সে খোঁজটা আমিও পেলাম না। ছন্দা কি করচে জান? সে সিনেমায় ঢুকেচে! অভিনেত্রী হয়েচে! খুব মজা হয়েচে, না?—খু-ব মজা—"

শ্যামাকান্ত আনন্দে নৃত্য জুড়িয়া দিল।

বিনোদিনী একা স্বামীকে সামলাইতে না পারিয়া বয়, বেয়ারা, আয়া, মালী বলিয়া আর্ত্তকণ্ঠে গগনভেদী রবে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কাহারাও সাড়া পাওয়া গেল না। বিনোদিনী চাকরদের দিকে গমনোদ্যত হইলে, শ্যামাকান্ত স্খলিতবসনে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া, পত্নীর হাতটা খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া, উন্মাদের মত অস্বাভাবিক উল্লাসে কহিল—"কেউ নেই, কেউ নেই। সব্বাইকে তাড়িয়ে দিয়েচি! ব্যস—তুমি আর আমি—এখন কেবল নাচ—নাচ—"

কোনও রকমে হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া, ভয়ার্ত্তভাবে বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?" বিনোদিনীর সর্ব্বশরীর হিম হইয়া গেল।

অট্টহাস্য করিয়া শ্যামাকান্ত কহিল—"কেন? জজ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে এস। জান না বুঝি? মোকদ্দমায় যে হেরে গেছি! এ বাড়ীঘর

বিষয়-সম্পত্তি এখন আর আমাদের নয়, এ এখন অসীমের। যার লক্ষ্মী, তার ঘরেই ফিরে গেছে! চোরের রাত্রিবাসই লাভ, বসবাস করবে, যে মালিক। কাল সকালেই মালিক আস্‌বে দখল নিতে, তাই ত বলচি—চল, এই বেলা পালাই: অন্ধকারে এই বেলা বেড়িয়ে পড়ি, কেউ দেখ্‌তে পাবে না। নৈলে রাত পোয়ালেই, তারা এসে ভয়ানক অপমান কর্‌বে কিন্তু: পাড়ার লোকজন জড় হবে, হাসাহাসি কর্‌বে, টিট্‌কিরি দেবে। অত আলোয় তখন বেরুনোই যাবে না। চলে এস, এই বেলা চলে এস—" বলিয়া বিনোদিনীকে টানাটানি করিতে গিয়া, টাল সামলাইতে না পারিয়া, পড়িয়া গিয়া, শ্যামাকান্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বিদ্যুতালোকে দেখা গেল, তাহার নাক ও মুখ দিয়া সবেগে তাজা গরম রক্তস্রোত বহিতেছিল: দেখিতে দেখিতে মার্ব্বেল পাথরের সাদা মেঝেটির কিয়দংশ লাল হইয়া উঠিল।

"ওগো আমার কি হল গো" বলিয়া বিনোদিনী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্যামাকান্তকে তুলিবার বহু চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। দেওয়ালের ছায়ামূর্ত্তি বিনোদিনীকে অনুকরণ করিয়া, নীরবে উপহাস করিতে লাগিল। হঠাৎ বিনোদিনীও চুপ করিল।

নিস্তব্ধ বাড়ীটি ক্রমে ক্রমে প্রেতপুরীর মত ভয়ানক হইয়া উঠিল। শ্যামাকান্তর দেহখানিও ধীরে ধীরে হইয়া উঠিল, কাঠের মত অসাড়, পাথরের মত শক্ত এবং বরফের মত শীতল!

স্থাণুর মত স্বামীর মাথাটি কোলে করিয়া, জীবন্তপ্রেতের মত এই জনহীন পুরীমধ্যে বিনোদিনী একাকিনী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিকী সংক্রান্তি। শহরে কার্ত্তিক পূজার ধূম। অন্যান্য বৎসর এ দিনে বিজলীর গৃহে খুবই ধূমধাম হইত : এবার সব ভোঁ-ভাঁ।

সকাল হইতে টিপিটিপি জল পড়িয়া শীতের প্রকোপটা একটু বেশী হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্নভোজন সারিয়া বিজলী ঘরে ঢুকিয়া লেপ-মুড়ি দিল। ভূষণও নিজের ঘরে গিয়া একখানা র‍্যাপার জড়াইয়া, একটি বিড়ি ধরাইয়া, পশ্চিমের খোলা জানালার কাছে বিছানার উপর, চুপচাপ করিয়া বসিল। গুটিগুটি করিয়া নানারকমের চিন্তা আসিয়া, ভূষণের মনে সংক্রান্তির মেলা জমাইয়া তুলিতে লাগিল।

বিজলী ও-বাড়ী ছাড়িলে, ভূষণ সেটা শাপে বরই ভাবিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল—এখন হইতে টেঁপীরা সর্ব্ববিষয়ে, তাহারই মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা হইল না : ঘটনার স্রোত উজান বহিল।

ভূষণের দৃঢ় ধারণা ছিল, টেঁপীকে সে বিবাহ করিবেই। কিন্তু সে আশাও যাইতে বসিয়াছে! টেঁপীর চালচলন এবং আচার-ব্যবহার তাহার মোটেই পছন্দ হয় না। ভূষণের আশঙ্কা—কোন দিন সে বুঝি তাহার হাত ফস্কাইয়া পলায়! ও-বাড়ীর ব্যবহারে উক্ত আশঙ্কা দিন দিন বদ্ধমূলই হইতেছে। টেঁপীর সঙ্গে তাহার বিবাহ যদি নিতান্ত না হয়, না হউক—কিন্তু তাই বলিয়া, তাহাকে একেবারে হাতছাড়া করিতে সে মোটেই প্রস্তুত নয় : বিবাহ না হইলে, টেঁপী হইবে তাহার কোম্পানীর কাগজ। তাহার সুদে সে নিজের

সৌভাগ্যপ্রাসাদের ভিত্তি স্থাপনা করিবে। কিন্তু টেঁপীরা যে এত শীঘ্র এত চালাক হইয়া পড়িয়া, তাহাকেই পদাঘাত করিবে, এ ছিল ভূষণের কল্পনাতীত। ভূষণ জানিত—পাড়াগেঁয়ে লোক, চিরদিন পাড়াগেঁয়েই থাকিবে ঃ ভূষণ তাহাদিগকে ভাঙ্গাইয়া খাইবে: এই ছাগল দেখাইয়া, সে শহরের বড় বড় বাঘ মারিবে। কিন্তু কে জানিত, যে ইহারাই এত শীঘ্র এক-একটি রয়্যাল বেঙ্গল বাঘ হইয়া দাঁড়াইবে! ভূষণ অবগত ছিল না যে, সুন্দর-বনেই বড় বড় বাঘের বাসা! ভূষণের রক্তেই টেঁপীরা বসন-রঞ্জন হইতে চরণ-প্রসাধন পর্য্যন্ত করিতে লাগিল! ভূষণ নিজের অদৃষ্টেরই দোষ দিল। সে বেশ ছিল, কেন এই এঁড়ে গরু কিনিতে গেল?

অগ্রহায়ণ মাস শেষ হইলেই ফ্ল্যাটের ভাড়াও শেষ হইবে। ভাবিতেও ভূষণের রক্ত হিম হইয়া উঠে! ইহাদের পৌষ মাস, কিন্তু তাহার যে সর্ব্বনাশ! এখন বেতনের টাকায় ইহাদের খাইখরচ ও দুই-একখানা আটপৌরে শাড়ী পর্য্যন্ত কোনও রকমে কষ্টে-সৃষ্টে চলিতেছে, কিন্তু ফ্ল্যাটের ভাড়া দিতে গেলে, সে কি করিবে?

বিজলী ত আর একটি পয়সাও উপুড়-হস্ত করিবে না। করিবেই বা কি করিয়া? তাহার কাজকর্ম্ম কিছুই নাই, সে এখন বেকার। যাহা জমাইয়াছে, তাহাই ভাঙিয়া এই পাঁচ মাস কাল বসিয়া-বসিয়া খাইতেছে, বাড়ী-ভাড়া চাকর-বামুন প্রভৃতি সব দিতেছে। তাহাকে ভূষণ বলিবেই বা কোন্ মুখে? আর বলিলেও সে শুনিবে না। বিজলীর শরীর যদি ভাল থাকিত অর্থাৎ পাগল না হইত, এবং অবস্থা স্বচ্ছল থাকিত, তাহা হইলেও বরং কথা ছিল! আহা, স্ত্রীলোকটা দোষে-গুণে নেহাৎ মন্দ ছিল না!

কিন্তু তাহার মাথা খারাপ হইতে আরম্ভ হইয়াই যত মুস্কিল বাধিয়াছে। পূর্ণ উন্মাদ হইতে আর বেশী দেরীও নাই। তাহা হইলে ভূষণকেই ত এখান হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে। সরিয়া পড়া ত মুখের কথা নয়—সে-ও একটা মস্ত খরচের ব্যাপার! চিন্তার কথা!

ভূষণের একমাত্র ভরসা ছিল বিজলী। কিন্তু বিজলীর মনের ঐ অবস্থা, সংসারের আবার ততোধিক তুরবস্থা। এখনও ভূষণ তুইবেলা এইখানেই খায়, রাত্রে কেবল ও-বাড়ী গিয়া শোয় এবং সকালে তাহাদের হাটবাজার করিয়া দিয়া, এ-বাড়ী চলিয়া আসে। আগে সময় পাইলে দিনেও তুই একবার ফুক্‌ফাক্‌ করিয়া ও-বাড়ী যাইত। সম্প্রতি কয়েক দিন হইতে আর যায় না। মনের তুঃখেই যায় না: আর কাহার কাছেই বা যাইবে?

ভূষণ কেবল ভাবে, অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া সে এ কি কুকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে! এ ত আর ফিরানো যায় না। ইহা অপেক্ষা ইহারা চৈতনপুরে ছিল, বেশ ছিল। কলিকাতাও দেখিত না, এত হিতৈষী বন্ধুও জুটিত না। মাঝে মাঝে বাড়ী গিয়া, ভূষণ দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আসিত—ভূষণের ষোল-আনা ইজ্জৎ বজায় থাকিত! বিবাহও হইত অনায়াসে। বিবাহ করিয়া কলিকাতায় আনিলেই ভাল করিত। কিন্তু এখন আর সে গতানুশোচনা করিয়া লাভ কি? এখন কি কর্ত্তব্য? কে তাহাকে সদুপদেশ দেয়?

বিজলী আর সে-বিজলী নাই। ভূষণের তুঃখ হইল: তাহার কপাল গুণে, ঠিক এই সময়েই কি পাগল হইতে হয়? বেশ ত, হও না! যত পার পাগল হও—পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াও, ধূলা-কাদা মাখ, আবোল-

তাবোল বক, রাস্তার ভাত কুড়াইয়া খাও, সব কর'—কোনও আপত্তি নাই! কিন্তু এখনি না হইয়া, আর দুই চারি মাস পরে হইলে ত মহাভারত অশুদ্ধ হইত না! কি অন্যায়! ভূষণ বুঝিল—তাহার সময় খারাপ পড়িয়াছে: পড়তা উল্টাইয়া গিয়াছে।

সময় মন্দ পড়িয়াছে বলিয়াই ত বিজলীর উপদেশ এখন বেশী করিয়া দরকার! বিশেষত এই সব প্রেমের ব্যাপারে ভূষণ একেবারেই আনাড়ী। ভূষণ জানে, বিনা-দায়িত্বে এবং বিনা-খরচেই প্রেম জমে ভাল। প্রেমের জন্য অর্থব্যয়টা নেহাৎ বোকামি। ভূষণের কাছে প্রেমের চেয়ে হেমের মূল্য ঢের বেশী। কিন্তু দুষ্ট গ্রহের প্রকোপে অর্থব্যয় করিয়া ভূষণের ফতুর হইবার উপক্রম ঘটিল, তবু এই ছয় মাসের মধ্যে প্রেমের এক ক্রান্তিও তাহার মিলিল না! এ-কি কম পরিতাপের বিষয়?

ভূষণ খতাইয়া দেখিল, এ বেসাতীতে ষোল আনাই সে ঠকিয়াছে। নিস্তারিণী চাহিয়াছিল কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব, সে তাহা পাইয়াছে। টেঁপী চাহিয়াছিল কলিকাতায় পসার-প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা, সে-ও তাহা পাইয়াছে ষোল-আনার উপর বত্রিশ-আনা। ক্ষেন্তি বুঁচিও যেমন তৈরি হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, অদূর-ভবিষ্যতে ইহারা দিদির উপরেও হয়ত টেক্কা মারিয়া যাইবে! ভূষণের অর্থে চেষ্টায় এবং সাহায্যে ইহাদের যে যাহা চাহিয়াছিল, সে তাহাই পাইয়াছে—কিন্তু এই পরোপকারের বিনিময়ে সে কি পাইল?

শুধু ব্যর্থতা আর বেদনা। ব্যর্থতায় সান্ত্বনা আছে—চেষ্টা করিলাম, সফল হইলাম না, কি করা যায়? কিন্তু অশ্রদ্ধা ও অবহেলার বেদনা অসহ্য।

ভূষণের গালে-মুখে চড়াইতে মনে হয় : এ সে কি করিতেছে ? এরূপ স্বার্থশূন্য পরোপকার—সম্পূর্ণ বোকামি ! ভূষণের জীবনে এই প্রথম !

এক সপ্তাহ আগেকার একটি ঘটনা মনে পড়িল : নিস্তারিণীকে তাহার রক্তাক্ত মনের সামান্য একটু পরিচয় দিবার জন্য বাগাড়ম্বরে পল্লবিত করিয়া, হতাশ প্রণয়ীর যৎকিঞ্চিৎ অভিমান নিবেদনছলে, সে সভয়ে প্রস্তাব করিয়াছিল—টেঁপী যখন রীতিমত রোজগার করিতেছে, তখন এখন হইতে সংসারের ভার তাহাদেরই লওয়া উচিত। সে টেঁপীকে বিবাহ করিবে বলিয়াই তাহাদিগকে এখানে আনিয়াছিল এবং এতদিন তাহাদের ভরণপোষণও করিল। কিন্তু বিবাহের কোন কথাই তাহারা যখন বলে না, তখন হয়ত তাহাদের সেরূপ মত আর নাই। কাজেই বিবাহ যদি না হয়, কেন সে মিছামিছি এই ভূতের বেগার খাটিবে? সেও গরীব লোক : সে তাহার যথাসাধ্য করিয়াছে—কিন্তু কি প্রতিদান পাইয়াছে ? সে বিনাবেতনে টেঁপীদিগকে পড়ার ইস্কুলে ও গানের ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে—রেডিওতে পরিচয় করাইয়া দিয়াছে—কলের গানের কোম্পানীতেও সে-ই টেঁপীকে ঢুকাইয়া দিয়াছে। শেষোক্ত দুই জায়গা হইতে টেঁপীর এখন বেশ মোটা মাসিক একটা আয় দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছাড়া, সভা-সমিতি-জলশাতেও টাকা লইয়া টেঁপী আর ক্ষেন্তি গান গায় এবং খুঁচি নাচে। ইহার আয়ও বড় কম নয়।

টেঁপীর এখন বহু হিতৈষী জুটিয়াছে এবং রোজই দুই-এক জন করিয়া নূতন সভ্য ভক্তের খাতায় নাম লিখাইতেছে। এ অবস্থায়, নিজের টাকা ভাঙিয়া যদি নিস্তারিণী না-ও খায়, এই সব ভক্তকে বলিলেই ত অনায়াসে তাহার রাজার হালে চলিয়া যাইতে পারে! ভক্তগণ

নিজেদের মধ্যে চাঁদা করিয়াও—কেহ ফ্ল্যাট-ভাড়া, কেহ খাই-খরচ, কেহ কাপড়চোপড়, কেহ জিনিষপত্রাদি দিতে পারে! এতদ্বারা উহাদের কাহারও গায়ে লাগিবে না, অথচ নির্ব্বিবাদে ইহাদের কাজও চলিয়া যাইবে! তাহাকে আর কেন? তাহাকে নিস্কৃতি দেওয়া হউক্।

প্রেমিকাকে অভিমান নিবেদন করাই সনাতন প্রথা। এ ক্ষেত্রে ভূষণ তাহার ব্যতিক্রম করিতে বাধ্য হইল। কেননা, আজকাল প্রেমিকার দর্শন পাওয়াই শক্ত: সারাদিনই সে ইহার-উহার সঙ্গে সভা-সমিতি-জলশায় ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন কোন দিন সন্ধ্যায়, নতুবা সাধারণত গভীর রাত্রে সে বাড়ী ফিরে! তখন আর ভূষণের তাহার নিকট যাইতে সাহস হয় না—আবার সাহস হইলেও, সুযোগ হয় না। টেঁপী যতক্ষণ না নিদ্রিত হইয়া পড়ে, ততক্ষণ কেহ না কেহ তাহার কাছে থাকেই। টেঁপী পরিশ্রান্ত হইয়া বাড়ী আসে—ভক্তগণের কেহ মাথায় হাত বুলায়, কেহ হাত-পা টিপে, কেহ মুখ মুছায়, কেহ জুতা খুলে, কেহ শাড়ী-ব্লাউজ ঝাড়িয়া পাট করে, কেহ খাবার আনে ও কেহ গল্প ফাঁদে। সে এক ভয়ানক কাণ্ড! ভূষণের সেখানে গিয়া কি তখন কাঁদুনি গাহিবার সাহস হয়? শুনিবে কে?

কিছুদিন আগেকার আর একটি ঘটনা মনে পড়িল। সেদিনের সে অপমান ভূষণ জীবনে ভুলিবে না। রাত্রি তখন প্রায় দশটা। টেঁপীর ঘরে জোর নাচ-গান চলিতেছিল। ভূষণ সেই সঙ্গীতসুধা পানে কৃতার্থ হইবার জন্য যেমন দুয়ার পর্য্যন্ত গিয়াছিল, অমনি চার-পাঁচ জন ছোক্‌রা "কে? কে?" বলিয়া, ষণ্ডের মত শৃঙ্গ আস্ফালন করিয়া, হুমকি দিতে দিতে, সবেগে বাহিরে আসিয়া, দুর্গদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া

দাঁড়াইল। অন্যদিক হইতে নিস্তারিণীও হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া, কর্কশ কণ্ঠে কহিল—"ওদিকে কোথা যেচিস্ ওরে ও ড্যাক্‌রা? বলি, চোখের মাথা একেবারে খেইচিস নেকি? আ মর্! ঘাটে-পড়ার আস্পর্দ্ধা ত বড় কম লয়! দেখ্‌চিস না, ভদ্দর নোকের ছেলেরা ওখানে রয়েচে?" বলিয়া এমন জোরে ভূষণকে এক ধাক্কা দিয়াছিল যে, মুখ থুব্‌ড়াইয়া পড়িতে পড়িতে সেদিন কোনও রকমে সে বাঁচিয়া গিয়াছিল।

ভূষণের প্রস্তাবের উত্তরে নিস্তারিণী সেদিন যাহা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা ভদ্রসমাজে প্রকাশযোগ্য নয় এবং যে-ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা কথ্য অর্থাৎ ইদানীন্তন চলতি হইলেও, লেখ্য নয়। নিস্তারিণী ভূষণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—বামনের চাঁদ ধরিতে যাওয়ার মত, টেঁপীকে ধরিতে যাওয়া তাহার নিছক বাতুলতা। নিস্তারিণী আরও জানাইয়াছিলেন যে, সামান্য ঐ কয়েকটি টাকা খরচ করিয়া, ভূষণ যদি মনে করে, নিস্তারিণী এবং তাঁহার কন্যাত্রয়ের মস্তক ক্রয় করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার টাকা তিনি চাহেন না: ভূষণের সে টাকায় এবং ভূষণের মুখেও নিস্তারিণী ঝাঁটা মারেন এবং আরও অনেক কিছুই করেন। টেঁপীরা দীর্ঘজীবিনী হউক্, তাহারা প্রত্যহই দশ-বিশ টাকা রোজগার করে। পূজারী বামুণের বেটা ঘুঁটেকে-খান্‌শামার মত লোককে তিনি তাঁহার চাকর রাখিতে পারেন, জামাতা করিতে পারেন না। তাঁহার জামাতা হইবার জন্য প্রত্যহ কত বড় বড় ঘরের সব ছেলে মটরে করিয়া আসে, দামী দামী জিনিষপত্র উপহার আনে—কার্ত্তিকের মত সব চেহারা। এক একটি দেবদূত! নিস্তারিণী মনে করিলে, ধুমধাম করিয়া যে-কোনও দিন কন্যার বিবাহ দিতে পারেন! কিন্তু

তাঁহার ইচ্ছা নয় যে, এখন মেয়ের বিবাহ হয়। এখন বিবাহ কি? টেঁপী ছেলেমানুষ! বিবাহের সে বোঝে কি? ভূষণের সাহায্য ছাড়াও তাঁহারা কলিকাতায় থাকিতে পারেন, কেননা এ শহর ভূষণের কেনা বা তাহার পৈত্রিক নয়। নফ্‌রা গাঙ্গুলীর ছেলে ঘুঁট্‌কে-খানশামার এই দুরাশায়, নিস্তারিণী দেবী অবাক্‌ হইয়াছিলেন!

ভূষণের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা লাভ হইল। ভূষণ নিস্তারিণীর প্রকৃত মনোভাব জানিতে পারিল। তবু, ভূষণ জাত-সাপ হইয়াও ঢোঁড়া সাজিয়া রহিল। আক্টোর ত! কেবল ছুঁচা গিলিয়াই এমন বিপন্ন হইয়াছে।

নিস্তারিণীর কথায়, ভূষণের টেঁপীকে বিবাহ করার কল্পনা, গরীবের কুঁড়ে ঘরের মত, ঝড়ে নিশ্চিহ্ন হইয়া উড়িয়া গেল। ভূষণ চক্ষে সরিষার ফুল দেখিল। এতদিনের আশায় এমন বজ্রাঘাত? সেইদিন হইতে ভূষণও ও-বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। উহাদের কথা ভুলিয়া যাইবে, উহাদের সহিত আর কোনও সম্বন্ধ রাখিবে না, উহারা মরুক্‌ বা বাঁচুক, জীবনে আর কোনও খোঁজ করিবে না—এই মর্ম্মে তৎপরদিবস প্রভাতেই ভূষণ এক কঠিন শপথ করিয়া ফেলিয়াছে! কিন্তু প্রতিজ্ঞার সে শক্ত বাঁধন সন্ধ্যা লাগিতে না লাগিতেই এমন আল্গা হইয়া উঠিল যে, ভূষণ আর তাহা রক্ষা করিতে পারিল না।

টেঁপীর ফ্ল্যাটের সম্মুখস্থ ফুটপাথে একটা গাছের তলায় অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া, ভূষণ দেখিতে লাগিল—নিস্তারিণী-কথিত কার্ত্তিকেয়গণের যাতায়াত। ইহাদের কাহাকেও সে চিনিতে পারিল না: ছোক্‌রা, যুবক, মধ্যবয়স্ক, প্রৌঢ় এমন কি দুই একজন বৃদ্ধকে পর্য্যন্ত ভূষণ ও-বাড়ীতে গতায়তি করিতে দেখিল।

ভূষণের দুঃখ হয়, রাগ হয়, মাথায় খুন চাপে। সে আর সেখানে দাঁড়াইতে পারে না, টলিতে টলিতে কোনও বন্ধুর মেসে বা বাড়ীতে গিয়া কোনও রকমে রাত্রিটা কাটাইয়া, সকালে যথারীতি বিজলীর গৃহে আসে। বিজলীকেও কিছু জানায় না : জানাইতে ভূষণের কেমন লজ্জা হয়।

পুণ্যাহ সংক্রান্তি-তিথির স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে ভূষণ তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল—কি করিল সে ? আর, এখন কি করা উচিত ! ভূষণ মনকে প্রবোধ দেয়—যে-মেয়ে, দিবারাত্রি পরপুরুষের সঙ্গে ঘুরে, তাহাকে বিবাহ করিলে অশান্তিই বাড়িবে। পথের জঞ্জাল কেন ঘরে ঠাঁই দিতে চায় ? কিন্তু মন বোঝে না, কোনও যুক্তিই শোনে না। মন চায়—টেঁপীকে একান্ত আপন করিয়া পাইতে! টেঁপীর জন্য ভূষণ যাহা করিয়াছে, তাহা ত করিয়াছেই—এখনো ডাকঘরে তাহার প্রায় পাঁচশত টাকা আছে—সেটা পর্য্যন্ত সে নিঃশেষে ব্যয় করিতেও প্রস্তুত ! ভূষণ টেঁপীর জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতেও রাজী ! কেবল টেঁপী রাজী হইলে হয়।

ভূষণ নিরাশ হইল না। ভাবিল, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। কয়দিন ও-বাড়ী না গেলেই তাহারা বুঝিবে এবং নিশ্চয় তাহারা খোঁজ করিবে। প্রত্যহ যাইতেছে কি না, তাই তাহার আদর নাই ! শ্বশুরবাড়ীতে ঘন ঘন যাতায়ত করিলে কোনও জামাইয়েরই মর্য্যাদা থাকে না ! ভূষণ টেঁপীদের আমন্ত্রণের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

সাত দিন কাটিয়া গেল, তাহারা কোন সংবাদই লইল না ত! কি রকম ? ঠিকানা ভুলিয়া গেল নাকি ? না, বাড়ী খুঁজিয়া পাইতেছে না ? সাত দিনের মধ্যে একটা খোঁজখবরও যে করিবে না, এ অসম্ভব ! কাহারও অসুখ-বিসুখ হইল না ত ? আশ্চর্য্য নয়। টেঁপী যে রকম

পরিশ্রম করিতেছে, তাহাতে তাহার শরীর ভাঙিয়া পড়া, কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। কলিকাতার স্বাস্থ্য ত দিন দিন খারাপই হইতেছে, সকলে বলে।

ভূষণের মনের মেঘগুলি ক্রমশ কাটিতে লাগিল। টেঁপী যে তাহার রাগ ভাঙাইতে আসিবে, সে সময় তাহার কই ? সারাদিনই সে ত ব্যস্ত। ষ্টুডিওতে যখন দিন-রাত কাজ হয়, ভূষণ তখন ব্যস্ত থাকে না ?

টেঁপীর কত খ্যাতি—! ভূষণের কাছে সে কিন্তু সেই টেঁপীই! কলিকাতার লোকে তাহাকে জানে তপতী দেবী। তপতী নামটি কি সুন্দর ? টেঁপীকে ঐ নামে বেশ মানায় !

"সঙ্গীতভারতী"র শিক্ষকদের মুখে সেদিন টেঁপীর প্রশংসা শুনিয়া, ভূষণের বুক দশ-হাত ফুলিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা বলিলেন—তপতীর আধুনিক ও কীর্ত্তন এবং খনার খেয়াল ও ধ্রুপদের তুলনা হয় না। বীথির নাচেই প্রতিভা খুলিয়াছে। মাত্র ছয় মাসে, ইহারা এমন শক্তির পরিচয় দিয়াছে যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ একেবারে অবাক্। সেইজন্য ইহারা এই ভগিনী-তিনটিকে সর্ব্বত্র লইয়া যান্ এবং ইহাদিগকে নাচাইয়া ও গাওয়াইয়া তাঁহাদের বিদ্যালয়ের প্রচারকার্য্য করেন।

কিন্তু উক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা বিদ্যালয়ের কি পরিমাণ লাভ হইয়াছে, তাহা সঠিক জানা যায় নাই, তবে তদ্দারা তপতী দেবীর যুগপৎ যশ অর্থ ও ভক্ত সংখ্যা যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, সে সংবাদ আমরা অহরহই পাইতেছি।

ভক্তবৃন্দের অযাচিত অতিভক্তিতে তপতী দেখিতে পাইয়াছে—তাহার সম্মুখে স্থিরজ্বলন্মণিদীপালোকোজ্জল পারিজাতমন্দারফুল্লারবিন্দ গন্ধামোদিত নয়নাভিরাম চিরঅরুণোদয়ের দেশে, মায়াপুরীর শূন্য ময়ূরসিংহাসন, তাহাকে স্বাগত-অভিবাদন জানাইতেছে। নিজের

সুললিত কণ্ঠসঙ্গীতে সে শোনে—কল্পলোকবাসীদের নান্দীপাঠ এবং রাজ-বৈতালিকের সাদর অভিনন্দন। সতত সেবা-উন্মুখ ভক্তগণের আত্মনিবেদনে তপতী আত্মবিস্মৃত হয়ঃ চরম পুলকরোমাঞ্চে একটি কদম্বের মত শিহরণে সঙ্কুচিত হইয়া, কাদম্বযমুনাতীরের নক্ষত্রখচিত ঝরা-বকুলের মাঝে সে হঠাৎ গিয়া, ঠিকরাইয়া পড়ে।

তপতীর সামান্য একটি ইচ্ছাপূরণ করিতে চক্ষের নিমেষে দশ জন প্রিয়দর্শন তরুণ দেবদূত মৃত্যুপণ করিয়া আগুয়ান হয়। দর্পণে তপতী নিজের মুখ দেখে, মৃদু মৃদু হাসে, আর রক্তবিম্বাধরটিকে মুক্তাদন্তে দংশন করেঃ তাহার প্রশস্ত গৌরপৃষ্ঠে ক্রমক্ষীণশেষ আলুলায়িত বেণীবন্ধ বংশীমুগ্ধ বেপথুমতী নাগিনীর ন্যায় আপনাআপনি দুলিয়া উঠেঃ নীলায়ত নয়নযুগল পাতালপুরীর অজ্ঞেয় রহস্যের আবেশে বুঁজিয়া আসেঃ অনাগত সৌভাগ্য-ইন্দিরার আসন-ইন্দীবরগন্ধে তাহার মানসলোক আকুলিয়া উঠেঃ পরিপূর্ণ পরিমলে অন্তরের অরবিন্দদল শতদলে বিকশিত হয়ঃ দেহ ও মন কালীদহের বিষের নেশায় ঝিমাইয়া পড়ে!

তপতী ভুলিয়া যায় যে, সে চৈতনপুরের কেশব চক্রবর্ত্তীর কন্যা টেঁপী। সে যেন শঙ্খপুরের রাজকুমারী! তাহার জন্য দশটা রূপনগরের রাজকুমার, তেপান্তরের মাঠের মধ্যকার জগদ্দল পাথরখানা অবলীলায় ঠেলিয়া ফেলিয়া, অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে ঢুকিয়া, তলোয়ারের আলোয় পথ দেখিতে দেখিতে গিয়া, পাতালপুরাধিপতি নাগরাজের মৌলিমণিটি হরণ করিয়া আনে। টেঁপীর মাথা ঝিমঝিম করিয়া উঠে।

ভক্তগণের স্তবে আকণ্ঠ বিষ পান করিয়া, জ্ঞান হারাইয়া, নিমীলিত নেত্রে ও শিথিলদেহে—তাহাদের উত্তপ্ত বাহুবন্ধনে আস্তে আস্তে সে ঢলিয়া

পড়ে। টেঁপী আত্মময় হইয়া ভাবে—সে কেবল ভালবাসার প্রণামী কুড়াইতেই জন্মিয়াছে! যে দেখে, সেই তাহাকে ভালবাসে! সে রূপসী, তরুণী। সে বহ্নি: বহ্নিতে ঝাঁপ দেওয়াই পতঙ্গের কাজ।

কন্যার খ্যাতিতে, জনপ্রিয়তায় এবং সমাদরে নিস্তারিণীর চোখের দৃষ্টিও ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিয়াছে: সেবকগণের অপ্রার্থিত সেবায় সাহচর্য্যে, স্তবগানে এবং উপহারের বৈচিত্র্যে ও প্রাচুর্য্যে—তাঁহার মাথাও ঠাণ্ডা রাখা রীতিমত শক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ইহার মধ্যেই শহরটিকে ইহারা যেমন চিনিয়াছে, শহরও তেমনি ইহাদিগকে যাদু করিয়াছে। রক্তরঙীন্ আফিম্-ফুলী এই শহর! আফিম্-ফুলের জলে ও হাওয়ায় ইহাদের মনে নেশার আমেজ লাগিয়াছে। জীয়নকাঠির স্পর্শে টেঁপী এখানে তপতী হইয়া নবজীবনে জাগিয়াছে। নিস্তারিণীর মনের গরুর গাড়ী-খানি এখানে আসিয়া, জগন্নাথের রথ হইয়াছে। তাঁহার জড়তা কাটিয়াছে, সাহস হইয়াছে, বুদ্ধি খুলিয়াছে, কুসংস্কার ঘুচিয়াছে। শহরের ধূলায় নিস্তারিণী লক্ষ্মীর সন্ধান পাইয়াছেন।

চৈতন্‌পুরের টেঁপী আর নাই, সে মরিয়াছে: তাহার সমাধির উপর জন্মিয়াছে তপতী-লতা। আচারে-ব্যবহারে, বেশে-ভূষায়, ফ্যাশানে-ব্যসনে, ভাষায়-আশায় তপতী এখন উগ্রতমা অতি-আধুনিকা।

আধুনিক আস্‌বাবে সুসজ্জিত অসীমের ঘর দেখিয়া, একদিন যাহারা বিস্ময়ে বিস্ফারিতনেত্র হইয়াছিল, আজ তাহাদের গৃহসজ্জাও অসীমের সেই কক্ষ অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়। শাড়ী ব্লাউস্ শায়ায় ঠাসা আলমারি। গায়ে স্বর্ণালঙ্কার। নিস্তারিণীর হাত-বাক্‌স নোট ও টাকায় ভর্ত্তি। কাগজে কাগজে তপতীর জয় গান এবং ছবি!

কলির সত্যনারায়ণ কলিকাতাই! ইনি মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। তপতী দেবী বাচাল হইয়াছেন, গিরিটি এখনও সম্পূর্ণরূপে লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই; তবে যে রকম দুশ্চর তপস্যা করিতেছেন, তাহাতে আশা হয়, শীঘ্রই ইহাও করিবেন।

তপতী দেবী এখন স্ত্রী-স্বাধীনতা, নারীপ্রগতি প্রভৃতি অনেক বড় বড় কথা শিখিয়াছে। সে এখন স্বাধীন। তাহার মা-ও কন্যার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে ভয় পায়। রত্নগর্ভা নিস্তারিণীর এই কন্যাই শতপুত্রের কাজ করিতেছে। টেঁপী কোনও খারাপ কাজ করিতেছে না, সে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। ঘরে বসিয়া কি তাহা সম্ভব? ছিল ত সকলেই এতদিন ঘরে বসিয়া! কখনও তাহাদের দুইবেলা পেট ভরিয়া ভাত বা একখানা কাপড়ও ত জুটে নাই!! ছেলেরা বিদেশে গিয়া চাকরী করে না? টেঁপীও তাঁহার ছেলে, কলিকাতায় টাকা উপায় করিতেছে! ছেলের বেলায় কোনও দোষ হয় না, দোষ কেবল মেয়ের? বেশ ত, যে দোষ দেয়, সে তাহাদিগকে এমনি সচ্ছল অবস্থায় রাখুক, তাহারা বাড়ীর বাহির হইবে না। দিবার সময় কেহই নাই, অথচ কথা বলিবার বেলায় সবাই? নিস্তারিণী এ সব গ্রাহ্য করে না!

কেন? সে এতদিন এই সব শুষ্ক শূন্যগর্ভ হুম্‌কি বহু শুনিয়াছে। শুনিয়া তাহার কি লাভ হইয়াছে? হুম্‌কি-দাতারা কি তাহাদিগকে কখনও একটা পয়সা দিয়াও উপকার করিয়াছে? তাহাদের ভাত ছিল না, কাপড় ছিল না, তাহারা পশুর মত কুঁড়ে ঘরে পড়িয়া ধুঁকিতেছিল—কেহ কি কখনও একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়াছে? বরং তাহারা পদে পদে অপমানিত ও অপদস্থই হইয়াছে! তাহাদের পয়সা ছিল না,

তাই তাহার এমন সুন্দরী কন্যার রূপও ছিল না! তাহারা গরীব—তাই তাহাদের নামে কলঙ্ক রটাইতেও কেহ কসুর করে নাই। সমাজ? গরীবের আবার সমাজ! ধর্ম্ম? গরীবের সমাজও নাই, ধর্ম্মও নাই! ও-সব বড় লোকদের! পেটে না খাইয়া, পরণে না পরিয়া, শূকরের মত বাঁচিয়া—সমাজ ও ধর্ম্ম লইয়া কি সে ধুইয়া খাইবে? ধর্ম্ম, সমাজ আর সমাজপতির সেবা এতকাল সে খুব করিয়াছে! আর সে ধাপ্পায় সে পড়িতে চাহে না। তাহারা কোনও অন্যায় কাজ করিতেছে না।

দোষ যদি কিছু হয়, হউক্—টাকার জোরে তাহা কাটিয়া যাইবে। টাকায় কি না হয়? সব হয়! সমাজ, ধর্ম্ম, ন্যায়—টাকায় কেনা যায়, বেচা যায়। ধনীর কাছে সবাই জোড়হস্ত। নিস্তারিণী ধনী হইবেন।

ভূষণ নিস্তারিণীকে বলিয়াছিল—"জানা নাই শোনা নাই, টেঁপীকে সবারি সঙ্গে যে ছেড়ে দিচ, একি ভাল করচ মাসীমা?"

শুক্‌না খড়ের গাদায় আগুনের মত নিস্তারিণী দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া, তাহার উত্তর দিয়াছিলেন—"দ্যাখ্ ঘুঁট্‌কে, তোর যত বড় মুখ লয়, তত বড় কথা! মর্‌চিস্ বুঝি হিংসেয় ফেটে, আমাদের দুটো জিনিষ আর দুটো পয়সা হচে বলে? পাঁচজন ভদ্দরনোকের ছেলে আসা যাওয়া কর্‌চে দেখে, বুক চড়চড় করচে বুঝি তোর?"

ভূষণ প্রতিবাদ করিবে কি? ভস্মীভূত খড়ের গাদার স্তূপীকৃত ছাই উড়িয়া, ভূষণকে তদ্দণ্ডেই আপাদমস্তক কালি মাখাইয়া দিয়াছিল! নিস্তারিণী আরও বলিয়াছিলেন—এই যে ছেলেগুলি আসে, কি সুন্দর চেহারা, কি মিষ্ট কথা, কি অমায়িক ব্যবহার, কি সৌজন্য, কি দরদ—তাহা নফরা গাঙ্গুলীর বেটা ঘুঁট্‌কে-খান্‌শামা কি বুঝিবে? নিস্তারিণীর

নিকট স্পষ্ট কথা এবং ন্যায্য বিচার! ইহাদের সঙ্গে কি তাহার তুলনা? মুড়ি-মিছরির এক দর? ইহাদের হিংসা যদি করে, তবে সে যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়!

ভূষণ থাকিতে পারে নাই, বলিয়াছিল—"বেশ, দেখ' পরে—এই মিছরিই হবে তোমাদের মিছরির ছুরি।"

নিস্তারিণী জবাব দিয়াছিলেন—"সে-ও ভাল। পোড়ামুড়ির মুড়ো কুঁচি থেকে, মিছরির ছুরি ঢের ভাল।"

ভূষণ সত্যই বড় দাগা পাইল! তাহাকে এত হতশ্রদ্ধা? ভূষণ সব দেখে, সব বুঝে, কিন্তু কিছু বলে না, কারণ বলিতে সাহস হয় না।

প্রথম কয়েকদিন, অর্থাৎ প্রায় মাসখানেক বড় জোর, ইহারা তবু দুই চারিটা কথা বলিত, মনে মনে না হউক, মুখেও আত্মীয়তা দেখাইত। ক্রমশ তাহাও বন্ধ হইল। বাহিরের লোক যত ভিতরে আসিতে আরম্ভ করিল, ভূষণও ততই দূরে ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল।

এক সপ্তাহই সে কেবল ও-বাড়ীতে যায় নাই; কিন্তু ইহার আগে ত প্রত্যহই গিয়াছে! গিয়া সে কি করিত? সে যেন বাড়ীতে পাহারা দেওয়ার জন্য একজন দারোয়ান! তাহার কোনও খোঁজও কেহ করিত না। দেখা হইলে, মুখের একটা কথা বলিয়াও তাহাকে কেহ ইদানীং আর সৌজন্য দেখাইত না। সে কখন আসিল, আসিল কি না, কেহ লক্ষ্য পর্য্যন্ত করিত না। তবু ভূষণ যাইত: চুপে চুপে বারান্দার ছোট ঘরটায় গিয়া ঢুকিত। রাত্রি প্রভাত হইলে উঠিয়া, বাজার যাইত, বাজার নামাইয়া দিয়া, বাহির হইয়া চলিয়া যাইত। সে যেন বোবা, কিম্বা ইহারাই বাড়ীসুদ্ধ সকলে বোবা!

প্রতি রাত্রিতেই টেঁপীর ঘরে লাল ও সবুজ দুইটি বিদ্যুৎবাতি জ্বলিয়া জ্যোৎস্না রচনা করে। ভূষণ তাহার ঘরে বসিয়া দেখে আর শোনে—দেবদূতগণের মুহুর্মুহু হাস্য-কোলাহল, তপতীর কণ্ঠে সুমধুর সঙ্গীতলহরী, এবং তপতীর ও খনার নৃত্যছন্দের ঘুমুর-নিক্বণ। প্রায় প্রত্যহই ভূষণ দেখিত, তপতী ও খনাদেবীকে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অবৈতনিক সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষাদানে, সঙ্গীতবিদ্যার উৎসাহী বিদ্যাসাগর-গণের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও শ্রম।

ভূষণের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইত, মশার কামড়ে সে অস্থির হইয়া উঠিত; ঘুমাইতে পারিত না। কিন্তু এ-বাড়ীতে ত মশারি আছে, তবুও তাহার ঘুম আসে না কেন? যে-ঘুমের জন্য ভূষণ বিজলীর নিকট হাজার লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে, সে ঘুম তাহার কোথায় গেল?

ভূষণ আপন মনে কেবল তোলপাড় করে: মাত্র এক সপ্তাহ সে যায় নাই, অথচ যাইবার প্রচণ্ড ইচ্ছা। কিন্তু যায় কি বলিয়া! দুর্ম্মতিবশে যাওয়া-আসা বন্ধ করিয়া, কি অন্যায়ই না সে করিয়াছে! ইহাকেই বলে, বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। রাগ চণ্ডাল—রাগিয়াই ত সে পায়ের দড়ি এমন গলায় তুলিয়াছে! বিজলী যদি একটা বরাত করিয়া ভূষণকে ও-বাড়ীতে একবার পাঠায় ত সে, অত্যন্ত খুসী হয়। অভিমান? ধেৎ! কিসের অভিমান? উহাদের উপর কি রাগ অভিমান চলে? উহারা জানেই বা কি, আর বোঝেই বা কি? অনেক দিন সে টেঁপীকে দেখে নাই—টেঁপীকে দেখিতে অত্যন্ত ইচ্ছা! করুকগে অবহেলা আর অশ্রদ্ধা! একবার টেঁপীকে না দেখিয়া ভূষণ কিছুতেই আর শান্ত হইতে পারে না।

উহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ তাই ভূষণকে চিনিতে পারে নাই, কিন্তু

সে ত বোকা নয়। সে ছাড়িবে কেন? এত টাকা খরচ করিয়া তিলে তিলে যে ইমারৎটি সে এতদিনে গড়িয়া তুলিল, আজ অন্যের হাতে স্বত্বত্যাগ করিয়া সেটি ছাড়িয়া দিয়া, সে অমনি অন্যত্র চলিয়া যাইবে? একি একটা কথা নাকি? ভূষণ কেন ছাড়িবে? শেষ পর্য্যন্ত সে দেখিবে। যদি ঝগড়া মারামারি, এমন কি পুলিশ-কেসও হয়—তাহাতেও সে পশ্চাৎপদ নয়। সে টেঁপীকে কখনও ছাড়িয়া দিবে না।

ঐ সব লোফারদের হাত হইতে টেঁপীকে সে উদ্ধার করিবেই। তাহার ইচ্ছা হয়, উহাদিগকে জুতাইয়া বিদায় করিয়া দিয়া, ভূষণ গিয়া ঐ স্নিগ্ধ আলোকের তলে টেঁপীকে একান্ত আপন অধিকারে লইয়া, বসে। তাহার হাত নিশ-পিশ করে—উহাদিগকে খুন করিয়া উহাদের তপ্ত রক্তে হাত ধুইয়া দেবীর চরণে প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে। উহাদের আড়ালে পড়িয়াই সে এমন অন্ধকারে হারাইয়া গিয়াছে! উহাদের আওতাতেই সে আজ বাড়িতে পারিতেছে না!

দিনের আলো নিবু-নিবু। দুশ্চিন্তার ভারে ভূষণের মাথা টন্ টন্ করিতেছিল। নির্ব্বুদ্ধিতায় তাহার নিজের উপরেই রাগ হইতে লাগিল।

নিঃশব্দপদসঞ্চারে বিজলী আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইতেই, ভূষণ অপ্রভিত ভাবে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ চার-পাঁচ মাসের মধ্যে বিজলী ভূষণের ঘরে আসা দূরে থাকুক, তাহার সহিত ভাল করিয়া কথাই বলে নাই। ভূষণ বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া বিজলীর মুখের পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—বোধ হয়, এতদিনে বিজলী সম্পূর্ণ উন্মাদ হইয়াছে! তাহার ভয় হইল, কামড়াইয়া না দেয়!

স্নেহসুমধুর কণ্ঠে বিজলী অনুরোধ করিল—"আমার একটা কাজ কর্‌তে পার্‌বে ভাই, ভূষণ?"

এ ত পাগলের কণ্ঠ নয়! ভূষণ আশ্বস্ত হইল। ব্যগ্রভাবে কহিল—"ক্যানে পার্‌ব না, দিদিমণি? বলুন্—আজ্ঞে করুন্—"

বিজলী কহিল—"যতীনবাবুকে একবার খবর দিতে হবে ভাই—তাঁর সময় হলে, কাল পরশুর মধ্যেই আমার সঙ্গে যেন একবার নিশ্চয় দেখা করেন। বিশেষ দরকার আছে। কি করে খবরটা তাঁকে দেবে?"

ভূষণ কহিল—"এখুনি তাঁর বাড়ী গিয়ে।"

বিজলী ভাবিয়া কহিল—"তাহলে, এখন না গিয়ে বরং কাল খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে যেয়ো। কি জানি এখন যদি তাঁকে না পাও বাড়ীতে?"

ভূষণ কহিল—"সেই ভাল। কাল আমাদের লাইট্ শূটিন্—"

বিজলী বাহিরের দিকে চাহিয়া উদাস ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"সারাদিন তুমি আজকাল ভাব' কি ভূষণ? তোমার মনে আগের মতন আর স্ফূর্ত্তি নেই: কি হয়েচে তোমার?"

ভূষণ গলিয়া জল হইয়া গেল। কি যে তাহার হইয়াছে, এক কথায় তাহা সে কি করিয়া বুঝায়? স্নেহের স্পর্শে ভূষণ কাঁদিয়া ফেলিল। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল—"আমার সর্ব্বনাশ হয়েচে দিদিমণি—"

বিস্মিতভাবে বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"সে কি? কি হয়েচে?"

তাহার বহুদিনের সঞ্চিত দুঃখকাহিনীর একজন দরদী শ্রোতা পাইয়া, ভূষণের অশ্রুস্রোত দ্বিগুণ বেগে বহিতে লাগিল। অনন্ত দুঃখ কি করিয়া তাহাকে বুঝাইবে, হঠাৎ ঠিক করিতে না পারিয়া, কি বলিয়া আরম্ভ করিবে, ভূষণ তাহাই ভাবিতে লাগিল।

বিজলী উত্তরের প্রতীক্ষায় ভূষণের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

ভূষণ ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কহিল—"টেঁপী বুঝি আমার হাত ছাড়া হয়ে গেল, দিদিমণি—"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"কেন? কি করেচে সে?"

ভূষণ আদ্যোপান্ত সব বলিয়া, কহিল—"টাকাকড়ি জিনিষপত্তর এমন কি দু'একখানা গয়না পর্য্যন্ত দিয়ে ঐ ছোক্‌রারা টেঁপীকে আর তার মাকে এমন বশ করেচে যে, আমাকে তারা সেদিন অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েচে। আমি তাই এক হপ্তা হল, ও-বাড়ী আর যাই নাই।"

বিজলী সব শুনিল, কিছু বলিল না। ভূষণ তেমনি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"তাহ'লে আমি এখন কি করি, দিদিমণি? টেঁপীকে বিয়ে না কর্‌তে পেলে, আমি বাঁচ্‌ব না। ছিনেমা-টিনেমা আমার আর কিছুই ভাল নাগ্‌চে না, দিদিমণি। মাইরি বল্‌চি, দিদিমণি, টেঁপীকে না পেলে আমি কিন্তু আত্মঘাতী হব—"

ভূষণের ভাবস্রোতে বাধা পড়িল। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—কয়েকজন অতিথি আসিয়াছে।

"এই ভর্‌ সন্ধ্যাবেলায় আবার কে এল? এস ত, ভূষণ, দেখি—" বলিয়া ভূষণকে লইয়া, বিজলী আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নীচে আসিয়া ভূষণ ও বিজলীর বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। বিজলী নিজের দৃষ্টিকে সহসা বিশ্বাসই করিতে পারিল না! ভূষণের ত মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম ঘটিল! টেঁপী ক্ষেন্তি ও বুঁচির সহিত স্বয়ং নিস্তারিণী দেবী উপস্থিত। একটা চেয়ারে বসিয়া নিস্তারিণী হাঁপাইতেছিলেন : ভগিনীত্রয় এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া ফিরিয়া আসবাবপত্রাদি পরীক্ষা ও নিজেদের অনুরূপ পদার্থগুলির সহিত তুলনা করিয়া, বিজলীর জিনিষগুলি যে নিতান্ত খেলো—ইহা প্রতিপন্ন করিতে নিজেদের মধ্যে তুমুল তর্ক-কোলাহল জুড়িয়া দিয়াছে।

বিজলী সকলকে সমাদরে আপ্যায়িত করিয়া, কহিল—"ওমা, কি ভাগ্যি আমার। মাসিমার পায়ের ধূলো আমার বাড়ীতে! তারপর? তোমরা কেমন আছ, ভাই?" বলিয়া একে একে ভগিনীত্রয়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া কুশল প্রশ্ন এবং সম্বর্দ্ধনা করিল।

টেঁপী প্রশ্ন করিল—"আচ্ছা দিদিমণি, এ আলমারিটার দাম কত?"

বিজলী সহাস্যে কহিল—"তা কি মনে আছে, ভাই?"

টেঁপী কহিল—"আমার একটা এয়েচে, সেটার দাম একশো-কুড়ি টাকা! কি পালিশ তার! তার দু'পাট দুয়োরেই দু'খানা আয়না।"

বিজলী কহিল—"বটে? সে তাহ'লে এর চেয়ে ঢের ভাল জিনিষ—"

ক্ষেন্তি কহিল—"আপনার ও পালঙ্কটা এইবার বদলান্, দিদিমণি।

এটা দেখতে ভারী বিচ্ছিরি হয়েচে। সমরবাবু দিদিকে যে পালঙ্কটা এনে দিয়েচে, তার দাম দু'শো টাকা!"

বুঁচি আর থাকিতে পারিল না। কহিল—"দুশো টাকা না, ঢেঁকি। দেড়শো হবে! বিনুদা মাকে যে-খানা দিয়েচে, সেখানার দাম কত? সেখানার দাম যদি আশী টাকা হয়, তাহ'লে দিদিরটা দু'শো হবে কি হিসেবে? ওটার চেয়ে কি এমন ভাল?"

বুঁচি এ সব জিনিষের কি জানে? টেঁপী সমরের সহিত দোকানে গিয়া নিজে পছন্দ করিয়া কিনিয়াছে। সে জানে না আসল দাম?

টেঁপী বুঁচিকে ধমক দিয়া নিরস্ত করিল।

টেঁপী উপদেশ দিল—"আপনার পাখাখানা বড্ড নোংরা হয়েচে, দিদিমণি। পুরাণোও হয়েচে, বদ্‌লে ফেলুন্। বাতিগুনোয় একটা করে ছেড্ দিয়ে নেবেন, দেখ্‌তে খুব ডিছেণ্ট হবে।"

ক্ষেন্তি কহিল—"এ ছোপাগুনোতে আর পদাত্ত নাই: নড়বড় কর্‌চে। বসবার ঘরে ভাল জিনিষ রাখতে হয়। আমাদের সব ছোপা লতুন কিনা—কি সোন্দর মানাচে! ঠিক যেন সায়েবদের ঘর!"

বুঁচি কহিল—"আপনার মোটে এই দু'খানা চেয়ার, দিদিমণি? আমাদের চেয়ার হয়েচে, প্রায় চার—পাঁচ—"

ক্ষেন্তি বাধা দিয়া কহিল—"ধেৎ—পাঁচখানা কোথা? ছ খানা। সে-গুনো খুব দামী, সায়েব-বাড়ীর তৈরী।"

টেঁপী প্রার্থনা করিল—"আপনার কাপড়ের আলমারিটা একবার খুলুন্ না, দিদিমণি, দেখি, আপনার কি আছে, আমার কি নাই?"

যতদূর সম্ভব, মুখে প্রফুল্লতা দেখাইয়া হাঁ-হু--ও-বটে প্রভৃতি বাক্যের

সদ্ব্যবহার করিয়া এবং ঘাড় মাথা ও চোখ নাড়িয়া, বহু কষ্টে বিজলী এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়া ছিল, এইবার বিপন্ন হইয়া পড়িল। এই চিত্তবিনোদিনী আলোচনাটা বন্ধ করিবার জন্য করুণভাবে কহিল—"কাপড়-চোপড় আমার তেমন কিছুই নেই, ভাই—কি দেখাব ?"

বুঁচি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সেকি ? ভাল কাপড় নাই ত' বাইরে, ভদ্রসমাজে বেরোন্ কি করে ?"

বিজলী করুণ ভাবে কহিল—"বাইরেই বেরুই না, তা কাপড় কি হবে ?"

ক্ষেন্তি জানাইল, তাহার দিদির দেশী, ঢাকাই, শান্তিপুরী, বেনারসী, পার্শী, বোম্বাই, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, নেপালী, ছোটনাগপুরী প্রভৃতি প্রায় ত্রিশখানা শাড়ী, সাতাশটা ব্লাউজ্ আর একচল্লিশটা শায়া জমিয়াছে। ইহা ছাড়া, আটপৌরে শাড়ীও হইয়াছে প্রায় খান বাইশ। ক্ষেন্তি ও বুঁচির অবশ্য অত নাই, তবে আট দশটা করিয়া তোলা কাপড়-ব্লাউজ, তাহাদের অনেক দিনই হইয়াছে।

সিড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিয়া, নিস্তারিণী হাঁফাইয়া উঠিয়াছিলেন। জিরাইয়া, এতক্ষণে একটু সুস্থ হইয়া, কহিলেন—"আরে, আরম্ভ করলি কি তোরা ? মেয়েকে তোরাই যদি অমন আটকে রাখিস্, কাজের কথা তাহ'লে, আমি বলি কি করে ?" নিস্তারিণী কন্যাদের সৌভাগ্য বর্ণনা উপভোগ করিতেছিলেন।

তপ্ত কড়াই হইতে নিস্তার পাইয়া, বিজলী এবার জ্বলন্ত আগুনে পড়িবার আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মৌখিক সৌজন্য রক্ষা করিয়া কহিল—"ছেলেমানুষ—ওরা ছেলেমি করবে না ত কি আমরা করব, মাসীমা ? ওদের আনন্দ করবার ত এই বয়েস।"

নিস্তারিণী মুখে তামাক-পোড়া গুঁজিয়া, পুলকিত হইয়া সহাস্যে কহিলেন—"তা যা বল্‌চ, মা! তুমি ওদিকে ভালবাস, তাই বল্‌চ। তবে কি জান মা, মেয়েরা আমার বড্ড ভাল। মনে ওদের এতটুকু খল-কপট নাই: ন্যাকাপড়া আর নাচগান নিয়েই সারাদিন থাকে। তপতী ঐ টুকু মেয়ে ত? কম খাটুনীটা খাটে দিনে? সকাল আটটায় বেরোয়, আর রাত দুপুরে বাড়ী ফেরে! তাই কি বাড়ী ফিরে একটু আরাম কর্‌তে পায়? ছেলেরা থাকে। আর কতক্ষণই বা সে বাড়ীতে থাকে? থাক্‌বার জো কি? ভোর হতে না হতেই আবার ডাক। হা-তপতী জো-তপতী করে' শহর-সুদ্ধ নোক হেদোচে! বাছার আমার নাইবার খাবার পর্য্যন্ত সময় হয় না। টাকা পয়সা যা আনে, আমার কাছে ফেলে দিয়ে, নিশ্চিন্দি! একটা পয়সা বাজে খরচ করে না। ছেলেগুনো ওকে তাই বড্ড ভালবাসে। তপতীকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে, তবে তারা কত রেতে বাড়ী যায়। সমর মাথায় হাত না বুলুলে, তপতীর আমার ঘুমই আসে না!"

ইহাদের জীবনযাত্রার কতকটা আঁচ পাইয়া বিজলীর অন্তর করুণায় ভরিয়া উঠিল, কিন্তু তাহাদিগকে সদুপদেশ দিবার দুঃসাহস তাহার নাই। আর সে করিবেই বা কি? ইহারা কক্ষচ্যুত উল্কাপিণ্ডের মত মহাশূন্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে: আর ফিরিবার উপায় নাই। বিজলী কোনও উচ্চবাচ্য করিল না।

ভূষণ অনেকক্ষণ হইতে একপাশে চুপচাপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে কেহ লক্ষ্যও করিল না, কেহ তাহাকে একটি কথাও বলিল না!

নিস্তারিণী ভূষণের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন—"তোর কি আক্কেল

বল্ দিকিনি, ঘুঁটকে? সাত আট দিন ধরে' তোর টিকিটি পর্য্যন্ত দেখবার জো নাই! বলি, তোর হয়েচে কি?"

ভূষণের অভিমানের লবণ-গিরি গলিতে আরম্ভ করিল। কহিল—"ব্যাপার আর কি? কিছুই না। আর তোমাদের আমাকে কাজই বা কি এখন? আমার যা করবার ছিল—তা ত সবই করিচি! আর কি কর্‌তে হবে বল? প্রাণত্যেগ কর্‌ব?"

নিস্তারিণী দেবী কাহারও কথা সহিয়া থাকিবার লোক নহেন। তাঁহার জিভেও বিষ আছে, কিন্তু তিনি তাহা সংহরণ করিয়া কহিলেন—"শুন্‌লে মা বিজুলী? তিদ্দুষের কথার ছিরি দেখলে? ও নামুনে মর্‌চে আমাদের হিংসেয়! ঐ যে ভদ্দর নোকের ছেলেরা আসে-যায়, এটা-সেটা দেয়—আর যাবে কোথা? ওর বুকে অমনি ভাতের তেউলো চেপেচে! একি অন্যায় বল' দিকিন্ মা!"

বিজলী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই, ভূষণ তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল—"অন্যায় ষোলো-আনা আমারি—তোমাদের সব ভাল! তাই দু' তিন মাসের মধ্যে, "কেমন আছিস" বলেও, তোমরা কেউ আমাকে একটা কথা বল নাই! আমি যেন বাড়ীর দারোয়ান্, কি বাজার-সরকার—"

নিস্তারিণী বাধা দিয়া কহিলেন—"তোর সঙ্গে কি কথা কইব বল্? কোনো কথা থাকে ত মানুষ কথা কয়! আমি বাজে বক্‌তে লারি। এই কথা আছে বলে, বাড়ী বয়ে এদ্দূর এলাম। কি বল' মেয়ে?"

বিজলী সমর্থন করিল—"ঠিক ত! কথা না থাকলে কি কথা বলা যায়?"

ভূষণ স্প্রিংয়ের পুতুলের মত লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—"হাঁ তা ত

ঠিক। আমার সঙ্গে কোনো কথা নাই, যত কথা ঐ সব ছোকরাগুনোর সঙ্গে, রোজ রাত বারোটা-একটা পর্য্যন্ত!"

নিস্তারিণী অনেকক্ষণ ধৈর্য্যধারণ করিয়া আছেন, আর বোধ হয় সম্ভব হইবে না। কহিলেন—"শুন্‌লে মা, শুন্‌লে মুখ্যু গোঁয়ারটার কথা? দিন রাত যারা এত কর্‌চে, এত সব দিচে, এত ভালবাসে, তাদের সঙ্গে দুটো মিষ্টি কথা না বল্‌লে কি চলে? তারা পরের ছেলে, তাদিকে একটু যত্ন-আত্যি না কর্‌লে, তারা আসবে ক্যানে? তারা আসচে বলেই ত আমাদের রাজার হালে সংসার চলচে, আর এই সব সোনাদানা কাপড়-চোপড় এষ্টার জিনিষপত্তর হচে! বলে, দাতায় দান করে, বখীলের বুক ফাটে! নিজের ক্ষ্যামতা ত ঐ, অথচ অপরে কিছু দেবে—তাতেও হিংসে? বল দিকিনি মা বিজুলী, হতভাগা কি একোলষেঁড়ে, কি হিংসুটে! তোর ভরসায় থাক্‌লে, আমাদের কি হবে, বল্? তোর ক্ষ্যামতা কি? কর্ না কি করবি? দে না একগাছা জড়োয়া নেক্‌লেচ—কেমন বাপের বেটা, দেখি—"

টেঁপী জননীকে চোখ-ইশারায় সাবধান করিয়া দেওয়াতেই, নিস্তারিণীর মুখের আগুনটা ভাল করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে পারিল না।

অপ্রিয় ব্যাপারটা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বিজলী কহিল—"তুমি ঘরের ছেলে, ভূষণ, তোমার কি এঁদের উপর রাগ করা উচিত? কাল একবার যেয়ো, মাসীমা কি বলেন শুনে এসো।"

নিস্তারিণী পুলকিত হইয়া কহিলেন—"এই হ'ল ভদ্দর নোকের কথা শোন্—শুন্‌লি? এমন ভাল নোকের কাছে থাকিস্, আর ভদ্দর নোকের সঙ্গে ব্যাভার করতে জানিস্ না? পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু কিনা?"

বিজলী ভূষণকেও চুপ করিতে ইঙ্গিত করিল। ভূষণ অগত্যা নীরব হইল। তাহার ইচ্ছা ছিল, নিজের দুর্গমধ্যে যখন ইহাদিগকে একবার পাইয়াছে, তখন সে আশা মিটাইয়া গায়ের ঝাল ঝাড়িয়া লয়। কিন্তু তাহা হইল না, বিজলী বাদ সাধিল। বিজলীর উপর ভূষণ অপ্রসন্ন হইল।

বিজলী ত্রয়ীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তারপর ? বল' ভাই, কল্‌কাতা কেমন লাগ্‌চে তোমাদের !"

টেঁপী সলজ্জভাবে কহিল—"আমার খুবই ভাল নাগ্‌চে—বিউটিফুল্।"

বুঁচি বলিয়া উঠিল—"আমার কিন্তু একটুও ভাল নাগ্‌চে না।"

বিজলী সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল—"দিদির ভাল লাগ্‌চে, আর তোমার ভাল লাগ্‌চে না কেন ভাই, বীথি দেবী ?"

বেশী কথা না বলিতে টেঁপী দুই একবার বুঁচিকে ইশারা করিল, কিন্তু সেদিকে সে দৃক্‌পাতও করিল না। কহিল—"দিদির ভাল নাগ্‌বে না ক্যানে ? রোজ সন্ধ্যেবেলা কারু না কারু মটরে চড়ে, রাতদোপর পর্য্যন্ত বেড়ায় ; ছিনেমা দেখে, থিয়েটার দেখে, সায়েবদের হোটেলে খানা খায়, রোজই কিছু না কিছু উপহার পায়, ভাল কাপড়-চোপড় পরে, তার ভাল নাগ্‌বে না ক্যানে ? আমার আর মেজদির কি ? কিছুই না। দিনরাত গুড়ের নাগ্‌ড়ি ঘরের কোণে বসে আছি ত, বসেই আছি। তাই কি আমাদিকে সঙ্গে লেবে ? কখ্‌খনো লেয় না।"

নিস্তারিণীও বুঁচির কথাবার্ত্তায় কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন।

বিজলী হাসিয়া কহিল—"এ তোমার অন্যায় রাগ ভাই। আগে দিদির মত বড় হও, লেখাপড়া শেখ, গানবাজনা শেখ, সবার সঙ্গে মিশ্‌তে শেখ—তবে ত ?"

বুঁচি কহিল—"তাই বা হল কৈ? বেশ ত ইস্কুলে আর গানের ইস্কুলে যেছিলাম—সমরদা এসে ছাড়িয়ে দিল। এখন আমাদের বাড়ীতেই অনেক মাষ্টার হয়েচে, দিদিমণি! প'ড়ো ত মাত্র তিন জন, কিন্তু মাষ্টার জুটেচে দশ-বারো জন—সমরদা, সলিলদা, কুণালদা, বিনুদা, ধীরেনদা, নরেনদা, সুহাসদা, বিধুদা, মনুজদা, বিনয়দা, শৈলদা—"

বলিতে বলিতে বুঁচি হাসিয়া বিজলীর কোলে গড়াইয়া পড়িল।

বিজলী কহিল—"ভালই ত হয়েচে। বাড়ীতে বসে' যদি কাজ হয়, তাহলে ইস্কুলে যাবার দরকার কি?"

বুঁচি ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল—"বা বা, খুব বল্‌লেন্! মাষ্টাররা সবাই দিদিকে নিয়েই ব্যস্ত! দিদিকে শেখাতে তাদের এতটুকু আলিস্যি নাই। দিদির হয়ত পড়্‌তে বা গান শিখ্‌তে মন নাই—কিন্তু মাষ্টাররা ছাড়্‌বে না, তারা পড়াবেই। অথচ আমি যদি বলি, সমরদা—কি অন্য কেউ—এইটে আমায় একটু বুঝিয়ে দাও না ভাই? অমনি তারা হাজার রকমের ওজর তোলে! দিদির সঙ্গে এই নিয়েই ত আমার ঝগ্‌ড়া—"

টেঁপী গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মত, উঠিয়া সোজা দাঁড়াইয়া, আদেশ-কঠোর স্বরে কহিল—"মা কি বাড়ী যাবার কথা ভুলে গেলে? আজ তোমার দশুমী। খাবার-টাবার করতে হবে না? তা ছাড়া, ইষ্টুডিও থেকে সন্তোষবাবু আস্‌বেন্, মনে নাই?"

টেঁপীর চক্ষু দিয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল।

নিস্তারিণী একটু নড়িয়া বসিলেন মাত্র, উঠিবার কোনো চেষ্টাই করিলেন না।

বিজলী টেঁপীকে জোর করিয়া বসাইয়া, সস্নেহ ভৎর্সনায় কহিল—

"খুব যে গিন্নি হয়েচ দেখ্‌চি! মা যেন তোমার একারই—আমি বানে ভেসে এসেচি, না? মায়ের আজ দশমী, তা আমিও জানি। আমি মায়ের বড় মেয়ে। যাও দেখি মাকে নিয়ে, কেমন যেতে পার?"

বিজলী ইহাদের বিষয়ে হঠাৎ কৌতূহলী হইয়া পড়িল। বিনা প্রশ্নেই ইহারা বলিয়া যাইতেছে। সুতরাং আর কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারিলে বাকীটুকুও আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়িবে। বিজলীর একবার সন্দেহ হইল, বুঁচিও কি নিস্তারিণীর গর্ভজাত কন্যা?

বিজলী আরও একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চায়। ইহাদের সম্বন্ধে যে-কথা ভূষণকে সে এতদিনের মধ্যেও বলিতে পারে নাই, ভূষণ আজ সেই সব ইহাদের মুখে নিজের কাণে শুনুক্। প্রধানত, ভূষণের জন্যই বিজলী ইহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে চায়।

নিস্তারিণী পুলকে গদগদ হইয়া টেঁপীকে কহিলেন—"কেমন জব্দ? আমার বড় মেয়ের সঙ্গে আর নাগ্‌বি?"

বিজলী ঠাকুরকে ডাকিয়া, নিস্তারিণীকে কহিল—"দশমীর কি ব্যবস্থা করব মাসীমা, আপনি বলে দিন। আমি ত জানি না। মেয়ের কাছে কিছুই লুকোবেন না যেন। আপনি যা খাবেন, তাই বলুন, 'কিন্তু' করবেন না। আমার বোনেদের ব্যবস্থা আমি কর্‌চি।"

নিস্তারিণী বহু ভূমিকা করিয়া, নিতান্ত ঔদাসীন্যের ভাণে কহিলেন—"কি ছাই আর খাব? খাওয়া কি আর আছে, মা? অথচ কিছু না খেলে, বড় মেয়ে আমার আবার মুখ লামাবে। খাওয়া গিয়েচে! কপাল পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে—খাওয়া গিয়েচে! তার উপর, কল্‌কাতা এসে থেকে পেটটা কিছুতেই ভাল থাকচে না। ক্ষিদে ত নাই-ই, পৃথিবীর সব

জিনিষেই অরুচি। কোনো জিনিষে রুচি নাই। তুমি ছাড়বে না... ত মা, খাই আর না-খাই পাত পেড়ে বস্‌তেই যখন হবে, তখন দু'খানা গরম লুচি—গুনে দু'খানা, তিনখানাও নয়, একটু আলুর দম, দু'খানা পটলভাজা, ফুলকপি উঠেচে—যদি পাওয়া যায়, নতুন আলু আর মটরসুঁটি দিয়ে কপির একটু ডালনা, একরত্তি দুধ, দুধ যদি না থাকে, এতটুকু, এক দশান পরিমাণ রাবড়ি, আর যা-হয় গোটা দুই মিষ্টি। ব্যস্—আর কিচ্ছু নয়। নতুন গুড়ের সন্দেশগুনোতে তবু মুখটা একটু ছাড়ে। আর ঐ একটু আচার কি চাটনী দিও। ব্যস্! বেশী যেন কিছু কর না। খাওয়া-পরা তোমার মেসোর সঙ্গেই সব গিয়েচে মা। যা-ও ছিল, তা এই কল্‌কাতা এসে গেল। না খেয়ে খেয়ে, গায়ে এতটুকু জোর নাই, অষ্টপহর শরীলটা ধ্বশ-ধ্বশ করে—ডাক্তার-ক্‌বরেজরা বল্‌চে—বাউ বেড়েচে।"

যথাযথ উপদেশ দিয়া বিজলী ঠাকুর-চাকরকে বিদায় দিল।

নিস্তারিণী ভাল করিয়া বসিয়া, হতাশ ভাবে কহিলেন—"খাবার-দাবার জায়গাই ত কল্‌কাতা, মা। মোচার মতন কেমন সব গলদা চিংড়ি—ডিম-ভরা বড় বড় ইলিশ, ভেটকী আর কৈ—কেমন চ্যাটাঙ্গো-চ্যাটালো খয়রা—ব্যাতে ত দেবার জো নাই, মা! শুধু দেখি, আর কর্‌ব কি? ছেলোগুনো আনে, আমি রেঁধে দি। আমার হাতের রান্না ওদের বড্ড ভাল নাগে। ওরা আনন্দ করে' সবাই খায়, আমি দেখেই খুশী থাকি। কি করব বল? কপাল যে পুড়ল, আমার কপাল গুণে, সে কি ঠিক এই কলকাতা আসার সম-সম কালেই? মাছ-ছাড়া জীবনে কখনো মুখে-ভাতে করি নাই।"

বিজলী আড়চোখে দেখিল, ভূষণের মুখেও বিরক্তির ছায়া। কহিল—"শাস্ত্রে নাকি বলে, মাসীমা, আত্মাকে ফাঁকি দিয়ে আর মনকে চোখ ঠেরে, ধর্ম্ম হয় না। কে জানে এর সত্যি মিথ্যে।"

নিস্তারিণী কহিলেন—"শাস্তরের কথা কি মিথ্যে হয়, মা? সত্যিই। তবে মাছ-মাংস পেঁয়াজ-রশুনটা কেবল হাতে তুলেই খেচি না। ছোঁয়া-লাড়া ত হচেই: এতটুকু চন্দন-পিঁড়ির মত রান্নাঘর, দেখেচ ত? সেখানে কি করে আঁষ-নিরামিষ আলাদা করি, বল? কি করব? মা কালীকে বলি—মা, আমার অপরাধ লিও না।"

বিজলী কহিল—"তা ছাড়া আর উপায় কি? কলকাতায় অত বাচ-বিচার করতে গেলে আমাদের মত গেরস্তদের কি চলে মাসীমা?"

নিস্তারিণী পরম পুলকিত হইয়া কহিলেন—"বেঁচে থাক মা, সুখে থাক। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তপতীও তাই বলে।"

টেপী কহিল—"আমি ত এখনো বলচি—বিধবারা যদি মাছ-মাংস খায়ই, তাতে ক্ষেতি কি? শুদ্দুরদের বিধবারা খেচে না? মেমসায়েব বিধবারা খায় না?"

নিস্তারিণী আশ্বস্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন—"সেদিন ওদের এই তর্কে মা, আমাকেও শেষ পর্য্যন্ত মত দিতে হল। কিছুতেই খাব না, অনেক ওজর আপত্তি করলাম, ওরাও ছাড়বে না। তারপর শাস্তর আউরে যখন বললে, তখন আর কি করি? খেলাম। সমর বললে—আপনি খান মা, যা পাপ হয়, আমার হবে। কি করি? সব পারি, শাস্তরের কথাও অমান্যি করতে পারি, কিন্তু সমরের কথাটি ঠেলতে লারলাম। খেলাম দুখানা চোপ আর দুখানা কাটলিশ। মন্দ লাগল না, মা। মুখটা তবু একটু ছাড়ল।"

বিজলী বুঝিল, পুকুরে কতখানি জল। জিজ্ঞাসা করিল—"সমর কে ?"

নিস্তারিণী বিস্মিত হইলেন। কহিলেন—"ওমা, সমরকে চেন না ? সমর রায়—বামুনদের ছেলে। খুব ভাল ছেলে, মা। যে সব ছেলেরা আসে, সবাই ভাল : তবে, তার মধ্যে সমর আর বিন্নুই সবার সেরা। এ দুয়ের মধ্যে আবার সমরের তুলনা নাই। দেখতে যেমন থাকার কার্ত্তিক, তেমনি বড়নোকও। কলকাতায় তার দু'খানা বাড়ী আছে। একখানায় নিজে থাকে, অন্যখানা ভাড়া দেয়। সমর মোহন-ফিলিমের হিরো। নাচতে গাইতে বাজাতে আক্টো কর্‌তে এমন চৌকষ ছেলে আমি আর কখনো দেখি নাই মা। ছিনেমাতেও সে মাসে তিন-চার শো টাকা মাইনে পায়। সেই ত তপতীকে ছিনেমায় ঢুকিয়ে দিচে ! আজ সন্ধ্যেবেলায় কোম্পানীর মালিক সন্তোষবাবুকে লিয়ে, সমরের আস্‌বার কথা আছে। টাকা দিয়ে ন্যাকাপড়া হবে।"

ভূষণের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। টেঁপী তাহার হাত ফস্কাইয়া শেষে মোহন-ফিলিমের সমর রায় আর সন্তোষের কবলে পড়িল ? সে নিরুপায় !

বিজলী টেঁপীর উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিল—"খুব সুখী হলাম, মাসীমা। ভালই হল, কত মাইনে হল ?"

নিস্তারিণী কহিলেন—"মাইনে এখন দু'শো দেবে, পরে আরও বাড়াবে বলেচে। সমরের জন্যেই এটা হল। সন্তোষবাবু ত দেড়শোর বেশী কিছুতেই উঠবে না। সমর তখন বললে—বেশ, আমার মাইনে থেকে পঞ্চাশ টাকা কেটে লিয়ে, তপতীকে দু'শো পুরিয়ে দেন। তখন নজ্জায় পড়ে, সে ড্যাকরা দু'শো করে। এমন ভাল ছেলে সমর। অথচ, এতটুকু গুমোর নাই : তপতীর জুতো পর্য্যন্ত বুরুষ করে দেয়।

—ভূপতীর মাথা খবুলে, তার আহার-নিদ্রে পর্য্যন্ত ঘুচে যায়! পয়সাকে পয়সাই ভাবে না। ভা-রী ভাল ছেলে, মা।"

বিজলী অনুমোদন করিয়া কহিল—"সত্যি, খুব অমায়িক ছেলে।"

নিস্তারিণী আত্মপ্রসন্নভাবে কহিলেন—"কি জান মা, যে গরু দুধ দেয়, তার জন্যেই জাব্। ঘুঁট্কে-তিদ্দুযের মতন নয়ঃ নির্গুণো সাপের কুলো-পারা ফণা! মুরোদ ত ভারি! তোমার মাসীমা ন্যাকাপড়াই জানে না, কিন্তু মানুষ চেনে ঠিক।"

বিজলী কহিল—"লেখাপড়াটাই কি খুব বড় হল? মানুষ চেনাই ত আসল জ্ঞান। মাসীমার তাহলে এখন মেলাই ছেলে। ক'জন হল?"

নিস্তারিণী কহিলেন—"তা দশ-বারো জন হবে, মা। এরা রোজই আসে, খায়-দায়, গান-বাজনা করে, মা মা করে পেছু-পেছু বেড়ায়। ভারি নিটু-পিটু! কে বলবে যে, এরা আমার পেটের ছেলে নয়। মধ্যে কজন ফড়ে' আর ধড়ীবাজ জুটেছিল, সে অলপ্পেয়েরা বিদেয় হয়েচে।"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম?"

নিস্তারিণী কহিলেন—"সেই জন্যেই ত এইচি মা। ঘুঁটকেকে পাঠাব তাদের কাছে—তাদের চুলের মুঠি ধরে নিয়ে আস্‌বে আমার কাছে। আমি দেখিয়ে দোব সেই ঘাটেপড়া ওলাউঠো নামুনেদিকে। নিস্তারিণী বাম্‌নীকে ঠকানো অত সোজা নয়।"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"কি করেচে তারা, মাসীমা?"

নিস্তারিণী সখেদে কহিতে লাগিলেন—"সে কথা আর কি বল্‌ব মা! অমিয় বলে একটা ছোকরা আস্‌ত, সে সেদিন চার মণ চাল, দশ সের ঘি, আধ মণ তেল, মণটেক ময়দা—এমনি অনেক জিনিষপত্তর এনে দিয়ে,

বল্‌লে—মা, এগুনো উঠিয়ে রাখুন। আমি রাখ লাম। তারপর—পরশু থেকে মুদীটা ত বাড়ী চষে ফেলচে। মহা হুজ্জৎ বাধিয়েচে টাকার জন্যে। সে বলচে, একজন বাবু এই বাড়ীর জন্যে এনেচে। অজয় বলে' একটা নোক্, তপতীকে সেদিন একশো টাকা চুক্তি করে কোন্ এক বাগানে গান করাতে নিয়ে যায়। আগাম কুড়ি টাকা বায়না করে, বল্‌ল—যখন পৌঁছে দোব, তখন বাকী টাকাটা মিটিয়ে দোবো। তা মা ব্যবসা-পত্তর ত সব নগদে হয় না—নোকের কথাও বিশ্বাস কর্‌তে হয়। ভদ্দর নোকের কথায় বিশ্বাস করে, মেয়েকে ছেড়ে দিলাম। সকাল বেলা দুয়োরে তপতীকে নামিয়ে দিয়ে, এই আস্‌চি বলে যে গিয়েচে, আজ ৭।৮ দিন, আর তার দেখা নাই। এমন করে পাওনা টাকা মারলে, এ শহরে কি করে চালাই বল দেখি মা? কি আক্কেল এই সব ঘাটেপড়াদের—"

বিজলী সহানুভূতির অভিনয় করিয়া কহিল—"তাই ত মাসীমা, এ সব কি ভদ্রলোকের কাজ?"

নিস্তারিণী উৎসাহিত হইয়া কহিলেন—"তাই ত দুখের কথা তোমাকে বল্‌তে এলাম, মা। নশে বলে আর-একজন যাওয়া-আসা কর্‌ত, সে সেদিন মার্কেট থেকে একখানা দামী শাড়ী এনে দিল। তার টাকার তাগাদা কর্‌তেও, একজন খোট্টা এসে কদিন থেকে যা-তা বলে যেচে। অভি বলে' একটা ছেলে, সে-ও অমনি জোড়া-চারেক আট-পৌরে শাড়ী এনে দিয়েছিল, তারও টাকা দেয় নাই—তারাও আস্‌চে টাকা চাইতে। আমায় একটা আংটি দিয়েচে, শশী—আমি ভাবলাম বুঝি সোনা! ওমা, যেদিন হাতে দিলাম, সেইদিনই সেটা

গেবে একেবারে যা-তা হয়ে গেল : একেবারে গিল্‌টি। কে এই সর্ব্বনেশে-দিকে চেয়েছিল যে, তারা আমাদিকে এমন ধাপ্পা দিয়ে গেল ? ঘুঁট্‌কেকে ত তাই বল্‌তেই এলাম—ও যদি একবার খোঁজখবর করে, চুলের মুঠি ধরে, তাদিকে ধরে আন্‌তে পারে, কি এই টাকাগুলো এদের কাছ থেকে আদায় করে দিতে পারে। কারু খাইও না, পরিও না : অথচ এ কি বিপদ দেখদিকিন মা ? পাওনাদারের উৎপাতে যে বাড়ীতে বাস করা শক্ত হয়ে উঠল।"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"তাদের পুরো নাম ঠিকানা সব জানেন ?"

নিস্তারিণী কহিলেন—"নাম ত ঐ বল্‌লাম। ওর বেশী ত জানি না। ঠিকানা ?—রাস্তার নাম জানি না। তা নাই বা হল, কল্‌কাতাতেই ত! একটু খুঁজলেই পাওয়া যাবে। এ আর এমন শক্ত কি ? চৈতনপুর হলে আমি লিজেই পারতাম, কারু খোশামুদী কর্‌তাম না।"

টেঁপী কহিল—"মা কিছুতেই বুঝবে না যে, রাস্তার নাম আর বাড়ীর নম্বর ছাড়া, তাদিকে কিছুতেই ধরা যাবে না। আমিও তখন অত শত বুঝি নাই। ঘুঁট্‌কে দাদা, পার' এদিকে খুঁজে বার কর্‌তে ?"

ভুষণ নিজের প্রয়োজনীয়তায় একটু গৌরব বোধ করিল। কহিল—"এ চৈতনপুর লয় যে নাম বল্‌লেই, নোক ধরা যাবে। এ কল্‌কাতা।"

নিস্তারিণী কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিলেন—"তা হলে কি হবে বাবা ঘুঁট্‌কে ? দু'একটা টাকা ত লয় যে দিয়ে দোব—এ যে অনেক টাকার ফের। এত টাকা কোথায় পাব ? এত ত দিতে লাবুব, বাবা !"

ভূষণ তিক্ত-কণ্ঠে কহিল—"তুমি না পার, সমর রায় দেবে। সে ত মস্ত নোক—তাকে বল গে না।"

নিস্তারিণী কহিলেন—"সমরকে বলি নাই, বললে সে লিশ্চয় দেবে,

তথ্‌খুনি দেবে। সে-ত তোর মতন পুজুরী-বামুনের বেটা 'খানশামা' লয়। হিংসে করে তুই তার করবি কি-রে ড্যাক্‌রা—ছোট নোক!"

বিজলী দুই উন্মুক্ত তরবারির মধ্যে মাথা দিয়া দাঁড়াইল। কহিল—"এ ভূষণের কম্ম নয় মাসীমা! এ পুলিশে খবর দিতে হবে।"

পুলিশের নামে নিস্তারিণী ও টেঁপী দুই জনেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"আর যারা যা দিয়েচে, সেগুলোতে কোন গোলমাল নেই ত, মাসীমা?"

নিস্তারিণী কহিল—"কৈ, তা ত মনে হচে না, মা। দামী জিনিষের মধ্যে—সমরের দেওয়া তপতীর ঐ আটগাছা চুড়ি, কুণালের দেওয়া কাণের ঐ মুক্তোর দুল দু'টো, সলিলের ঐ হারগাছটা আর সুহাসের ঐ হীরের আংটি দু'টো! খাট-পালঙ্ক, বালিশবিছানাও সমরের দেওয়া। বিনু দিয়েছে আমার শোবার খাটখানা, বিধু দিয়েছে একটা হার্ম্মোনিয়া, মনুজ দিয়েচে ছোপা, গদি-মোড়া চেয়ার চারখানা আর দু'খানা বড় আর তিনখানা ছোট টেবিল—এ তার নিজের দোকানেরই জিনিষ। মোটামুটি ত এই। ছোট-খাট খুচ্‌রো-খাচ্‌রার ন্যাকাজোকা নাই। এগুনোতে গোলমাল নাই বলেই মনে হচে। রোজই এরা আসে। আর হয়েও গেল অনেক দিন।"

বিজলী চিন্তিতভাবে কহিল—"তাইত মাসীমা—"

নিস্তারিণী বাধা দিয়া কহিল—"না মা, এ ছেলেদেরদের মধ্যে ফের-ফাঁপড়, ধড়ি-ধাপ্পা নাই। হাটবাজার করা, মেয়েগুনোকে পড়ান, নাচ-গান শেখানো, এখানে-ওখানে নিয়ে যাওয়া-আসা থেকে সমস্ত ফাইফর্‌মাশ—এরাই ত দিনরাত্তির খাটে। চাকর-বাকর ত নাই। সব কাজকর্ম্ম

এরাই করে দেয়। সেদিন আমার জ্বর হয়েছিল, মালোয়ারি জর—ওরাই বাসনমাজা, কাপড়কাচা, রান্নাবান্না, খাওয়ান-ধোয়ান মায় আমার পথ্যি পর্য্যন্ত সবই ওরাই করূল! হাসিমুখে করূল। বড় ভাল ছেলে এরা। ভদ্দর নোক একেই বলে! ঘুঁটকের মতন লয়। ঘুঁটকের ভরসায় কল্‌কাতা এলাম বটে, কিন্তু ওর আশায় থাকলে, আমরা এদ্দিনে গুষ্টিসুদ্ধ মরে কোন্ দিন ভূত হয়ে যেতাম। অলা—ও-খনা ও-বীথি ঘুমুস্ না, উঠে বস্, গিল্‌তে হবে না? বাড়ী যেতে হবে না?"

ক্ষেন্তি ও বুঁচি সোফায় হেলান দিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। মাতার আদেশে চোখ মুছিতে মুছিতে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

বিজলী ভূষণকে কহিল—"ভূষণ, একখানা ট্যাক্সি ঠিক করে' রেখ', ভাই, মাসীমারা যাবেন।"

নিস্তারিণী কহিলেন—"না মা টেক্সির দরকার নাই। সমরের মটরে আমরা এইচি। মটর নীচেই আছে, আমাদিকে লিয়ে তবে যাবে।"

বিজলী কহিল—"ও, আচ্ছা। দেখবেন মাসীমা, তপতী যে রকম পরিশ্রম করচে—ছেলেমানুষ, অভ্যাস নেই ত—হঠাৎ কোনও অসুখ-বিসুখ না বাধিয়ে বসে আবার।"

নিস্তারিণী পুলকিতভাবে কহিলেন—"আমিও সেটা ভাবি, মা। বলিও মাঝে মাঝে। কিন্তু ও-কি পারে? ওর সময় কৈ? ডাকে ডাকে ওর কি নিশ্বেস ফেল্‌বার সময় আছে? রেডিও, কলের গান, জল্‌শা এ ত রোজই নেগে আছে! বাছা আমার একলা, করে কি?"

ঠাকুর আসিয়া সংবাদ দিল, খাবার প্রস্তুত, মাংসের সামান্ত বাকী। ইদানীং এক নূতন চাকর আসিয়াছে, সেই মাংস রাঁধে।

ঝুঁচি নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া, চতুর্দ্দিক একবার দেখিয়া লইয়া, কহিল—"আচ্ছা, সবাই কথা কইচে, ঘুঁটেকেদা ত কিছু বল্‌চে না?"

ভূষণ কহিল—"আমার বলবার কিছু আছে নেকি? শুনচি।"

ঝুঁচি কহিল—"উঁহুঃ, তুমি আমাদিগকে আর ভাল বাস না।"

ভূষণ কহিল—"আমি ঠিকই ভাল বাসি, তোরাই বাসিস না। সোন্দর সোন্দর সব বড় বড় নোকের ছেলেরা এখন তোদের দাদা জুটেচে—আমাকে আর মনে ধর্‌বে কেন? ঐ যে বলে না?

যখন ছিল পীরিতি—তখন তেঁতুল পাতায় শুয়েচি
এখন পিরীত গেল বিচ্ছেদ হল—জায়গা হয় না মানপাতে॥"

নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি পাঁচালী বল্‌চিস্ রে ঘুটকে?"

ঝড় আসিতেছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি দুয়ার-জানালা বন্ধ করিয়া দেওয়ার মত, বিজলী টেঁপীকে কহিল—"ওমা, এতক্ষণ কেবল কথাই হল! তপতী দেবীর এত নাম-ডাক, অথচ এতক্ষণে তার একখানা গানও শুনলাম না? তা কি হয়? দাও ত ভাই ভূষণ, হার্ম্মোনিয়মটা।"

ভূষণ হার্ম্মোনিয়ম আনিয়া দিল। গলায় টিনশীল, বুকে নীলমনিয়া, থোরোট-ক্যাম্‌পেন্, বরণকাইটিচ, সর্দ্দিকাসি প্রভৃতি এত অজুহাত টেঁপী জড় করিল যে, বিজলী একদম বেকুফ হইয়া পড়িল।

কন্যার গৌরবে এবং তাহা প্রদর্শন করিয়া আত্মপ্রসাদলাভের কল্পনায়, নিস্তারিণী কহিলেন—"যা পারিস একখানা গান শুনিয়ে দে, মা তপতী। বিজলী বল্‌চে এত করে। কি জান মা? টাকা ছাড়া ও কোথাও মুখই খোলে না। সভায়-টভায় গান করে ত? গান পিছু দশ থেকে কুড়ি টাকা করে লেয়, তবে হার্ম্মোনিয়া ছোঁয়।"

বিজলীর কাণ পর্য্যন্ত লজ্জায় গরম হইয়া উঠিল। মাতৃআজ্ঞা পালনকল্পে তপতী দেবী দয়া করিয়া একখানি গান করিলেন।

অপূর্ব্ব কণ্ঠ। বিজলী সত্যসত্যই স্বীকার করিল, এমন সুললিত সুরৈশ্বর্য্যসমৃদ্ধ স্বর সে খুব কমই শুনিয়াছে।

চাকর খবর দিল, খাবার ঠাঁই তৈরী।

নিস্তারিণীর খাওয়া সত্যই আর নাই। বিজলী শঙ্কিত হইয়া উঠিল: এরূপ খাইলে মাসীমা সত্যই আর কতদিন বাঁচিবেন? বিজলীর ইঙ্গিতে, ভূষণ ছুটিয়া রান্নাঘরে গিয়া ঠাকুরকে সাহায্য করিতে লাগিয়া গেল। ৩২খানি লুচি, একবাটি ছোলার ডাল, দুইটি বড় বড় বেগুন ভাজা, আটটি পটলের দোর্ম্মা, এক বাটি ফুলকপির ডালনা, আধ পোয়া আলু ভাজা, এক বাটি ছকা, এক বাটি চাট্নী, এক পোয়া রাবড়ি, এক পোয়া দই, আটটি নূতন গুড়ের সন্দেশ, এবং এক গ্লাস্ জলে সমাসন্ন একাদশীর দশমীকৃত্য সুসম্পন্ন হইল!!

হাতমুখ ধুইয়া আসিয়া পান মুখে দিয়া, একটু বিশ্রাম করিতে করিতে নিস্তারিণী কহিলেন—"এই ত খেলাম, কাল সারাদিন চোঁয়া ঢেকুর উঠ্বে, আর পেট হয়ে থাকবে পাথর। বল্লাম যে মা, খাওয়া আর নাই! কল্‌কাতার সব ভাল, কেবল জল-হাওয়াটা বড্ড খারাপ! আর এই না-খেয়ে-খেয়ে পেট মরে' গিয়েচে। তোমার জানা কোনও অষুধ-টষুধ যদি থাকে, আমাকে একটু দিও ত মা! এই হজ্‌মী আর কি? যাতে একটু ক্ষিদে হয়, আর মুখে একটু রুচি হয়! দেখলে ত মা, খাওয়া নাম-মাত্র, বসাই সার! এই যা চাট্টি খাই, তাও যদি হজম না হয়, তাহলে শরীল আর কি করে থাকে?"

বিজলী করুণভাবে নিবেদন করিল, ভাল একজন কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিয়া ভূষণকে দিয়া ঔষধ পাঠাইয়া দিবে।

ক্ষেন্তি ও বুঁচির ঘুম পাইয়াছিল, তাহারা মটরে বসিতে গেল। নিস্তারিণীর দুর্ব্বল শরীর আহারান্তে একটু না বসিয়া চলা-ফেরা করা ডাক্তারদের নিষেধ। নিস্তারিণী বসিলেন।

টেঁপী ছাদ দেখিবার অছিলায় বিজলীকে লইয়া গিয়া, জিজ্ঞাসা করিল—"শীলার খবর কিছু জানেন, দিদিমণি?"

বিজলীও টেঁপীর মনের এই দিকটার একটু পরিচয় লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সুযোগ না পাইয়া খুবই অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। খুশী হইয়াই সে টেঁপীর প্রস্তাবে সম্মত হইল।

বিজলী জানে, টেঁপীর ব্যথা কোথায় এবং শীলার আড়ালে কে দাঁড়াইয়া আছে। বিজলী মহামুস্কিলে পড়িল। বিজলীকে শীলা বলিয়া গিয়াছিল, তাহার বিবাহে সে বিজলীকে নিমন্ত্রণ করিবে। শীলা যখন যায়, বিজলী তখন তাহাকে তাহার আসল নাম ও বাড়ীর ঠিকানাও দিয়াছিল। শীলা ঠিকই নিমন্ত্রণ করিয়াছে। তাহার উত্তরে বিজলী তাহাকে সেই দিনই একগাছা দামী হার পাঠাইয়া দিয়া, লিখিয়া দিয়াছে যে—কোনও অনিবার্য্য কারণে তাহার যাওয়া হইল না। কলিকাতায় আসিলে সে কারণ জানাইবে এবং দম্পতিকে অভ্যর্থনা করিবে।

বিজলী মিথ্যা বলিল। কহিল—"না ভাই, জানি না ত।"

টেঁপী কহিল—"সত্যি জানেন না, না, আমার সঙ্গে চালাকী করছেন?"

বিজলী কহিল—"চালাকী কেন করব ভাই! শীলা আমার ত কেউ নয়, আর তার খোঁজই বা পাব কি করে?"

টেঁপী কহিল—"তার যে বিয়ে, এই ৫ই অঘ্রাণ।"

বিজলী আকাশ হইতে পড়িল। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—""তাই নাকি? তুমি কি করে জানলে?"

টেঁপী তাহার হাতের ব্যাগ হইতে একখানা রঙীন চিঠি বাহির করিয়া বিজলীর হাতে দিয়া কহিল—"এই পড়ুন। ভাব্‌বেন না যে এ চিঠি সে আমাকে পাঠিয়েচে। এ চিঠি বৃন্দাবন বলে ছোটবাবুর একজন বন্ধু আছে, তার কাছে এয়েছিল। বিনু আবার আমার বিশেষ বন্ধু। তার পকেট থেকে চুরি করে রেখেচি, আপনাকে দেখাব বলে।"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল,—"চুরি কর্‌লে কেন?"

টেঁপী কহিল—"পাছে চাইলে, কোনো সন্দেহ করে।"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল,—"বিনু কে?"

টেঁপী জানাইল—"রয়্যাল বেঙ্গল হোটেলের মালিকের ছেলে। ছোট-বাবুর সঙ্গে পড়ত, দুইজনে বিশেষ বন্ধু। বিনু বিয়েতে চট্টগ্রাম গিয়েচে।"

স্বল্পালোকে চিঠিখানা পড়িবার ভাণে, বিজলী কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। তাহার মনটা অপ্রসন্ন হইল। কি জানি, কখন এ শীলার কি সর্ব্বনাশ করে!

ভূষণ আসিয়া কহিল—"মাসীমারা গাড়ীতে উঠেচে। আয় টেঁপী—"

টেঁপী তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল—"ও কি অসভ্যতা? টেঁপী বল'না, বল্‌চি! আমার নাম তপতী! শুনেচ আমার মাকে টেঁপী বলতে? ও পাড়াগেঁয়ে চালচলন, আর গায়ে-পড়ে অধিকার ফলানো, তুমি আমার সঙ্গে আর কখনো করবে না কিন্তু! তোমায় আমি সাবধান করে দিচি—বেলাডি সোয়াইন—"

এতদিন পরে—তাহার মানসী টেঁপীকে একান্তে পাইয়া, তাড়াতাড়ি মনের দুই-একটা ব্যথার কথা বলিবে বলিয়া, ভূষণ তাহাকে ডাকিয়া

দিবার অছিলায় সাগ্রহে উপরে আসিয়াছিল। কিন্তু টেঁপীর ব্যবহারে ও ভাষায়, অকস্মাৎ সে বজ্রাহত হইয়া মাথা ঘুরিয়া, সেইখানে বসিয়া পড়িল।

অতিথিগণ বিদায় গ্রহণ করিলে, নীরবে সলজ্জভাবে ভূষণ নামিয়া আসিল। রাত্রি এগারটা। ঠাকুর ও চাকর আসিয়া জানাইল রান্নাঘর শূন্য। বিজলী টাকা বাহির করিয়া দিয়া কহিল—"এই টাকা নাও, আমাদের চারজনের যা হয় একটা-কিছু কর।"

যে বহ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেখিয়া বিজলী একদিন শঙ্কিত হইয়াছিল, আজ স্পষ্ট দেখিল, সে আর স্ফুলিঙ্গ নাই, হুতাশন হইয়াছে। ভূষণকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বুঝ্‌লে ভূষণ?"

ভূষণ কি করিয়া বুঝায়, যে সে কি বুঝিল! মাথা কাহার খারাপ হইয়াছে? বিজলীর, না ভূষণের? ভূষণ ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল—"বুঝলাম ত সবই, কিন্তু মন যে মান্‌চে না, দিদিমণি।"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"টেঁপীকে বিয়ে করার মন আছে তোমার এখনও?"

ভূষণ কহিল—"বিয়ে ওকে আর করচি না। মরে গেলেও না।"

বিজলী কহিল—"তবে মিছেমিছি মন খারাপ করচ কেন?"

ভূষণ কহিল—"মন আর রইল কৈ, দিদিমণি, যে খারাপ করব?"

বিজলী কহিল—"এইবার বুঝতে পারচ, কেন এতদিন তোমায় আমি এদের সম্বন্ধে কোনো কথা বলি নি? তুমি হয় ত তার জন্যে আমার উপর একটু চটেছিলে, না?"

বিজলীর পদধূলি লইয়া ভূষণ কহিল—"দিদিমণি, আমায় মাফ করুন্। আমি এদের জন্যে ধনে প্রাণে মলাম।"

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অসীম ও শীলা উভয়েরই শরীর অত্যন্ত খারাপ হওয়ায়, চুণীবাবু দুইজনকেই সঙ্গে লইয়া চট্টগ্রামে ফিরিয়াছেন। গত মাস-তিনেকে দুইজনেই এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

৩রা অগ্রহায়ণ। দ্বিপ্রহর। বেশ শীত পড়িয়াছে। চুণীবাবুর বাসায় তাঁহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে বহু আত্মীয়-কুটুম্ব সমবেত হইয়াছে।

উৎসবমুখর বাড়ী। আজ অসীম-শীলার আশীর্ব্বাদী, আগামী কল্য গাত্রহরিদ্রা এবং পরশু দিন বিবাহ। নহবতে সমাসন্ন মিলনোৎসবের সঙ্গীতময়ী স্মরণিকা ধ্বনিত হইতেছে। বেলা পাঁচটায় আশীর্ব্বাদের লগ্ন।

অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সহিত কলিকাতা হইতে চুণীবাবুর বন্ধু ডাঃ বিপ্রদাস পাকড়াশী ও শ্যালক সুবোধ রায়ও আসিয়াছেন।

চৈতনপুর হইতে জানকী মল্লিক, কার্ত্তিক, পুরোহিত, নাপিত এবং তিন-চারিজন গ্রামবাসী ও কলিকাতা হইতে বৃন্দাবন আসিয়াছে।

বাহিরের ঘরে মেঝে-জোড়া প্রকাণ্ড ফরাশ। একদিকে চুণীবাবু ও ডাঃ পাকড়াশী দাবাখেলায় মশগুল্। অন্যদিকে অসীম ও জানকী কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। এখানে-ওখানে কয়েকজন অভ্যাগত র‍্যাপার মুড়ি দিয়া দিবা-নিদ্রায় মগ্ন। জানকী হাইকোর্টের বিচার, রায় এবং অসীমের অপহৃত সম্পত্তির দখলের বিশদ বর্ণনা করিতেছিল—"শ্যামাকান্তবাবু চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু দিনকে-রাত-করা কি হাইকোর্টে চলে? জজ কিছুতে শুনলেন না। গড়িয়াহাটের বাড়ী, আস্‌বাবপত্র,

এমন কি, ব্যাঙ্কের টাকাকড়ি-অবধি, সমস্তই আমাদিকে দখল দিতে, হুকুম দিলেন। যেমনি হুকুম, অমনি আমিও সঙ্গে সঙ্গে দখলের ব্যবস্থাটাও করিয়ে নিলাম। খুব ভাল জজ।"

অসীম চুপ করিয়া শুনিতেছিল। জানকী কহিতে লাগিল—"তবে বেচারা এ অপমানটা সহ্য করতে আর রইল না, বাসি রাত পোয়াল না। আহা, লোকটা মরে যাওয়াতেই মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে, বাবা! বাড়ী ফিরে সেদিন সে জামা-কাপড় পর্য্যন্ত ছাড়ে নাই!"

অসীম জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা কাকা, আপনি যদি তারপর দিন সকাল হতে-না-হতেই না যেতেন, তাহ'লে সৎকারের কি হত?"

জানকী কহিল—"কি জানি, বাবা, কি হত! তাঁর স্ত্রী ত একদম হতভম্ব হয়ে, সারা রাত মড়া কোলে করে স্তব্ধ হয়ে বসে'। দশটা কথা জিজ্ঞেস করলে, একটা কথার উত্তর দেন। কি রকম যে অভিভূত-ভাব তাঁর হয়েছিল, তা তোমায় কি বলব! চোখে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত নাই! পাথরের দেবীমূর্ত্তির মত স্থির, নিশ্চল। আমাদিকে তিনি কিছুই বল্‌চেন না, অথচ আমরা বললেও কিছু শুন্‌চেন না। তিনিও বাঁচবেন না: এই ক'দিনেই হয়ত, তিনিও হার্ট-ফেল করে মারা গেছেন! বোধ হল, শোকটা খুব মর্ম্মান্তিক হয়েই তাঁর লেগেছে।"

অসীম জিজ্ঞাসা করিল—"ওঁদের চাকরবাকর সব কোথায় ছিল?"

জানকী কহিল—"কে জানে? কর্ত্তাগিন্নি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি ত কাউকেই দেখ্‌লাম না। আমি ত তাই আশ্চর্য্য হচ্ছি! অত বড় অমন সাজান বাড়ী, একটা চাকর পর্য্যন্ত নাই? পাড়ায় আশপাশের বাড়ীতে খবর দিলাম, কারু টিকিটি পর্য্যন্ত দেখা গেল না।

কি করি? ব্রাহ্মণের মড়া। অগত্যা এক সৎকার-সমিতিকে ডেকে, তবে সৎকারের ব্যবস্থা করি। কিছু করুক আর নাই করুক, চক্ষুলজ্জার খাতিরেও একবার এসে দাঁড়ায় ত? আচ্ছা লোক যা হোক্, কেউ একটা উঁকিও মার্‌ল না! আমরা ত কখনো পারি না, বাবা!”

অসীম তাচ্ছিল্যভরে কহিল—“কলকাতার লোক সব অমনিই।”

জানকী কহিল—“তা কি করে বলি, বাবা? আমি ত বহুদিন শিমলে-পাড়ায় ছিলাম, সেখানে ত এ রকম কখনো দেখি নাই—”

অসীম কহিল—“আপনি যে নেটিভ্-পাড়ায় ছিলেন, কাকা! সাহেব পাড়ার ব্যবস্থা অন্য রকম। বাঙালীপাড়ার চাল খুঁজতে আপনি একেবারে বিলেতী সাহেবপাড়ায় গেছেন যে! পাবেন কেন? আপনি কশাইপাড়ায় গেছেন জৈন খুঁজতে। বয়-বেয়ারারা যে আপনাকে অপমান করে' তাড়িয়ে দেয় নি, এই আপনার মহাভাগ্যি!”

বাজিটি চটিয়া যাওয়ায়, পুনর্ব্বার রণসজ্জা করিতে করিতে ডাঃ পাকড়াশী অসীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“বাবাজী, এ তোমার মস্ত কুসংস্কার। কথাটা ঠিক হল না। কলকাতার যারা আসল লোক, তারা ঠিকই সবার খোঁজ-খবর নেয়, সবই করে। করে না কেবল, যারা বাইরের লোক, নতুন কলকাতাবাসী হয়, তারাই।”

ডাক্তারবাবু কলিকাতার একজন বহু পুরাতন বাসিন্দা, কলিকাতা-বাসীদের অন্যায় অপহ্নবে, তিনি প্রতিবাদ না করিয়া পারিলেন না।

অসীম জিজ্ঞাসুভাবে ডাক্তারবাবুর মুখপানে চাহিল। ডাঃ পাকড়াশী খেলাটি কিয়ৎকাল স্থগিত রাখিয়া, ফিরিয়া বসিয়া কহিলেন—“কুসংস্কারটা ঠিক বুঝতে পার নি, কেমন? আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। এখন

কলকাতায় আদি-বাসিন্দার চেয়ে, বাইরের লোকই বেশী—লক্ষ্য করেচ কি? কল্‌কাতার যারা লোক, তারা পড়েচে ছড়িয়ে, আর যত বাইরের লোক, তারাই শহরটা জুড়ে বসেচে! দেখচ না? যে-জন্যে কল্‌কাতা দিন দিন বেড়েই চলেচে? আগের কল্‌কাতা ত তোমরা দেখ নাই, বাবাজী—তোমাদের কালীঘাটই ছিল কলিকাতার বাইরে!"

ডাঃ পাকৃড়াশী বৎসর চারেক বিলাতে ছিলেন, সেই সময় এক ইংরাজ-মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীর ঘর করিতে একবার মাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; কিন্তু ইঁহাদের সামাজিক কুসংস্কার এবং এদেশের গ্রীষ্ম, ম্যালেরিয়া, সর্পভীতি, এবং বন্যজন্তুর মত আচার-ব্যবহার দেখিয়া, আতঙ্কে ভয়ানক স্নায়ুপীড়িত হইয়া, স্বদেশে পলাইয়া গিয়া' বহুদিন যাবৎ আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার ভরণ-পোষণের নিমিত্ত ডাক্তারসাহেব তাঁহাকে নিয়মিত টাকা পাঠাইতেন। পাছে কুসংস্কারের ছোঁয়াচ লাগে, এই ভয়ে ডাক্তারবাবুও চিরদিন পত্নীহীন জীবন যাপন করিয়াছেন।' কিছু দিন হইল, তিনি বিপত্নীক হইয়াছেন।

অসীম সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"বলেন কি?"

ডাঃ পাকৃড়াশী কহিতে লাগিলেন—"হাজরা রোডই ছিল কল্‌কাতার সীমা! দাশ সাহেবের বাড়ীই ছিল,তখন কল্‌কাতার শেষ বাড়ী—এখন যেটা চিত্তরঞ্জন সেবাসদন। তার পরেই, মেটে আলের পথ, মানুষ সমান উঁচু উলুখড়ের বন। তার ভিতর দিয়ে যেতে হত তোমাদের কালীমন্দিরে। কালীদর্শন করে লোকে বেলাবেলি, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরে আস্‌ত। আর এখন দেখ, কি হয়েচে! আরও বিশ বছর পরে দেখবে, ব্যারাকপুর থেকে ডায়মণ্ড হারবার পর্য্যন্ত কল্‌কাতা হয়ে গেছে! এখন

এই নতুন দিকে সস্তায় জমি কিনে, বাইরে থেকে হুড়হুড় করে লোক এসে কল্‌কাতার বাসিন্দা হয়ে পড়চে। এরা বাড়ীঘর করে', গাড়ীজুড়ি হাঁকিয়ে, কল্‌কাতাবাসী হচ্ছে বটে, কিন্তু এত শীগ্‌গীর কল্‌কাতার আসল জাতও পাচ্ছে না, অথচ বাইরের ধাতও যাচ্ছে না: অর্থাৎ কল্‌কাতার লোকের বাইরের চালগুলোই এরা অনুকরণ করচে, তাদের মনোবৃত্তিটা অনুসরণ কর্‌তে পারচে না। ফলে, এরা যে-বিদেশী, সেই-বিদেশীই থেকে যাচ্ছে। অথচ, উট্‌কো লোক এসে, এদিকে দেখেই ভাবে, কল্‌কাতার লোক বুঝি সবাই ঐ রকম। এ তোমাদের মস্ত কুসংস্কার, বাবাজী।"

চুণীবাবু কহিলেন—"এই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরে কল্‌কাতা ডবল হয়েচে, ঠিক, কিন্তু সবটাই যে বাইরের লোকের জন্যে বেড়েচে, তা হয়ত নয়। আগে এত বড় বড় আর এত বেশী রাস্তা ছিল না। রাস্তা, পার্ক প্রভৃতি করতে এই যে সব বাড়ী ভাঙ্গল, তারাও ছড়িয়ে পড়ল ত?"

বিপ্রদাস কহিলেন—"হাঁ, এ-ও একটা কারণ বৈ কি।"

চুণীবাবু কহিলেন—"আচ্ছা। সে কারণ হোক্ বা কুসংস্কার হোক্, তোমার-আমার তার জন্যে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নাই, এখন মাথা ঠাণ্ডা করে' খেল' দেখি।" বলিতে বলিতে চুণীবাবু পদাতিক ও গজ চালনা করিয়া জানাইলেন, যুদ্ধং দেহি। এক মিনিটেই কলিকাতার ভূ ও নৃতত্ত্ব দাবার চাপে দাবিয়া গেল।

অসীম জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, কাকা, আপনি যে বললেন শ্যামবাবুর বাড়ীতে কর্ত্তাগিন্নি ছাড়া জনমানব ছিল না। কিন্তু তাঁর যে দু'টি মেয়ে ছিলেন, তাঁরা কোথা গেলেন?"

জানকী একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল—"কৈ, একটি মেয়েকেও ত

দেখলাম না, বাবা। গিন্নি ত একলাই ছিলেন। মুখাগ্নিও তিনিই করলেন। মেয়েদের নামগন্ধ পর্য্যন্ত শুনলাম না ত।"

অসীম একটু চিন্তা করিয়া কহিল—"তা'হলে বোধ করি, মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে, তাঁরা সব শ্বশুর বাড়ীতে ! খবর পান নি। রাত্রে শ্যামবাবু হঠাৎ মারা যান, খবর পাবেনই বা কি করে?"

জানকী কহিল—"তাই সম্ভব। কেননা, টিকিট কেটে যখন গিন্নিকে গাড়ীতে উঠিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিই, তখনও ত তিনি মেয়েদের সম্বন্ধে কোনও কথাই বললেন না?"

করুণার ভারে অসীম একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। জানকী কহিতে লাগিল—"একশোটা টাকা আমি যাবার সময় গিন্নীকে দিতে এত চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই তা নিলেন না—"

অসীম জিজ্ঞাসা করিল—"কেন? কি বললেন?"

জানকী কহিল—"কিছু বললে ত বুঝতামই। কোনও কথাই বললেন না, শুধু বাঁ হাতে করে ঠেলে দিলেন। যতবার দিলাম, ততবারই তিনি সরিয়ে দিলেন। বললাম, আপনার কাপড়-চোপড় যা আছে, সব নিতে পারেন: এই বলে ট্যাক্সি করে শ্মশান থেকে বাড়ীতে পর্য্যন্ত নিয়ে এলাম, কিন্তু তিনি ফটকের কাছে গাড়ী দাঁড় করিয়ে নেমে, ছুটে পথের দিকে পালালেন। বুঝলাম, এ বাড়ীতে তিনি আর ঢুকবেন না। অতি কষ্টে তাঁকে ট্যাক্সিতে তুলে তবে ষ্টেশনে আনি। মড়ার চেয়ে, এই জ্যান্তর সৎকার করাই আমার সব চেয়ে শক্ত হয়ে পড়েছিল।"

অসীম কহিল—"এ রকম শোকার্ত্ত উদ্‌ভ্রান্ত লোককে একলা গাড়ীতে তুলে দিয়ে, আপনি ভাল কাজ করেন নি কাকা—"

জানকী কহিল—"বেশ বুঝ্‌লাম তিনি কলকাতায় জলগ্রহণ পর্য্যন্ত কর্‌বেন না। তাঁকে আমি দশবার বলেচি, আপনি কলকাতায় কোথায় যেতে চান বলুন, আমি পৌঁছে দিচ্ছি। তিনি শুধু একটি মাত্র কথা বলেছিলেন—দেশে যাব। ব্যস! এই 'দেশে যাব' ছাড়া, আর দ্বিতীয় কোন কথা আমি তাঁর মুখে শুনি নাই। শ্রাদ্ধের জন্যে কিছু পাঠাব কিনা জিজ্ঞেস কর্‌তে, সজোরে হাত আর ঘাড় নেড়ে তিনি জানালেন—দরকার নাই। এ অবস্থায় তাঁকে দেশে পাঠিয়ে না দিয়ে, করি কি? জিজ্ঞাসা করলাম, একলা যেতে পার্‌বেন, না, সঙ্গে কোনো লোক দেব? তিনি ঘাড় নেড়ে জানালেন, লোকের দরকার নাই, তিনি একাই যেতে পারবেন। সে এক মহা বিপদ, বাবা।"

অসীম পূর্ব্বকালের কথা স্মরণ করিয়া, গম্ভীরভাবে কহিল—"শ্যামবাবু নিজে লোকটা ভালই ছিলেন। তাঁর ঐ স্ত্রীটিই হয়েছিল তাঁর কাল।"

জানকী কহিল—"ঐ জন্যেই ত বাবা আমাদের হিন্দুশাস্ত্রের বিধানে—ঠিকুজি কোষ্ঠীর মিল, গোত্র, বংশ, লগ্ন, কত-কি সব দেখার নিয়ম। বিয়ে কি অমনি একটা ছেলেখেলা? স্ত্রী গৃহলক্ষ্মী। লক্ষ্মীকে আনতে শুভদিন শুভক্ষণ, অনুকূল গ্রহনক্ষত্র, এ সব বিশেষ করে দেখা উচিত! এ সব কাজ ভেবে করা ভাল, বাবা, করে' ভাব্‌লে আর কি হবে? আমি দেখেচি, অত্যন্ত দুঃস্থ পরিবারে বৌ আসার সঙ্গে সঙ্গে, স্বয়ং মা লক্ষ্মীর আবির্ভাবের মত সংসারে সুখ-সৌভাগ্য উথলে ওঠে। আবার রাজার সংসারও বৌয়ের পদার্পণে শ্মশান হয়ে যায়!"

মাথার উপর একটা টিক্‌টিকি টিক্‌টিক্ করিয়া উঠিল: যেন কহিল—ঠিক, ঠিক। অসীম অন্যমনস্কভাবে উপর দিকে একবার চাহিল।

জানকী কপালে হাত ঠেকাইয়া, ভাবাবেশে কহিল—"সত্যি, সত্যি! অন্য সব জাতের বিয়ে একটা চুক্তি মাত্র। কেবল হিন্দু-বিবাহই একমাত্র আত্মীয়তা-স্থাপন, যা কোনো দিনই ভাঙা যায় না, ত্যাগও করা যায় না। কারণ, হিন্দু-বিবাহ নর্ম্মসখীর জন্যে নয়, ধর্ম্মপত্নীর জন্য।"

ডাঃ পাকড়াশী মুখ না তুলিয়াই কহিলেন—"মল্লিক মশাই, এটাও আপনার কুসংস্কার! ও-সব কথা শুনো না, বাবাজী। বিয়ে—বিয়ে! ওতে আধ্যাত্মিক কিছুই নেই। এইরূপ কিছু আরোপ করাই হল কুসংস্কার।"

অসীম জিজ্ঞাসা করিল—"তাহলে ও-বাড়ীতে গিয়ে এখন ওঠা যাবে?"

জানকী কহিল—"না বাবা, এখন হবে না। প্রথমত, বিয়ের পর জোড়ে তোমাদিকে চৈতনপুর যেতেই হবে। সেখানে কিছুদিন বাস করে, তারপর যেখানে ইচ্ছে, যেও। এটা হিন্দুর প্রথা। বাপ-পিতামহের ভিটে,সেখানে আগে না গিয়ে কি অন্য কোথাও তোমার এখন ওঠা চলে? তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা অশরীরীরূপে এসে নিত্য তোমাদিকে আশীর্ব্বাদ করে যাবেন। তোমাদের তাতে কল্যাণ হবে। তুমি দেশের রাজা: সেখানে লোকজন, আত্মীয়-স্বজন তোমাদের প্রতীক্ষা করচে—উৎসব ত সেখানে। আর ততদিন বাড়ীটাতেও কলি ফেরাই, রং করাই, ধোয়াই; তার পর শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, শ্যামাপূজা, চণ্ডীপাঠ ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতি করিয়ে শুদ্ধ করে নিই, তারপর এসে বাস করো। বাড়ী ত তোমার বাসের যোগ্যই। আমি লোকও লাগিয়ে দিয়ে এসেচি। বেশী দেরী হবে না!"

অকস্মাৎ নহবতে ভৈরবীর সকরুণ স্বর, পুরাঙ্গনাদের কলহাস্য-মুখরিত উৎসব-কোলাহল, শঙ্খনিনাদ ও সুবোধের ভৈরব হাঁকডাকে

ইঁহাদের আলোচনা যেমন মধ্যপথে বন্ধ হইল, তেমনি ওধারে সমাসন্ন ঘোড়ার কিস্তিতে চুণীবাবুর মন্ত্রী নিহত হইয়া নৌকাটিও ডুবুডুবু।

একটা গরম পুলোভার গায়ে, হাঁটুর উপর কাপড়-তোলা, গলায় পরিষ্কার একটা বড় তোয়ালে, খালি পা, সুবোধ আসিয়া ব্যস্তভাবে কহিল—"উঠুন, উঠুন, জামাইবাবু, পাঁচটা বাজতে আর দেরী নেই। আকাশে ভীষণ মেঘ করেচে। কি করে যে লোক্‌জনকে খাওয়াব, সেইটেই হয়েচে এখন আমার মস্ত ভাবনা। উঠুন ডাঃ পাকড়াশী—"

চুণীবাবু ও ডাঃ পাকৃড়াশী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

চুণীবাবু শ্যালকের সহিত রসিকতা করিয়া কহিলেন—"তুমি থাকৃতে জলঝড়ে আমাদের ভাবনা সুবোধ কি?"

ডাক্তারবাবু কহিলেন—"কি রকম?"

চুণীবাবু যাইতে যাইতে কহিলেন—"ও, তা বুঝি জাননা? সুবোধ যে ফিল্ম তোলে। ফিল্মে দেখ না—জলে দেশ ভেসে যায়, বাড়ীঘর গাছপালা ডুবে সমভূমি হয়, অথচ অভিনেতাদের কারো গায়ে এক ফোঁটা জলও লাগে না।" উভয়েই হাসিতে হাসিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সুবোধ কহিল—"কৈ বাবাজী, তোমার সে বন্ধুটিকে দেখচি না ত?"

অসীম কহিল—"বিনু বেরিয়েচে শহর দেখতে, এক্ষুণি এসে পড়বে।"

সুবোধ কহিল—"তা'হলে মল্লিক মশায়, বাবাজীকে নিয়ে আপনিও গা তুলুন—সময় বেশী নেই!"

আশীর্ব্বাদের ঘরে ছোট একটি টেবিলের উপর, পর্য্যাপ্ত পুষ্পমালায় বিভূষিত করিয়া, অসীমের স্বর্গগত পিতা ও মাতার দুইখানি তৈলচিত্র পাশাপাশি রাখা হইয়াছে। কোনও নিকট-আত্মীয় না থাকায়, তাহার

পিতামাতার প্রতিকৃতি দুইখানিই পুত্রের বিবাহে প্রতিভূ হইবে বলিয়া, চিত্র দুইখানি চৈতনপুর হইতে জানকী আনিয়াছে।

নির্ব্বিঘ্নে পাত্রাশীর্ব্বাদ হইয়া গেল। কন্যার আশীর্ব্বাদী সময়ে অন্যান্য বহু সামগ্রীর সহিত, রূপার একটি কৌটায় সযত্নে রক্ষিত এক-জোড়া সোনার বালা বাহির করিয়া, অসীমের হাতে দিয়া, জানকী ভাবাবেগে গভীর স্বরে কহিল—"বাবা, কর্ত্তাবাবু কি মাঠাকৃরুণ যে নাই, তা মনে করো না। ঐ তাঁদের প্রতিকৃতি আছে। তাঁরাও অশরীরী হয়ে তাঁদের একমাত্র বংশধরের শুভ বিবাহে এখানে উপস্থিত হয়ে আশীর্ব্বাদ করচেন। এই বালাজোড়াটি মা-লক্ষ্মীর হাতে পরিয়ে দাও।"

শীলাকে কহিল—"মা লক্ষ্মী, তুমি আমাদের চৈতনপুর রাজ-পরিবারে রাজলক্ষ্মী হয়ে যাচ্ছ! তোমাদের বংশে গত তিন পুরুষ যাবৎ, আশীব্বাদীর সময়ে এই বালাজোড়াটি কন্যার হাতে পড়িয়ে দেবার প্রথা চলে আসচে। তোমার হাতে উঠে এই চতুর্থ পুরুষ আরম্ভ হবে! এটি অত্যন্ত পয়মন্ত। তোমার স্বামীর পূর্ব্বপুরুষেরা ইষ্টদেবতার মত এটিকে দেখে আস্‌চেন! আজ থেকে এক বৎসর-কাল এ বালা তোমায় পরে' থাকতে হবে। কোনও কারণে এক দণ্ডের জন্যেও হাত হতে যেন নামান না হয়। এই তোমার শ্বশুরবংশের আদেশ। এক বৎসর যেদিন পূর্ণ হবে, সেদিন তোমাদের কুলদেবতা শ্রীধরের সম্মুখে নামিয়ে, ঐ ঠাকুরঘরের সিন্দুকেই এটি রেখে দিও। তারপর তোমার যখন আবার বৌ আসবেন, তখন এমনি করে এই বালা পরিয়ে, তাঁকে ঘরে আন্‌বে।"

অসীম সলজ্জভাবে কৌটাসুদ্ধ বালা-জোড়াটি হাতে করিয়া নতমুখে বসিয়াছিল।

ডাঃ পাকড়াশী কহিলেন—"মল্লিকমশাই, এটা নিতান্তই কুসংস্কার। আপনি বল্‌চেন বটে, কিন্তু ঐ ভারী বেপ্যাটার্ণ একজোড়া বালা আজকালকার মেয়েরা এক বৎসরকাল, পরে থাকতে রাজী হলে হয়!"

জানকী কহিল—"এ অলঙ্কার দেহের নয়, ডাক্তারবাবু, এ মনের। শ্রদ্ধার সঙ্গে বংশের কল্যাণের জন্যে এটা পরতেই হবে। এটা অলঙ্কার বটে, তবে বিলাসের নয়। মধু যেমন পানীয়, তেমনি অষুধও: কিন্তু মধু খাবার মত দেহ রাখতে হলে, অষুধ খাওয়াও সময় সময় দরকারী হয়ে পড়ে ত! অষুধ খাওয়া যদি কুসংস্কার না হয়, তাহলে এটাও নয়।"

সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

ডাক্তারবাবু কহিলেন—"যাই বলুন, এ কুসংস্কার—"

জানকী একটু তীক্ষ্ণভাবেই কহিল—"মাপ করবেন ডাক্তারবাবু, নিজেদের সব-কিছু কুসংস্কার বলে' উড়িয়ে দেওয়াও, আপনার একটা মারাত্মক কুসংস্কার হয়ে পড়েচে, দেখ্‌চি। হাজারটা কুসংস্কার যদি মানি, তার উপরে আর একটা মানতেই বা তবে আপত্তি কিসের?"

চুণীবাবু কহিলেন—"থাক্, থাক্, এ তর্ক বাইরে গিয়ে হবে। এখন যে কাজ হচ্ছে, তাই হোক। উঃ বৃষ্টি এল বলে'—ঝড় উঠেচে। দাও বাবা. বালাজোড়াটা তুমি পরিয়ে দাও—"

লজ্জাকম্পিত হাতে সসঙ্কোচে শীলার হাতে বালাজোড়াটি পরাইতে গিয়া, হঠাৎ অসীমের হাত এমন কাঁপিয়া উঠিল যে, হাত ফস্কাইয়া একগাছা মাটিতে ঠক্ করিয়া পড়িয়া, বহু দূর পর্য্যন্ত গড়াইয়া চলিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা হাওয়া আসিয়া ঘরের সার্সি-খড়্‌খড়িগুলি সশব্দে নাড়া দিয়া, কক্ষমধ্যে একটা বিরাট দৈত্যের মত উপদ্রব জুড়িয়া

দিল। অসীমের পিতামাতার তৈলচিত্র দুইখানি টেবিলের উপর হইতে ভূমিতে পড়িয়া গেল ঃ ঘৃতদীপ নিভিয়া গেল ঃ ধূপের গন্ধ উড়িয়া গিয়া, ধূপদানীর ছাইয়ে ঘর ভরিয়া উঠিল ঃ ধান্য-দূর্ব্বা-চন্দনসহ রূপার থালিটি উল্টাইয়া পড়িল! অকস্মাৎ এই উৎপাতে লগ্নও অতিবাহিত হইয়া গেল। কিয়ৎকালের জন্য সকলেই কেমন বিভ্রান্ত এবং বিমূঢ় হইয়া পড়িল। ব্যস্তভাবে দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া, ঝড়-জলকে সবলে ঘর হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য সকলে একত্র হইয়া উঠিল।

গৃহিণী ও অন্যান্য পুরাঙ্গনাগণ পুনরায় গোছগাছ করিতে লাগিলেন।

সহসা সকলেরই মনটা একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ডাঃ পাকৃড়াশীও অব্যক্ত কারণে একটু বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়া, মনে-মনে মনকে কহিলেন—তাঁহারও কি কুসংস্কারের ছোঁয়াচ লাগিল?

ঘরে একটা বিশ্রী অস্বস্তির নীরবতা ছড়াইয়া পড়িল। বাহিরে দৈত্যকুলের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার এবং প্রলয়মাতন।

গৃহিণী কহিলেন—"আমি জানি, শীলা যে বাদুলে—"

সুবোধ জ্যেষ্ঠাকে সমর্থন করিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল—"বাদুলে বলে' বাদুলে? মনে আছে, দিদি? শীলা যেদিন হয়? জামাইবাবু, আপনার মনে আছে? শীলার জন্মদিনে, পদ্মায় কি ভীষণ তুফান্! কত নৌকো যে সেদিন ডুবেছিল, আর কত লোক যে মরেছিল, আজ অবধি তার আর লেখাজোখা হল না!"

নীরন্ধ্র কালিমায় আকাশটা সদ্যোত্থিত জলহস্তীর মত দেখাইতেছিল। এই ভয়াল জন্তুটার শ্বাসে-প্রশ্বাসে বহিতে লাগিল প্রবল বাত্যা, তাহার ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গিমায় ঝলসিতে লাগিল ক্ষণে ক্ষণে

ক্ষণপ্রভা, তাহার হুঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল বজ্র, তাহার স্বেদজলে ঝরিয়া পড়িল মহাপ্লাবনের অশ্রান্ত ধারা।

নহবৎ বাজিতেছিল। দূরাগত ক্রন্দনধ্বনির মত তাহার ক্ষীণ শব্দ, ধনীর দুয়ারে দরিদ্রের ন্যায়, সার্সি-খড়খড়িতে মাথা কুটিয়া মরিতেছিল।

সমারোহে পুরনারীগণের পরিহাসে ও কলহাস্যে, বর্ষাধৌত রজনী-গন্ধার মত, উৎসবটি মুখর ও রমনীয় হইয়া উঠিল। কাহারও মনে আর কোনও গ্লানি রহিল না। ফুলের মালায় বুকের ক্ষত চাপা পড়িল।

উদ্যোগপর্ব্ব শেষ হইল। প্রমোদক্লান্ত তরুণীগণ গৃহে ফিরিয়া বাত্যাবিতাড়িত ব্রততীর মত শ্রান্ত দেহ এলাইয়া দিয়া স্বপনহীন সুপ্তিসুখে যখন নিমগ্ন, তখন দ্বিতলে পর্দ্দা-ঢাকা বারান্দার স্বল্পালোকিত এক কোণে, অসীম একাকী চুপ করিয়া বসিয়া। বাহিরে ক্লান্তিহীন বারিপাত: বারান্দাটি বন্দিনী হাস্নু-হানা এবং রজনীগন্ধার সুরভিত নিঃশ্বাসে উতল এবং আকুল।

নিঃশব্দপদসঞ্চারে শীলা আসিয়া অসীমের পাশে দাঁড়াইল।

অসীম চমকিয়া উঠিল। কহিল—"কি? এখনও ঘুমোওনি যে?"

শীলা কহিল—"আমিও তোমাকে ঠিক ঐ প্রশ্নই করতে এসেচি।"

অসীম কহিল—"কি জানি, ঘুম আসচে না।"

শীলা জিজ্ঞাসা করিল—"শরীর ভাল আছে ত?"

অসীম ম্লানহাস্যে উত্তর দিল—"অত্যন্ত ভাল আছে।"

শীলা কহিল—"তোমার আজ হল কি? এমন গাম্ভীর্য্য বা খারাপ মেজাজ তোমার ত কখনো দেখি নি! তোমার জন্যে এমন উৎসবটাই মাটি হয়ে গেল। কি হয়েচে?" বলিয়া শীলা বসিল।

অসীম কহিল—"ঠিক ধরেচ', মনটা ভাল নেই। কিন্তু কেন যে মন খারাপ হল, সেটা আমি সন্ধ্যাবেলা থেকেই ভাবচি, কিন্তু কিছুই ঠাওর করতে পারচি না। তুমি এর কিছু কারণ নির্দ্ধারণ করতে পার, শীলা?"

শীলা ঘামিয়া উঠিল। শীলার মনেও একটা কালো ছায়া পড়িয়াছে। সেটা সে কতকটা বুঝিতে পারিলেও, স্বীকার করিতে পারে না। শীলা তাহার মন হইতে যতই সেই কুসংস্কারটাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে চায়, ততই সেটা আরও চাপিয়া বসে। শীলা হয়ত এ কাঁটাটি তুলিয়া ফেলিতে পারিত, যদি অসীম আশীর্ব্বাদীর ঠিক পর হইতেই, এমন অন্যমনস্ক না হইয়া পড়িত! এক-একবার শীলার মনে হইতেছে, বুঝি বা একটি কাঁটাই দুইজনের মনে বিঁধিয়াছে। শীলা আন্দাজ করিলেও, প্রকাশ করিতে পারে না! কি জানি, কাঁটা যদি একটাই হয়? তাহা হইলে, তাহার কাঁটাটিতে হাত দিলে, অসীমের বুকেও যে আঘাত লাগিবে! কাঁটারও পরিচয় ফাঁস হইয়া পড়িবে! শীলা চায়, কাঁটা না তুলিয়া, ক্ষত আরাম করিতে।

কহিল—"কারণ নির্দ্ধারণই যদি করতে পারতাম, তাহলে কি আর এতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি মন খারাপ করে বসে থাকতে পারতে? আমার বান্ধবীরা হাসি পরিহাস রসিকতা গান কিছুই বাকী রাখেনি, কিন্তু হঠাৎ কি যে তোমার হল, কিছুতেই তুমি প্রফুল্ল হলে না! তোমার ভাবান্তর দেখে, তারা সব দুঃখিত হয়েই বাড়ী চলে গেল। মা-ও তোমার এই হঠাৎ অপ্রফুল্লতা লক্ষ্য করেচেন। সন্ধ্যে থেকে তুমি কারো সঙ্গে ভাল করে কথা পর্য্যন্ত বল নি।"

অসীম স্বীকার করিল। উদাসীনভাবে কহিল—"ঠিক বলেচ শীলা,

কিন্তু আমি ইচ্ছে করে এ সব করি নি, আমায় বিশ্বাস কর'। বরং আমি জোর করে ফুর্ত্তি করতে চেষ্টা করেছি, প্রাণপণে চেষ্টা করেছি প্রফুল্ল হতে, কিন্তু পারি নি। কে যেন আমার কণ্ঠ রোধ করে' বুকে বসে রয়েচে।"

শীলা কহিল—"একখানা বইয়ে পড়েছিলাম একবার, বিবাহের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে, কোন কোনও পুরুষ এমন দমে' যায় যে, সে যেন একটা মহা অপরাধ করচে। বিয়ে না হলেই সে যেন খুসী হয়!"

অসীম জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

শীলা কহিল—"একটা প্রকাণ্ড দায়িত্ব ঘাড়ে নেবার আগে দায়িত্ব-জ্ঞানশীল বিচক্ষণ লোক একটু চঞ্চল, একটু ভীত, একটু উত্তেজিত হয়েই থাকে। হওয়াই স্বাভাবিক। আমার মনে হয়, ঐ অব্যক্ত কারণেই স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়ে, তোমার মনটা হঠাৎ এমন অবসন্ন হয়েচে!"

অসীম কহিল—"আমার মন না হয় খারাপই বল আর অবসন্নই বল' —যা হয় একটা কিছু হয়েচে। তোমার কি হয়েচে? তোমারও ত ঘুম নেই। তোমার মনও কি ঐ কারণেই অবসাদগ্রস্ত?"

শীলা কহিল—"ঠিক তার উল্টো। মনে শুধু অবসাদ এলেই যে ঘুম আসে না, তা নয়ঃ মনে আনন্দের আতিশয্য ঘটলেও ঘুম হয় না। আমার মন আজ পালকের মত হাল্কা, পুলকের প্রাচুর্য্যেই আমার ঘুম আসচে না।"

অসীম সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"পুলক?"

শীলা কহিল—"নিশ্চয়। মেয়েদের ভাবনা বিয়ের আগেঃ কার সঙ্গে বিয়ে হবে, কেমন বর হবে, কি বলবে, কোথায় নিয়ে যাবে—এই রকম হাজার চিন্তায়, বিয়ের আগেই মেয়েরা ভাবে, ভেবে ভেবে শুকিয়ে ওঠে।

কিন্তু বিয়ে হয়ে গেলে, আর ঘর-বর যদি ঠিক তার মনের মত হয়, তাহলে মেয়েরা শুধু নিশ্চিন্তই হয় না, হাতে স্বর্গ পায়। এই জন্যেই, বিয়ের পরেই মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যও ভাল হতে আরম্ভ করে। একটা কথাই তাই হয়েচে—বিয়ের জল গায়ে পড়্‌লেই মেয়েদের চেহারা খোলে! আজ থেকে আমার সব চিন্তাই চিন্তামণি গ্রহণ কর্‌লেন। আমি নিশ্চিন্ত।"

অসীমের মনটা একটু লঘু হইল। কহিল—"বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক শীলা। এইবার আমি যেন কতকটা ধর্‌তে পার্‌চি। আচ্ছা, এইবার তুমি শোওগে যাও, দু'টো বাজল। কাল সকালেই আবার গায়ে হলুদের মস্ত এক হাঙ্গামা আছে।"

৫ই অগ্রহায়ণ শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইল। যথাসময়ে জানকী মল্লিক বরবধূ লইয়া চৈতনপুরের পথে কলিকাতাগামী ট্রেণে আরোহণ করিল। রাণাঘাটে নামিয়া গাড়ী বদল করিতে হইবে।

শীলা চোখের জলে, অশ্রুভারাতুর পিতামাতাকে পশ্চাতে ফেলিয়া, প্রথম স্বামীগৃহে যাত্রা করিল।

সেদিনও আকাশে মেঘের উৎসব ছিল, কিন্তু জল ছিল না। কেবল বিদ্যুৎ-দৈত্য সশব্দে ঘনঘন কোষ হইতে তরবারি নিষ্কাসিত করিয়া যতবার ইহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছিল, ততবারই এক করুণাময় দেবতার বজ্রগম্ভীর আদেশে, সে তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া, অপ্রসন্নমনে পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বালিগঞ্জে সুপরিসর একখণ্ড জমির উপর, নবনির্ম্মিত ত্রিতল একখানি বাড়ী। চতুর্দ্দিকে উঁচু প্রাচীর-ঘেরা সীমানা। জমির মধ্যখানে বাড়ী, চারিদিকে খোলা মাঠ। বাড়ীটি অতি-আধুনিক মার্কিনী ধাঁচের। বাড়ীর মালিক চন্দনার জমিদার হরগোবিন্দ রায় চৌধুরী।

হরগোবিন্দর বয়স ষাঠের কাছাকাছি। গৌরবর্ণ, পাতলা ছিপছিপে, ঋজু বলিষ্ঠ দেহ ; মাথার চুলগুলি কাল কশ্‌কশে, একটি দাঁতও পড়ে নাই। এখনও তিনি মাঝে মাঝে নারিকেল দিয়া গরম মুড়ি-ছোলাভাজা খান, আখের টিক্‌লি চিবান এবং প্রত্যহ নিমের দাঁতন করেন। ভোর পাঁচটায় শয্যাত্যাগ করিয়াই তিন-চার মাইল বেড়াইয়া আসিয়া, এক ছটাক খাঁটি সরিসার তৈল মর্দ্দন করাইয়া, ঠাণ্ডা জলে স্নান করেন। পূজাহ্নিক সারিয়া, ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় আটটায়, সেরেস্তায় বসেন, ওঠেনও ঠিক বেলা বারোটায়। এক কথায়, হরগোবিন্দর সব কাজই ঘড়ি-ধরিয়া। সাধারণত, এ নিয়মের বড় ব্যতিক্রম হয় না।

লোকটি রাশ-ভারী। সেকালের লোক বলিয়া, পুরাতনে গোঁড়ামি এবং এ-কালের সব-কিছুকেই তিনি যেমন তাচ্ছিল্য করেন না, তেমনি কলিকাতাবাসী হইয়া লোক-দেখান বড়-মানুষী এবং শ্বেতাঙ্গ-ভক্তি বা ধনীপ্রীতিও তাঁহার ছিল না। তিনি একদিকে যেমন পাকা জমিদার, বিশেষ বুদ্ধিমান্ এবং মিতব্যয়ী, অন্যদিকে তেমনি অতীব অমায়িক মিষ্টভাষী, সচ্চরিত্র, এবং আশ্রিতবৎসল। তিনি পূজা আহ্নিক এবং কুল-

দেবতার সেবা না হইলে জলগ্রহণ করেন না : বাড়ীতে বারো মাসে তের-পর্ব্বও আছে—কিন্তু বিলাতী-হোটেলেও খান্, দরবারেও যান এবং সরকারী খাতায় মোটা চাঁদাও দেন। বাড়ীতে বাংলা ও ইংরাজী অনেক বই আছে। তাঁহার বইয়ের আল্মারিগুলি লোক ঠকাইবার জন্য আস্বাবের সামিল নয় : তিনি রীতিমত বই কিনেন এবং পড়েন। পান তামাক হইতে উচ্চতর সকল প্রকার নেশার উপর তিনি হাড়ে চটা।

পৌষ মাস। প্রাতঃকাল, প্রায় সাড়ে আটটা। কন্‌কনে শীত। ত্রিতলের সুসজ্জিত একটা কক্ষে, দড়ির চটি পায়ে হরগোবিন্দ উত্তেজিত-ভাবে পদচারণা করিতেছিলেন। পূর্ব্বদিকে একটা মশারিঢাকা পালঙ্কে লেপ-চাপা দিয়া, তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় রুগ্ন পুত্র নিদ্রিত।

ভৃত্য মাধব আসিয়া সংবাদ দিল, দাদাবাবু আসিয়াছেন। হর-গোবিন্দ সেই ঘরে তাহাকে ডাকিতে আদেশ দিলেন।

যতীন আসিয়া পদধূলি লইল। ঘরে ঢুকিয়াই যতীন বুঝিল, চৌধুরী মহাশয় কিঞ্চিৎ উত্তেজিত। খোকা ঘুমাইতেছিল বলিয়া, হরগোবিন্দ নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছ'টায় গাড়ী পাঠিয়েচি, আর তুই এখন এলি, যতু? গাড়ী ঠিক পৌঁছেছিল ত?"

যতীন সবিনয়ে জানাইল—"আজ্ঞে হাঁ, পিষে মহাশয়, গাড়ী ঠিকই পৌঁছেছিল, আমারই বেরুতে একটু দেরী হয়ে গেছে।"

হরগোবিন্দ সুবিখ্যাত চিত্রনট যতীন মজুমদারের পিষা মহাশয়।

হরগোবিন্দ নিশ্চিন্ত হইয়া কহিলেন—"তা হোক্, এমন কিছু দেরী হয় নি। আমি জানতে চাই—গাড়ী ঠিক গিয়েছিল এবং পথে ব্যাটা কোথাও আড্ডা মারেনি। তোর যাবার কোনও তাড়াতাড়ি আছে নাকি?"

যতীন কহিল—"আজ্ঞে না। কয়েক দিন রোজ ১৮।১৯ ঘণ্টা করে' কাজ করে, আজ কাল দু'টো দিন বিশ্রাম করব, ঠিক করেছি।"

চৌধুরী মহাশয় পুলকিত হইয়া কহিলেন—"ভালই হয়েছে; বাবা, তাহ'লে আজ দিনভোর তুই এইখানেই থাক্। তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। মহামুস্কিলে—"

নিদ্রাভঙ্গে খোকা উঠিতেই, মুখের কথা অসমাপ্ত রাখিয়া, তাহার কাছে গিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন আছ, বাবা?"

খোকা কহিল—"ভাল আছি, বাবা। আরে—বড়দা কখন এলে?"

চৌধুরী মহাশয়ের মুখে পুলকের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। খোকার হাত মুখ ধুইবার গরম জল, তোয়ালে, দাঁতমাজন প্রভৃতি হাতে হাতে দিয়া, কাপড়চোপড় ছাড়াইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যতীন এদিক-ওদিক চাহিয়া, একটু বিস্মিতভাবে পিষাকে সাহায্য করিতে গেল। হরগোবিন্দ যতীনকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন—"থাক্ বাবা, তুমি স্থির হয়ে বস', আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি! এ তুমি পারবে না।"

যতীন প্রতিবাদ করিতে গেল। চৌধুরী মহাশয় বাধা দিয়া কহিলেন—"এ তুমি পারবে না, যতু! ছেলের কাজ বা তার সেবা-শুশ্রূষা তার বাপ-মা ছাড়া, আর কেউ পারে না। অবিশ্যি, তোমার পিষিমা থাকলে, কোন ভাবনাই থাকত না। তিনি যখন নেই, তখন আমাকেই এ তাল সাম্‌লাতে হবে। পারব না বল্‌লে বা বিরক্ত হলে ত চল্‌বে না, বাবা। ছেলেপিলে হয়েছে, এইবার বুঝ্‌বে—বাব হওয়ার শাজা! বৌমা বেঁচে থাকুন, ছেলে-দুটি বেঁচে থাক্, তোমায় যেন আমার মত, একাধারে বাপ আর মা না হতে হয়।"

ভৃত্যেরা দুয়ারের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, গরম দুধ প্রভৃতি আনিয়া হাজির করিল। রোগীকে খাওয়াইয়া, সুস্থ করিয়া, চৌধুরী মহাশয় খোকাকে কহিলেন—"তাহ'লে এইবার ও-ঘরে বসে' তোমার বড়দার সঙ্গে আমি একটু কথা কইগে : তুমি খেলা কর। কেমন?"

খোকা কহিল—"কেন এ ঘরে তোমাদের কথা হয় না, বাবা?"

হরগোবিন্দ সহাস্যে কহিলেন—"আমরা কাজের কথা কইব, তুমি তা কি বুঝবে? আমরা এই পাশের ঘরেই ত রইলাম। মাধব, ছোটবাবুর সব খেল্না বের করে দে।"

খোকা আর দ্বিমত করিল না। যতীনকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—"আমায় গল্প না বলে, তুমি যেন পালিও না, বড়দা।"

যতীন কহিল—"পাগল? আমি সারাদিন থাক্‌ব। পিষেমশায়ের সঙ্গে কথা সেরেই, আমি তোমার কাছে এসে বস্‌চি—"

পাশের ঘরে দুইজনে মুখোমুখি বসিলেন।

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার সে মেম্-সায়েব নার্স কোথা গেল, পিষেমশায়? ছুটি নিয়েচে বুঝি?"

চৌধুরী মহাশয় কহিলেন—"সেই সব কথা বল্‌বার আর পরামর্শ করবার জন্যেই ত তোমায় ডেকেচি, বাবা। প্রথমেই বলে রাখ্‌চি, তোমার কথা না শুনে, বড্ড ঠকেচি। মিছিমিছি কতকগুলো টাকা গচ্চা গেল, অপমানও হলাম।"

যতীন কৌতূহলী হইয়া হরগোবিন্দর মুখপানে চাহিল।

হরগোবিন্দ কহিতে লাগিলেন—"সবাই বলে, ইংরেজ নার্স ছেলে-পিলেদের খুব যত্ন করে, তাই ভেবে মাসে দু'শো টাকা মাইনে,

খাওয়া-পরা-থাকা সব স্বীকার করে, সেই বেটিকে রাখ্‌লাম। ছিল'ত মোটে দু'মাস: প্রথম মাসটা বেশ ভালই রইল, খোকাকেও বেশ যত্ন-আত্যি করত, আমি ভাব্‌লাম, ভালই হল। আমার শোবার ঘর পর্য্যন্ত তাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম থাক্‌তে। আমি চলে গেলাম, একেবারে দোতলায়। এ ত তুমি জান। সকাল-বিকেল গাড়ী করে খোকাকে নিয়ে বেড়াতে যেত। একলা তার সঙ্গে ছেলে ছেড়ে দিতাম না, সঙ্গে মাধবও থাকৃত। পরে শুন্‌লাম, ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে, সে মাঝ-পথে কোথায় যেত, আর এরা গাড়ীতে চুপচাপ বসে থাকৃত। ঘণ্টা-দুই আড্ডা মেরে বাড়ী ফিরৃত। বেড়ান মোটেই হত না।"

যতীন বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল—"বলেন কি পিষে মশায় ?"

হরগোবিন্দ কহিলেন—"শেষ পর্য্যন্ত শোন' আগে, তাহলে বুঝ্‌বে—দুধ-কলা দিয়ে কি কাল-সাপই না পুষেছিলাম! বেড়ান ত হতই না, ছেলের যত্নেও ক্রমশ ঢিল পড়্‌তে আরম্ভ হল। দিবারাত্র, যখনই উপরে আসি, দেখি, মেম্‌-সাহেব টেলিফোনে প্রেমালাপ করৃচেন্! আমি এসব দেখেও দেখ্‌তাম না। ভাবতাম্, মরুক্‌গে। সেদিন সকালে উপরে উঠ্‌চি, শুন্‌লাম, মহারাণী টেলিফোনে প্রেম করৃচেন, আর খোকা ও-ঘর থেকে ডাকাডাকি করৃচে, সেদিকে খেয়ালই নেই। আমি চুপ করে সিঁড়ির দোরে দাঁড়ালাম, দেখি কি ব্যাপার। খোকার ডাকাডাকিতে তিনি অগ্নিশর্ম্মা হয়ে, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, ওকে যেন খেতে এলেন, আর যা মুখে এল, তাই বলে গালাগালি দিয়ে, বলে কিনা, কেলে-কুত্তার মত সেই থেকে ঘেউ ঘেউ কচ্ছিস্, কি তোর মাথামুণ্ডু করৃব, বল্? বলে'—এমন করে সাবুর বাটিটা তার দিকে এগিয়ে দিল

যে, বাছার গায়ে প'ড়ে, বিছানা বালিশ ভিজে, একটা ঘা—তা! আমার আর সহ্য হ'ল না! আমি এসে তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে, সে আমার মুখের উপর চেঁচিয়ে, চোঁপা করে', আমাকে পর্য্যন্ত অপমান করে! এত বড় তার আস্পর্দ্ধা? আমাকেও বলে কেলেকুত্তা! জঙ্গীকে বল্‌লাম, নিয়ে আয় আমার হাণ্টার! আমি হরগোবিন্দ চৌধুরী, রাধাগোবিন্দ চৌধুরীর ছেলে, কৃষ্ণগোবিন্দ চৌধুরীর নাতি, ধন্বন্তরী গোত্র, বদ্দি। আমার ছেলেকে চোখ রাঙাবে, আমায় অপমান করবে—আমার চাকরাণী? একেবারে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত পাট বিছিয়ে দিলাম হাণ্টার দিয়ে।"

যতীন নিরুদ্ধশ্বাসে কহিল—"পিষে মশায়—"

হরগোবিন্দ কহিলেন—"হাঁ বাবা, চৌধুরী-গোষ্ঠীর নামও যেমন দেশ জোড়া, তাদের রাগও তেমনি ডাকসাইটে। বেটিকে গলাধাক্কা দিতে দিতে তখ্‌খুনি ফটক পার করিয়ে দিলাম!"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—"মার খেয়ে অমনি চলে গেল?"

হরগোবিন্দ উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন—"তাই কি যায়, বাবা? সে থানায় ডাইরি করাতে গিয়েছিল। দারোগা এসেছিল তদন্ত কর্‌তে, তাকেও সব বল্‌লাম। শুন্‌লাম যে, পুলিশ কেস্‌ নেয় নি, তাকে আদালতে নালিশ কর্‌তে বলে, বিদেয় দিয়েচে। চৌধুরীগোষ্ঠী কি ফৌজদারীতে ডরায়? না হয়, দোবো ৫০ টাকা জরিমানা। করুক সে মকদ্দমা: তাকে সাত ঘাটের জল খাইয়ে, নাস্তানাবুদ ক'রে যদি না ছাড়ি ত, আমার নাম হরগোবিন্দ চৌধুরীই নয়।"

যতীন সভয়ে কহিল—"স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিলেন ত?"

হরগোবিন্দ মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"আমি ঠিক অনুমান করেচি বাবা,

এইবার তুমি এই কথাই বল্‌বে। আজকালকার ছোক্‌রা কিনা তোমরা? ঐ একটা গালভরা কথাই শুধু শিখে রেখেচ, স্ত্রীলোক! এই যে তোমাদের অন্ধ ফিরিঙ্গিয়ানা, এতেই আমি ভারি চটি।"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—"কেন পিষে মশায়? অন্যায়টা কি?"

হরগোবিন্দ কহিলেন—"এটা যে তোমাদের কত বড় নির্ব্বুদ্ধিতা, তা বোঝাতে গেলে, সাতকাণ্ড রামায়ণ গাইতে হয়। মোটামুটি শুধু এইটুকু বোঝ' যে, যে-সব স্ত্রীলোক, কি-দেশী কি-বিদেশী, যারা সব-তাতেই পুরুষদের সমকক্ষ হতে চায়, তাদের জন্যে কেন পুরুষরা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কর্‌বে? একদিকে নারী-প্রগতি বল্‌চ, অন্যদিকে আবার স্ত্রীলোককে সম্মান দেখাবার নামে, অপমানিত হয়েও প্রতি-অপমান কর্‌বে না—এ কি রকম যুক্তি, বাবাজী? যে-জন্যে আমি হাণ্টার ব্যবহার করেচি, সে-কাজ যদি কোনও পুরুষে কর্‌ত, নিশ্চয়ই তুমি তাহলে আমাকে এমন দোষী কর্‌তে না। কিন্তু যেহেতু সে স্ত্রীলোক, অমনি তোমার শিভ্যালরি জেগে উঠ্‌ল। স্ত্রীলোককে সম্মান কর্‌তে চন্দনার চৌধুরীগোষ্ঠী খুব জানে, যদি সে স্ত্রীলোক হয়। যে-স্ত্রীলোকের এতটা মর্দ্দানি আর এত বড় বুকের পাটা যে, রাধাগোবিন্দ চৌধুরীর ছেলেকে আর তাঁর নাতিকে ডার্টি ডগ্‌ বল্‌তে পারে, তার হাণ্টার খাবার মত দুঃসাহসও থাকা উচিত! সে স্ত্রীলোক হতে পারে, কিন্তু মহিলা নয়। কল্‌কাতায় দেখ্‌চি, দেশী মেয়েরা আজকাল পথে বেড়ান্‌, একাই ট্রামে-বাসেও যাতায়াত করেন, অথচ লেডিজ সীটে বসেন। কেন, বল্‌তে পার? কেন তাঁরা পুরুষদের পাশে এসে বস্‌তে পারেন না? আরে বাপু, স্ত্রীলোক আর পুরুষ, দুটো সম্পূর্ণ বিভিন্ন জীব।

এটা অস্বীকার করলে চল্‌বে কেন? তাদের দেহ, গঠনভঙ্গী, শারীরিক ক্রিয়া-কলাপ, শক্তি, বুদ্ধি, মনস্তত্ত্ব—সমস্তই যে আলাদা! পুরুষদের সঙ্গে তাদের কোথাও কোনও বিষয়েই মিল নেই! ভগবান যাদিকে এমন স্বতন্ত্র করে গড়েচেন, তারা কি-বুঝে পুরুষদের সমান হতে চায়, বাপু? এ কি খোদার উপর খোদকারী নয়? এ হবে কেন? স্ত্রীলোকের মনস্তত্ত্ব যে কি রকম নিকৃষ্ট, তার প্রমাণ তাদের পুরুষদের সমকক্ষ হবার চেষ্টা দেখেই বোঝা যায়। পুরুষের বলিষ্ঠ মন ত কখন রমণীর সমকক্ষ হতে চায় না! স্ত্রীলোকেরা এটা বোঝে না: তারা অল্পবুদ্ধি। কিন্তু পুরুষরা যখন এই নিয়ে বাড়াবাড়ি আর মাতামাতি করে, তখনি আমার গা চিড়বিড় করে ওঠে। শিশু চাঁদ ধরতে হাত বাড়ায়, দেখতে ভাল লাগে, কিন্তু আমি যদি তা করি, কেমন লাগে, বাবা? স্ত্রীলোক পুরুষের সমকক্ষ কোন দিনই হতে পারে নি, পারবেও না।"

যতীন কহিল—"কেন পারবে না? ক্রমশ পারবে। দেখুন না, আজকাল মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ডিগ্রি, সব সম্মানই পাচ্ছে।"

হরগোবিন্দ উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন—"ডিগ্রি নেওয়ায় বাহাদুরি থাকতে পারে, পৌরুষ নাই। পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত কখনো শুনেচ কি মেয়ে-ইঞ্জিনিয়ার? সৈন্য? সেনাপতি? বীর? কারিগর? মুটে? গাড়োয়ান্? মেয়ে মাঝিমাল্লা হ'তে, জাহাজের নাবিক? পৌরুষ বলি একে। করুক্ মেয়েরা এই সব কাজ? মেয়েরা কটা দেশ আবিষ্কার করেচে, বল? মেয়েদের মধ্যে কটা বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক জন্মেচে? পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে তারা কি দিয়েচে? একে বলে পৌরুষ। পৃথিবীতে কটা মেয়ে জগৎপ্রসিদ্ধ কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক,

সাহিত্যিক কি ধর্ম্মগুরু হয়েচে? নাম কর দেখি একটি ত্যাগী মেয়ের! পারবে না। বাপু হে, না-ভেবে না-চিন্তে মিছেমিছি নারীর মর্য্যাদা আর নারীপ্রগতি বলে লাফালাফি কর' না। অন্তত আমি এ সব শুনতে রাজী নই। যাক, এ সব বাজে আলোচনায় কাজ নেই, এখন কাজের কথাগুলো বলি, এখুনি খোকার খাবার সময় হবে। আচ্ছা দাঁড়াও, দেখে আসি একবার—"

বলিয়া হরগোবিন্দ দ্রুতপদে খোকাকে দেখিয়া আসিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া, কহিলেন—"এইবার তুমি আমায় এমন একটি মেয়ে এনে দাও, যার হাতে আমি খোকাকে সঁপে দিয়ে, খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারি। তুমি যে বলেছিলে, তুমি দেখবে। দেখেছিলে?"

যতীন কহিল—"দেখতে দিলেন কৈ? আপনি বলছিলেন, বাঙালী মেয়েরা ছেলে মানুষ করতে জানে না। তারা ছেলে মানুষ না করে' চিরকাল ছেলে-মানুষই করে রাখে।"

হরগোবিন্দ কহিলেন—"বটে, বাবা বটে, আমি তা বলেছিলাম। কিন্তু সে মত এখন আমি বদলেচি। ঠেকে শিখেচি, বাবা। তোমার কথাই ঠিক: বাঙালীর ছেলে বাঙালীর হাতেই ভাল মানুষ হয়।"

যতীন হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

হরগোবিন্দ নিম্নস্বরে কহিলেন—"বেটির রাগের আরো একটু কারণ ছিল বাবা! বেটির মতলব ছিল খারাপ—"

যতীন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—"আবার কি করেছিল, পিষেমশায়?"

হরগোবিন্দ কহিলেন—"তুমি ছেলে, তবু তোমায় না বলে পারচি না। সে দেখলে আমি বিপত্নীক, যৎসামান্য অর্থও আছে: বাড়ীতে

আর কেউ নেই : গভার্নেস্ না থেকে, তাই সে একেবারে গিন্নিই হতে চাইল! লজ্জার কথা! তার লজ্জা নাই, কিন্তু সে কথা ভাবতে আমার মাথা হেঁটে হয়ে পড়ে! টাকার লোভে এই যাঠ বছরের বুড়োকেও এরা বাদ দিতে চায় না! কি পশু এরা? আর তুমি বল্‌চ, এরা নারী, এদিকে সম্মান কর্‌তে হয়! চন্দনার চৌধুরীরা যে কত পবিত্র, তা তোমার পিতামহ পিতা আর পিষিমা জান্‌তেন।"

যতীন নতমস্তকে শুনিতেছিল। চৌধুরী মহাশয় কহিলেন—"তাহলে, ব্যাপার ত সব শুনলে, এখন তোমার ভাইটি যাতে মানুষ হয়, তার একটা বন্দোবস্ত করে দাও। প্রথমে ভেবেছিলাম, কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিই, কিন্তু তাতেও যে ভাল ফল হবে, তা মনে হল না! এরই কোনও জুড়ীদার হয়ত আবার এসে জুটবে! তার চেয়ে জানা লোক রাখাই ভাল। কাল রাত্রে এইটে ঠিক করে, ভোরেই তোমায় গাড়ী পাঠাই। তুমি যে মেয়ে দেখ্‌বে—সে যেন মৃতবৎসা হয়, বন্ধ্যা না হয়—"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, পিষে মশায়?"

হরগোবিন্দ কহিলেন—"বন্ধ্যা ছেলের মর্ম্ম বুঝবে না। মৃতবৎসার ছেলের মুখ মনে পড়্‌বে, আর তার আমার ছেলের উপর সত্যিকার দরদ হবে। সে যেন বিধবা হয়, তিন কুলে কেউ না থাকে। তাহলে সে এ-বাড়ী ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাইবে না। তার বয়স যেন আটাশ কি ত্রিশ হয়—অর্থাৎ তাকে খোকার মায়ের বয়সী হতে হবে। ওর মা জীবিত থাক্‌লে কত বয়স হত? তুমি ত জান—বল না।"

যতীনের কান পর্য্যন্ত গরম হইয়া উঠিল। কহিল—"আজ্ঞে হাঁ, ঐ রকমই হত, দু'এক বছরের কম বেশী আর কি? ২৬ কি ২৮ অমনিই।"

হরগোবিন্দ কহিলেন—"আমিও তাই বল্‌চি। বলার মানে, সে যেন খোকাকে ঠিক নিজের ছেলের মত দেখতে পারে! নিতান্ত কম বয়স হলে তার মায়ের মন হবে না, আবার বেশী বয়স হলেও তা হবে না। মেয়েটি সচ্চরিত্র এবং শিক্ষিত হওয়া চাই। তবে ত সে ছেলেকে সৎশিক্ষা দিতে পার্‌বে। আমাদের স্বজাতি হলে ত কথাই নাই।"

যতীন চিন্তা করিয়া কহিল—"আচ্ছা পিষেমশায়, আমি দেখ্‌চি। এখন এ-রকম বামুনের গরু পেলে হয়!"

হরগোবিন্দ সহাস্যে কহিলেন—"দেখচি নয়, শীগ্‌গীর দেখ, আর ভাল করে দেখ। আমি তোমার ভরসাতেই থাক্‌লাম। সে যা নেয়, তাই দেব। আজ যদি পাও ত, কাল নয়। দেখ্‌চ ত, সব ঝক্কিটা আমাকেই পোয়াতে হচ্ছে। যেমন বললাম, ঠিক তেমনটি যদি নিতান্ত না-ও মেলে, একটু উনিশ-বিশও হয়, তাহলেও ক্ষতি নেই। এই রকম লোক যদি পাও ত, আমার জন্যে আর অপেক্ষা কর্‌বে না। ঠিক্ করে ফেলে, একেবারে নিয়ে আস্‌বে। এবার দায়িত্ব তোমার। ব্যস।"

যতীন কহিল—"যে আজ্ঞে।"

হরগোবিন্দ কহিলেন—"যাক্ একটা হল! তারপর, গত হপ্তায় আমি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, একজন রেসিডেণ্ট টিউটারের জন্যে। গৌর আর ত পরের ছেলে নয়, এখন সে চৌধুরীগোষ্ঠীর ছেলে, মুখ্যু হলে ত চল্‌বে না? লেখাপড়া শেখা চাই। আট বছরের হল। তাই একজন ভাল শিক্ষক চাই, যার কাছে সে পড়্‌বে, সঙ্গে বেড়াবে, থাক্‌বে, শিখবে। তাকে একাধারে শিক্ষককে শিক্ষক, সাথীকে সাথী হতে হবে। অনেক দরখাস্ত এসেচে। আমি তার মধ্যে

থেকে একজনকে পছন্দ করেচি। সে অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট, ব্যারিষ্টারও মনে হচ্ছে। বয়স বোধ করি, বছর ত্রিশই যেন, ঠিক মনে নাই। তাকে আজ তিনটের সময় সাক্ষাৎ করতে বলেচি। সে আস্‌বে। তুইও থাক্‌বি আমার কাছে, বাবা! একা, না বোকা! তোর কথা না শুনে একবার ঠকেচি বলে, এখন থেকে আর কোন কাজ তোকে জিজ্ঞেস না করে করব না। তোর বুদ্ধিসুদ্ধি ভাল। আমার কি আর কিছু ভাস্থি আছে? বয়েস ষাট হল, কবে আছি, কবে না। হঠাৎ চট্‌ করে যদি কিছু হয়, তাহলে তোকেই ত সব সাম্‌লাতে হবে, বাবা!"

খোকা ডাকিল—"বড়্‌দা—"

হরগোবিন্দ কহিলেন—"তুই যা, খোকার কাছে একটু বস্‌গে। আমি সেরেস্তাটা ঘুরে আসি, সকাল থেকে একবারও যাইনি।"

যতীন খোকার কাছে গেল। হরগোবিন্দ সেরেস্তায় চলিয়া গেলেন।

খোকার নাম গৌরগোবিন্দ, হরগোবিন্দ বাবুর পোষ্যপুত্র। চৌধুরী-মহাশয় অপুত্রক। গৃহিণীও আজ আট বৎসর গত হইয়াছেন। পাছে চন্দনার সুপ্রাচীন চৌধুরীবংশ নির্ব্বংশ হইয়া যায়, তাই হরগোবিন্দ অগত্যা দত্তক লইয়াছেন। এই স্বজাতীয় শিশুকে যতীনই আনিয়া দিয়াছে। হরগোবিন্দ হিন্দুধর্ম্মানুসারে তাহাকে স্বগোত্রীকৃত এবং আইনমতে তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারী করিয়া লইয়া, আপনার সন্তানের মত পরম স্নেহে লালন পালন করিতেছেন। খোকা জানে না যে, সে পোষ্যপুত্র। সে জানে, সূতিকাগারেই তাহার মাতা স্বর্গারোহন করিয়াছেন।

বেলা প্রায় চারিটা। হরগোবিন্দ নীচে বসিবার ঘরের বারান্দায় একটা ঈজিচেয়ারে অর্দ্ধশয়িতাবস্থায় কাগজ পড়িতেছেন ও দরখাস্তকারী

অধিবাসী-শিক্ষকের প্রতীক্ষা করিতেছেন। যতীন আহারান্তে খোকার ঘরে তাহাকে গল্প বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

দারোয়ান একখানা কার্ড আনিল। হরগোবিন্দ ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সস্তা সিগারেটের একটা টিন হাতে, আসিয়া দাঁড়াতেই, হরগোবিন্দ পার্শ্বস্থ শূন্য চেয়ার খানা দেখাইয়া দিয়া, আগন্তুককে বসিতে বলিলেন।

পাশের টীপয়ে রক্ষিত মোটা একটা ফাইল হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া, হরগোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই দরখাস্ত আপনার?"

আগন্তুক কহিল—"আজ্ঞে, হাঁ।"

হরগোবিন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আগন্তুকের মাথার বাম দিকে প্রায় অর্দ্ধেকটায় বিশ্রী একটা পোড়া দাগ, সেখানে চুল পর্য্যন্ত নাই। মাথার যে অপরার্দ্ধে চুল আছে, সেখানে আবার প্রকাণ্ড একটা আঘাতের চিহ্ন। মুখের স্থানে স্থানে পুড়িয়া গিয়া, কালো কালো পোড়া দাগ এবং এখানে-ওখানে মাংস জমিয়া, সদ্য-চষা মাঠের মত নতোন্নত। ভুরু নাই। একটা চোখ ঢেলা বাহির হইয়া অন্ধ। মুখটা এমন বাঁকা যে, কথা কহিবার সময় জিভ বাহির হইয়া পড়ে। আগন্তুকের আকৃতি বিভীষিকাজনক। পরিধানে সস্তা ময়লা এক ইংরাজী পোষাক, দুই-এক স্থানে অল্প অল্প ছেঁড়া। গা দিয়া কেমন একটা দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছিল।

হরগোবিন্দ ইহাকে বাহাল যে করিবেন না, এ তিনি আগন্তুককে দেখিবামাত্রই স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া, কি বলিয়া প্রত্যাখান করেন, এই সমস্যার সমাধান করিতে তিনি

গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিলেন। মৌখিক সৌজন্য রক্ষাকল্পে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কতদিন বিলাতে ছিলেন ?"

আগন্তুক কহিল—"প্রায় পাঁচ বছর।"

—"কোন্ সালে ফিরেছেন ?"

—"১৯৩৭ সালের মার্চ্চে।"

দেখা গেল, আগন্তুকের তিন-চারিটী দাঁত পর্য্যন্ত নাই।

হরগোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি ব্যারিষ্টার ত? তা প্র্যাক্‌টিস ছাড়লেন কেন ?"

আগন্তুক কহিল—"প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভই করিনি, মিঃ চৌধুরী!"

—"তা'হলে এতদিন কি কর্‌ছিলেন ?"

আগন্তুক একটু উষ্ণ হইয়া কহিল—"কত কি যে করেচি, সে সবের কত ফিরিস্তি আপনাকে দেব, বলুন ?"

হরগোবিন্দ দিরক্ত হইলেন। কহিলেন—"আমি আপনার হাতে আমার ছেলেকে ছেড়ে দেব, আপনি হবেন তার শিক্ষক। আপনি এই বাড়ীতে, আমাদের পরিবারভুক্ত একজন বন্ধুর মত থাক্‌বেন, সুতরাং আপনার সমস্ত সঠিক পরিচয়, বংশ, স্বভাবচরিত্র, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মমত প্রভৃতি বিষয় আমায় জান্‌তে হবে, এবং অকপটে আপনাকেও তা জানাতে হবে, যদি এখানে চাকরী করতে চান্। আর শুধু আপনার কথাতেই আমি সন্তুষ্ট থাক্‌ব না: আপনি যে পরিচয় দেবেন, আমি তা পুলিশের দ্বারা যাচিয়ে নেব। আপনি স্বদেশী মামলার বা অন্য কোনও মামলার যে আসামী নন্, সেটাও আমার জানা দরকার। আপনার জন্যে আমি ত বিপন্ন হতে পারব না। কাজেই আপনার সম্পূর্ণ

পরিচয় চাই। অবিশ্যি দেওয়া না-দেওয়া আপনার ইচ্ছে। যদি আপত্তি থাকে, বলবার কোনও প্রয়োজন নেই, আপনি চলে যেতে পারেন।"

যতীন চোখ মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে আসিয়া পিষা মহাশয়ের নিকট বসিয়া, আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আগন্তুকের মধ্যে যতীন যেন কি খুঁজিতেছিল।

আগন্তুক ঘাড় শক্ত করিয়া চৌধুরীমহাশয়ের সহিত এতক্ষণ কথা কহিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার মাথা মুইয়া পড়িল, সে ইহাদের সঙ্গে আর চোখোচোখি করিতেই যেন সাহস করিল না।

হরগোবিন্দ যতীনকে কহিলেন—"শোন্ যতু, ইনি এঁর কোনও পরিচয় দেবেন না, অথচ আমার বাড়ীতে চাক্‌রী কর্‌বেন।"

যতীন অতিথির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কহিল—"আসতে আসতে শুনছিলাম বটে। তা অত হাঙ্গামায় কাজ কি—উনি, যেতে পারেন।"

আগন্তুক আর একটি কথাও বলিল না, নীরবে নতমুখে চলিয়া গেল।

হরগোবিন্দ কহিল—"লোকটার চেহারা যে বীভৎস, তাতে ওকে ত রাখতামই না—কেবল একটু দেরী করছিলাম মাত্র। যাক্ বাবা, ভালয় ভালয় বিদেয় হল, বাঁচলাম। লোকটাকে তেমন সুবিধের মনে হল না।"

যতীন কহিল—"যে বীভৎস চেহারা—"

হরগোবিন্দ কহিলেন—"না বাবা, ওর চেয়েও, ঢের বীভৎস চেহারার লোক আমি দেখেচি। কিন্তু মন অমন আঁৎকে ওঠেনি। ওর কোনও দুর্ঘটনা হয়েছিল, মনে হচ্ছে। খুব সম্ভব, ঘরে আগুন-টাগুন লেগে অমন পুড়ে গেছে। সে মরুক্ গে, যা হয়। যে-মানুষকে দেখামাত্রই মনে হয়, লোকটা পাজী, সে রীতিমত পাজী, দস্তুরমত বদমাইস। এ তুই

মিলিয়ে দেখিস যতু। কুৎসিত চেহারা দেখতে ভাল না লাগতে পারে, কিন্তু কুৎসিত চেহারার লোক দেখ্‌লে কি অন্তর পর্য্যন্ত শিউরে ওঠে? লোকের চেহারা খারাপ হলেই, লোকও যে খারাপ হবে, তার কোনও হেতু নাই। অথচ অনেক সুপুরুষ আছে, যাকে দেখেও মন প্রসন্ন হয় না।"

যতীন অন্যমনস্কভাবে হরগোবিন্দর মুখপানে চাহিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল—"লোকটার নাম কি পিষে মশায়?"

হরগোবিন্দ দরখাস্তখানা হাতে লইয়া পড়িতে পড়িতে কহিলেন —"এই যে, নাম—জীবানন্দ ব্যানার্জ্জি বি-এ (অক্সন্), ব্যারিষ্টার-য়্যাট্-ল, দেশবন্ধু হোটেল।"

যতীন চমকিয়া উঠিল। মনোভাব গোপন করিয়া কহিল—"ও। তা'হলে এইবার যাই, পিষে মশায়। দু'এক জায়গায় খোঁজ করতে হবে ত গভর্ণেসের জন্যে? আজ আর কাল, দু'দিন ছুটির, একদিন ত হয়েই গেল! মাত্র কালকার দিনটা হাতে।"

হরগোবিন্দ প্রস্তাব করিলেন, যতীন ইচ্ছা করিলে গাড়ী লইয়া গিয়া রাখিতে পারে, তাহাতে কাশীপুর হইতে বালিগঞ্জ যাতায়াতের সুবিধা হইবে। যতীন রাজী হইল না। কহিল—"গাড়ীর এখন কোনও প্রয়োজন নেই। যদি হয়, ফোন্ করব।"

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—"এই দূষিত আবেষ্টনীর মধ্যে নিষ্কর্ম্মা হয়ে, অলস কল্পনার অকূল সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে খেয়ে, ক্লান্ত হওয়া অপেক্ষা কি এ ভাল নয়? পুতুল-খেলার চেয়ে ত ভাল!"

বিজলী যতীনের কথা শুনিতেছিল আর পুতুলটির গায়ে হাত বুলাইতেছিল। কহিল—"কিন্তু তুমি যে বলেছিলে খোকাকে আমায় একদিন দেখাবে, তার কি হল?"

যতীন কহিল—"প্রতিজ্ঞা আমি ভুলিনি, বিজলী, যথাসময়েই তা পালন করব। সুযোগ চাই ত? সে মস্ত বড়লোকের বাড়ী, একজন রাজা বল্‌লেই হয়, তাঁর বাড়ীতে ত হুট্ করে' তোমায় নিয়ে যেতে পারিনে! তারা যদি কিছু সন্দেহ ক'রে, তাহলে তোমার ছেলের তাতে ক্ষতি হতে পারে।"

বিজলী ভাবিয়া কহিল—"বেশ, আমায় তাঁর নাম ঠিকানা বলে' দাও, আমি কোনও একটা ছুতো করে, তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে, খোকাকে একবার দেখে আসি। একটিবার দেখবার জন্যে আমার মনটা ভারি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমি স্ত্রীলোক, আমায় ত কেউ বাধা দেবে না—"

যতীন কহিল—"বড়লোকের বাড়ী। তোমাকেই বা দারোয়ানরা ঢুকতে দেবে কেন? আর তাঁদের নাম-ঠিকানা ত তোমায় আমি এখন বল্‌তে পারি না, বিজলী! কেন বারম্বার ঐ কথা বলে' আমায় লজ্জা দিচ্ছ? বল্‌তে পারলে, ঢের আগেই ত তোমায় তা বল্‌তাম।"

বিজলী সজল চোখে জিজ্ঞাসা করিল—"এ আবার তবে কার বাড়ী ?

যতীন কহিল—"গেলেই জানতে পার্‌বে। কেন, আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না ?"

বিজলী বাধা দিয়া কহিল—"ওকি কথা বল্‌চ, যতু ? তোমায় যেদিন অবিশ্বাস কর্‌ব, সেদিন আমার মাথায় বজ্রাঘাত হবে।"

যতীন কহিল—"শোন': এঁরাও খুব বড়লোক। বাড়ীতে কর্ত্তা আর ঐ ছেলেটি ছাড়া তৃতীয় কোনও লোক নেই। এই ছেলেটিকে আঁতুরে রেখে গিন্নির মৃত্যু হয়; কর্ত্তার আর কোনও সন্তান নেই। তিনি একজন মহাশয় লোক—বয়স প্রায় ষাঠ বছর। এমন একজন লোক তিনি চান, যে ছেলেটিকে ঠিক তার মায়ের মত মানুষ করবে। তোমার খাওয়া-দাওয়া থাকা কাপড়-চোপড় অর্থাৎ সমস্ত ভার তিনি নেবেন। মাসিক মাইনেও দেবেন দেড়শো টাকা। এই কাজের জন্যে তিনি একটা মেমকে বাহাল করেছিলেন। কিন্তু সে বেটি টাকার লোভে বাড়ীর গিন্নি হবার চেষ্টা করাতে এবং ছেলেকে ধমক দিতে, তাকে তিনি হাণ্টার মেরে তাড়িয়েচেন—"

বিজলী সচকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হাণ্টার মেরে ? বল কি ? আচ্ছা মানুষরে লোক ত ?"

যতীন মৃদু হাসিয়া কহিল—"একেবারেই তা নন্। দেখ্‌লেই বুঝতে পার্‌বে: অত্যন্ত দয়ালু, মহানুভব ব্যক্তি, চরিত্রবান্ লোক। তিনি তোমায় মেয়ের মত আদর শ্রদ্ধা কর্‌বেন—বিনিময়ে চান, তাঁর ছেলেটিকে তুমি যত্ন ক'র্‌বে। বাড়ীর ঝি চাকর মোটর সব তোমারি হুকুমে থাক্‌বে। তোমার কোনো কষ্ট হবে না। এমন লোক তুমি

এ কালে পাবে না, বিজলী, এ আমি তোমায় জোর গলায় বল্‌তে পারি।”

বিজলী অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল—“কত বড় ছেলে?”

যতীন কহিল—“বছর আষ্টেক হবে, আর কি? ছেলেটি বড় রোগা, জর-জ্বালা এটা-সেটা প্রায়ই লেগে আছে।”

বিজলী চিন্তা করিতে করিতে নিজের মনেই কহিল—“আঁতুরেই মা মারা গেছে কিনা, মায়ের দুধ পায় নি, তাই এমন রুগ্ন!”

তাহার মনের অন্ধকার ঘরেও সহসা একটা আলোকরশ্মি ঝিলিক মারিয়া গেল—তাহার খোকাও ত মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত, সে-ও হয়ত এমনি চিররুগ্ন! রোগযন্ত্রণায় সে যখন ‘মা’ ‘মা’ বলিয়া কাতরায়, তখন হয়ত এমনি কোনও নার্স তাহাকে ধমক দেয়, সে ম্লান মুখে বালিশে মুখ গুঁজিয়া নীরবে গুমরিয়া কাঁদে। নার্স লক্ষ্য করে না, মুখ ফিরাইয়া বসিয়া নভেল পড়ে। বিজলীর গণ্ড বাহিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রুর মুক্তা ঝরিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি পুতুলটিকে বুকে চাপিয়া ভাবাবেশে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—“খোকার ঘুম এসেচে, শুইয়ে রেখে আসি, দাঁড়াও—”

যতীন বিজলীর এই পুতুল-খেলায় যেমন পুলকিত হইল, তেমনি শঙ্কিতও হইল—এ ভাবপ্রবণতা উন্মাদের পূর্ব্বলক্ষণ নয় ত?

বিজলী ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

যতীন কহিল—“ছেলের লেখাপড়ার জন্যে তিনি একজন রেসিডেণ্ট-টিউটার (অধিবাসী-শিক্ষক)ও রাখতে মনস্থ করেচেন। তুমি আই-এ পাশ, অক্লেশে তুমি তাকে পড়াতেও পার’। তাহ’লে আর সে মাষ্টারেরও প্রয়োজন হবে না। দেখ্‌বে, এ জান্‌লে, কর্ত্তা তোমায় হয়ত আড়াইশো টাকা মাইনেও করে দিতে পারেন।”

বিজলী বিমর্ষভাবে কহিল—"এই চাকরীটি আমার খোকার বাড়ীতে যদি হত, তাহ'লে আমি বিনা-মাইনেতে আমরণ থাকতাম্। কি জান, যতু? পরের ছেলেকে যতই স্নেহ করি, আদর করি, সেটা আর যা-ই হোক্, মাতৃ-স্নেহ ঠিক হবে না।"

যতীন প্রতিবাদ করিয়া কহিল—"যে মার নিজের ছেলে হাতছাড়া, আর তার অন্তরে যদি প্রকৃত মা থাকে তাহ'লে কেন সে পরের ছেলেকে নিজের ছেলের মত দেখতে পার্‌বে না? তোমার ছেলেকে যাঁরা পুষ্যি নিয়েচেন, তাঁরাও তাহ'লে, ঐ কথা বল্‌তে পারেন! কিন্তু তাঁরা ত তা করেন না, বরং পরম সমাদরেই তাঁরা তোমার ছেলেকে নিজের ছেলে করে নিয়ে, মানুষ কর্‌চেন্। আমি যত দূর জানি এবং শুনেচি, নিজের ছেলেকেও লোকে এত আদর করে না।"

বিজলী নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

যতীন কহিল—"আমার বিমাতা ছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ আমার তিরিশ-বত্রিশ বয়স পর্য্যন্ত, আমি একটি দিনের জন্যেও জানতে পারি নি যে, তিনি আমার গর্ভধারিণী ছিলেন না। শুনেচি, তোমার ছেলেকেও জানতে দেওয়া হয় নি, যে সে পোষ্যপুত্র। সে জানে, সে ঐ বংশেরই সন্তান।"

বিজলী হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিল—"বটে? আমার খোকা জানেনা যে সে হতভাগিনীর সন্তান? তাঁরা বড় ভাল লোক ত!"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—"আমি ত বরাবরই বলে আসচি, তাঁরা অত্যন্ত ভাল লোক। তাহ'লে, আমার কথার একটা উত্তর দাও।"

বিজলী কহিল—"বেশ, যাব। যা বলেচ, পুতুল-খেলার চেয়ে ত ভাল!"

যতীন কহিল—"একশো বার। তা ছাড়া এঁরাও বড়লোক, তাঁরাও বড়লোক—বড়লোকের কুটুম বড়লোক। কাজেই, এই দুই পরিবারে বন্ধুত্ব এবং আসা-যাওয়াও হয়ত আছে: যদি না থাকে, হতে কতক্ষণ? তাহলে, বাড়ীতে বসেই ত খোকার সন্ধান পাবে!"

বিজলী উচ্ছ্বসিত পুলকে কহিল—"তাই তবে করে' দাও, যতু! লক্ষ্মীটি, মাইনে যদি কমও দেয়, তবু আমি যাব—এঁদের বাড়ীতেই থাকব। কবে নিয়ে যাবে? আজ ত রাত্রি হয়ে গেছে, কাল যাবে?"

যতীন কহিল—"তাঁদিকে বলি। মত হলে কাল-পরশুই নিয়ে যাব।"

বিজলী কহিল—"মাইনের জন্যে আমি যাচ্ছিনা। তবে কিছু হাত খরচ আপাতত চাই, কেননা এ বাড়ী এখন ছাড়চি না। সেখানে বনি-বনাও না হ'লে ফিরে আস্তে হবে ত? হাণ্টার খেয়ে না আস্তে হয়!"

যতীন সহাস্যে কহিল—"ছেলের মা না হয়ে, বাড়ীর গিন্নি হবার চেষ্টা করলে হাণ্টার খেতেই হবে, কেউ রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না।"

উভয়েই জোরে হাসিয়া উঠিল। মনের অনেকটা ময়লা হাসির দমকা হাওয়ায় উড়িয়া গিয়া, উভয়েই অনেকটা হাল্কা বোধ করিল।

রাত্রি প্রায় নয়টা। যতীন বিদায় লইল।

পথে নামিতেই, পথিপার্শ্বস্থ একটা চায়ের দোকান হইতে, একজন লোক খপ্ করিয়া বাহির হইয়া, পশ্চাদ্দিক হইতে যতীনের পিঠে হাত দিতেই, যতীন চমকিয়া, পিছন ফিরিয়া দেখিল, জীবানন্দ।

জীবানন্দ মৃদুস্বরে কহিল—"যতীন, সেই সন্ধ্যে থেকে তোমার জন্যে বসে আছি! একটা কোন নিরিবিলি জায়গায় বসি চল, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

যতীন উল্লসিত হইয়া কহিল—"আমারও আছে। চন্দনা-হাউস থেকে আমি ঠিক তোমার পিছু-পিছুই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু পথে এসে তোমায় আর খুঁজে পেলাম না।"

জীবানন্দ চাপা গলায় কহিল—"চুপ্। পথে কোনো কথা নয়।"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি বল দেখি? তোমার একি অবস্থা? এত দিন ছিলে কোথা?"

জীবানন্দ কহিল—"সেই কথাই বল্‌ব। কিন্তু তার আগে আমায় কিছু খাওয়াও ভাই, সকাল থেকে আমার কিছু খাওয়া হয়নি।" বলিয়া হস্তস্থিত সিগারেটের টিনের ভিতর হইতে একটি বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইয়া কহিল—"বিড়ি ত তুমি খাবে না।"

যতীন্ ব্যথিত হইল। কহিল—"সকাল থেকে খাওনি? চল'—"

একখানা ট্যাক্সি করিয়া দুইজনে চৌরঙ্গীতে একটা দেশী হোটেলে ঢুকিল। তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া, ময়দানে হার্ডিং-ষ্ট্যাচুর তলে আসিয়া বসিল। স্থানটি আলো-আঁধারিতে মনোরম এবং জনবিরল।

যতীন কহিল—"এইবার বল', এতদিন কোথা ছিলে, আর তোমার এই দুর্ঘটনাই বা কি করে ঘট্‌ল।"

জীবানন্দ কহিল—"ধর্ম্মতলার বাড়ী হতে শীলার মুক্তি পাবার দু'একদিন আগেই, এই শ্রাবণের শেষাশেষি আর কি, নন্দাকে নিয়ে গিয়েছিলাম ডায়মণ্ড হারবার বেড়াতে। সেখানে ডাক্‌বাংলায় ডিনার্-টিনার্ খেয়ে যখন বাড়ীর কাছ-বরাবর এসেচি, তখন রাত প্রায় চারটে। পানের মাত্রাটা সেদিন একটু অধিকই হয়েছিল। সমস্ত রাস্তা ঠিক গাড়ী চালিয়ে এলাম, কিন্তু আমাদের রাস্তাটা রসা রোডে পড়েচে

জান ত ? যেমনি মোড় ঘুরিয়েচি, অমনি ও-দিক থেকে একখানা গাড়ী সজোরে এসে মারল এক প্রচণ্ড ধাক্কা !"

যতীন্ শিহরিয়া উঠিয়া কহিল—"তারপর ?"

জীবানন্দ কহিল—"তারপর আর কি ? যা হয়ে থাকে। কিচ্ছু জান্‌লাম না, কি হল। কয়েক দিন পরে যখন জ্ঞান হল, তখন বুঝলাম আমি পুলিশের হেফাজতে হাঁসপাতালে : গা মাথা মুখ সব ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা !"

পুলিশের তদন্তে জানলাম গাড়ীখানা পুড়ে, ভাগাড়ের একটা পশুর কঙ্কালের মত, পড়েছিল। একধারে অর্দ্ধদগ্ধ অজ্ঞান আমি, অন্যধারে পূর্ণদগ্ধ মরা নন্দা। পাড়ার লোকে পুলিশে খবর দেয়, পুলিশ এসে শেষকৃত্য করে।"

যতীন অধীর কৌতূহলে কহিল—"তারপর ?"

জীবানন্দ সজোরে বিড়িতে টান দিয়া, কিঞ্চিৎ ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল —"তারপর আর কি ? বল্‌লাম, পাশে ছিলেন আমার স্ত্রী। কোনও রকমে লজ্জা হতে ত রেহাই পেলাম, কিন্তু আইন তা শুন্‌বে কেন ? অনেক তদ্বির-তাবাশ করে, হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে, আর দু'মাস জেল খেটে, এই সাত দিন হল বেরিয়েচি।"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—"হরগোবিন্দবাবুকে যে কার্ড দিয়েছিলে তাতে রয়েচে দেশবন্ধু হোটেল। তোমার বাড়ীটা কি ভাড়া দিয়েচ !"

উচ্চহাস্য করিয়া জীবানন্দ কহিল—"বাড়ী বেচেচি আজ প্রায় ৭।৮ মাস। তা নৈলে এ সব খরচ জুট্‌ত কোত্থেকে ? বাড়ী গেছে, নগদ যা ছিল তাও গেছে। বইগুলো আসবাবপত্তর আর পোষাক-টোষাক যা ছিল, মায় পুরোণো জুতোগুলো পর্য্যন্ত যথাসর্ব্বস্ব বেচে, তবে

ঐ হাজার টাকা জরিমানা আর মোকদ্দমার খরচ জোগাই। এখন আমার যা সম্পত্তি, তা আমার এই কাছেই, আর পকেটেই। এই—সাড়ে তের আনা পয়সা! ব্যস—" পকেট হইতে কতকগুলি আনা ও পয়সা বাহির করিয়া দেখাইল।

যতীন কহিল—"তুমি সে-বাড়ীতে তাহলে কি করে থাকৃতে?"

জীবানন্দ কহিল—"সেটা বাড়ীওলার অনুগ্রহ! মিঃ ঘোষাল আমার বাড়ী যখন কিনলেন তখনই তিনি বল্‌লেন্—আপনি ইচ্ছা কর্‌লে নীচের ঐ ঘরে থাক্‌তে পারেন, ভাড়া লাগ্‌বে না। লোকের কাছে আমার ইজ্জৎ রক্ষা হল। এখন দেশে যে যাব তারও কোনও পথ নাই। বিষয়-সম্পত্তি অন্য সরিককে সব বিক্রি করে, এই বাড়ী করেছিলাম। কাজেই, সেখানে যাব কোথা? তা ছাড়া চুণীবাবুর সাম্‌নে দাঁড়াই বা কি করে?"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—"চুণীবাবু কে?"

জীবানন্দ কহিল—"শীলার বাপ।"

যতীন কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া, সহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তাহলে এখন চল্‌বে কি করে?"

জীবানন্দ কহিল—"সেই সমস্যার সমাধান কর্‌তেই ত তোমায় খুঁজ্‌চি। হরগোবিন্দবাবু তোমার কে হন্?"

যতীন উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"চল' রাত বারোটা বাজে, ভয়ানক ঠাণ্ডা লাগ্‌চে। কথা কইতে কইতেই যাওয়া যাক্। হরগোবিন্দবাবু আবার আমার কে হবেন? আলাপ আছে, ছেলের মত স্নেহ করেন, ছুটি-ছাঁটা পেলে এক আধ বার দেখা কর্‌তে যাই, এই মাত্র।"

জীবানন্দ একটু নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল—"ও—আমি তোমায় ওখানে

দেখে ত অবাক্। ভেবেছিলাম, চাকরীটা যদি হয়, তবু দাঁড়াবার একটা ঠাঁই হবে! কিন্তু তা হল না!"

যতীন্ কহিল—"হয়নি ভালই হয়েচে। লোকটা তত সুবিধের নয়। তুমি ওখানে সাত দিনও টিঁক্‌তে পার্‌তে না।"

যতীন সাপ মারিল, অথচ লাঠি ভাঙিল না।

জীবানন্দ আত্মগতভাবে কহিল—"তুমি ত বল্‌চ, বন্ধু, ভালই হয়েচে, কিন্তু আমার যে দিন চলে না। মাসিক চল্লিশ টাকায় পাঞ্জাবী হোটেলে আছি, টাকা দিতে হবে ত? বহু জায়গায় চেষ্টা কর্‌লাম, ছোটখাট যা হয় একটা চাক্‌রী, কিন্তু চেহারা দেখেই লোকে ভির্‌মি যাচ্ছে, তা চাকরী দেবে কি? এখন কি করা যায়, বল দেখি?"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি ভগবান্ বিশ্বাস কর', জীবা?"

জীবানন্দ উচ্চহাস্য করিয়া কহিল—"না, ভাই, অনেক কিছুই করেচি, ঐটে এখনো কর্‌তে পারি নি! আচম্‌কা তোমার এ রকম প্রশ্নের হেতু?"

যতীন কহিল—"এম্‌নি মনে এল! যাক্, না করে ভালই আছ।"

জীবানন্দ একটু ভাবিয়া কহিল—"ওঃ বুঝিচি—যতীন্—"

যতীন বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি বুঝলে? কিছুই বোঝ' নি।"

জীবানন্দ কহিল—"হয় ত বুঝি নি। তবে সেদিন আর একজন বন্ধু বল্‌লেন, যে এ সব আমার পাপের ফল, ভুগ্‌তেই হবে। সুতরাং তিনি আমায় কি সাহায্য কর্‌বেন? ভগবানের কোপের বিরুদ্ধে তিনি কি কর্‌তে পারেন? আমি ভাব্‌লাম, তুমিও হয়ত তাই বল্‌বে।"

যতীন কহিল—"তাহলে ঠিকই বুঝেচ। আমিও ঠিক ঐ কথাই বল্‌চি। তোমার অদৃষ্টে বহু ভোগ আছে, তাই মারা না গিয়ে, এই

রকম বীভৎস চেহারা নিয়ে, সর্ব্বস্বান্ত হয়ে, তুমি বেঁচে রইলে! তুমিও অনায়াসে মারা যেতে পার্‌তে সেই মোটর দুর্ঘটনায় এবং মারা গেলে বোধ হয়, তোমার ভালই হত—অন্তত এ ভাবে পলে পলে মর্‌তে হত না! কিন্তু এমনি তাঁর বিধান, তুমি মারা গেলে না!"

জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল—"কেন বল ত ভগবান-মশায়ের আমার উপর এমন নেক্‌নজর? আমার উপর তাঁর এত অনুগ্রহ কেন? এ যে পুলিশের নজরের চেয়েও বেশী হে—"

যতীন কহিল—"তুমি জান, কত মেয়ের তুমি সর্ব্বনাশ করেচ, কত লোকের মনে ব্যথা দিয়েচ, কত সংসার ছারে-খারে দিয়েচ—"

জীবানন্দ আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। কহিল—"তোমরা সেই ভগবান-মশায়ের কর্ম্মচারী, উকীল, আম্‌লা—তোমরাই যদি ভুল বোঝ, তাহলে, তোমাদের মনিবও যে ভুল বুঝ্‌বেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? মিঃ ভগবান্‌ও ঠিক ভুল বুঝেই অবিচার কর্‌চেন।"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—"অবিচার?"

জীবানন্দ কহিল—"যদি তোমার ভগবান্ আমার এই সর্ব্বনাশ করে থাকেন, তাহলে আলবৎ তিনি অবিচারই করেচেন। কেন না, জোর করে' আমি কোনও কাজই করিনি। অবিশ্যি এটা ঠিক, যে বহু মেয়েকে নিয়ে একটু আনন্দ করেচি। ভদ্রঘরের সুশ্রী তরুণীদের উপর আমার কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা ছিল। তারা সুলভ হয়ে এল, আমিও সুযোগের সদ্ব্যবহার কর্‌লাম। তুমি বল্‌বে, নারীই যখন কাম্য, তখন অন্য স্থানের সুলভ নারী ছেড়ে, এদিকে দৃষ্টি কেন? এ যুক্তি অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়: রাস্তার মোড়ে মোড়ে পিতলের ঘড়ায় চা বিক্রী হয় নিশ্চয় দেখেচ!

সাধারণ কুলি মজুরেরা খায়, তুমি খেতে পার? অনেকে এই চা-ই, আবার সাধারণ সব দোকানেও খায় না, আরো ভাল বিশ্বস্ত হোটেলে গিয়ে, বত্রিশগুণ বেশী দাম দিয়েও খেয়ে থাকে। কেন খায়? রুচি এবং স্বাস্থ্যের জন্যে। আমিও তেমনি শত গুণ বেশী মূল্য দিয়ে, নারীমাংস খেয়েচি—রুচি ও স্বাস্থ্যের অনুকূল। তোমার যুক্তি হচ্ছে এই যে, পরিষ্কার বিশ্বস্ত জায়গায় খাবে না, খাবে ঐ নোংরা হিন্দুস্থানীটার ঘড়ার চা, রাস্তায় বসে, আর মাটীর ভাঁড়ে। নয় কি?"

যতীন বিরক্ত হইয়া কহিল—"রাত্রি অনেক হল, আর এ তর্কেরও শেষ নাই। ন্যায় অন্যায় জ্ঞান পর্য্যন্ত যার নেই, তার সঙ্গে তর্ক করা শক্তি ও সময়ের অপব্যবহার।"

জীবানন্দ মৃদু হাসিয়া কহিল—"এ অনুমানও ভগবান-সাহেবের প্রিয়পাত্রদেরই সাজে, বুদ্ধিমান্ লোকের আসরে চলে না। তুমি জান না, তাই বলচ: শুন্‌তে এরা ভদ্র, কিন্তু জান কি? নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্যে এরা উদ্‌গ্রীব হয়ে পথে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ আসে পাকড়াও কর্‌তে, কেউ আসে কিছু টাকা পয়সা বাগাতে, কেউ আসে, পরের পয়সায় এবং সাহচর্য্যে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন কর্‌তে, কেউ আসে বিলাসের অর্থ উপার্জ্জন কর্‌তে, কেউ আসে ফুর্ত্তি কর্‌তে, আর কেউ আসে পেটের দায়ে। এরা যে আসে, বিনা স্বার্থে কেউই আসে না! আর ঐ যে বল্‌লাম, না? সাহেবী হোটেলের একটা চায়ের মত, এদের দামও বত্রিশগুণ বেশী: বিনা পয়সাতে এদিকে পাওয়া যায় না! এরা তোমার-আমার চেয়ে ঢের বেশী চতুর। দাঁড় কাক সবাই, কিন্তু ময়ূরপুচ্ছের আবরণে থাকে বলে, বাইরের লোকে জানে

ভদ্র : যার-তার সঙ্গেও যায় না, কাজেই, এরা ভদ্র !! এরা যাবে ঠিকই, তবে লোক বুঝে। যার কাছে দাঁও মারবার সম্ভাবনা আছে, এমন লোকের সঙ্গেই তারা যায়। এদের বাড়ীর আনাচে-কানাচে আমিও ঘুরচি, আরও দশজন ঘুরচে! যার মেলে, তার মেলে। আমি যদি সে সুযোগ না নিই, আর দশজন নেবে : গাছের তলায় ফল পড়েচে, আমি কুড়িয়ে খেয়েচি : আমি যদি না খাই, আর কেউ খাবে—না হয়, গরুতে ছাগলে খাবে, নয়, পচে শুকিয়ে যে-মাটিতে পড়েচে, সেই-মাটিতেই মিশিয়ে যাবে। কি অন্যায় করেচি? আমায় দোষ দিচ্ছ, দাও, আমি শুনে যাচ্ছি। কিন্তু এতে আমার কি দোষ? অবিশ্যি এমনও অনেক ফল খেয়েচি, যেগুলি ঠিক তখনও পড়েনি : কাকতালীয় ন্যায়ের মত, আমিও হাত দিলাম, তালটিও পড়্‌ল। আমি হাত না দিলেও সে ঠিক সেই সময়েই পড়্‌ত, কিন্তু দোষ হল আমার, যে আমার হাত লেগেই তালটি পড়্‌ল! ওদিকে তাল পড়্‌ল মাটিতে, এদিকে তোমরা তাল ফেল্‌চ আমার উপর! মোদ্দা কথা, যা করেচি, তার জন্যে আমার এতটুকু অনুতাপ নেই, একবিন্দু অনুশোচনা নেই, কোনও দুঃখ নেই। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশলে তুমি বুঝতে পার্‌তে, ওরা কি! মেয়েদের অভিভাবকরাই অনেক সময় মেয়েদিগকে বাঘের মুখে ঠেলে দেয়। আর এই বাঘ সেজে অনেক শেয়ালও যে যায়, তা আমায় দেখেই বুঝতে পার্‌চ। যাক্, ও সব তুমি বুঝবেও না, আর আমারও এ আলোচনা আর ভাল লাগে না। তবে ভগবান মানি না, তাই আজও বেঁচে আছি, নৈলে এত দিন পাগল হয়ে যেতাম।"

যতীন একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া ঘৃণা-সঙ্কুচিত মুখে কহিল—"ওঠ—"

জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল—"কোথা ?"

যতীন কহিল—"রাত্রি একটা। আমায় বাড়ী যেতে হবে ত? তোমার হোটেল পথেই পড়্‌বে, তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাব।"

জীবানন্দ গম্ভীরভাবে কহিল—"আমি এখন যাব না, তুমি যাও। হাঁ দেখ', এই চিঠিখানা যদি দয়া করে প্রকাশ ভট্‌চাজকে দাও ত বড় উপকৃত হব। এখানা আমি ডাকে দিইনি, পাছে, অন্য কারু হাতে পড়ে। অন্যের হাতে দিতেও সাহস হয় না। এর মধ্যে অনেক গোপনীয় ব্যাপার আছে। তুমি আমার এই শেষ অনুরোধটা রাখ্‌বে ভাই? একটু তাড়াতাড়ি দিও কিন্তু।"

যতীন দ্বিধাজড়িত ভাবে কহিল—"আচ্ছা দাও।" জীবানন্দ আষ্টেপৃষ্ঠে শীলমোহর-করা একখানা মোটা খাম যতীনের হাতে দিল।

ট্যাক্সি উত্তর দিকে চলিয়া গেল। জীবানন্দ দক্ষিণ মুখে চলিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—"তোমার আঠার-মাসে-বছরের বদভ্যাস এখনো গেল না, যতু !"

—"কি করে' বুঝ্‌লে ? জান ত, স্বভাব যায় না মলে, ইল্লৎ যায় না ধুলে।" বলিয়া যতীন উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

বিজলী ম্লান হাসিয়া কহিল—"সেদিন এমন করে বললে, যেন তখ্‌খুনি নিয়ে যাচ্ছ। তারপর আজ সাত-আট দিন হয়ে গেল, যাবার নামগন্ধ ত নেই-ই, তোমারও টিকিটি পর্য্যন্ত দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে উঠেচে।"

যতীন কহিল—"একি তাড়াতাড়ির কাজ, বিজলী ? সব কাজ ভেবে কর্‌তে হয়, তা হলে পরে আর মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসতে হয় না। একটু দেরী হলই বা ? কাজটা তাতে ভালই হবে।"

বিজলীর মুখখানা সহসা ছাইয়ের মত শাদা হইয়া উঠিল। অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"আমার কথা তাঁদিকে বলেছিলে ? শুনে তাঁরা কি বললেন ? তাঁদের পছন্দ হল না বুঝি ? আরো ভাল লোক পেয়েছেন বুঝি ? তা এতে 'কিন্তু' কর্‌চ কেন ? খোলশা করে সব বলেই ফেল না ! আমি দুঃখ করব ভেবে বুঝি, কেবল তানা-মানা কর্‌চ ?"

যতীন দেখিল—বিজলীর মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না মেয়েকে আর ধাপ্‌পা দেওয়া চলে না। ভাবিল, জেরা করিয়া আসল কথা সে বাহির করিবেই। স্বভাবতই সে ভাব-প্রবণ, এই কয়মাসে সে যেন আরও ভাবালু হইয়া পড়িয়াছে! যদি ভুল বুঝিয়া একটা অঘটনই ঘটাইয়া বসে ? এতদিন যে-পথে তাহার জীবনের নদী বহিয়াছে, সে পথ

ছাড়িয়া এখন সে অন্যপথে চলিয়াছে। এ পথে পদে পদে বাধা। বাধার ব্যথা সহ্য করিবার মত এখনও তাহার মন হয়ত শক্ত হয় নাই। যতীন স্থির করিল, বিলম্বের সত্য কারণটাও তাহাকে বলাই সমীচীন।

বাধা দিয়া যতীন কহিল—"যে-ভাবে তুমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেচ, তাতে আমি ত কোন ছার, কেউই তোমায় উত্তর দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। আমি সব কথাই বলচি, তুমি শুধু দয়া করে একটু স্থির হয়ে শোন, অমন উত্তেজিত হয়ো না।"

বিজলী বিরক্তভাবে কহিল—"আমার আর এ বাড়ী ভাল লাগ্‌চে না। সেই ছেলেটিকে নিয়েই আমি সুখে থাকব। সে দিন ত সব কথাই হল। তবে আবার এত দেরী হচ্ছে কেন?"

যতীন কহিল—"দেরীর কথাই ত বলচি, শোন। কর্ত্তার সঙ্গে রোজই আমি দেখা করি, আর যা-তা একটা বলি—"

বিজলী বাধা দিয়া তীক্ষ্নস্বরে কহিল—"কেন যা-তা বল? আমি বুঝতে পেরেচি—তুমি তাঁর কাছে আমার কথা উত্থাপনই কর নি এখনো। তাহ'লে আর কেন? ছেড়ে দাও, এ সব কথা। আমি যেমন আছি তেমনি থাক্‌ব। ধূমকেতুর মতন মাঝে মাঝে এসে, আমার মনে এমন এক-একটা চাঞ্চল্য জাগিয়ে দিতে, তুমি আর দয়া করে এস না। উঃ, কি পাপই না করেচি। দেহ নিয়ে এতদিন চিলে শকুণে ছেঁড়াছিঁড়ি করল, এইবার তুমি আরম্ভ করলে আমার মনটা নিয়ে ফুটবল খেলতে—" বলিতে বলিতে বিজলী কাঁদিয়া ফেলিল।

যতীন হতভম্ব হইয়া গেল। কহিল—"ঠিক যা ভেবেচি! শেষ পর্য্যন্ত আমার কথাটা যদি না শোন, আর আমায় যদি বিশ্বাসই না

কর, তা'হলে তোমার যা ইচ্ছে তুমি কর্‌তে পার। আমার সময়ের দাম আছে। আমার অবসরটুকু অন্যের অবকাশ চেয়ে ঢের বেশী মূল্যবান্, কারণ অতি কষ্টে আমি একটু সময় পাই। আমি উঠলাম, এ সব আমার আর ভাল লাগে না! শুধু তোমার জন্যেই আমার এই কষ্ট, আর লোকের বাড়ী বাড়ী ঘোরা। আমার এতে স্বার্থ কি?—"

বলিতে বলিতে যতীন উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজলী সাশ্রুনয়নে তাড়াতাড়ি তাহার হাতটি চাপিয়া ধরিয়া জোর করিয়া বসাইয়া, কহিল—"তুমি রাগ কর্‌লে, যতু? তোমার মনে দুঃখ দেবার জন্যে আমি বলিনি। আমার ভেতরটা বড্ড ছট্‌ফট্‌ কর্‌চে, কি যে হচ্ছে, তা তুমি বুঝবে না, বোঝাতেও পার্‌ব না। আমায় ক্ষমা কর: চিরদিন ক্ষমা করে এসেচ, আজ আবার কর, তোমার দুটি পায় পড়ি।"

যতীন বুঝিল, মৃতবৎসা জননীর স্তনযুগল হইতে স্বতর্নির্গত স্তন্য ধারার মত বিজলীর এই আকুলতা। বেদনার ভারে তাহার মানসিক সমতা পর্য্যন্ত হয়ত নাই। যতীন হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া লজ্জিত হইল। পুনরায় বসিয়া, কোমলভাবে কহিল—"আগে সবটা শোন কি বলি, তা'হলেই তুমি বুঝ্‌বে। তোমারি ভালর জন্যে সব কর্‌চি।"

বিজলী ছলছল চোখে কহিল—"বল—"

যতীন কহিল—"কর্ত্তাকে বলি, তাঁর নির্দ্দেশমত লোক পাচ্ছি না, শুধু তাঁর আগ্রহ বাড়াবার জন্যে। ফট্‌ করে যদি বলি যে, লোক পাওয়া গেছে, তা'লে তাঁর তেমন আগ্রহ না হতে পারে, বা অন্যায় কিছু-একটা সন্দেহও কর্‌তে পারেন। লোকটি ভয়ানক চালাক। তাঁর কি রকম লোকের বরাত জান?"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম ?"

যতীন কহিল—"জাতিতে বৈদ্য হবে, মৃতবৎসা হবে, ত্রিসংসারে তার কেউ থাকবে না, বয়স প্রায় ২৮।৩০ হবে, শিক্ষিতা এবং সচ্চরিত্রা হবে, এবং তাঁর ছেলেটিকে নিজের ছেলের মত দেখবে, এমন একটি বাঙালী মেয়ে। তোমার সঙ্গে সবই মিলেচে, কেবল একটা বাদ—"

—"বুঝতেই ত পারচ। এখন তিনি যে রকম বাঘা লোক, তাতে তাঁকে কোনো কথা গোপন করা চল্‌বে না। মিছে কথা বলে তাঁর কাছে পার পাওয়া শক্ত। কাজেই সব সত্যি কথাই বল্‌ব। সব জেনে-শুনে তিনি তোমায় ঘরে নেন্ নেবেন, না হয় নেবেন না। মোট কথা, প্রথমেই তিনি যদি সব জেনে থাকেন, তাহলে আর কোনও ভয় থাক্‌বে না। নৈলে, এর পরে যদি তিনি এ কথাটা শোনেন, তাহলে তোমার সব গুণই এক লহমাই দোষ হয়ে পড়বে, আর তোমার বা আমার তাঁকে আর মুখ দেখাবার পর্য্যন্ত মুখ থাক্‌বে না, মহা অনর্থ হবে। তোমার ব্যবহারে কাজে আর পরিচয়ে তিনি যে অত্যন্ত খুসী হবেন, একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। তোমার মত লোক সারা পৃথিবী খুঁজে তিনি পাবেন না, সেটা আমি যেমন জানি, তিনিও তেমনিই বুঝ্‌বেন। আমি তাই কেবল সুযোগ খুঁজচি। আজ কতকটা পত্তনও করে এসেচি।" বলিয়া যতীন চুপ করিল।

বিজলী হতাশভাবে কহিল—"এ হবে না, যতু, ছেড়ে দাও এ আশা।"

যতীন কহিল—"বারো আনা হয়েচে। আশা ছাড়ার মত নয়। আজ বললাম—আপনার কথামত সবই মিলেচে এক জনের সঙ্গে, কেবল—"

বাধা দিয়া বিজলী কহিল—"কোন গেরস্ত বাড়ীতেই ঝগড়াটে আর দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক এবং চোর মিথ্যাবাদী আর চরিত্রহীন পুরুষকে কেউ ঠাঁই দেয় না। তিনিই বা কেন দেবেন? তাঁর কি লোকের অভাব?"

যতীন কহিল—"এক্ষেত্রে সেটা না-ও খাট্‌তে পারে: কারণ, এ স্ত্রীলোক চরিত্রহীনা হলেও, কারও চরিত্রহরণের জন্যে যাচ্ছে না।"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল "যাচ্ছে না যে, তিনি তা কি করে বুঝবেন?"

যতীন কহিল—"সেইটেই তাঁকে আমি বোঝাব। সব তাঁর মনোমত হয়েচে, কেবল ঐটে নিয়েই তিনি একটু খুঁৎ খুঁৎ করচেন। আমি বললাম—এ পথ সে ছেড়ে দিয়েচে। আর ছেড়ে দিয়েচে বলেই, আপনার বাড়ীতে আসচে দেড়শো টাকায়! নৈলে ফিলিমে থাক্‌লে, সে হেসে খেলে অক্লেশে, মাসে হাজার টাকা রোজগার কর্‌তে পারে। সেখানে অজস্র পয়সা, যশ, আদর সবই তার করতলগত। সে সব ছেড়ে স্বেচ্ছায় যে আসচে, তাকে কি আপনি অসচ্চরিত্রা বলে বিদেয় দেবেন? ধরুন, ভাল বলে গেরস্ত ঘরের একটি বিধবা এল: সে যে ঠিক ভাল, তা আপনি জানবেন কি করে? এ-ও এমনি একটা কৌশল করেও ত আস্‌তে পারত! কিন্তু সে তা চায় না। সে জানিয়ে আসতে চায়, সে কি।"

বিজলীর মুখে প্রসন্নতার আলো ঝলমল করিয়া উঠিল। কহিল—"বেশ বলেচ। তাতে তিনি কি বললেন?"

যতীন কহিল—"তিনি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। বল্‌বেন আর কি? তাঁকে নিতেই হবে: তাঁর নির্দ্দেশমত লোক পাওয়া কি এতই সোজা? তাইত প্রথম ৪।৫ দিন তাঁকে বল্‌লাম, আপনার কথামত লোক পাওয়া যাচ্ছে না। যত দেরী হচ্ছে, ততই তাঁর কষ্ট হচ্ছে আর ছেলেরও

অসুবিধা হচ্ছে। তিনিও দিন দিন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠ্‌চেন। তাঁর কথার সব যখন মিল্‌চে, তখন এটার জন্যে শেষ পর্য্যন্ত তিনি আর আপত্তি কর্‌বেন্ না বলেই, মনে হয়। বাধ্য হয়েই তাঁকে রাজী হতে হবে। আরও দু'দিন যাক্, দেখ্‌বে, নিজেই তিনি একদিন বলে পাঠাবেন, সেই মেয়েকেই নিয়ে এস হে—এইজন্যেই প্রথম কয়েকদিন যা-তা বলেচি! এখন আমি যদি গরজ দেখাই, তাহ'লে তিনি ভাব্‌বেন, আমার কোনও স্বার্থ আছে, নয় ত যাবেন বিগ্‌ড়ে। বোঝ না ত, একে বুড়োমানুষ, তার উপর জমিদার। নিজে হ'তে কিছু চট্ করে এঁদিকে বল্‌তে নেই। এমন ভাবে কথা পাড়্‌তে হবে, যেন তিনি নিজেই, তোমার মুখের কথাটি নিজের মুখে বলেন। তাহ'লেই উদ্দেশ্য হবে সফল। কাজেই, ইচ্ছে করেই আমি এই ঔদাসীন্য দেখাচ্ছি, তাড়াতাড়ি কর্‌চি না। রেলের কোনও পোল যদি একটু অশক্ত হয়, দেখ', তার উপর দিয়ে গাড়ী যায়, অত্যন্ত আস্তে আস্তে, আর অতি সন্তর্পণে: জোরে চালালে, পোল ভেঙে, গাড়ীসুদ্ধ পড়ে যাবারই সমধিক সম্ভাবনা।"

বিজলী পুলকিত ভাবে কহিল—"এইবার বুঝিচি। আমায় ক্ষমা কর', তোমার কথা না শুনে, প্রথমেই তোমায় আঘাত করেছিলাম। সেই একদিন তুমি আমায় রক্ষা করেছিলে, আমার ছেলেকে রক্ষা করেছিলে, আবার আজও সেই তুমিই আমাকে রক্ষা কর্‌তে এসেচ। মনে হয়, তোমার সঙ্গে আমার শুধু এই জন্মেরই পরিচয় নয়, জন্মজন্মান্তরের। জানি না, তুমি পূর্ব্বজন্মে আমার কে ছিলে?"

যতীন ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তবু কি ছিলাম, মনে হয়?"

বিজলী সলজ্জহাস্যে কহিল—"যাও—তুমি ভারি—ইয়ে—"

যতীন কহিল—"আমি ইয়ে নই—আমি—" যতীন হঠাৎ স্তব্ধ হইল।

বিজলী সতৃষ্ণভাবে চাহিয়া, কহিল—"থাম্‌লে কেন? তুমি কি? বল—"

যতীন কহিল—"ভাই!"

—"দাদা?"

বিজলী পুলকাশ্রুপ্লাবিত হইয়া গলবস্ত্রে যতীনকে অনেক ক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। প্রণামান্তে উঠিতেই দেখে, দুয়ারে শেঠজী, ভূদেব ও প্রকাশ ভট্টাচার্য্য দাঁড়াইয়া।

প্রকাশ সহাস্যে কহিল—"ভাইফোঁটা হল? এইবার আসতে পারি?"

বিজলী সাদরে অভ্যর্থনা করিল—"আসুন্‌, আসুন, ভাইফোঁটা আপনিও নিন্‌। আসুন শেঠজী, ভূদেববাবু আসুন! বসুন্‌—"

সকলে ঘরে আসিয়া বসিল।

যতীনকে দেখিয়া ভূদেব কহিল—"এই যে যতীনবাবু আপনিও এখানে আছেন, ভালই হল। দেখুন্‌ শেঠজী, ভগবান্‌ আমাদের সহায়। তানৈলে, যতীনবাবুকে যে এখানে পাব, তা কি কেউ আমরা ভেবেছিলাম? অথচ ওঁকেই আমাদের সব চেয়ে বেশী দরকার।"

যতীন হতভম্ব হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি?"

শেঠজী কহিলেন—"সব্‌কুছু বোলবে, লেকেন, হাপনিকে পাইয়ে, সম্‌জো, বহুৎ খুশ্‌ হোইয়েছে হাম—লেকেন—"

উত্তেজিত ভাবে তিনজনেই পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল।

শেঠজী কহিলেন—"আরে ভোঁদেও, লেকেন্‌, তুমহি বিজ্‌লিবিবি আর মজুমদার সাহেবকো সব বোলিয়ে দাও, সম্‌জো। লেকেন্‌ দের্‌ কেঁও কোর্‌ছিস্‌, সম্‌জো!"

ভূদেব সোৎসাহে কহিল—"বহুৎ আচ্ছা শেঠজী। বিজলীদেবী. শুনুন্, যতীনবাবু আপনিও শুনুন্। আমাদের 'অনিন্দিতা' বইয়ে হিরোইন্ নিয়ে বেধেচে, মহা গণ্ডগোল। যতীনবাবু, আপনি যান নি অনেকদিন ওদিকে, তাই সব খবর আপনি হয়ত জানেন না।"

যতীন কহিল—"কেন ? হিরোইন্ ত নতুন এসেচেন, ছন্দা দেবী—"

ভূদেব সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"তাকে ত আপনিও দেখেচেন! তার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, তাকে দিয়ে কি হিরোইন্ হয় ?"

যতীন কহিল—"হয়, কি হয় না, আমি তার কি বল্ব ?"

ভূদেব কহিল—"সে কি কথা বল্চেন যতীনবাবু ? আপনি বর্ত্তমান বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা। আপনার সঙ্গে সে অভিনয় কর্বে—"

যতীন বাধা দিয়া কহিল—"করলেই বা। সে কি কর্বে না-কর্বে, তা দেখা ত আমার কাজ নয়, ভূদেব বাবু। আমিও কোম্পানির যেমন চাকর, সেও তাই। আমার কাজ আমি কর্ব, ভুল হয়, আপনি ডিরেক্টার দেখিয়ে দেবেন। অন্যের সমালোচনা কর্বার আমার কি অধিকার ?"

শেঠজী ভূদেবকে বাধা দিয়া কহিলেন—"লেকেন্ হাপনি ঠিক কহিয়েছেন, যতীন বাবুজী। লেকেন্ তোম ডাইরেক্টার, সম্‌জো, এ তুমার কাম। দুস্‌রা শক্‌শ্ কেঁও বোল্‌বে ? সম্‌জো ভোঁদেও। ইয়ে তক্‌ড়ার লেকেন ফজুল ইন্‌কো সাথ—কি বোলিস্ ভট্‌চাজ সাহেব ?"

প্রকাশ কহিল—"আজ্ঞে হাঁ, শেঠজী। যতীনবাবু ঠিকই বল্চেন।"

ভূদেব কহিল—"যতীন বাবুর সঙ্গে তর্ক করার স্পর্দ্ধা আমার নেই। বেশ উনি যদি কিছু না বলেন, বল্বেন না। ছবির আমি ডিরেক্টার, আমিই বল্ব। আপনি কোম্পানির মালিক, আপনি বলবেন।

সুবোধ বলবার কে? ছবি খারাপ হলে তার কি? বদ্‌নামও তার নয়, লোকশানও তার নয়। এখন কথা হচ্ছে এই: ছন্দা দেবীকে সুবোধ পছন্দ করেচে, আমিও তাকে তৈরী কর্‌তে যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌লাম। কিন্তু তাকে কিছু বল্‌তে গেলেই, সে ফোঁস্‌ করে ওঠে আর যা মুখে আসে, ছুট্‌-বেছুট্‌ তাই বলে। সুবোধকে বল্‌লে, সে উল্টে আমারই দোষ দেয়! কাজেই, শেঠজীকে কাল আমি সব বললাম—এতদিন ওঁকেও আমি কিছু জানাই নি! ভেবেছিলাম, ঠিক হয়ে যাবে! কিন্তু তা যখন হল না, তখন মালিকের টাকা বর্‌বাদ যাবে, আমার বদ্‌নাম হবে—কি করে দেখি?"

প্রকাশ কহিল—"ঠিক করেচেন, আপনার এ কর্ত্তব্য। বলে, 'যার ধন তার ধন নয়, নেপো মারে দই'। শেঠজীর পয়সায়, সুবোধ রায় কর্‌বে কাপ্তেনী? বাঃ—মজা ত মন্দ নয়!"

শেঠজী কহিলেন—"সমজো, বাবুজী, হামি ত লেকেন্‌ চার-পান লাখ রুপেয়া দিইছিস। আওর ভি একলাখ মঞ্জুর কোরিয়েছে সম্‌জো, ইএ ছবির জোন্যে, লেকেন্‌—"

ভূদেব কহিল—"শেঠজী সব শুনে বল্‌লেন, চল আমি ষ্টুডিওতে যাব, রিহার্সাল দেখ্‌ব, আর সুবোধের সঙ্গে সব কথা বল্‌ব।"

শেঠজী কহিলেন—"সমজো, করীব এক মাহিনা হোইল, লেকেন্‌ সুবোধবাবু ত হামার সাথে সম্‌জো, এক দিন ভি মুলাকাৎ তক্‌ কোরিয়েছে না, সম্‌জো—"

প্রকাশ কহিল—"বাবুর সময় হয় নি!"

ভূদেব কহিল—"শেঠজী এসে পৌছবামাত্রই সুবোধ ছন্দাদবীকে

নিয়ে মটরে উঠে পালাবার মৎলব করলেন। শেঠজী জোর করে' তাঁকে বসিয়ে যখন জিজ্ঞাসা করলেন, বিজলী দেবীকে হিরোইন্ না দিয়ে, এ মেয়েকে দেবার উদ্দেশ্য ?"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—"কি বললেন, তার উত্তরে সুবোধ বাবু ?"

ভূদেব কহিল—"শেঠজীকে প্রথমে ত কোন কথার আমলই দিতে চায় না। বলে, আপনি এর কি বুঝবেন ? তারপর উনি যখন খুব পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন, তখন আর হালে পানি পেল না। উঠলো চ'টে, শেঠজীকে লোকজনের সাক্ষ্যে যা মুখে এল, বললেঃ বলে কি না—আমার ইচ্ছে! তুমি এ সবের কি বোঝ ? তুমি যা বোঝ, পাট গানি হেশিয়ান, তাই দেখগে। বলুন ত বিজলী দেবী, এটা কি ভদ্রলোকের কথা ? এমনি করে কি মালিককে বলতে হয় ?"

প্রকাশ কহিল—"তাকে আপনারা সিংহাসনে বসিয়ে গলায় মুক্তার মালা পরিয়ে দিয়েচেন। এইবার তার ঠ্যালা সাম্লান! সে তা সহ্য করতে পারবে কেন ? দোষ ত আপনাদের। আমাদের পাড়ায়, সুবোধ ছিল এক চা-ওলা। ওর বিদ্যেবুদ্ধির দৌড় আর কতদূর ?"

কোনও ভাবান্তর না দেখাইয়া বিজলী নির্ব্বিকারভাবে সব শুনিতেছিল।

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—"তারপর ?"

ভূদেব কহিতে লাগিল—"শেঠজী ত শেঠজী, ষ্টুডিওসুদ্ধ লোক উঠল ক্ষেপে। দিলাম তাকে সবাই মিলে আচ্ছা করে পাট করে। তারপর ঘাড় ধরে' ষ্টুডিও থেকে বের করে দেওয়া হল। এ ষ্টুডিওতে ঢোকা তার জন্মের মত বন্ধ হল। এখন বিজলী দেবী, আপনার ভরসা।"

বিজলী উদাসীন ভাবে কহিল—"আমি কি করতে পারি ?"

ভূদেব কহিল—"শেঠজীকে আমি আপনার কথা সব বলেচি। সুবোধ কেন যে আপনাকে ছেড়ে, ঐ মেয়েটাকে হিরোইন কর্‌তে প্রস্তুত, তাও শেঠজী সব শুনেচেন, আর বুঝেচেনও। সুবোধ রায় যখন বিদেয় হল, তখন আর আপনার, বোধ করি, কোনো আপত্তি হবে না।"

শেঠজী কহিলেন—"লেকেন হামি সোব্ শুনিয়েছে, সম্‌জো, সোব্ বুঝিয়েছে। লেকেন হাপনিকে বাদ দিয়ে সমজো, রোয়্যাল ফিলিমমে কভি কোই ছোবি হোইতে পারে, সম্‌জো বিজ্‌লিবিবি? হাপনাকে যাইতেই হোবে। লেকেন উস্ খাতির, সম্‌জো, হামি আপকো নিমন্ত্রোণ কোরিতে এসিয়েছে সম্‌জো।"

বিজলী কোমলভাবে কহিল—"আপনার নিমন্ত্রণ নয় শেঠজী, আপনার আদেশ, আমি শিরোধার্য্য কর্‌চি। সুবোধ বাবু থাকুন বা না থাকুন, আপনার আদেশ পেলে, আমার কিছুই আটকাত না। বহুদিন আপনার কোম্পানির মাইনে খেয়েচি, আমি নিমকহারাম নই। আমি সানন্দেই যেতাম, কিন্তু আমি আর অভিনয় কর্‌ব না।"

ভূদেব বিস্মিত ভাবে বলিয়া উঠিল—"অভিনয় কর্‌বেন না?"

শেঠজী কহিল—"এ কি কোথা, সমজো বিজ্‌লিবিবি, এ হাপনি হামার সোঙ্গে লেকেন্ তফ্‌ড়ি ত কোর্‌ছিস্ না, সম্‌জো—"

বিজলী কহিল—"না শেঠ্‌জী, আপনি আমার পিতৃতুল্য, আপনার সঙ্গে তফ্‌ড়ি কেন করব? সত্যি, এ কাজ আমি ছেড়ে দিয়েচি—" বিজলীর কণ্ঠস্বর দৃঢ়, অবিকম্পিত।

শেঠজী কহিলেন—"রাম কহো, রাম কহো, বিজ্‌লী বিবি, সম্‌জো, এ ত লেকেন্ তফ্‌ড়ি কোর্‌ছিস্—"

বিজলী অবিচলিত স্বরেই উত্তর দিল—"আজ্ঞে না, শেঠজী, এ তফ্‌ড়ি নয়। আপনি বিশ্বাস করুন্—আমি অভিনয় করা ছেড়ে দিয়েছি।"

প্রকাশ একটু অন্তরঙ্গতা দেখাইয়া কহিল—"এটা কিন্তু অভিমানের মত শোনাচ্ছে, বিজলী দেবী! এ ঠিক আপনার মনের কথা নয়, মনে হচ্ছে। চোরের পর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মত—"

বিজলী একটু শ্লেষের সহিত কহিল—"আমার মনের খবর দেখ্‌চি, আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন! তাহলে আপনিই আমার কথা না বলে, এঁদিকে কষ্ট দিয়ে এখানে আনলেন কেন?"

প্রকাশের কৃষ্ণবর্ণ মুখমণ্ডল রক্তচাপে লাল হইল না বটে, তবে কতকটা টাট্‌কা কালি-বুরুশ করা জুতার মত চক্‌চকে হইয়া উঠিল।

অপ্রতিভ হইয়া প্রকাশ কহিল—"আজ্ঞে না, বিজলী দেবী, আপনার কথা আপনিই বলুন্। তবে আমি মনে করেছিলাম যে, সুবোধের উপর হয় ত অভিমান—"

বিজলী একটু ধমক দিয়া কহিল—"মনে করবার মত আপনার মনের পরিচয় আমি ভালই পেয়েছি। আপনি অন্যের সম্বন্ধে দয়া করে আর কখনও কিছু মনে করতে যাবেন না। মনে করতে হলে, যে মন আর বিদ্যেবুদ্ধির প্রয়োজন, তা আপনার নেই।"

প্রকাশ একটু শঙ্কিত এবং একটু কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমার মনের পরিচয় আবার আপনি পেলেন কোথায়?"

বিজলী দমিয়া গেল। একটু ভাবিয়া কহিল—"যদি আপনার এঁদের সঙ্গে যাবার তাড়া না থাকে, তা হলে মিনিট-কয়েক অপেক্ষা করে যাবেন, বলব। এঁদের সামনে আর আপনাকে লজ্জা দেব না।"

মনটা হঠাৎ খারাপ হইয়া প্রকাশের সমস্ত উৎসাহ নিভিয়া গেল।

প্রকাশের কবল হইতে ছিট্‌কাইয়া, সিনেমার মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া ছন্দা সুবোধের জালে পড়িয়াছে। রাজা রামচন্দ্র যেমন রাবণের কবল হইতে সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্য হনুমানের সহিত মৈত্রী করিয়াছিলেন, প্রকাশও তেমনি সুবোধের হাত হইতে ছন্দাকে উদ্ধার করিতে শেঠজীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছে।

শেঠজী কহিলেন—"তাহ'লে, সম্‌জো বিজ্‌লিবিবি, হামাকে বোলিয়ে দিবেন লেকেন, হাপনি কোবে, সম্‌জো, যাচ্ছিস্—

বিজলী সবিনয়ে কহিল—"আমায় ক্ষমা করবেন শেঠজী, যাবার হলে আপনাকে দু'বার বল্‌তে হত না, এক কথাতেই আমি যেতাম।"

শেঠজী সবিস্ময়ে কহিলেন—"লেকেন্, হামি ত, সম্‌জো, পান্‌-শো কি ছে-সাত শো রুপেয়া তক্, সম্‌জো, হাপনিকে দিবে বোলিয়ে এসিয়েছে—"

বিজলী কহিল—""টাকার জন্যে নয়, শেঠজী। হাজার টাকা দিলেও নয়, পাঁচ হাজারেও নয়। আমায় মাফ করবেন।"

ভূদেব কহিল—"তাহলে, এ নিয়ে আর কথা কাটাকাটি করে' কোনও লাভ নেই, শেঠজী। উনি যে আর অভিনয় করবেন না, এ কথাটা আমিও শুনেচি: সেদিন বেঙ্গল-টকীজের হিতেন্ ঘোষ বল্‌ছিল।"

শেঠজী চিন্তিতভাবে কহিলেন—"সমজো বিজলি বিবি, লেকেন ঠোকিয়ে যেচ্ছিস। সাত শো রুপেয়া মাহিনা, লেকেন, বহুৎ ডিপ্‌টি মেজিসটেট্‌কো ভি, সমজো, নেহি মিলতা। দেখিয়ে লেন হাপনি, আচ্ছা সোচ্‌-সম্‌জ্‌ কোরিয়ে।"

বিজলী কহিল—"দেখেচি, শেঠজী। এই আমার শেষ কথা।"

শেঠজী হতাশভাবে কহিলেন—"আচ্ছা ভাই, বিজলিবিবি, য্যায়সা তেরা রায়, সমজো। তব্—পেরকাসবাবু, আপকো ছন্দাদেবীজীকো ত কুছু, সম্‌জো, কর্‌নে না পার্‌বে হাম। ও আপ্ সুবোধসে লেকেন, ঠিক কোরিয়ে লেবেন্, সম্‌জো। চল ভাই, ভোঁদেও—"

শেঠজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভূদেব উঠিতে উঠিতে কহিল—"সেই ঠিক। ছন্দাকে ত আমরা ডিস্‌মিস্ করছি—তা'হলেই দেখবেন—যে গোয়ালের গরু ঠিক সেইখানেই গুড় গুড় করে ফিরে যাবে।"

প্রকাশ ছাড়া সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

শেঠজী ও ভূদেব বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

যতীন কহিল—"মিঃ ভট্টাচার্য্য, আপনাকে আমি আজ ৮।১০ দিন থেকে খুঁজচি। আপনার একখানা চিঠি আছে।" বলিয়া হাতের এটাচি-কেস্ হইতে সিল-মোহর করা একখানা খাম বাহির করিয়া দিল।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল—"বাপরে বাপ, অমন আষ্টে-পৃষ্ঠে সিল-মোহর-করা আবার কার চিঠি?"

যতীন কহিল—"খুলে দেখুন। ঐ ঘরে গিয়ে, দেখুন গে খুলে।"

প্রকাশ অন্য ঘরে যাইবার জন্য উঠিয়া, বিজলীকে জিজ্ঞাসা করিল—"বিজলী দেবী, আপনি যে কি বলছিলেন—"

বিজলী কহিল—"আপনি গগন ঘোষালের মেয়ে নীহারকে চেনেন?"

হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া, প্রকাশ পড়িতে পড়িতে কোনও প্রকারে তাল সামলাইয়া লইয়া, তোৎলার মত কহিল—"জানি। তার সঙ্গে আপনার আলাপ হল কোথা? আচ্ছা, আমি আস্‌চি—"

বলিয়া অন্য ঘরে চিঠি পড়িবার নাম করিয়া পলাইয়া গিয়া, প্রকাশ

স্থির হইয়া একাকী একটু বসিতে পাইয়া, চিন্তা করিয়া বাঁচিল।

যতীন ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি ?"

বিজলী মৃদু স্বরে জানাইল—"এখন নয়, পরে বলব।"

ষ্টুডিও হইতে ভূষণ ধর্ম্মতলায় গিয়াছিল, সেখান হইতে ফিরিয়া, বিজলীর নিকট ম্লানমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভূষণ ?"

কাঁদ-কাঁদ হইয়া ভূষণ কহিল—"টালিগঞ্জে টেঁপীদের বাড়ী হচে।"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"ভালই ত, কে করে দিচ্ছে ?"

ভূষণ কহিল—"হনুমান-ফিলিমের মালিক, রামকিষণ মাড়োয়ারী।"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"তাতে আর তোমার দুঃখ কিসের ?"

ভূষণ কাঁদিয়া ফেলিল। সরোদনে কহিল—"দুঃখ আর কিছুই নয়, দিদিমণি, তবে, এতদিনে সত্যি-সত্যি টেঁপী আমার হাতছাড়া হল। আমিই তাদিকে এখানে আন্‌লাম, আর আমার কপালেই তেঁতুল-গোলা ? টেঁপীকে প্রায় হাজার টাকার গয়নাই দিয়েচে, রামকিষণবাবু। ওখানে আমায় ঢুক্‌তেই দিলে না—সিঁড়ি থেকেই তারা তাড়িয়ে দিলে।"

বিজলী সস্নেহে কহিল—"আচ্ছা, জলটল খাও গে, পরে সব শুন্‌ব।"

ভূষণ চলিয়া গেল। প্রকাশ উত্তেজিতভাবে আসিয়া, কহিল—"চিঠিতে কি আছে জানেন, যতীন বাবু ?

যতীন কহিল—"আমি কি করে জানব ? আমার সঙ্গে তার হঠাৎ একদিন দেখা। আপনাকে দেবার জন্যে ঐ চিঠিখানা দিয়ে সে বললে যে, এটা ডাকে দিতে পারে নি, পাছে অন্য কারও হাতে পড়ে। ব্যাপার কি ?"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"কার চিঠি?"

প্রকাশ গম্ভীরভাবে কহিল—"আপনি চেনেন না, জীবানন্দ বলে আমার পরিচিত একজন লোক লিখেচে।"

বিজলী কিছু বলিল না।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল—"এতদিন সে কোথায় ছিল, যতীনবাবু?"

জীবানন্দর নিকট যতীন যাহা শুনিয়াছিল, বর্ণনা করিল।

বিজলী কহিল—"জীবানন্দকে আমি চিনি, প্রকাশবাবু। লোকটার মত অত বড় বদ্‌মাইস্ আর ধড়ীবাজ আমি জীবনে কখনো দেখি ত নেই-ই, কল্পনাও করতে পারি না। বেশ হয়েচে! চেহারা আর টাকা এই দু'টোই ছিল তার একমাত্র মূলধন, ভগবান তার সেই দু'টোই নিলেন আগে। হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস পর্য্যন্ত যখন নিস্তার পায় নি, তখন কি ছার এই জীবানন্দ বাঁড়ুয্যে!!"

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল—"নীহারের কথা কি বল্‌ছিলেন, বিজলী দেবী?"

যতীন কহিল—"সন্ধ্যা হল, আমি তাহ'লে উঠি।"

প্রকাশ কহিল—"যতীনবাবু, আপনি একটু বসুন।"

যতীন কহিল—"এ ব্যক্তিগত আলোচনার মধ্যে আর আমায় কেন?"

হঠাৎ ভাবাবিষ্ট হইয়া প্রকাশ কহিল—"আমি ঈডিয়ট্, আমি কাপুরুষ! আমি মহাপাতকী! আপনি একটু বসুন—আমায় একটু সাহায্য করতে হবে। নীহারের সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছিল, বিজলী দেবী?" প্রকাশের কণ্ঠে একটা তীব্র অনুশোচনা।

বিজলী কহিল—"শুধু দেখাই নয়, তার সব কথাই সে আমায় বলেচে। দেহে মনে সে পরিপূর্ণ সতী। আপনি তাকে জোর করে নিকৃড়ে

বাঘের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। আপনার দোষেই তাকে বাঘে ছোবল মেরেচে, একেবারে খেয়ে ফেল্‌তে পারেনি। বাঘ যে তাকে স্পর্শ কর্‌তে পেরেছিল, তার কারণও, তখন সে ছিল আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কিন্তু যেমনি সে জান্‌তে পার্‌ল সে নিরাশ্রয়, অমনি সে হয়ে উঠ্‌ল মহাশক্তিমতী! কৈ, সেদিনের পর ত আর কেউ তার সাম্‌নে পর্য্যন্ত আস্‌তে সাহস করে নি? আপনার কাপুরুষতাতেই তার বদ্‌নাম, আর আপনিই কর্‌লেন তাকে পরিত্যাগ?

অনুতাপবিদ্ধ প্রকাশ কহিল—"সত্যি বিজলী দেবী! যা বল্‌চেন, সব সত্যি? সে কি বল্‌লে, আমায় বলুন, দয়া করে—"

বিজলী নীহারের নিকট যাহা শুনিয়াছিল, জানাইল।

নিশ্চল স্থানুর মত প্রকাশ সব শুনিল।

প্রকাশ শুষ্ককণ্ঠে কহিল—"কোথায় থাকে টুনি, জানেন?"

বিজলী কহিল—"জানি।"

প্রকাশ উত্তেজিত হইয়া কহিল—জানেন? আমায় তাঁর কাছে আপনি নিয়ে চলুন্ একবার—আমি অনুনয় কর্‌চি। আমি সসম্ভ্রমে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব। যতীন্‌বাবু, আপনিও যদি দয়া করে আমাদের সঙ্গে যান্ ত আমার নিরপরাধ স্ত্রীকে আমি ফিরে পাই। জীবানন্দও তাই লিখেছে, সে সতী। তার দেহ পর্য্যন্ত নিষ্কলঙ্ক। নীহারের ধারণা, তাকে ওর লোকেরা অমর্য্যাদা করেচে, কিন্তু সেটা ঠিক নয়: তার মনে ঐ ভুল ধারণা তারা করিয়ে দিয়েছিল, যাতে সে আর ঘরে ফিরে যেতে না চায় এবং আমরাও না নিই! ঘটেওছিল ঠিক তাই। এর জন্যে সম্পূর্ণ আমিই দায়ী। অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে জীবানন্দ এতদিনে

এই সত্য কথাটা প্রকাশ করেচে। এই পড়ে দেখুন—" বলিয়া জীবানন্দর দীর্ঘ পত্রখানা যতীনের হাতে দিয়া, প্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার মা-ভাইয়েরা যদি না নেন্—"

প্রকাশ দৃঢ়ভাবে কহিল—"সে ভয় আর নেই, বিজলী দেবী। মা মারা যেতেই, আমরা পৃথক হয়েচি। আমি এখন স্বাধীন।"

বিজলীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল—"দাদা, ঐ চিঠিখানা সঙ্গে নিয়ে যাই চল, নীহারকে শুনিয়ে, তাকে যদি ফিরিয়ে আন্‌তে পারি।"

তিন জনেই প্রকাশের গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

প্রকাশ ড্রাইভারকে কেবলি কহিতে লাগিল—"জল্‌দি—জল্‌দি—"

* * *

বহুদিন পরে প্রকাশের অন্তঃপুরের সব তালা খোলা হইল: ঘরে বাহিরে কক্ষে কক্ষে বিদ্যুদালোকের জয়জয়ন্তী রাগিণীতে এক রমণীয় মিলন-মহোৎসব রূপায়িত হইয়া উঠিল।

দুইটা বাজিল। বিজলী কহিল—"রাত ত কাট্‌ল, ভাই, এইবার যাই।"

সজল চোখে নীহার কহিল—"আশীর্ব্বাদ কর' দিদি, আমার রাতও যেন সত্যিই কাটে!"

বিজলী নীহারের চোখ দুইটি মুছাইয়া দিয়া, মৃদু হাসিয়া কহিল—"সূর্য্যদেবকে ধরে রেখ', তাহ'লেই আর কখনো রাত আস্‌বে না।"

যতীন যাইতে যাইতে কহিল—"সূর্য্যদেবকে বগলদাবা করে রাখ্‌বেন, বৌঠান্—"

ষড়্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ঘরে গৌরগোবিন্দ একখানা চেয়ারে বসিয়া, আর সম্মুখস্থ বারান্দায় বিজলী গৌরের জন্য ষ্টোভে মাংস রাঁধিতেছিল।

গৌর কহিল—"দিদি, বড় হয়ে আমি চাকরী করব।"

—"পাগলা ছেলে কোথাকার! চাকরীটা কি খুব গৌরবের?"

গৌর অনুযোগ করিল—"তবে আপনি যে কর্‌চেন?"

বিজলীর মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কহিল—"আমি কর্‌চি, আমি গরীব। তুমি কেন চাকরী কর্‌বে, ভাই? চাকরী করা ভাল নয়।"

গৌর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"ভাল নয়? বেশ, তাহলে কর্‌ব না। কিন্তু অনেক পথ ঘুরে ঘুরে, গাড়ী করে, নয় ট্রামে বাসে চড়ে আফিস যেতে, আমার ভারি ভাল লাগে।"

বিজলী প্রসঙ্গটি ঘুরাইবার অভিপ্রায়ে কহিল—"ঘোড়ার কথাটা বুঝি ভুলেই গেছ? কাল অত রাত্রি অবধি ঘোড়ার এত কথা হল, আর আজ সকালে বিছানা থেকে উঠেই আর মনে নাই? বাঃ।"

পুলকে হাততালি দিয়া গৌর কহিল—"সত্যি দিদি, আমি ভুলে গিছলাম। ঘোড়াটা কখন আসবে? আমার আর দেরী সহ্য হচ্ছে না।"

বিজলী কহিল—"এই দশটার মধ্যেই আসবে। এলেই চড়বে।"

আনন্দের আবেশে গৌরের ভাবালু চক্ষু দুইটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল—"খুব জোরে জোরে ঘোড়া ছোটাব, কিন্তু বাবা যদি রাগ করেন? তাঁকে না জানিয়ে কেন কিন্‌লেন, দিদি?"

বিজলী কহিল—"বাবা কি মেয়ের উপর কখনও রাগ করেন রে পাগল? ঘোড়া দেখে বাবা খুসীই হবেন, দেখ।"

গৌর একটু চিন্তিতভাবে কহিল—"কিন্তু আপনি গরীব লোক, কেন আপনি আমার জন্যে এই পাঁচ-শো টাকা খরচ করলেন? কম দামী কিছু উপহার দিলেই পারতেন। আপনার বুঝি অনেক টাকা আছে, দিদি? সব চাক্‌রী করে জমিয়েচেন? আমি চাকরী করলে আমিও জমাব। আপনাকেও আমি একটা উপহার দেব। কি দেব, দিদি?"

বিজলী সহাস্যে কহিল—"তুমিই বল।"

গৌর কহিল—"আপনি কি ভালবাসেন, তা ত জানি না।...... আচ্ছা......দাঁড়ান...আপনাকে...আপনাকে...একটা হাতী কিনে দেব।"

বিজলী উচ্চহাস্য করিয়া কহিল—"হাতী আমি কি কর্‌ব, ভাই? আমি মেয়েমানুষ, আমায় হাতীতে চড়তে নেই যে!"

গৌর বিষণ্ণভাবে কহিল—"ও। তাহলে কি দেব, দিদি?"

বিজলী সকৌতুকে কহিল—"সে এখন বল্‌ব না। তুমি আগে টাকা জমাও, তারপর বল্‌ব—"

গৌর কহিল—"জমিয়েচি ত। আপনি দিয়েচেন দু'শো, বড়দা পঞ্চাশ, এইত আড়াই-শো জমেচে! বাবার কাছে আরও টাকা পাব।"

বিজলী কহিল—"বাবা ত দিয়েচেন, আবার পাবে কি?"

গৌর পুলকিত ভাবে কহিল—"বারে বা! ১১ই বোশেখ আমার জন্মদিন যে! আমার জন্মদিনে বাবা বরাবর আমায় জিজ্ঞাসা করেন, খোকা কি নেবে? এবার বল্‌ব—আমায় আড়াই-শো টাকা দাও, জমাব, দিদির জন্যে—ও, হাতীতে আবার আপনাকে চড়্‌তে নেই! তাহলে?"

১১ই বৈশাখ গৌরের জন্মদিন। বিজলীর মনে পড়িল, তাহার খোকও ১১ই বৈশাখ হইয়াছিল। বিজলী হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

গৌর অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাব্‌চেন দিদি? আজ ২রা বোশেখ হল, ১১ই হতে আর কতদিন?"

বিজলী প্রকৃতিস্থ হইয়া, গৌরকে শিখাইয়া দিল, কি করিয়া মুখে মুখে দিন গণনা করিতে হয়। এই নূতন বিদ্যা শিখিয়া গৌরের আনন্দ আর ধরে না! বিজলী যতগুলি প্রশ্ন করিল, গৌর সব গুলিরই সঠিক উত্তর দিয়া কহিল—"তাহলে, অঙ্কেও ফুল্‌ নম্বর পেলাম?"

গৌরের কথা যেন শেষ হইয়া গেল। হঠাৎ সে চিন্তিত হইয়া পড়িল।

বিজলী কহিল—"কি? হঠাৎ চুপ করে গেলে যে? ভাব্‌চ কি?"

গৌরের মুখে ম্লানিমার একটা মেঘ সঞ্চারিত হইল। বিজলীও একটু চঞ্চল হইল। তাহাকে খুশী করিবার নিমিত্ত বিজলী দুই একটী প্রসঙ্গের অবতারণা করিল, কিন্তু গৌর সে দিকে মনোযোগ দিল না।

বিজলী জিজ্ঞাসা করিল—"কি হল হঠাৎ, ভাই? শরীর ভাল আছে ত? দেখি"—বলিয়া বিজলী গৌরের কপালে গায়ে ও বুকে হাত দিয়া দেখিয়া, কহিল—"শরীর ভালই আছে—"

বিমর্ষভাবে গৌর কহিল—"আচ্ছা দিদি, আমার মা ত স্বর্গে গেছেন, তবে তাঁর কথা আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে কেন?"

বিজলী ব্যথিত হইল। মনোভাব গোপন করিয়া কহিল—"তোমার মাকে তুমি যখন দেখ' নি, ভাই, তখন তাঁর কথা মনে করে আর কি হবে? মা স্বর্গে গেছেন, তাঁকে মনে করে দুঃখ কর্‌তে নেই। অলক্ষ্যে থেকে তিনি তোমায় সারাদিন আশীর্ব্বাদ কর্‌চেন। তাঁকে স্মরণ কর্‌বে,

ভক্তি করবে, মানুষ হবে, বাবার মত সর্ব্বজনমান্য হবে, দয়ালু হবে, সৎ হবে, তাহলেই মা সুখী হবেন। তাঁর জন্যে তুমি যদি মন খারাপ কর', তাহলে তিনি দুঃখ পাবেন। জান ত, বাপ-মায়ের মনে দুঃখ দিতে নেই!"

গৌর ভাবাবিষ্ট ভাবে কহিল—"মন ত খারাপ করছি না, মনে হচ্ছে, তাই বললাম। আচ্ছা দিদি, আমার মা কেমন ছিলেন? খুব ভাল, না?"

গৌরের মাতৃচিন্তাগত মনটিকে অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য, বিজলী কহিল—"নিশ্চয়। তোমার মা যে খুব ভাল ছিলেন, তা বাবাকে দেখেই বুঝতে পার। বাবা কি সুন্দর লোক! তোমায় কত ভালবাসেন।"

গৌরের মনের ঘোড়া তবু ফিরিল না। আত্মগতভাবে কহিতে লাগিল—"এমন কেউ থাকৃত বাড়ীতে, যাকে মা বলে ডাক্‌তাম্, তা হলে, বেশ হত। এত লোক রয়েচে, কত কি বলে ডাকি, কিন্তু 'মা' বলতে একজনও নেই! এমন কেন, দিদি?"

বিজলী এইবার সত্য সত্যই বিপন্ন হইয়া পড়িল। এ অদ্ভুত প্রশ্নের সে কি উত্তর দিবে? বিজলীর এখানে আজ তিন মাস পূর্ণ হইল। ২রা মাঘ সে আসিয়াছে, আজ ২রা বৈশাখ। ইহার মধ্যে এই সরল ভাবপ্রবণ শিশুটিকে, বিজলী অত্যন্ত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। গৌরও বিজলীকে ছাড়া থাকিতে পারে না। বিজলীর নিজের ছেলের কথা যখন মনে পড়ে, সে তখন গৌরের মুখপানে চাহিয়া, গৌরকে বক্ষে চাপিয়া, স্বস্তি অনুভব করে।

শিশুসুলভ বহু হাস্যকর প্রশ্নের মধ্যে মাঝে মাঝে হঠাৎ গৌরের মাতার স্মৃতি জাগ্রত হয়। বিজলী বিস্মিত হইল না, কিন্তু বিপন্ন হইল। মায়ের কথার উত্তর দিতে বিজলীকে রীতিমত বেগ পাইতে হয়।

বিজলী কহিল—"মা বাবা একটাই হয়, হু'টো হয় না।"

গৌর ধীরে ধীরে অন্যমনস্কভাবে কহিতে লাগিল—"আপনাকে 'দিদি' বল্‌তে আমার একটুও ভাল লাগে না, দিদি। আপনাকে আমার 'মা' বল্‌তে ইচ্ছে হয়। আপনাকে মা বল্‌লে দোষ কি, দিদি?"

বিজলীর অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। এ ছেলেটি বলে কি? এমন অদ্ভুত কথা ত সে কখনও অন্যের ছেলের মুখে শোনে নাই! তাহার অন্তরের মাতৃদেবীটি প্রসন্ন হইলেন বটে, কিন্তু এ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। তিনি আছেন, তাঁহার খোকার একান্ত আপনার, অখণ্ডরূপে, অতন্দ্র প্রতীক্ষায়ঃ অথচ বুভুক্ষিত মাতৃদেবী মা-নামের এ অমৃতভোগ প্রত্যাখ্যান করিতেও ব্যথিত হন! খেলার ছলে বিজলীর অন্তরক্ষতে গৌর মর্ম্মান্তিক আঘাত করিয়া ফেলিয়াছে। বিজলীর মুখে অব্যক্ত যন্ত্রণার চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

কোনও রকমে বিজলী কহিল—"বড়দিদি মায়েরই তুল্য, ভাই। তাই বলে, দিদিকে কেউ মা বলে ডাকে না! লোকে শুন্‌লে নিন্দে কর্‌বে—"

—"কি নিন্দে কর্‌বে?"

—"বল্‌বে, গৌর বড় বোকা।"

—"বল্‌লেই বা! বোকা বল্‌লেই ত আমি বোকা হয়ে যাব না।"

—"তা যাবে না, সত্যি, তবু লোককে তা বল্‌তেই বা দেব কেন আমরা? আমরা জানি, আমাদের গৌর কত বুদ্ধিমান্, কত ভাল ছেলে —এবার পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ডিভিশনে সে পাশ করেচে—"

গৌর খুশী হইল না। আব্‌দারের সুরে কহিল—"পাশ করেচে ত, বয়ে গেছে। আপনি জোর করে নম্বর দিয়ে পাশ ক'রে দিয়েচেন। কিন্তু

আপনাকে মা বল্‌লে ক্ষতি কি? বাবাকে বল্‌ব—বাবা, দিদ্দিকে আমি মা বলে ডাক্‌ব, সেজন্যে আমায় যেন কেউ নিন্দে না করে, দেখ'।"

বিজলী গৌরকে বক্ষোবদ্ধ করিয়া সস্নেহে কহিল—"তুমি একটা পাগল!"

—"কে পাগল, মা বিজলী? খোকা বুঝি? একদম—একদম—" বলিতে বলিতে প্রসন্ন হাস্যে আলো করিয়া হরগোবিন্দ আসিয়া বসিলেন।

হরগোবিন্দ অলক্ষ্যে, ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। আনন্দাশ্রুতে তাঁহার শীর্ণ গণ্ডযুগল পরিপ্লাবিত হইয়া উঠিল। সেই ইংরাজ-নার্সের পর হইতে হরগোবিন্দ আড়ি পাতিয়া, মাঝে মাঝে ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া থাকেন। তাঁহার আশঙ্কা—কি জানি, বিজলীও যদি সেইরূপ কোনও নিষ্ঠুর ব্যবহার করে? কুশিক্ষা দেয়? প্রত্যেক বারই হরগোবিন্দ বিজলীর শিশুপ্রীতি ও স্নেহশীলতায় মুগ্ধ হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার সে বিভীষিকা যায় নাই।

বিজলী অপ্রস্তুত হইয়া এক পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

হরগোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ যে পড়া শোনা হচ্ছে না, মা?"

হরগোবিন্দর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, বিজলী মৃদু অথচ স্পষ্ট করিয়া কহিল—"খোকার পরীক্ষা হয়ে গেছে, বাবা। খোকা ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ করেচে। তাই, চার দিন ওর এখন ছুটি—"

প্রসন্নহাস্যে হরগোবিন্দ কহিলেন—"বটে? খোকা এত উন্নতি করেচে? দেখ্‌লে মা? তুমি এসে কি উপকারটা হয়েছে! বেশ, বেশ—"

—"বাবা, আমি কি প্রাইজ পেয়েচি জান না ত—" সোৎসাহে বলিতে গিয়া বিজলীর সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। বিজলী মুখটি সরু করিয়া, তাহাতে তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিল।

হরগোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি প্রাইজ ? বলা', থাম্‌লে কেন ?"

কথায় বাধা পড়িল। নায়েব আসিয়া জানাইল—সাজ-সমেত আরব-টাট্টু টি আসিয়াছে। হুজুর একবার দেখিলে, লোকটি চলিয়া যায়।

গৌর তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া, বিজলীকে ধরিয়া টানিতে টানিতে একেবারে নীচে আসিয়া হাজির।

হরগোবিন্দ সবিস্ময়ে কহিলেন যে তিনি এর বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানেন না : কে এ ঘোড়া পাঠাইল ? এ নিশ্চয় বাড়ী ভুল করিয়াছে !

বিক্রেতার রশীদ দেখাইয়া নায়েব কহিল—"ভুল তারা করে নাই হুজুর। এই দেখুন্ আপনার নাম আর আমাদেরি বাড়ীর ঠিকানা, স্পষ্ট লেখা রয়েচে। নগদ পাঁচশো টাকাও পেয়েচে, এই তার রশীদ।"

উভয়েই বিস্মিতভাবে নীচে আসিয়া দেখে, ঘোড়ার উপর খোকা উপবিষ্ট : বাড়ীর পশ্চাৎ দিকের খোলা জায়গাটায় বিজলী ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ঘুরাইতেছে। মাধব দেখিয়া, তাড়াতাড়ি আসিয়া লাগাম ধরিল।

হরগোবিন্দ আসিয়া দাঁড়াইতেই, খোকা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আনন্দাতিশয্যে কহিল—"এই দেখ বাবা, দিদি আমায় এই প্রাইজ দিয়েচেন—"

বিজলী দ্রুতপদে সেখান হইতে পলাইয়া, ত্রিতলে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া, গৌরের অশ্বারোহণ দেখিতে লাগিল।

অভিভূতের মত হরগোবিন্দও বিজলীকে অনুসরণ করিয়া উপরে আসিয়া গাঢ় স্বরে ডাকিলেন—"মা বিজু—"

—"বাবা—" বলিয়া বিজলী আসিয়া নতনেত্রে দাঁড়াইল।

হরগোবিন্দ কহিলেন—"বস মা, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

বিজলী মৃদু স্বরে কহিল—"বলুন্।"

হরগোবিন্দ কহিলেন—"এ তুমি কি করেচ, মা? ঘোড়া কিনেচ, বেশ করেচ। কিন্তু এ টাকাটা তোমায় নিতে হবে।"

বিজলী পরিষ্কার কণ্ঠে কহিল—"ছোট ভাইয়ের উপর যদি আমার এটুকু অধিকারও না থাকে, তাহ'লে, আমি কি করে এখানে থাকি, বাবা?"

হরগোবিন্দ কহিলেন—"না, না, মানুষ যাকে ভালবাসে, তাকে কিছু দিতে চায়। এটা মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি, এটায় ত দোষ নেই! দোষ সেইখানে, যেখানে তার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়! তরকারিতে নূন্ দরকার, তার একটা মাত্রা আছে। তোমার এটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, মা।"

অবিকম্পিত কণ্ঠে বিজলী কহিল—"আমি বল্‌চি বাবা, আপনি হয়ত তাই মনে করচেন, কিন্তু তা নয়। নূন্ কেউ কেউ একটু বেশীই দেয়—"

হরগোবিন্দ কহিলেন—"দোস্‌রা মাঘ তুমি এ বাড়ী এসেচ, আর আজ ২রা বোশেখ। তিন মাসে তুমি পেয়েচই সাড়ে চার শো টাকা। অথচ খরচ কর্‌লে একেবারে পাঁচশো টাকা! এ ছাড়াও শুন্‌লাম, খোকাকে তুমি নগদও দিয়েচ দু'শো: এটা কি মাত্রা, মা? হরগোবিন্দ চৌধুরীকে তুমি হিসেবে ঠকাবে? তাহ'লে চাকরী নিলে কেন, মা?"

বিজলী ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"আপনি পাটিগণিতের হিসেবে যা দেখ্‌চেন, বাবা, শুভঙ্করের হিসেবে কিন্তু তা বলে না। পৃথিবী থেকে বাষ্পকণা নিয়ে মেঘ যখন ধরণীকে শস্যশ্যামল কর্‌তে বর্ষণ করে, তখন সে কি পাটিগণিত ধরে' কষে', ধারাযন্ত্রটি ঘুরোয়? আপনার আশীর্ব্বাদই আমার টাকা। আমি এখানে টাকাই শুধু পাইনি, বাবা, টাকার চেয়ে ঢের বড়, অর্থাৎ টাকাতে যা পাওয়া যায় না, এমন জিনিষ পেয়েচি। তার দাম টাকা-আনা-পাই-য়ে হয় না। টাকার খুবই দরকার, কিন্তু টাকাটাই

সব নয় : বাঁচ্তে হলে খাওয়া খুবই দরকার, কিন্তু খাওয়ার জন্যেই আমরা বাঁচি না। আমাকে মেয়ে বলে যখন গ্রহণ করেচেন, তখন চাকরাণীর অমর্য্যাদা হ'তে আমায় রক্ষা কর্বেন্—আপনার শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা, বাবা।"

হরগোবিন্দ দেখিলেন, মেয়েটি বুদ্ধিমতী, কথা কহিতে জানে। প্রীত হইয়া কহিলেন—"এ কথা তুমি কেন মনে কর্‌চ, মা? তুমি ত চাকরাণী নও, তুমি আমার মেয়ে। তোমার যা অন্তর, ও-ত টাকায় পাওয়া না, মা, তা আমি বুঝি। তোমায় আমি চিনেচি; তুমি সত্যিই আমার মেয়ে। আমার খোকাকে ঠিক যে-ভাবে আমি চাই, তোমার হাতে সেই ভাবেই সে মানুষ হবে, আমি বুঝতে পেরেচি। কত ভাগ্যে আমি তোমায় পেয়েচি। এই তিন মাসে খোকার রোগবালাই সব সেরে গেছে, সে কেমন স্বাস্থ্যবান্ হয়েচে। তার জন্যে মাষ্টার রাখ্‌ব ভেবেছিলাম, তাও রাখ্‌তে দিলে না—অথচ ছেলের লেখাপড়াও হচ্ছে খুব ভাল। ছেলে আমার মন প্রফুল্ল করে বেড়াচ্ছে! তোমার গুণের অন্ত নাই। এ মাস থেকে তোমায় তিন শো টাকা করে হাত খরচ নিতে হবে, আর এই পাঁচশো টাকাটা ফেরৎ নিতে হবে। লক্ষ্মি মা আমার, বুড়ো বাপের এই কথাটা রাখ—"

বিজলী হরগোবিন্দকে বাধা দিয়া কহিল—"বাবা, দাদা এসেচেন,—ঐ দেখুন, ঘোড়ার লাগাম ধরে নীচে ছুটোছুটি কর্‌চেন।"

হরগোবিন্দ কহিলেন—"যতু? যতু এসেচে—" বলিয়া রেলিং-য়ে ঝুঁকিয়া উভয়ের ছেলেমানুষী দেখিতে দেখিতে একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। সেই ফাঁকে বিজলী সেখান হইতে পলায়ন করিল।

' হরগোবিন্দ দেখিলেন, বিজলী পলাইয়াছে। ভাবিলেন, মেয়েটি সত্যই অপূর্ব্ব। বিজলী সত্যই তাঁহার কন্যার অভাব মোচন করিয়াছে। বিজলীর উপর তাঁহার শ্রদ্ধা শতগুণ বাড়িয়া গেল। এইরূপ মেয়েই তিনি খুঁজিয়াছিলেন। মনে মনে হাসিলেন : এই মেয়েকে পতিতা বলিয়া তিনি গৃহে স্থান দিতে প্রথমে অনেক ইতঃস্ততও করিয়াছিলেন! পরের ছেলেকে যে এমন ভালবাসিতে পারে, সে মহীয়সী! মনে পড়িল—যতীন বলিয়াছিল, ইহার নামই বদ্ হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতি বদ্‌লায় নাই। নাম দেয় মানুষ, প্রকৃতি দেন—ভগবান্। কংসের ভগিনীই ছিলেন, মাতা দেবকী—যাঁহার গর্ভরথারূঢ় হইয়া ভগবান্ এই ধরণীতে আসিয়াছিলেন। নারী কি কখনও শুধু শুধু দুঃশীলা হয়? দুষ্ট পুরুষেই তাহাকে খারাপ করে।

সারা দ্বিপ্রহর হরগোবিন্দ ও যতীন উত্তেজিতভাবে, অথচ নিম্নস্বরে পরামর্শ করিলেন। অপরাহ্ন প্রায় চারিটায় হরগোবিন্দ বিজলীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বিজলী আসিয়া দুয়ারের গোড়ায় সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইল। যতীন্ নীলাকাশ পানে চাহিয়াছিল। সে চাহনিতে ছিল অসীম উৎকণ্ঠা ও কৌতূহল।

হরগোবিন্দ কহিলেন—"দেখ' মা বিজু, একটা কথা তোমায় বলা হয়নি—ভুলে গিছ্‌লাম—"

বিজলী একটু তীক্ষ্ণভাবে কহিল—"আমি প্রথমেই বলে রাখ্‌চি, বাবা, সকালবেলাকার সেই কথাটা যদি আবার বল্‌তে চান্, তাহ'লে আমি এ বাড়ী ছেড়ে এখুনি চলে যেতে বাধ্য হব।"

হরগোবিন্দ মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন মা?"

বিজলী কহিল—"আপনি জানেন বাবা, আমি স্বাধীন জীবনযাপন



কর্‌তে অভ্যস্ত। আমার স্বাধীনতা যেখানে খর্ব্ব হবে, সেখানে আমি থাক্‌ব না। আমায় যদি অগণিত চাকর-চাকরাণীর মত, আর একজন নিছক্‌ বেতনভুক্‌ আপনার ছেলের পরিচারিকা ভাবেন, তাহলে আপনি ভুল কর্‌বেন, এবং আমারও থাকা আর সম্ভব হবে না।”

হরগোবিন্দ বিজলীর তেজস্বিতায় মুগ্ধ হইয়া, যতীনের পানে চাহিলেন। যতীন মুখ নামাইল। ভাবিল—বুঝি বা বিপদ বাধায়!

বিজলী ভাবাবেশে কহিতে লাগিল—“আপনি এ-ও হয়ত শুনেচেন, আমি পুত্রহারা। আমার খোকাও, ঠিক গৌরের মতই হয়েচে এতদিনে। সে-ও জন্মেচে ঐ ১১ই বৈশাখ। আপনার ছেলেকে নিয়ে আমি সেই দুঃসহ যন্ত্রণা ভুল্‌তে চেষ্টা কর্‌চি এখানে এসে। চাক্‌রী কর্‌তে আমি এখানে আসি নি।” বলিতে বলিতে বিজলী কাঁদিয়া ফেলিল।

কথাগুলি হরগোবিন্দর বড় ভাল লাগিল। তাঁহার বেতনভুক্‌ কোনও ব্যক্তি যে তাঁহাকে বলিতেছে, এ কথা তাঁহার মনেই হইল না। তাঁহারও চক্ষু দুইটি অজ্ঞাতে অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

হরগোবিন্দ কহিলেন—“বেশ, মা, তোমার যেমন অভিরুচি। আমি আর কখনও তোমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কর্‌ব না। হল ত? এইবার শোন’, যে জন্যে তোমায় ডেকেচি—”

বিজলী আশ্বস্ত হইয়া, কোমলভাবে কহিল—“আপনি বিচক্ষণ লোক, আমি বাবা বলি, সুতরাং আপনি যেন চিরদিন আমার বাবা হয়েই থাকেন্‌, এই আমার প্রার্থনা। এইবার বলুন, কি আদেশ—”

হরগোবিন্দ কহিলেন—“সকালে তোমাদের কথা হচ্ছিল, না?”

তোমাকে খোকার মা বলে ডাক্‌তে ভারি ইচ্ছে : তুমি তাঁকে বোঝালে দিদিকে মা বলতে নেই—কেমন, না ?"

বিজলী সলজ্জভাবে কহিল—"সে কথাটিও আপনি শুনেচেন ?"

হরগোবিন্দ কহিলেন—"তা শুনেচি মা। খোকার যখন মা বলার অত ইচ্ছে, তখন বলুক্‌ই না। তোমার তাতে কোনও আপত্তি আছে ?"

বিজলী কহিল—"না বাবা, আপত্তি আমার নেই। তবে আমায় মা বল্‌লে, ওর নিজের মায়ের উপর শ্রদ্ধা ক্রমশ কমে যেতে পারে, চাই কি, কিছুদিনে, তাঁকে একেবারে ভুলেও যেতে পারে। সেটা বড় খারাপ হবে না কি ? দাদা কি বল ?"

যতীন কহিল—"পিষে মহাশয়ের কথার উপর আমি আর কি বল্‌ব ?"

"পিষে মশায় ?" বিজলী চমকিয়া উঠিল।

সহাস্যে হরগোবিন্দ কহিলেন—"আমি যে ওর আপন পিষে মশায়। তুমি জান্‌তে না ? যতু বলিস্‌ নি তুই, বিজু মাকে ?"

যতীন কহিল—"আজ্ঞে না।"

হরগোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার ছেলেটি এখন কোথায় মা ?"

বিজলী ছলছল চোখে কহিল—"আমি তা জানি না। দাদা জানেন।"

গৌর ছুটিয়া আসিয়া ধপ করিয়া যতীনের পাশে বসিতেই, সকলে চুপ করিল। গৌর অনুযোগের সুরে কহিল—"তোমরা আচ্ছা মজার লোক ত ? ও-ঘরে চুপটি করে মুখটি বুঁজে আমি একলা বসে, আর এখানে তোমরা বেশ গল্প কর্‌চ—"

যতীন কহিল—"তা তুমি এতক্ষণ এলেই পার্‌তে, ভাই। তোমায় কি কেউ মানা করেছিল ?"

গৌর কহিল—“বাবা, আমি বলেচি, আমার জন্ম দিনে দিদিকে আমি একটা উপহার দেব। কি দেব বল ত? বড়দা, তুমি ঠিক করে দাও—”

যতীন কহিল—“যাতে উনি সত্যি খুশী হন্, এমন কিছু দাও।”

খোকা কহিল—“ঘোড়া আমার খুব পছন্দ, দিদি আমায় ঘোড়া দিয়েচেন। আমি বল্লাম, আমি একটা হাতী কিনে দিচ্ছি। দিদি বললেন—ওঁকে হাতী নিতে নেই—”

খোকা ছাড়া তিন জনেই হাসিয়া উঠিল।

যতীন কহিল—“তুমি যদি ওঁকে মা বলে ডাক’, তাহ’লে বোধ হয় উনি খুব খুসী হন্।”

বিজলী মৃদু হাসিয়া, দুরু দুরু হৃদয়ে কহিল—“তা হই, তবে এ মা হওয়াও অভিনয় হবে! সত্যি যার মা—”

বাধা দিয়া হরগোবিন্দ কহিলেন—“যদি বলি, সত্যিই তুমি খোকার গর্ভধারিণী মা!”

বিজলীর দুই চক্ষু কপালে উঠিল। মুখে অস্বাভাবিক একটা দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর শুষ্ক। উত্তেজিতভাবে ডাকিল—“দাদা?”

কোমল ভাবে যতীন কহিল—“পিযে মহাশয়কে আমি যে সব বলেচি, তা ত তুমি জান, বোন্।”

খোকা আনন্দে করতালি দিয়া, এক লাফে বিজলীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—“তুমি আমার মা, দিদি? বেশ হল—তুমি মা—আমার মা—”

অসহ্য পুলকের হঠাৎ নিদারুণ আঘাতে, বিজলী আর দাঁড়াইতে পারিল না। খোকাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পাঁচ মাস চৈতনপুরে বাস করিয়া, অসীম শীলাকে লইয়া প্রায় এক মাস হইল কলিকাতার গড়িয়াহাটের বাড়ীতে আসিয়াছে।

নূতন রং ও চূণকাম হওয়ায় বাড়ীটি একেবারে নূতনের মত দেখাইতেছিল। বিস্তৃত শষ্পশ্যামল মাঠের মধ্যে শঙ্খধবল বাড়ীখানি যেন কালীদীঘির কালো জলে একটি শ্বেত পদ্ম। শীলার সহজ সৌন্দর্য্য-বোধ বাড়ীখানিকে পূর্ব্বাপেক্ষা ঢের বেশী সুন্দর করিয়াছে: এই এক মাস কাল সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মিস্ত্রীদের সহিত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, শীলা নূতন নূতন বহু ফুল গাছ লতা ও টব বসাইয়াছে, দুয়ারে ও জানালায় বড় বড় দামী পর্দ্দা ঝুলাইয়াছে এবং কম্পাউণ্ডটিকে সযত্নে পরিষ্কার করাইয়া, নির্ম্মল রাখিয়াছে।

এত কাজের মধ্যেও শীলা দুই বেলাই কিছু না কিছু মাছ তরকারী রাঁধিয়া, সম্মুখে বসিয়া স্বামীকে খাওয়াইয়াছে এবং চাকরবাকরদের খাওয়ারও খোঁজখবর করিতে ভুলে নাই। প্রশংসমান দৃষ্টিতে বি-এ পড়া, জজের কন্যা এই আধুনিকাকে অসীম দেখে, আর অনির্ব্বচনীয় পুলকে আত্মবিস্মৃত হয়। কোলের উপর খোলা বই পড়িয়া থাকে, বাতাসে পাতা উল্টাইয়া যায়, কখন কখন হাত হইতে বই মাটিতে পড়িয়া যায়, অসীমের খেয়াল থাকে না: সে ভবিষ্যতের অবিনাশী সুখনীড় রচনা করে এবং নিজের ভাগ্যদেবীকে কৃতজ্ঞতাঞ্জলি দেয়।

জ্যৈষ্ঠ মাস। অপরাহ্ন। ভয়ানক গুমোট। অসীম ও শীলা এক-খানা গোল টেবিলের দুই পাশে মুখোমুখি বসিয়া, বিশ্রম্ভালাপে ব্যস্ত।

অসীম রহস্যচ্ছলে কহিল—"তোমার উচিত ছিল একজন কর্ম্মীকে বিয়ে করা, আমার মতন এমন কুঁড়ের বাদশাকে বিয়ে করে' মস্ত ভুল করেচ।"

শীলা ম্লানহাস্যে কহিল—"তা যখন হয়ে গেছে, তখন আর কি হবে? মানুষমাত্রেই ভুল করে, যে মহৎ সে ক্ষমা করে। তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

অসীম সজোরে হাসিয়া উঠিল। কহিল—"চৈতনপুরে পাঁচ মাস রইলে, কেবল বাড়ীই সাজালে। এখানে এসেচ মাসখানেক, মাসভোরই ব্যস্ত বাড়ীর সাজগোছ করতে! একি ব্যারাম তোমার বল দেখি? নাঃ, এর চিকিৎসা দরকার।"

শীলা মৃদু হাসিয়া সলজ্জভাবে কহিল—"বাড়ীর তুমি কি বুঝবে? বাল্যকাল থেকে হয় চাকর-বাকরের কাছে, নয়, বাসা-হোটেলে মানুষ হয়েচ। তুমি বাসার রকমই জান, বাড়ীর রকমারি বুঝ্‌বে কি?"

অসীম কৌতুক করিয়া কহিল—"বাড়ীর রকমারি না বুঝলেও, এ রকম ঝকমারি যদি আর কিছুদিন চলে, তাহলে বাড়ীই ছেড়ে পালাতে হবে।"

শীলা কহিল—"ছাড়ব বল্‌লেই কি ছাড়া যায়? তুমি বাড়ী ছাড়্‌বে, কিন্তু বাড়ী তোমায় ছাড়্‌বে কেন? জান ত, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। এখন আর এ বাসা নয়, এ গৃহ। কারণ, এই যে—এই দিকে তাকাও—আমি—অর্থাৎ গৃহিণী—এসেচি।"

অসীম কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল—"গৃহিণী এসেচেন, শুনেচি। তার প্রমাণস্বরূপ গৃহই কেবল দেখচি, গৃহিণীর কোনও পাত্তা নাই।"

সলজ্জ হাস্যে শীলা কহিল—"মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে আদালত তোমায় শাজা দিতে পারেন, তা জান? গৃহিণীর পাত্তা নিয়মিতই পাচ্ছ। এর বেশী পেতে চাইলে, পাওয়ায় অরুচি ধরে যাবে।"

অসীম কহিল—"মিথ্যা কথা। অমৃতে অরুচি কখন হয় না, বরং পুরাতন দুশ্চিকিৎস্য অরুচি তাতে সারে। কোথায় বেশী পাওয়ায় পায়াভারী হবে, না, পাওয়াই ভার হয়ে উঠ্‌ল? কি ভাগ্য?"

একসঙ্গে যুগ্ম হাসির দক্ষিণানিল দুইটি অন্তরেই চূতমুকুলগুলিকে দোলা দিয়া, কদম্বকোরকে পুলক শিহরণ তুলিয়া এবং নীপবীথির বয়ঃসন্ধির পাঁপ্‌ড়িগুলি খুলিয়া দিয়া, চলিয়া গেল। বাম প্রকোষ্ঠের বলয়গাছটি দক্ষিণ হস্তে ঘুরাইতে ঘুরাইতে মৃদু মধুর কণ্ঠে, শীলা জিজ্ঞাসা করিল—"এ সব ত হল। এইবার বাড়ী কবে যাওয়া হচ্ছে, বল!"

অসীম বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"সেকি? এরি মধ্যে বাড়ী কি? এত করে বাড়ীটা সাজালে-গোছালে, দু' চার মাস বাস কর"—

শীলার মুখটি ম্লান হইয়া গেল—অসীম লক্ষ্য করিল না। কহিতে লাগিল—"কলকাতা এলে, তোমার বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কর', তাঁদিকে দুয়েক দিন নেমন্তন্ন কর—"

শীলা বাধা দিয়া কহিল—"আমার বান্ধবী কেউই নেই। যা-ও দুয়েক জন ছিল, বিয়ে হয়ে তারা কে কোথায় চলে গেছে, জানিও না।"

অসীম জিজ্ঞাসা করিল—"দু চারদিন সিনেমা-থিয়েটার দেখবে না?"

শীলা জানাইল—"ও সব আমার ভাল লাগে না।"

অসীম রঙ্গ করিল—"অবাক্ করলে, রাণি! এই ১৯৪১ সালে কোনও তরুণীর যে সিনেমা দেখ্‌তে ভাল লাগে না, এ আমার ধারণাতীত!"

শীলা মৃদু হাসিয়া কহিল—"শুধু তরুণীরা কেন, তরুণরা নয়? আমি নাই বা গেলাম! তুমি গেলেও ত পার! যাও না, দেখে এস।"

অসীম কহিল—"আমি ও-সব কখনই দেখি না।"

শীলা সকটাক্ষে কহিল—"পতিব্রতা নারী সেইজন্যে স্বামী যা পছন্দ করেন না, কখনই তা করে না।"

অসীম পুলকে নির্ব্বাক্ হইল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া, কোমল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"যে অজ-পাড়াগাঁয়ে যেতে লোকে ভয় পায়, সেখানে যাবার জন্যে তুমি এত উতলা কেন বল দেখি ?"

শীলার নীলায়ত চক্ষু দুইটিতে একটা সজল মায়া ঘনাইয়া উঠিল। কহিল—"চৈতনপুর আমার বড্ড ভাল লেগেচে।"

অসীম সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—"কলকাতার চেয়েও ?"

শীলা তাচ্ছিল্যভরে কহিল—"কলকাতা কি বাসের যোগ্য ? এ শুধু চাকুরে আর ব্যবসাদারের বাসভূমি, ভদ্রলোকের নয়। বিলেতে সৌখীন লোকেরা কখনও লণ্ডনে বাস করে না। সারা দিন তাঁরা শহরে কাজকর্ম্ম করে, সন্ধ্যায় চলে যান্ পল্লী মায়ের নিভৃত অঞ্চলে।"

অসীম কহিল—"বিলেতের পল্লী, আর ভারতের পল্লী ? সেখানে পল্লী আছে, আর এখানে আছে শুধু পাড়াগাঁ। এখন নতুন্ নতুন্ ভাল লাগ্‌চে, কয়েক মাস পরে কেঁদে পালিয়ে আস্‌তে পথ পাবে না।"

শীলা প্রতিবাদ করিয়া কহিল—"কিন্তু পল্লীকে এমন অবাসযোগ্য করল কে ? তোমরা অর্থাৎ জমিদারেরাই ত করেচ।"

অসীম সম্মুখে কিঞ্চিৎ ঝুঁকিয়া, সকৌতুকে কহিল,—"জমিদাররা ?"

শীলা দৃঢ়ভাবে কহিল—"হাঁ তোমরাই ! তোমার কথাই ধর। পল্লীর কল্যাণের বা উন্নয়নের জন্যে তুমি কি করেচ ? প্রজাদের কাছ থেকে তুমি যে নিয়মিত খাজনা নিচ্ছ, তার বিনিময়ে তাদিকে কি দিচ্ছ ?"

অসীম খানিকটা অপ্রতিভ এবং খানিকটা প্রসন্ন হইয়া কহিল—

"তুমি যা বল্‌চ, শীলা, তা নিয়ে খুব ভাল প্রবন্ধ লেখা চলে, বক্তৃতা দেওয়া যায়, এমন কি, চার-আনি থিয়েটারের জন্যে তিন অঙ্কের একখানা নাটকও রচনা করা যায়, কিন্তু কাজ করা যায় না। কাজটা ঠিক তার উল্টো।"

শীলা কহিল—"উল্টো করে দেখে দেখে, তোমরা কেবল উল্টোই দেখ সব, পাছে কাজ কর্‌তে হয়। জমিদারের রথ সোজা চলে না, উল্টোরথেই তাঁদের উৎসব। উল্টো রথে মস্ত একটা সুবিধেও আছে যে—"

অসীম খুব একচোট হাসিয়া কহিল—"কি রকম?"

শীলা কহিল—"সোজা রথে চোখ রাখ্‌তে হয় সম্মুখে! উল্টো-রথের সে চক্ষুলজ্জা পর্য্যন্ত নেই! পিছনে চোখ থাকে বলে, লোক চাপা দিয়েই সে রথ চলে। কাজেই, গরীব গেরস্ত-লোক সব গ্রাম ছেড়ে পালায়, শহরের গর্ত্তে আত্মরক্ষা কর্‌তে।"

অসীম সহাস্যে কহিল—"একজন জমিদারগিন্নির মুখে এ প্রকার প্রশস্তি শুনলে, বাংলাদেশের জমিদারগণ আমাদিকে কালাপানি পাঠাবার ব্যবস্থা কর্‌বেন। আমি তাতে রাজী নই, অতএব আত্মরক্ষা এবং স্ত্রী-রক্ষার জন্যে, তোমার মতেই সায় দিচ্ছি। চল, চৈতনপুরেই আমরা নীড়-নির্ম্মাণ করিগে। মিছেমিছি, এ বাড়ীটায় কতকগুলো পয়সা নষ্ট হল।"

শীলা কহিল—"নষ্ট কেন হবে? থাকল এ বাড়ী আমাদের। মাঝে-মিশেলে এসে, দু'চার দিন করে থেকে যাওয়া যাবে।"

পুলকাতিশয্যে শীলার হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া, গভীর স্বরে অসীম কহিল—"সত্যি শীলা, তোমার মত রত্নলাভ করে,' আমি যথার্থই বড় ভাগ্যবান্‌। সাধারণত বিবাহ করে', লোকের লক্ষ্মীলাভ হয়, আমি করেছি এক সঙ্গে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী, দুইজনকেই।"

ভাবাবেগে অজ্ঞাতে শীলার চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু, অসীমের হাতে পড়িল। অসীম হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিল—"চোখ মোছ', রাণি।"

চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া শীলা কহিল—"আশীর্ব্বাদ কর, তোমায় যেন চিরদিন এমনি সুখী কর্‌তে পারি। তোমায় ছাড়া আমি আর কিছুই চাইনা: আমায় ক্ষমা কর', ত্যাগ কর' না—"

হঠাৎ সেতারের তার ছিঁড়িয়া যাওয়ার মত, শীলা নীরব হইল।

আনন্দে গদগদ হইয়া অসীম জিজ্ঞাসা করিল—"ভাবপ্রবণ হয়ে মাঝে মাঝে তুমি এ অনুযোগ কেন কর, বল দেখি ? আমি তোমায় ত্যাগ কর্‌ব, এ সন্দেহ তোমার কোত্থেকে হল ? এমন কিছু কি দেখেচ ?"

ভাবাতিশয্যে শীলা কতবার যে এই কথাটি বলিয়া ফেলিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই ! যতবার বলিয়াছে, ততবারই সে লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হইয়াছে ! তবু ঐ কথাটাই কেবল যখন-তখন তাহার মুখ ফস্কাইয়া বাহির হইয়া পড়ে। যে আশঙ্কাটিকে এড়াইবার জন্য সে সারাদিন কাজের পাতালপুরীতে ঢুকিয়া থাকে, কর্ত্তব্যের পাহাড়ের আড়ালে গিয়া লুকায়, সর্ব্বদা স্বামীর সান্নিধ্যে থাকিয়া নিরাপত্তা খুঁজে, সেই অদৃশ্য বৃশ্চিকটা কিছুতেই তাহাকে রেহাই দেয় না ! সামান্য একটু ছোঁয়া লাগিলেই, রবারের বলের মত ঐ চিন্তাটিই লাফাইয়া উঠে: তেলকে চাপা দিবার জন্য যতই সে জল ঢালে, তেল ততই জলের উপরে ভাসিয়া উঠিয়া মৃদুমৃদু হাসে।

শীলা আরক্তমুখে কহিল—"না, তা কিছু দেখি নি ! তবে এ ভাবনা প্রত্যেক স্ত্রীর অন্তরে সর্ব্বদা জাগরূক। হারাবার ভয় না থাকলে প্রীতির গভীরতা এবং মমত্ববোধ তেমন জন্মে না।"

অসীমের মনের অন্ধকার একটি কোণ শীলার কথায় সহসা আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অসীম অপ্রতিভ হইয়া তাহার মনের স্বর্ণ সৌধের কক্ষগুলিতে কি খুঁজিতে লাগিল।

শীলা মিথ্যা বলে নাই। সে জানে, সে অপরাধী। অপরাধের গ্লানিও সহনীয় হইত, যদি সে এমন নিরপরাধের অভিনয়ে না আত্মগোপন করিত। তাহার এই ছদ্মবেশই তাহার অপরাধকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অসহ্য করিয়া তুলিয়াছে। শীলা ভাবে, অপরাধীর জন্য দণ্ডবিধান যিনি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তিনি সত্যই সত্যদ্রষ্টা ঋষি! দণ্ডে সান্ত্বনা আছে, একটা গভীর স্বস্তি আছে। দণ্ড দেখিতে ভয়াল, কিন্তু পরিণামরমণীয়। শীলা দণ্ড পায় নাই, দণ্ডকে ভয় করে। তাই সে দিবানিশি এমন শাস্তি ভোগ করিতেছে, যাহা এ যাবৎ কোনও দণ্ডধরই কাহাকেও দিতে পারে নাই।

শীলা প্রাণপণে অসীমকে আঁকড়িয়া ধরে। অসীম ছাড়া তাহার কোনও চিন্তা নাই, তবু তাহার সন্দেহ হয়, হয়ত বা এ তাহার প্রকৃত ভালবাসা নয়: এ বুঝি অভিনয়! শীলা নিজের মনকেও আর বিশ্বাস করে না। নিজের এ সর্ব্বনাশ সে নিজেই করিয়াছে। এ শাস্তির কাছে মানুষের দণ্ডও ঢের বেশী সহনীয় হইত বলিয়া, শীলার মনে হয়।

শীলা ভাবে: সব প্রকাশ করিয়া বলে: পারে না। যন্ত্রণার শেষ করিতে আত্মহত্যা করিতে চায়: তাহাও পারে না। অতীতকে ভুলিয়া যতই সে তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিতে চায়, ততই সে অটল অনড় ও উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়! সে জানিত, মনে রাখাই শক্ত, কিন্তু ভোলা যে মনে রাখার অপেক্ষাও শক্ত, সেটি শীলা সম্প্রতি বুঝিয়াছে।

শীলা কোথাও যায় না, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করে না!

বাড়ীতে কেহ আসিলে সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে! সে লুকাইয়া থাকিতে চায়। লোক দেখিলেই তাহার ভয় হয়। কলিকাতার অসংখ্যপথ অসংখ্য নাগিনীর মত তাহাকে দংশন করিতে আসেঃ অগণিত লোক যেন তাহার গোপন কথাটি প্রকাশ করিয়া দিয়া, তাহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে! তাই সে কলিকাতা হইতে পলাইতে চায়। চৈতনপুরে এত পথ নাই, এত লোক নাই, এত লোকসমাগমও নাই। বিপুল প্রাসাদের মধ্যে সে একেলা থাকে—সুখে থাকে, নিরাপদে থাকে।

কলিকাতায় সে সর্ব্বদা সশঙ্ক, সন্ত্রস্ত। কে আসিতেছে, কি বলিতেছে, এই সব খোঁজ করিতে করিতেই, সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার কাকগুলাকে শীলা সন্দেহ করে, কুকুরগুলাকে ভয় করে, চাকরবাকর দিগকেও অবিশ্বাস করে। কে জানে? হয়ত তাহারা সব জানে!

উভয়েই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

অসীম গাঢ় ভাবে কহিল—"এইবার বুঝ্‌তে পারৃচি, কেন তুমি রাত্রে ঘুমের ঘোরেও থেকে-থেকে আঁৎকে ওঠ।"

শীলার চিন্তাসূত্র ছিঁড়িয়া গেল। সশঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"ঘুমের ঘোরে আঁৎকে উঠি? কি বল্‌চ?"

শীলার মুখখানা সহসা রক্তহীন হইয়া উঠিল।

অসীম মৃদু হাসিয়া কহিল—"প্রত্যহই, অন্তত দু'এক বার ত বটেই।"

—"কি বলি?

—"কি বল' ভাল বোঝা যায় নাঃ তবে একটা চিৎকার করে, ঘেমে কাঁপতে কাঁপতে আমায় জড়িয়ে ধর। আমি ভাবতাম, তোমার বোধ হয় ক্রিমির ধাত, তাই ঘুমের ঘোরে অমন কর।"

শীলার ভয় কাটিলেও, আশঙ্কা গেল না। সে মুখখানা নামাইল।

অসীম কহিল—"যাক্, ধরে' ফেলেচি, তাহলে তোমার ব্যারাম। তুমি তোমার মনের সব বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও: মৃত্যু ছাড়া পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যা আমাদিকে বিচ্ছিন্ন কর্‌তে পারে।"

শীলা উঠিয়া সজল নেত্রে গলবস্ত্রে অসীমের পদধূলি লইল।

কার্ত্তিক ছুটিয়া আসিয়া জানাইল—"বৃন্দাবনবাবু এসেচেন।"

অসীম কহিল—"একখানা চেয়ার এনে রেখে, ডেকে নিয়ে আয়।"

শীলা সন্ত্রস্তভাবে উঠিতেছিল। অসীম কহিল—"উঠ্‌চ কেন? বস। বিনুকে ত তুমি চেন: আমাদের বিয়েতে চাট্‌গাঁ গিয়েছিল!"

শীলা সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"ইনি এত ঘন ঘন আসেন কেন?"

অসীম রহস্য করিয়া কহিল—"কি আশ্চর্য্য! আমার বন্ধুরা আমার কাছে আস্‌বে না? বিয়ে করে' আমি একঘরে' হয়েচি নাকি? তুমি ত আচ্ছা স্বার্থপর? তুমি এসেচ আজ, এতদিন ওরাই ছিল আমার অন্তরঙ্গ। এতদিন আস্‌তে পারনি?"

শীলা মৃদু হাসিয়া কহিল—"এতদিন এ-সম্পত্তি এজমালি ছিল, সবাই ভোগ-দখল করেচে! আর তা নেই, এ এখন আমার মাল্‌কানি স্বত্ব।"

উভয়েই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

বাঘ যেমন ছাগলের দিকে লোলুপদৃষ্টিতে চায়, সেইরূপ চাহিতে চাহিতে, বৃন্দাবন আসিয়া নমস্কার করিয়া, শীলার কাছ পানে চেয়ারটা টানিয়া লইয়া বসিল।

এ নীরব ইঙ্গিতটি অসীম বুঝিল না, সে সাদরে বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিল। শীলা বিরক্ত হইয়া অসীমের দিকে সরিয়া বসিল।

অসীম জিজ্ঞাসা করিল—"তারপর, তোমার কতদূর? একটু শীগগির করে সেরে নাও ভাই, আমাদের আবার চৈতনপুর যেতে হচ্ছে।"

বৃন্দাবন বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"সে কি? এই সেদিন বল্‌লে, এখানে এখন থাক্‌বে! এরি মধ্যে আবার কি হল?"

শীলার পানে আড়চোখে একবার চাহিয়া, অসীম মৃদু হাসিয়া কহিল —"মানুষ ভাবে এক, দেবতা ঘটান আর-এক। আমি ত বলেছিলাম, এখানে থাক্‌ব: কিন্তু আমার জীবনদেবতা যে কলকাতায় থাক্‌তে মোটেই রাজী নন্! কি করি বল?"

বৃন্দাবন অভিনেতাসুলভ ব্যঞ্জনা ও অঙ্গহার প্রদর্শন করিয়া কহিল— "বল কি অসীম? তুমি যে অবাক্ করলে! তোমার পত্নীপ্রীতি যতই উঁচুদরের হোক্, আমি কিন্তু এতে খুসী হতে পার্‌লাম না।"

অসীম কহিল—"এখন পার্‌বে না। বিয়ে কর,' তারপর বুঝ্‌বে।"

বৃন্দাবন শীলার পানে একটা কটাক্ষ হানিয়া, কহিল—"দরকার নেই, ভাই, পেরে! বেশ আছি।"

অসীম প্রসঙ্গটি ঘুরাইয়া, জিজ্ঞাসা করিল—"তারপর, কতদূর কি হল?"

শীলা জিজ্ঞাসা করিল—"কি?"

অসীম কহিল—"তোমায় একটা প্রকাণ্ড বিস্ময় দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে।"

বৃন্দাবন বাধা দিয়া কহিল—"আমি বল্‌চি, বৌদি। আপনাদের বিয়ে হল, এখানে বসবাস আরম্ভ কর্‌লেন, তাই আমরা, আপনাদিকে এখানকার সমাজে পরিচিত করে দিতে একটা সম্বর্দ্ধনা কর্‌ব। তারি একটা পার্টি। অসীমের কিছু খরচ করিয়ে দেওয়া আর কি?"

শীলা বিশেষ ভীত হইয়া কহিল—"এ আপনাদের বড্ড বাড়াবাড়ি,

বৃন্দাবনবাবু। এ রকম ফিরিঙ্গিয়ানা আমি মোটেই পছন্দ করি না। হিন্দুকুলবধু সভায় দাঁড়িয়ে পরিচিত হবে কি?"

অসীম একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল—"আমি মত দিয়েচি, শীলা!"

সকাতর দৃষ্টিতে শীলা স্বামীর পানে চাহিয়া কহিল—"তুমি যখন কথা দিয়েচ, তখন আর কি? হোক।"

বৃন্দাবন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল—"আপনি অবাক্ করলেন, বৌদি। আজকালকার কোনও তরুণী যে পার্টি পছন্দ করেন না, এ একটা আবিষ্কার!"

শীলা একটু তীক্ষ্ণভাবে কহিল—"আপনার কাছে বিবাহই যখন অপ্রয়োজনীয়, তখন এটা ত আবিষ্কার মনে হবেই। এ পার্টির সার্থকতা কি, আমায় বুঝিয়ে দিতে পারেন?"

বৃন্দাবন চক্ষে অন্ধকার দেখিল। ঈদৃশ প্রশ্নের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। বৃন্দাবনের বিমূঢ় ভাব দেখিয়া, অসীম কহিল—"পার্টির প্রয়োজন, সামাজিকতা রক্ষা।"

বৃন্দাবন তাড়াতাড়ি অসীমের কথার প্রতিধ্বনি করিল।

শীলা কহিল—"সম্পূর্ণ মিথ্যা। সাহেবরা করে, অতএব আমাদিকেও করতে হবে! না করলে, সভ্যতা যেন অপ্রমাণিত থেকে যায়—এই মর্কট-মনোবৃত্তি! পার্টিতে কুমারী মেয়েরা আসে, বর পছন্দ করতে: তরুণেরা আসে, তরুণীদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে: আর অভিভাবকেরা আসে মেয়েদিকে স্বয়ম্বরা করাতে। সামাজিকতা দূরের কথা, পার্টিতে কারুর সঙ্গে কারুর আলাপ পর্য্যন্ত হয় না। সবাই নিজের নিজের তালে ঘোরে। এ সব আমি ঢের দেখেচি! এটা কি জানেন, বিনু বাবু?"

বৃন্দাবন হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি ?"

শীলা কহিল—"এ হচ্ছে, পুরুষদের ভদ্রভাবে পরস্ত্রীর সঙ্গে একটু আলাপ জমান এবং মেয়েদেরও পরপুরুষের মনে একটু চাঞ্চল্য জাগিয়ে দিয়ে আত্মপ্রসাদলাভের ধৃষ্টতা! ইংরেজের ঠাকুরঘরে ত আমরা ঢুকতে পারিনি, তাদের আস্তাকুঁড়ই কেবল দেখেচি: কাজেই, সেখান থেকে তাদের আবর্জ্জনাগুলোকে পরম শ্রদ্ধাসহকারে ঘরে নিয়ে এসে, পূজো করে' নিজেদিকে ভাবি, আমরা সভ্যতা-লক্ষ্মীর বরপুত্র !!"

বৃন্দাবন অপ্রসন্ন মুখে কহিল—"তাহলে এ থাক্, অসীম: বৌদির যখন এতে ভয়ানক অমত—"

শীলা বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি কহিল—"মাপ্ করবেন, বিনু বাবু। কথা হল বলেই, আমি আমার মনোভাবটা জানিয়ে দিলাম। আমার স্বামী যখন মত দিয়েচেন, তখন আমারও এতে সম্পূর্ণ মত আছে।"

বৃন্দাবনের নিকট অসীমের কথা শুনিয়া, টেঁপী তাহাকে ধরিয়াছে, এই উপলক্ষ্যে, একটা জলশা করাইয়া, তাহাকে কিছু পাওয়াইয়া দিতে এবং অসীম ও তাহার স্ত্রীর সহিত টেঁপীর আলাপ করাইয়া দিতে। বৃন্দাবন স্বীকার করিয়াছে। কাজেই, এ ব্যাপারে তাহার উৎসাহও অপরিসীম। এ প্রস্তাবে টেঁপীদের বর্ত্তমান আশ্রয়দাতা রামকিষণবাবু প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু টেঁপী তাহা শোনে নাই: শুধু টাকার জন্য নয়, সে ভদ্রসমাজে পরিচিত হইতে চায়, ঘরের কোণে আবদ্ধ থাকিবার জন্য সে নাচ গান শিখে নাই। বৃন্দাবন রামকিষণের বন্ধু, বৃন্দাবনও তাহাকে বহু উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে: রামকিষণ মত দিতে বাধ্য হইয়াছে।

' বিনু টেঁপীকে বলিয়াছে, সব ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। এখন কি করিয়া তাহাকে গিয়া বলে যে, হইল না! বৃন্দাবন সেইজন্য শীলার কথায় বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। শীলার উপর মনে মনে চটিয়া, অসীমকে ভাবিল—একটা অপদার্থ, স্ত্রৈণ, গাড়োল!

অসীম কহিল—"বল বিনু, কি কি হচ্ছে।"

বিনুর ধড়ে প্রাণ আসিল। কোনও রকমে মুখটা একটু প্রসন্ন করিয়া কহিল—"লণ্ডন হোটেলে বলে দিয়েচি, তারা পাঁচ-শো ডিনার খাইয়ে যাবে। খাবার সময়কার অর্কেষ্ট্রাও তারাই দেবে। বলা বাহুল্য, ডিনারের সঙ্গে ড্রিঙ্কও থাকবে। প্রথমে "মধুচন্দ্র" নামে ঘণ্টাখানেকের মত একটা গীতি-নাট্য অভিনয় হবে।"

অসীম কহিল—"বেশ নাম ত? মধুচন্দ্র। কার লেখা? কে কে অভিনয় করবে?"

বৃন্দাবন সবিনয়ে কহিল—"লেখা এই অধীনেরই। অভিনয় করবে—নরেন বোস, ধীরেন মজুমদার, আর আমি, স্ত্রী-ভূমিকায় থাকবেন, কুমারী তপতীদেবী, খনাদেবী এবং বীথিদেবী।

অসীম কহিল—"তারপর।"

বৃন্দাবন কহিল—"তারপর ডিনার, সঙ্গে ইংরেজী অর্কেষ্ট্রা। ডিনারের পর সিনেমা।"

শীলা জিজ্ঞাসা করিল—"কি ছবি?"

বৃন্দাবন জানাইল—"হনুমান্ ফিলিমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক আলেখ্য, চিত্রজগতে যা মন্বন্তর এনেচে! সেই অবিস্মরণীয় কথাচিত্র—রাঁধুনী বামনীর কাঁদুনী মেয়ে। এতে কোনও খরচ নেই. খরচ কেবল

শো-পাঁচেক লাগ্‌বে ঐ মেয়ে-কটির জন্যে। মেয়েগুলি ভদ্রঘরের, এই করেই তারা খায় কি না!"

শীলা জিজ্ঞাসা করিল—"অভিনয় করে', নেচে গেয়ে যারা খায়, কি-রকম ভদ্র ঘরের মেয়ে তারা?"

অসীম কহিল—"এ জান্‌তে চেয়ো না শীলা! আজকাল নর্ত্তকী অভিনেত্রী বা গাইয়ে মেয়ে, সবই ভদ্রঘরের! পেশাদার নর্ত্তকী-বাঈজীর দিন আর নেই। আজকাল তারা অচল।"

বৃন্দাবন কহিল—"আমাদের সব প্রস্তুত। কাল থেকে তাহলে লোকজন লাগিয়ে দিই, মণ্ডপ তৈরি করুক্। আজ মঙ্গলবার, শুক্রবারে হোক্ উৎসব। কি বল?"

অসীম কহিল—"উত্তম।"

বৃন্দাবন আর কাল-বিলম্ব করিতে চাহিল না। কি জানি, আবার যদি মত বদ্‌লায়? বৃন্দাবন তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। এই সম্বর্দ্ধনা ব্যাপারে শীলা রাজী হইল বটে, কিন্তু তাহার মন প্রসন্নভাবে সায় দিল না।

*　　*

বাড়ীর সম্মুখস্থ কম্পাউণ্ড জুড়িয়া, সৌধসংলগ্ন হোগ্‌লার দুইটি প্রকাণ্ড মণ্ডপ। ভিতরে সুদৃশ্য চাঁদোয়া এবং পর্দ্দা, নীচে দামী শতরঞ্চি পাতা। মণ্ডপে বিদ্যুৎ-বাতির অনেকগুলি ঝাড় ব্যতীত, খোলা বাতিও বহু। মণ্ডপের বাহিরের চতুর্দ্দিকে বিবিধ বর্ণের বাতির চারনরী হার।

শিল্পীগণকে লইয়া যথাসময়ে আসিবে বলিয়া, মণ্ডপ এবং মঞ্চ সাজাইতে সাজাইতে বেলা একটায় বৃন্দাবন চলিয়া গিয়াছে। যাহা বাকী রহিল, অসীম ও শীলা পরিদর্শন করিয়া শেষ করিবে বলিয়া

প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল : কিন্তু ছয়টা বাজিল, মণ্ডপসজ্জাই শেষ হইল না, অথচ অতিথি আঁসিতে আরম্ভ করিল।

একদিকে মণ্ডপ-সজ্জা পরিদর্শন ও অন্যদিকে অতিথিগণকে অভ্যর্থনা করিতে, দম্পতি মহাবিব্রত হইয়া পড়িল। সাড়ে ছয়টার মধ্যেই সুসজ্জিত এবং সুবেশা নারীনরে মণ্ডপে তিল ধারণের পর্য্যন্ত স্থান রহিল না। তখনও বৃন্দাবন পৌঁছিল না, অসীম মহা চিন্তিত হইয়া পড়িল।

ইহারা এখনও স্নান প্রসাধন পর্য্যন্ত করিতে সময় পায় নাই। অসীম ঠিক করিল, অভিনয় আরম্ভ হইলেই, তাহারা উক্ত কার্য্য সারিয়া লইয়া, ঠিক ডিনারের পূর্ব্বেই আসিয়া, সকলের সহিত যোগ দিবে। শীলাও অগত্যা তাহাতেই রাজী হইল।

নীচেকার হলের একদিকে হোটেলের পরিচারকগণ আহার্য্য ও তৈজসপত্রাদি জমা করিয়াছে, অন্যদিকে পানীয়ের সদাব্রত খুলিয়া দিয়াছে। অভ্যাগতগণের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জন একে একে পানসত্রে আসিয়া আলাপ-আলোচনায় বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মণ্ডপে রহিল নারীরাজ্য এবং কয়েকজন পুরুষ। বাড়ীর বামে রঙ্গমঞ্চ ও দক্ষিণে সিনেমাঘর এবং উভয়ের সম্মুখেই দুইটি পৃথক্ মণ্ডপ।

গুঞ্জনরত জনতা সহসা নিস্তব্ধ হইল। অসীম ফিরিয়া দেখে, বৃন্দাবন কখন আসিয়া পড়িয়াছে। অভিনয়ের পূর্ব্বে কন্‌সার্ট আরম্ভ হইল। অসীমও নিশ্চিন্ত হইল। ক্লান্তভাবে দ্বিতলের পথে যাত্রা করিল, পথিমধ্যে শীলার সহিত দেখা।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে অসীম কহিল—"বেশী দেরী করোনা রাণী! আমাদিকে কেউ যদি খুঁজে না পায়, তা হলে ভারী অন্যায় হবে।"

শীলা কহিল—"আমার দশ মিনিটও লাগবে না। তোমার যদি আগে হয় ত, পালিও না যেন। আমায় ডেকো, একসঙ্গে আসব।"

অসীম পুলকিতভাবে অভিনয়ের স্বরে—"যথা আজ্ঞা তব মহারাণি—" বলিতে বলিতে নিজের কক্ষে অদৃশ্য হইল। শীলাও হাসিতে হাসিতে তাহার কক্ষে ঢুকিয়া, ভিতর হইতে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

কনসার্ট-শেষে মধুচন্দ্র-গীতিনাট্যের অভিনয় আরম্ভ হইল। পানসত্র কিঞ্চিৎ পাতলা হইল বটে, কিন্তু একেবারে খালি হইল না। হোটেল পরিচারকগণ সিনেমা-ঘরের সম্মুখস্থ মণ্ডপে ডিনারের চেয়ার-টেবিল কাঁটা-চামচ প্লেট-ন্যাপকিন্ সাজাইতে লাগিল।

বাহির হইতে স্বামীস্ত্রীর দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগ মনে হইলেও, আসলে কিন্তু একটিই ঘর। প্রত্যেক বিভাগে তিনটি করিয়া কক্ষ : ভিতরে ভিতরে যাতায়াত চলে। অসীমের দিকে ঢুকিলে, প্রথমেই একটি বসিবার ঘর : এখানে লেখাপড়া, আলাপ-আলোচনা এবং জমিদারী-সংক্রান্ত সব কাজকর্ম্ম হয় ; পাশে প্রসাধনকক্ষ ও তাহার পর কলঘর। প্রসাধনকক্ষের মধ্যে একটি দুয়ার আছে, তদ্দারা যে-ঘরে যাওয়া যায়, সেইটিই উভয়ের শয়নকক্ষ। শীলার দিকেও অনুরূপ ব্যবস্থা : তাহারও প্রসাধান ঘর দিয়া শয়নকক্ষে ঢুকিবার একটি দরজা আছে।

শীলা তাড়াতাড়ি তাহার গায়ের গহনাগুলি খুলিয়া, ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখিয়া, কলঘরে ঢুকিয়াছিল, কিন্তু বাহিরে আসিয়া সেদিকে প্রথমে লক্ষ্য না করিয়া, আলমারি খুলিয়া অলঙ্কার ও কাপড়-চোপড় বাহির করিয়া, পুরাতনগুলি রাখিবার নিমিত্ত, টেবিলের নিকট গিয়া দেখিল—সেখানে কিছুই নাই! একি? কোথায় রাখিল? তাহার ঠিক

মনে আছে, সে ড্রেসিং টেবিলের উপরেই রাখিয়াছিল! নীচে পড়িয়া গিয়াছে কিনা দেখিবার নিমিত্ত, হেঁট হইয়া দেখিতে গিয়া, শীলা যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল! সে ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া থরথর কাঁপিতে লাগিল।

বীভৎস-আকৃতি একটা লোক আলমারির আলোআঁধারি কোণ হইতে বাহিরে আসিয়া, সজোরে শীলার মুখ চাপিয়া ধরিয়া, নিম্ন স্বরে কহিল—"ভয় নেই, চেঁচিও না—আমি জীবা। মোটরদুর্ঘটনায় আমার এ রকম চেহারা হয়েচে। ভাল করে দেখ, চিন্‌তে পার্‌বে।"

কম্পিতদেহে বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, শীলা কহিল—"তা তুমি এখানে কি কর্‌চ? আমাব ড্রেসিং ঘরে এমন ইতরের মত লুকিয়ে কেন?"

জীবানন্দ বক্র হাসিয়া কহিল—"তুমি বেশ ভদ্র কুলবধূ হয়েচ ত?"

শীলা কহিল—"আমার গয়নাগুলো তাহলে তুমিই চুরি করেচ। শীগ্‌গীর বের করে' দিয়ে, এই মুহূর্ত্তে বেরিয়ে যাও।"

জীবানন্দর মুখে হিংস্র কুকুরের মত একটা ভাব ফুটিয়া উঠিল। কহিল—"আমার কিছু টাকার দরকার: অন্তত হাজারখানেক। টাকাটা দিয়ে দাও, চলে যাচ্ছি।"

শীলা কহিল—"টাকা পয়সা আমার কাছে নেই, থাকেও না! দয়া করে আমার গয়নাগুলো দাও, আমার সময় নেই। বাইরে আমার স্বামী আমার জন্যে অপেক্ষা কর্‌চেন। তোমায় দেখলে তিনি কি ভাব্‌বেন?"

জীবানন্দ কহিল—"সেই জন্যেই বল্‌চি, টাকাটা শীগ্‌গীর দিয়ে ফেল', নৈলে কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত হবে। তুমিই ঠক্‌বে।"

শীলা তখনও কাঁপিতেছিল। কোনও রকমে শাড়ীটা তাহার গায়ে

জড়ান ছিল মাত্র, কাপড় পর্য্যন্ত পরা হয় নাই। শীলার মাথা ঘুরিতেছিল, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিল, মুখের ভিতর মরুভূমি, মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হয় না। অতিকষ্টে কহিল—"আমার বালাজোড়াটা দাও আগে—তোমার পায়ে পড়ি। ওটা খুলতে নেই। কখনও খুলি নি। কি দুর্ম্মতি হল, কেন আজ খুললাম!"

জীবানন্দ কহিল—"জমিদারের স্ত্রী! দু-তিন হাজার টাকা খরচ করে পার্টি দিচ্ছ, আর আমার বেলায় এই এক হাজার টাকা নেই? চালাকী?"

শীলা কাঁদিতে চায়, চোখে জল আসে না: চিৎকার করিতে চায়, গলায় স্বর ফুটে না।

জীবানন্দ কহিল—"ঐ শোন, তোমার পতিদেবতা তোমায় ডাকচেন। তাহলে কি লোক জড় করে', সেই গোপন কথাটা জানাজানি করাতে চাও?"

শীলা ধপ করিয়া জীবানন্দের পদতলে পড়িয়া, আর্ত্তস্বরে মিনতি জানাইল —"আমায় বাঁচাও, আমায় রক্ষা কর,—আমার বালাজোড়াটা ফিরিয়ে দিয়ে, চলে যাও। আমার সর্ব্বনাশ ত করেচ—আমায় বাঁচতে দাও—"

জীবানন্দ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। কহিল—"ভয় নেই, আমারও সর্ব্বনাশ হয়েচে! তুমি একলা মরবে না, আমিও সঙ্গে যাব। এখন, আমিও বাঁচতে চাই, তাই কিছু টাকার দরকার—"

বাহির হইতে অসীম ডাকিতেছিল—"শীলা, শীলা—"

ক্রমশ দুয়ারে মৃদু হইতে জোরে করাঘাত হইতে লাগিল। শীলা উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিতে অগ্রসর হইতেই, জীবানন্দ তাহার হাত ধরিয়া এমন একটা হেঁচকা টান দিল যে, খোলা আলমারির দুয়ারে ছিটকাইয়া পড়িয়া, শীলার কপাল কাটিয়া দর দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল।

অসম্বৃত বস্ত্রে, তপ্ত রক্তের স্রোতে মুখ গুঁজিয়া, জ্ঞান হারাইয়া শীলা কক্ষকুট্টিমে পড়িয়া রহিল।

জীবানন্দ আলমারি হইতে যাহা সম্মুখে পাইল, তাড়াতাড়ি পকেটে ভরিয়া, যেদিক দিয়া আসিয়াছিল, সেই দিক দিয়া অর্থাৎ কলঘরের পশ্চাদ্দিকস্থ ঘুরান-সিঁড়ি বাহিয়া, পলাইবার উপক্রম করিল।

অভিনয় শেষ হইয়াছে। অভ্যাগত নরনারীগণ মঞ্চমণ্ডপ ছাড়িয়া, চিত্র-মণ্ডপে আসিয়া ডিনারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছিল। হলের পানসত্রে আবার ভীষণ ভীড় জমিল। ডিনারের সমভিব্যাহারী অর্কেষ্ট্রা বাজিয়া উঠিল। ডিনারের পরেই ছায়াচিত্র দেখান হইবে।

অসীম বহু ডাকাডাকি করিয়া শীলার কোনও সাড়াশব্দ না পাইয়া, অত্যন্ত ভীত হইয়া, চাকরবাকরদিগকে ডাকিয়া আনিল। কিছুক্ষণ দুয়ারে ধাক্কাধাক্কি করিয়াও যখন কোনও ফল ফলিল না, অসীমের আদেশে তখন দুয়ার ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল।

উজ্জ্বল কক্ষ। আল্‌মারির দুই পাট দুয়ারই খোলা। ঘরময় শাড়ী-শায়া ব্লাউস এটা-ওটা ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। আল্‌মারির গোড়ায় রক্তাপ্লুত দেহে জ্ঞানহারা শীলা উপুড় হইয়া পড়িয়া! গৌর পৃষ্ঠ ও বাহু অনাবৃত, কটিতে কোনও প্রকারে শাড়ীখানা আল্‌গাভাবে জড়ান মাত্র।

ভৃত্যেরা "খুন্, খুন্" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। অসীম তাহা-দিগকে গোল করিতে নিষেধ করিয়া, তাড়াতাড়ি শীলার মাথাটি কোলে তুলিয়া লইয়া, জল আনাইয়া, মুখ চোখ মুছাইয়া দিয়া জলপটি বাঁধিতে লাগিল। ভৃত্যেরা পাখা খুলিয়া দিল।

টেঁপী ক্ষেন্তি ও বুঁচিকে লইয়া বৃন্দাবন ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে কহিল—

"কি হে, তোমাদের ব্যাপারখানা কি বল ত? এমন সুন্দর অভিনয় হল, কর্ত্তাগিন্নিতে তোমরা কেউ একবার উঁকিও মার্‌লে না? একি? বৌদির কি হল? শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েচে নাকি? তাইত! কি মুস্কিল! তপতীদেবী যে এসেছিলেন, তোমাদের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে: এঁরা, তপতীদেবীর বোন্ খনাদেবী, বীথিদেবী—"

ঘরে ঢুকিতেই, অসীম বৃন্দাবনের দিকে অত্যন্ত বিরক্তভাবে একবার চাহিল মাত্র,:কিছুই বলিল না—তাহার কোনও কথাতেও কাণ দিল না: অনন্যমনে শীলার কপালের জলপটিতে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল।

তপতী করতালি দিয়া উচ্চহাস্য করিয়া কহিল—"কেমন ঠকিয়েচি তোমায়, বীনু? অসীমবাবু, আমায় চিন্‌তে পারেন? নমস্কার।"

রাগে এবং লজ্জায় মুখ না তুলিয়াই কঠোরভাবে অসীম কহিল—"তোমার কি এতটুকু আক্কেল নেই, বীনু? দেখ্‌চ আমার স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে অজ্ঞান, আর এই সময়ে তুমি এলে রসিকতা করে' আলাপ জমাতে? এখন যাও, নীচে বসগে। লোকজনের খাওয়াদাওয়া যাতে সুশৃঙ্খলায় হয়, তাই দেখগে—আপনারাও দয়া করে' এখন নীচে বসুন্ গে। এটা আলাপের সময় নয়! আমায় এখন বিরক্ত কর্‌বেন না।"

অসীম ইহাদের মুখপানেও চাহিল না। বৃন্দাবন চলিয়া যাইতে চাহিল, টেঁপী বাধা দিয়া ইশারা করিল—দাঁড়াও, না।

শীলা ধীরে ধীরে ক্লান্তভাবে উঠিয়া বসিয়া, অসীমকে কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিয়া, চারিদিকে ভীতভাবে চাহিয়া কহিল—"চলে গেছে? সে চলে গেছে? তুমি আর আমায় ছেড়ে কোথাও যেও না! একটু জল—একটু জল—" একজন ভৃত্য এক গেলাস জল ঢালিয়া দিল।

'ভয় কি? ভয় কি? এই ত রয়েচি। কে এসেছিল;
নেই ঘরে!" বলিয়া অসীম শীলার পিঠে কাপড় খানা টা
মুখের নিকট জলের গেলাসটা ধরিল।

জলপান করিয়া সুস্থ হইয়া, শীলা কহিল—"আমার বালা

অসীমও এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই। বিস্মিত ভাবে কহিল
বালা ত এখানে পড়ে নেই? সে বালা কি করে হারালে?"

অসীমেরও মাথা ঘুরিয়া উঠিল।

শীলা অস্বাভাবিক রকমের আর্ত্ত কণ্ঠে কহিল—"চোরে নি
ঘরে চোর এসেছিল। চোর—চোর—" বলিতে বলিতে ডুক
উঠিল।

নীচেও সেই সময় "চোর, চোর" শব্দে গোলমাল হইল।
লোকেরা বাড়ীর পিছন দিকে খাবারগুলি গরম করিতে
কলঘরের ঘুরান-সিঁড়ি দিয়া একজন বীভৎস চেহারার লোক
জনকভাবে নামিতে দেখিয়া, চোর ভাবিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছে
মাল শুনিয়া, অভ্যাগতগণের মধ্য হইতে কতকগুলি লোক গিয়া
প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া, তাহার পকেট তল্লাসী করিয়া অনেক
পায়। গহনাসুদ্ধ চোরকে ধরিয়া, কোলাহল করিতে করিতে
উপরে আসিয়া সমবেত হইল।

শীলা চোরকে দেখিয়া "ঐ চোর" বলিয়া উন্মাদের মত স্বা
মুখ লুকাইয়া, সজোরে অসীমকে জড়াইয়া ধরিল।

চোর কহিল—"আমি চোর নই অসীম, আমি জীবানন্দ
এ গয়না শীলা আমায় দিয়েচে। সত্যি-মিথ্যে ওকে জিজ্ঞেস ক